বুদ্ধিবৃত্তিক
আগ্রাসনের
ইতিবৃত্ত
মাওলানা ইসমাইল রেহান
আহমাদ সাব্বির
অনূদিত

মাওলানা ইসমাইল রেহান। সময়ের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ। জন্ম ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে, পাকিস্তানের বন্দরনগরী করাচিতে। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তাকমিল সম্পন্ন করেন। ২০০৬ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিএ (সম্মান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিহাস গবেষণায় তিনি মাওলানা আবদুর রশীদ নোমানী রহ. এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ২০১০ সালে করাচি উরদু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি গবেষণা, গ্রন্থরচনা ও পত্রিকা সম্পাদনা করে যাচ্ছেন। এ যাবত প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা অনেক। বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়ে এসেছে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস (দুই খণ্ড), মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস (১৫ খণ্ড), বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড, বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত ইত্যাদি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা লেখকের কর্মমুখর জীবনে এবং সময়ে বরকত দান করুক।

বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত

বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত

মূল
মাওলানা ইসমাইল রেহান
অনুবাদ
আহমাদ সাব্বির

নাশাত

বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত
লেখক : মাওলানা ইসমাইল রেহান
অনুবাদক : আহমাদ সাব্বির

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০২১

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৬২৭৪৬৩০৬৮, ০১৭১২২৯৮৯৪১
nashatpub@gmail.com

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
বানানসংশোধন : মুহাম্মদ আমানুল্লাহ আবিদ

মূল্য : ৪৭৫ (চারশ পঁচাত্তর) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

মুসা আল হাফিজ

দুঃসময়ের বধ্যভূমিতে একজন স্বপ্নচাষী

নাশাতের আরও কিছু বই

খোলাসাতুল কোরআন/ মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী রহ.
হিউম্যান বিয়িং : শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব/ ইফতেখার সিফাত
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত/ সাইয়েদ সুলাইমান নদবী রহ.
খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস/ মাওলানা ইসমাইল রেহান
সিরাতে রাসুল : শিক্ষা ও সৌন্দর্য/ ড. মুসতফা সিবায়ী
মোগল পরিবারের শেষদিনগুলি/ খাজা হাসান নিজামী
ইসলাম ও কোয়ান্টাম মেথড/ মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন
ইসলাম ও মুক্তচিন্তা/ মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

আমরা যখন নিজেদের খুঁজে পাই
ফুলের সুগন্ধিতে খুঁজে পাই

মাওলানা ইসমাইল রেহান। সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় বোধহয়—তিনি একজন ইতিহাসবিদ। আমাদের চারপাশে হরহামেশাই যত কপিপেস্ট ঐতিহাসিক দেখে উঠি তেমন নয়; বরং সত্যিকার অর্থেই ইসমাইল রেহান একজন ঐতিহাসিক। তার রয়েছে অতীতের বুকে আলো ফেলার তীব্র ও দারুণ এক ক্ষমতা। রয়েছে 'পেছন পানে' ফিরে তাকাবার বিস্ময়কর একজোড়া 'চোখ'। তিনি অতীত খুঁড়ে 'বেদনা' জাগাতেই কেবল ভালোবাসেন না; বরং সময়ের সাথে অতীতের সেতুবন্ধন তৈরি করবার কাজটিও করেন বেশ চমৎকারিত্বের সাথে। ফলে ইতিহাস হয়ে ওঠে তাৎপর্যময়; বোধজাগানিয়া। এ কি আমাদের সৌভাগ্য—আমরা তার কালে জন্মেছি! নিঃসন্দেহে। অতীতের আয়নায় বর্তমানকে জাগরূককারী এমন একজন 'মাওলানা'কে আমরা পেয়েছি—সত্যিই আমরা গর্বিত।

আমার সৌভাগ্য আরও খানিক সুপ্রসন্নই হবে হয়তো-বা। নইলে আমার দ্বারা আল্লাহ পাক তার মতন একজন লেখকের এমন অনিন্দ্যসুন্দর ও প্রয়োজনীয় একটি কিতাব ভাষান্তর কেন করাবেন! এই বেলাতে তাই শুকরিয়া আদায় করছি দয়াময়ের। আলহামদুলিল্লাহ।

বলছি মাওলানার লিখিত 'নজরিয়াতি জঙ্গ কে মাহাজ' গ্রন্থের কথা, যা ইতোমধ্যে ভাষান্তরিত হয়ে 'বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত' নাম নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে। নাম থেকেই পাঠক বইটির আলোচ্য উপলব্ধ করে উঠেছেন নিশ্চয়ই। সেই সৃষ্টির শুরু যেদিন, সেদিন থেকেই সত্য-মিথ্যা, সাদা আর কালোর দ্বন্দ্ব। সেই প্রথমদিন থেকেই আলো-আঁধারের বিরোধ। প্রতিকালে, প্রতিযুগেই অন্ধকার চেয়েছে আলোর যাত্রা রুখে দিতে, মিথ্যা চেয়েছে সত্যের টুঁটি চেপে ধরতে; কিন্তু আলো বরাবরই ভাস্বর থেকেছে আপন দ্যুতিতে। সত্য কোনোকালেই মাথা নত করেনি মিথ্যার সামনে। মাওলানা তার গ্রন্থে সত্য-মিথ্যার আবহমান দ্বন্দ্বের সেই দাস্তানই হাজির করেছেন।

আর এই ইতিবৃত্ত তুলে ধরতে গিয়ে তিনি যে আখ্যান সাজিয়েছেন, তাতে কেবল অতীতের চিত্রই চিত্রায়িত করেননি। বরং যেমনটা সূচনা অংশে বলেছিলাম, বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অন্ধকার ও মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যপন্থি-আলোর মশালবাহীদের করণীয় কী হবে—তা-ও নির্দেশ করেছেন ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের অভিনব

মিশেলে। মাওলানা অতীত ও বর্তমানের নানা উপাখ্যান ছেনে আমাদের দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন—কালে কালে মিথ্যা কী কী রূপ ধরে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাল আমলেই-বা মিথ্যার রূপ কেমন! সে কোন আকৃতি নিয়ে হাজির হয়েছে আমাদের দুয়ারে! কোন বেশে আঘাত করে চলেছে সত্যের প্রাসাদে—তার পূর্ণ ছবি অঙ্কন করেছেন লেখক তার এই বিস্ময়কর চিত্রপটে: 'বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে।

পাঠক, মাওলানা ইসমাইল রেহানের এই নান্দনিক ভুবনে আপনাকে স্বাগতম।

যেকোনো নির্মাণ, যা আমরা পূর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ করে উঠি, তার পেছনে থাকে বহু মানুষের গল্প। আমার এই অনুবাদকর্মটিও তার বিপরীত নয়। পাঠকের টেবিল পর্যন্ত পৌঁছতে তাতে মিশে গেছে অজস্র মানুষের ঘাম। লেগে গেছে বহুজনের করস্পর্শ। বইটির সাথে যার 'সামান্যও' সংশ্লেষ ঘটেছে, এই সুযোগে আমি তাদের সকলকে স্মরণ করছি শ্রদ্ধার সাথে। পরম করুণাময় তাঁর শান অনুযায়ী প্রত্যেকের আমলনামা পূর্ণ করে দিন।

তবে যে মানুষটির কথা আলাদাভাবে না বললে বিরাট অন্যায় হবে, তিনি আমার মা। এই বইটির প্রতি হরফে তার স্নেহ-মমতা মিশে আছে। প্রকাশকের বেঁধে দেওয়া সময় পেরিয়ে যাচ্ছিল। নানান ব্যস্ততায় কাজটি সম্পাদিত হয়ে উঠছিল না। শেষমেশ একটানা কয়দিন বুঁদ হয়ে কাজটি শেষ করি। যে কয়দিন কাজ নিয়ে ডুবে ছিলাম, আমার পাশে আমার মায়ের উপস্থিতি টের পেয়েছি নিজের ছায়ার মতন। আমার ঘনঘন চা পানের অভ্যাস। কাজ করতে গিয়ে যখনই তেষ্টা অনুভব করেছি, দেখি আম্মু চায়ের পেয়ালা নিয়ে হাজির। কখনও তাকে নির্দেশ করেছি—এমন নয়। নিজের থেকেই সারাক্ষণ আমার চাহিদা মিটিয়ে গেছেন তিনি। কাজ ফেলে পানি খেতে উঠব। দেখতে পাই, মা পানির বোতল নিয়ে হাজির। কখনও বাজার-সদাই বা টুকটাক কিছু কেনাকাটার প্রয়োজন হলে আমি যেতে চাইলে মায়ের নির্দেশ হতো—তুই লেখ, আমি অন্য কাউকে পাঠাচ্ছি। মায়ের এমন মমতার বিপরীতে কীইবা বলার থাকতে পারে! কেবল এই এতটুকু ছাড়া—রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা।

এবারে অনুবাদ বিষয়ে দু' চার কথা বলি। ভাষান্তর নিঃসন্দেহে জটিল কাজ। অন্য একটি ভাষার বক্তব্য, আরেক ভাষার লেখকের ভাবাবেগ নিজ ভাষায় তুলে আনা কোনো সহজ কর্ম নয়। যে কারণে অনুবাদকাজটি সব সময়ই এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছি। তদুপরি এই বইটি তত্ত্বচর্চার বই, বিজ্ঞজনেরা যার ভাষান্তর প্রায় অসম্ভবই মনে করে থাকেন। সত্যিও তাই। তত্ত্বের অনুবাদ নানা কারণেই অসম্ভবপ্রায়। তার একটি প্রধান অন্তরায়—ভাষার সীমাবদ্ধতা। দ্বিতীয় হলো—আরবি-উরদু-ফারসিসহ বিদেশি ভাষার বহু পরিভাষা এখন পর্যন্ত আমাদের ভাষায় অনূদিত হয়ে আসেনি। পরিভাষার অনুবাদ আদৌ সম্ভব কি না—সে 'তর্কের' জায়গা

এটা নয়। তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে পরিভাষাগত জটিলতা যে সত্যই এক প্রতিবন্ধকতা—বিজ্ঞজনেরা আশা করছি তাতে একমত হবেন। তারপরও চেষ্টা করেছি। আমার তরফ থেকে অনুবাদটি সাবলীল, প্রাঞ্জল এবং ভাব ও বক্তব্য ঠিক রেখে মূল ভাষার গন্ধ দূর করবার ক্ষেত্রে কোনো কসুর রাখিনি। বাকি বিচারের ভার পাঠক ও সমালোচকদের হাতে। তবে একটি কথা—ভাষান্তর করবার ক্ষেত্রে প্রথম ছত্র থেকেই আমার মাথায় ছিল যে, এটি প্রবন্ধের বই; গল্প-উপন্যাস নয়। পাঠকও যদি পাঠকালে এই ব্যাপারটা মাথায় রাখেন তাহলে সুবিধাই হবে বোধ করি।

পাঠক, একথা প্রায় অলিখিত রীতি হয়ে গেছে—মানুষ ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। এবং আমিও নিজেকে মনুষ্যসম্প্রদায়ভুক্তই ভাবি। তাই বলছি—ভুল-চুক যা কিছুই আপনাদের নজরে পড়বে, আমাদের জানাবেন। আমরা নিজেদের সংশোধনের জন্য সহাস্য প্রস্তুত। কেবল বলার জন্যই নয়; বরং মন থেকেই বলছি—এই অনুবাদকর্মের যা কিছু বিচ্যুতি, তার দায়ভার আমার। আর ভালো যা কিছু, তা কেবলই আমার নয়; বরং শ্রদ্ধাভাজন মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারুক, মুহাম্মদ আমানুল্লাহ আবিদ এবং বন্ধুপ্রতীম আল মাসুদ আবদুল্লাহরও তাতে অংশ আছে। তারা আন্তরিক না হলে আমার বহু বিচ্যুতি পাঠকের থেকে আড়াল করা সম্ভব হতো না। এই অবকাশে তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

শেষ করছি। বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত সকলের বোধজাগানিয়া হোক—প্রত্যাশা।

আহমাদ সাব্বির
নিউ টাউন, দিনাজপুর
ahmedsabbir7422@gmail.com

যুদ্ধজয়ের পূর্বে দেখা হয়ে থাকে

১. আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কার সাথে?
২. শত্রুর হামলা কোন দিক থেকে আসছে?
৩. তাদের লক্ষ্য কী?
৪. প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র কোনটা, কেমন?
৫. লড়াইয়ের হাতিয়ার কী কী?
৬. আমাদের অবস্থান কেমন? অর্থাৎ আমাদের শক্তি-সামর্থ্য কেমন, যা আমরা কাজে লাগাবো; এবং আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা কী, যা থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।
৭. শত্রুর অবস্থান কী? অর্থাৎ তাদের শক্তি-সামর্থ্য কেমন? এবং তাদের দুর্বল পয়েন্টগুলো কী, যার উপর আমরা আঘাত হানতে পারি?

এক কঠিন যুদ্ধ, যাতে সাফল্যের সাথে জয়ের আশা ও প্রত্যাশা করা হয়ে থাকে, তাতে তখনই অবতীর্ণ হওয়া যেতে পারে যখন যুদ্ধের শুরু থেকেই উল্লিখিত বিষয়গুলোর জবাব আমাদের কাছে প্রস্তুত থাকবে।

সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে সেই উত্তরগুলোই আমরা পেতে যাচ্ছি...

ক্রমবিন্যাস

১. পরিচিতি।
২. বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত।
৩. ক্রুসেড।
৪. ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যতত্ত্ব।
৫. কলোনিয়ালিজম বা উপনিবেশবাদ।
৬. গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন।
৭. মিশনারি কার্যক্রম।
৮. সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষবাদ।
৯. পাশ্চাত্যতত্ত্ব।
১০. বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের উপকরণ।
১১. বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিপক্ষের সাথে মোকাবেলার পন্থা ও উপায়।

মুখবন্ধ

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই আরবদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সিলেবাসভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কিন্তু পাক-ভারত উপমহাদেশের মাদরাসাগুলোতে এখন পর্যন্ত বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধ হয়ে ওঠেনি। বিষয়টি নিয়মতান্ত্রিকভাবে মাদরাসার পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ বিষয়ে গবেষণা ও গভীর বিশ্লেষণধর্মী লেখাজোখা প্রস্তুত করা এখন সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হয়ে দেখা দিয়েছে।

পাকিস্তানের খ্যাতনামা ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামিয়াতুর রশিদ আহসানাবাদ করাচি এই শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসে। সেই উদ্যোগের অধীন এই বিষয়টিকে প্রথমে 'শরিয়াহ অনুষদে' এবং পরবর্তী সময়ে 'দাওয়াহ অনুষদে' আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৪২৮ হিজরিতে (২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ) যখন 'বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই' বিষয়টিকে আমার দায়িত্বে দেওয়া হয় তখনও আমার জানা ছিল না যে, কখনো এই বিষয়ে আমাকে কলম ধরতে হবে! কিন্তু কয়েকদিন লেকচার দেওয়ার পর শিক্ষার্থীদের তরফ থেকে দাবি আসতে থাকে যে, এই বিষয়ে উরদু ভাষায় যেন আমি কিছু রচনা করি। এর কারণ হয়তো-বা ছিল, সেই সময় এই বিষয়ে কোনো আরবি বইপত্র পাকিস্তানে সহজলভ্য ছিল না। আর বিশেষ আগ্রহী যারা, এই বিষয়ক বইপত্রের সন্ধানের জন্য তাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হতো। এমতাবস্থায় এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা ছিল স্পষ্টতই অত্যন্ত পরিশ্রমের।

যেহেতু পাঠদান প্রস্তুতির জন্য এই বিষয়ে আমার অধ্যয়নের ভিত্তি ছিল 'বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই' বিষয়ে রচিত আরবি বইপত্র, সে কারণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উরদু কোনো রচনা আমার অনুসন্ধানেরই প্রয়োজন পড়ে না। তারপরও এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের কথা মনে করে যখন উরদু বইপত্রের সন্ধান আরম্ভ করলাম তখন দ্রুতই আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আমাদের মাতৃভাষায় মনস্তাত্ত্বিক আগ্রাসন নিয়ে, স্বতন্ত্রভাবে এই শাস্ত্রে, কোনো রচনাই এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি। এটা অস্বীকার করি না—ইতিহাস, পত্রপত্রিকা এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে লিখিত বইপত্র থেকে এই বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল; কিন্তু সেগুলো এমন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে যে, সেগুলোকে একটি ট্রাকে উঠিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্রের ছাঁচে ঢেলে পরিবেশন করা কোনো সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য, যাদের মাথার উপর আরও কয়েকটি বিষয়ের বোঝা ইতোমধ্যে তুলে দেওয়া আছে; এই সম্পূর্ণ নতুন শাস্ত্রের জন্য, তৎসংশ্লিষ্ট বইপত্র অনুসন্ধানের জন্য এত সময় বের

করা তাদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভবই। এই কারণেই শরিয়াহ অনুষদের প্রিন্সিপাল মাওলানা আলতাফুর রহমান, দাওয়াহ অনুষদের পরিচালক মাওলানা ফাইয়াজ আহমদ এবং আরও কতিপয় বন্ধু-স্বজন বারবার অধমকে উল্লিখিত প্রয়োজনপূরণে এগিয়ে আসার জন্য তাগাদা দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি নিজেও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের বিষয়টি অনুধাবন করে আসছিলাম। অবশেষে আমি এই বিষয়ের বিরাট কলেবরের সব গ্রন্থ নিংড়ে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা রচনা করি, যা 'নজরিয়াতি জঙ্গ কে উসুল' নামে প্রকাশিত হয়। এবং বর্তমানে জামেয়াতুর রশিদের দাওয়াহ অনুষদে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই বিষয়ে মূলপাঠ হিসেবে পড়ানো হচ্ছে।

যাই হোক, এরপরও বন্ধুদের পক্ষ থেকে তাগিদ ও প্রত্যাশা অব্যাহত থাকে। তাদের দাবি-সেই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটির বিস্তার, যা আমি আমার ক্লাসরুম লেকচারে করে থাকি, যেন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করি। ইতোমধ্যে করাচির বিভিন্ন স্থানে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই বিষয়ে বিভিন্ন কোর্স করানোর সুযোগও আমার ঘটেছে। আর কতিপয় বন্ধু সে-সব কোর্সের লেকচারগুলো রেকর্ড করে রেখেছে; কেউ আবার শ্রুতিলিখনও সম্পন্ন করে উঠেছে।

বন্ধুদের বারবারের তাগাদা শেষ পর্যন্ত কাজটির জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়তে আমাকে বাধ্য করে। এবং লাগাতার কয়েক মাস এই কাজে লেগে থাকি। যদিও এই গ্রন্থটির ভিত্তি আমার রচিত 'নজরিয়াতি জঙ্গ কে উসুল'[১] পুস্তিকাটি; কিন্তু নতুনভাবে কাজ করতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত এই পুস্তিকাটি আমাকে ঢেলে সাজাতে হয়। এটাও বলা যেতে পারে, নজরিয়াতি জঙ্গ কে উসুল (বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের পদ্ধতি) পুস্তিকাটি হলো মূল আর বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তার ব্যাখ্যা।

কাজটি সম্পাদন করতে গিয়ে এই বিষয়ে বিভিন্ন বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা, জার্নাল, ম্যাগাজিন ছাড়াও আমার লেকচারগুলো সামনে ছিল, যা শরিয়াহ অনুষদের শিক্ষার্থী মাওলানা ইউনুস কাশ্মিরী এবং মাওলানা উজায়ের আহমাদ সিদ্দিকী এবং আরও কতিপয় বন্ধু মিলে বিন্যস্ত করেছে। এ ছাড়া ডিজিটাল মাধ্যম এবং ইন্টারনেটে সংরক্ষিত বইপত্র ও ওয়েবসাইট থেকেও উপকৃত হয়েছি। জামিয়াতুর রশিদের শরিয়াহ অনুষদের প্রিন্সিপাল মাওলানা আলতাফুর রহমান এবং দাওয়াহ অনুষদের তত্ত্বাবধায়ক মাওলানা ফাইয়াজ আহমদ বইটির প্রকাশে সহায়তা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলকে দুনিয়া এবং আখিরাতে উত্তম বিনিময় দান করুন।

ইসমাইল রেহান
২৭ মহররম ১৪৩৪;
১১ ডিসেম্বর ২০১২

---

[১] মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারুক হাফিজাহুল্লাহর অনুবাদে বইটি 'বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের পরিচয়

দ্বিতীয় অধ্যায় : বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায় : ক্রুসেড

চতুর্থ অধ্যায় : বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রসমূহ

পঞ্চম অধ্যায় : বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ধারণা

ষষ্ঠ অধ্যায় : বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের উপকরণ এবং মাধ্যম

সপ্তম অধ্যায় : বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের মোকাবেলায় আমাদের করণীয়

প্রথম অধ্যায়

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের পরিচয়

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই

পৃথিবীতে যুদ্ধের দুটি ধারা প্রচলিত রয়েছে। এক প্রকার সংঘটিত হয়ে থাকে সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে, যেখানে মানুষ হত্যা করা হয়। প্রবাহিত হয় রক্ত। জনপদ বিধ্বস্ত করে ফেলা হয়। স্বাধীন মানুষ হয়ে পড়ে গোলাম। ব্যাপকভাবে চলতে থাকে লুণ্ঠন ও লুটতরাজ।

আরেক প্রকার যুদ্ধে খুনখারাবি রক্তপাত অরাজকতা হয় না বটে; তবে আক্রমণটা নেমে আসে চিন্তাজগতে। লড়াইটা হয় বুদ্ধি ও মানসের সাথে। উদ্দেশ্য এবং প্রভাবের বিবেচনায় এই দ্বিতীয় প্রকারের লড়াই কোনোভাবেই প্রথম প্রকারের চেয়ে কম ক্ষতিকর নয়; বরং কিছু কিছু বিবেচনায় দ্বিতীয় প্রকারের লড়াইয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রথম প্রকারের চেয়ে অধিক। আর এই দ্বিতীয় প্রকারকেই বলা হয়ে থাকে الغزو الفكري বা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই।

১.১: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের সংজ্ঞা

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের একাধিক সংজ্ঞা (Definition) বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রদান করা হয়েছে। এর যে সংজ্ঞা-দুটি বিশেষ প্রসিদ্ধ :

مجموعة الجهود التي تقوم بها الأمة من الأمم للاستيلاء علي أمة أخري أو التاثير عليها حتي تتجه وجهة معينة

কিছু চেষ্টা বা সমন্বিত প্রয়াস, যার মাধ্যমে একটি জাতি অপর কোনো জাতির উপর নিজের ক্ষমতা বিস্তার করে থাকে। কিংবা কোনো জাতিকে বিশেষ কাঠামোয় গড়ে তুলতে যে প্রয়াসের মাধ্যমে তাকে প্রভাবিত করে।

দ্বিতীয় সংজ্ঞা কিছুটা সংক্ষিপ্ত :

هو الغزو بوسائل غير عسكرية

এই সংজ্ঞা অনুসারে আমরা বলতে পারি—বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই, যেখানে সামরিক হাতিয়ারের বিকল্প অস্ত্রাদি ব্যবহার করা হয়।

১.২: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই এবং আন্তর্জাতিক জাতিগোষ্ঠী

যখন কোনো জাতি অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা, তাহজিব-তামাদ্দুন, কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা-সংস্কৃতি বদলে দেবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হয় তখন তাদের সেই প্রচেষ্টাকে বলা হয় বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই। পৃথিবীর প্রতিটি ক্ষমতাধর জাতি, যে অন্য জাতিগোষ্ঠীর উপর নিজের ক্ষমতা বিস্তার করতে চায় কিংবা চায় অন্য জাতির থেকে নিজের ভৌগোলিক ও চিন্তাজগতের সীমানা নিরাপদ রাখতে, সে আবশ্যিকভাবে এই

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের অবতারণা করে। যদি কোনো জাতি তার প্রতিপক্ষকে কাবু করবার জন্য কেবল অস্ত্রের লড়াইকেই যথেষ্ট মনে করে, সে কখনোই পরিপূর্ণ সাফল্যের মুখ দেখতে সক্ষম হবে না। এমন তো হতেই পারে, সে অস্ত্রের জোরে সাময়িক বিজয় ছিনিয়ে আনবে; কিন্তু সে তার প্রতিপক্ষের উপর কখনোই কেবল অস্ত্রের মাধ্যমে জাদুকরী প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছে এমন প্রতিটি জাতি বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের মাধ্যমেই ইতিহাসের বুকে নিজেদের ঠাঁই করে নিয়েছে। কেউ তো অন্যের উপর নিজের মোহময় প্রভাব বিস্তারের জন্য এ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ আবার লড়েছে পৃথিবীর বুকে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। কখনো-বা এ লড়াই সংঘটিত হয়েছে অন্যের চিন্তাজগৎকে বিক্ষত করে দেবার উদগ্র বাসনা নিয়ে। আবার কখনো সংঘটিত হয়েছে নিজেদের লুটতরাজ ও খুনখারাবির বৈধতা আদায়ের লক্ষ্যে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দুই প্রান্তেই এই লড়াইয়ে অসংখ্য মানুষ অংশ নিয়েছে। অমুসলিমেরা যেমন অবতীর্ণ হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ময়দানে, তেমনি সেই ময়দানে মুসলমানদেরও দেখা গেছে যথার্থ টক্কর দিতে।

তবে উভয়ের ফারাক থেকেছে চিন্তা ও আদর্শে। বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করে অনায়াসেই আমরা মুসলিম ও অমুসলিমের সেই চিন্তা এবং আদর্শগত ভিন্নতা বিশ্লেষণ করে উঠতে পারি।

যুগ যুগ ধরে মুসলমানেরা চিন্তাগত লড়াইয়ে শামিল হয়ে আসছে। তাদের ভূমিকা কখনো আত্মরক্ষামূলক ছিল, আবার কখনো ছিল আক্রমণাত্মক। কখনো-বা একইসাথে উভয় প্রকার লড়াইয়েই তারা অবতীর্ণ হয়েছে। মুদাফায়াত বা প্রতিরক্ষামূলক লড়াই দ্বারা উদ্দেশ্য—আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ মনোনীত ধর্মকে তার আসল আকৃতিতে টিকিয়ে রাখা। আর আক্রমণাত্মক বা ইকদামি লড়াই দ্বারা উদ্দেশ্য—দীনকে পৃথিবীর সকল প্রান্তে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া। এই সকল কর্মযজ্ঞে মুসলমানদের পক্ষ থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই যেভাবে পরিচালিত হয়েছে, তা উৎকৃষ্ট আদর্শ এবং উন্নত চরিত্রের উত্তম নমুনা। এই লড়াইয়ে মুসলমানেরা প্রতিটি পদক্ষেপে সততা, সদিচ্ছা, নিঃস্বার্থতা, আখিরাতের চিন্তা, চরিত্রের উচ্চতা, মানবতার প্রতি দায়বোধ, নিপীড়িতের প্রতি সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচয় দিয়ে গেছে অকল্পনীয়ভাবে। কারণ, কুরআন ও সুন্নাহ মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছে যুদ্ধ ও লড়াইয়ের ময়দানেও উন্নত আখলাকের পরিচয় দেবার জন্য; লড়াইটা অস্ত্রের হোক কিংবা চিন্তার।

বিপরীতে পাশ্চাত্য এবং কাফিরদের অস্ত্রের লড়াইয়ের ইতিহাস যেভাবে জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন ও সহিংসতায় বিক্ষত তেমনিভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়েও তাদের আঁচল মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা, ওয়াদাখেলাফি এবং কৃত্রিমতার কালিতে কালো হয়ে আছে। বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের এই ময়দান, যেখানে আমরা নিজেদের চারিত্রিক নীতি-নৈতিকতার অনুসরণের মাধ্যমে আমাদের প্রতিপক্ষকে অনবরত আঘাত করে

যাচ্ছিলাম, আজ আমাদেরই অলসতা ও উদাসীনতার সুযোগে সে ময়দান শত্রুর দখলে চলে গেছে। আমাদের ধারাবাহিক উদাসীনতা বর্তমান সময়ে শত্রুকে সুযোগ করে দিয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ময়দানে কর্তৃত্বশীল হয়ে উঠবার জন্য।

১.৩: একটি বড় পার্থক্য

বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যতটুকু আলোচনা হলো, আশা করছি তাতে করে স্পষ্ট হয়ে গেছে, নিষিদ্ধ কর্মের প্রতি আগ্রহ, অশ্লীলতা, বিদআত এবং চারিত্রিক ও বিশ্বাসগত দুর্বলতা, যা বাইরের শত্রুর মাধ্যমে নয়; বরং মুসলমানের অন্তঃস্থিত শত্রুর মাধ্যমেই তার মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে, তাকে আমরা চিন্তাযুদ্ধের আলোচ্য হিসেবে গণ্য করছি না। কোনো মুসলমান যদি বেচা-বিক্রি বা চাকরিবাকরির ব্যস্ততায় নামাজে অংশ নিতে না পারে তবে এটা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্রের আলোচ্য নয়; বরং তা দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধির আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত।

অবশ্য এতে কোনো দ্বিমত নেই যে—মুসলমানদের চিন্তার যে লড়াই পরিচালিত হয়েছে, দাওয়াত এবং আত্মশুদ্ধিমূলক প্রচারণার সাথে তার সম্পর্ক গভীর। কিন্তু তারপরও দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধি একটি বিস্তৃত পরিসর। বিপরীতে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ব্যাপ্তি কিছুটা স্বল্প। বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে সেইসব চিন্তাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলের মোকাবেলা করা হয়, যার ফলে সমাজে মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক এবং চারিত্রিক অধঃপতন নেমে আসে। সুতরাং আমরা এভাবে বলতে পারি—দাওয়াত এবং আত্মশুদ্ধি একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়, যার একটি অংশ হলো এই বুদ্ধবৃত্তিক লড়াই।

উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যের আরেকটি দিক বলা যেতে পারে—দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধিমূলক কার্যক্রম সাধারণত মুসলমানদের তরফে হয়ে থাকে ধর্মের বিস্তৃতির লক্ষ্যে। বিপরীতে চিন্তাযুদ্ধে মুসলিম অমুসলিম উভয়েই অংশ নেয়। এই বিবেচনায় চিন্তার লড়াইটি হলো আম বা ব্যাপক। আর দাওয়াত হলো খাস বা বিশেষ এবং সীমাবদ্ধ।

১.৪: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের দ্বিতীয় সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে তো যেকোনো জাতির পক্ষ থেকে পরিচালিত চিন্তার লড়াইকে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই বলা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান সময়ে যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ইসলামের শত্রুদের দৌরাত্ম্য অধিক এবং ইসলাম ও মুসলমানের উপর মনস্তাত্ত্বিক আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে তারা ক্রমশ সমুখে অগ্রসর হয়ে চলেছে; সে কারণে বর্তমান সময়টাতে যে-সকল মুসলিম স্কলার চিন্তাযুদ্ধের সংজ্ঞায়ন করেছেন, তারা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই দ্বারা মুসলিমের বিরুদ্ধে পরিচালিত অমুসলিমদের মনস্তাত্ত্বিক লড়াইকে উদ্দেশ্য করে থাকেন।

অধিকাংশ আরব গবেষকের রচনায় যেখানে الغزو الفكري। বা চিন্তাযুদ্ধের উল্লেখ হয়েছে, সেখানে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিমবিশ্বের, বিশেষ করে পশ্চিমের পরিচালিত বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইকে।

এ কারণেই কতক আরব আলেম চিন্তাযুদ্ধের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :

هو الغزو الذي اتخذها الصليبيين ضد المسلمين لا زالة المظاهر الحياة الاسلامية وصرف المسلمين عن التمسك بالاسلام بالوسائل غير العسكرية

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই হলো, অস্ত্রের বিপরীতে অন্যান্য উপায়-উপকরণের মাধ্যমে পরিচালিত এমন যুদ্ধ, ক্রুসেডাররা যা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শুরু করেছে। ইসলাম বিষয়ে মুসলমানদের আবেগ ও অনুভূতি শূন্য করে ফেলা এবং ইসলাম থেকে তাদের দূরে সরিয়ে নেওয়াই হলো এই লড়াইয়ের উদ্দেশ্য।

তবু সংজ্ঞাটি আমরা ক্রুসেডারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারি না। কারণ, বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই কেবল তাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়—এমন নয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে ইহুদি, হিন্দু, কম্যুনিস্টসহ বহু জাতিগোষ্ঠী, দল ও সম্প্রদায়।

১.৫: তৃতীয় সংজ্ঞা

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের তৃতীয় যে সংজ্ঞাটি আমরা পাই :

هو اسلوب جديد للغزو ضد المسلمين بعد هزائم متكررة

অনবরত পরাজয়ের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নতুন তরিকা।

অর্থের বিস্তৃতি এবং শব্দের সংক্ষিপ্ততার কারণে এই সংজ্ঞাটি বেশি উপযোগী। বিশেষ করে 'অনবরত পরাজয়ের পর' বাক্যবন্ধটি বিশেষ অর্থ ধারণ করে। এই বাক্যবন্ধ দ্বারা মূলত একটি ধারাবাহিক ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত' শিরোনামে আমরা তা দেখে উঠব।

বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের আলোচনা যেহেতু বিরোধীপক্ষ কীভাবে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনা করছে এবং তাদের প্রতিরোধে কী কী পদক্ষেপ আমাদের গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়ে, সেজন্য মনস্তাত্ত্বিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই দ্বারা আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য সেই আগ্রাসন, পশ্চিম যা আমাদের উপর অব্যাহত রেখেছে।

১.৬: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের লক্ষ্য

ইসলামের বিরোধীশক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের পথ কেন বেছে নিল? তাদের উদ্দেশ্য কেবল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ব্যক্তিত্ব, চিন্তার স্বাতন্ত্র্য এবং বুদ্ধিবৃত্তির তরতজা বৃক্ষকে শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলা। আরও স্পষ্ট করে বললে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন দ্বারা ইসলামের বিপক্ষশক্তির উদ্দেশ্য হলো—কোনো জাতির মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মার বিনাশ সাধন করে মরদেহটা নিজেদের মতন সাজিয়ে নেওয়া।

১.৭: চিন্তাযুদ্ধে আমাদের লক্ষ্য

চিন্তাযুদ্ধে আমাদের বর্তমান অবস্থান আত্মরক্ষামূলক। সেজন্য প্রতিপক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক আঘাত প্রতিহত করাই হবে আমাদের প্রথম লক্ষ্য। নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারলে যুদ্ধের দ্বিতীয় ধাপে প্রতিপক্ষের জবাব দেওয়ার অবকাশও আমাদের হবে।

এখন পর্যন্ত আমরা আলাপ করেছি 'বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই'-কেন্দ্রিক। কিন্তু শাস্ত্র হিসেবে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই ভিন্ন বিষয়। আমরা এখন প্রবেশ করব—শাস্ত্র হিসেবে চিন্তাযুদ্ধের পরিচিতি কী, তার বিশ্লেষণপর্বে।

১.৮: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্রের পরিচিতি

এটা এমন শাস্ত্র, যেখানে প্রতিপক্ষের মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয়, আত্মরক্ষার কৌশল পর্যালোচনা করা হয় এবং ঐকান্তিক প্রয়াস চালানো হয় প্রতিপক্ষকে যথার্থ ও প্রভাবক জবাব দেওয়ার জন্য।

একটি বিষয় এখানে বলে রাখা জরুরি মনে করছি—বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই এবং বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্র এ দুইয়ে কিন্তু পার্থক্য আছে। বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং গবেষণার বিষয়। আর বুদ্ধির লড়াইটা সংঘটিত হয়ে থাকে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে।

১.৯: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্রের আলোচ্য

সে সকল মাধ্যম ও পন্থা এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়, যা দ্বারা একটি জাতির মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন সাধন করা হয়। এই শাস্ত্রের আলোচনার কেন্দ্রে থাকে সেই পন্থা ও পদ্ধতি, যার সাহায্যে একটি জাতির চিন্তার গতিপথ এবং হৃদয়ের উত্তাপ বদলে দেওয়া হয়। ঘুরিয়ে দেওয়া হয় একটি জাতির কর্মের ছায়াপথ।

একজন বিজ্ঞ সার্জন যেভাবে রোগীর শরীরে ব্যাধির পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন, একজন কবি যেভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন কাব্যের উপমা, রূপক ও ভাষার নিগূঢ়ার্থ নিয়ে, এই শাস্ত্রের অধ্যয়নকারী তেমনি গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করবে চিন্তাযুদ্ধের সকল উপায়, অবলম্বন ও মাধ্যম নিয়ে, বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ময়দানে প্রতিপক্ষ ঠিক যে মাধ্যমসমূহের সাহায্যে আক্রমণে উদ্যত হয়।

১.১০: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নিজের চিন্তা, চেতনা, আকিদা, বিশ্বাস, জাতিগত স্বাতন্ত্র্য এবং তাহজিব-তামাদ্দুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি সুরক্ষিত করবার পাশাপাশি অন্যান্য জাতির উপর মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্তৃত্ব অর্জন করাই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

১.১১: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই শাস্ত্রের তাৎপর্য

কোনো শাস্ত্রের তাৎপর্য ও গুরুত্ব নির্ভর করে সমাজে তার প্রয়োজন অনুপাতে। একটি শাস্ত্র সমাজের জন্য যতটা কল্যাণ বয়ে আনার সম্ভাবনা রাখে, তার গুরুত্ব হয়ে থাকে ঠিক ততটা।

বর্তমান সময়টাতে সমগ্র বিশ্ব সম্মিলিতভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এই যুদ্ধ যেভাবে সামরিক ক্ষেত্রে সংঘটিত হচ্ছে, তদ্রূপ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রেও। চিন্তার লড়াইয়েও মুসলনাদেরকে আজ প্রতিপক্ষের সম্মিলিত আঘাতের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। মুসলমানদের তাই আবশ্যিক কর্তব্য—আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রের লড়াইয়ের পাশাপাশি চিন্তাযুদ্ধের জন্যও প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

নেতা, রাজনীতিক, আলেম, গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র, মসজিদের ইমাম, খতিবসহ প্রতিজন মুসলমানের কর্তব্য—ইসলামের শত্রুপক্ষের সকল প্রকার ধোঁকা ও অপকৌশল সম্বন্ধে পূর্ণ অবগতি অর্জন করা। আর অমুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের কৌশল জানার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্র অধ্যয়নের বিকল্প নেই।

এই শাস্ত্রটিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তার চর্চা ব্যাপক করা এখন সময়ের দাবি। কিন্তু বাস্তবতা দেখা যায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কিছু মানুষ মনে করেন, ইসলামের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য অস্ত্রের লড়াইটাই একমাত্র সমাধান। চিন্তাযুদ্ধের কোনো প্রয়োজন নেই। নিঃসন্দেহে তাদের এই চিন্তার সংশোধন প্রয়োজন। সশস্ত্র জিহাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কোনো মুসলমান সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন অস্বীকার করতে পারে না। সশস্ত্র লড়াই ছাড়া ইসলামের পুনরুজ্জীবন এবং তার স্থায়ীকরণ কখনোই সম্ভব নয়। তবে সেই সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইও চালিয়ে যেতে হবে। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কোনোভাবেই চিন্তাযুদ্ধের আবশ্যকতাকে খাটো করা যাবে না। চিন্তাযুদ্ধের প্রয়োজন যদি অস্বীকার করা হয় তবে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে যে লক্ষ্য অর্জন উদ্দেশ্য—আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন সমুন্নত করা—বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তারের জন্য অস্ত্রের লড়াইয়ের মতোই সমান দরকারি চিন্তার লড়াই। অস্ত্র ও চিন্তার লড়াই দুটো যদি সমান তালে লড়ে যাওয়া না হয় এবং দুই যুদ্ধের মধ্যে যদি কোনো প্রকার সম্পর্ক না থাকে তাহলে অস্ত্র ও সৈন্যবলে বলীয়ান বিশাল বাহিনী সামান্য ক্ষুদ্র একটি বাহিনীর বিরুদ্ধেও জয় ছিনিয়ে আনতে সমর্থ হবে না। যদি-বা বিজয় লাভ করে; তবে তা হবে সাময়িকের জন্য। বিজিত জাতিগোষ্ঠীর হৃদয়-মন যদি জয় করা না যায় তবে পাশার দান উলটে যেতে পারে যেকোনো মুহূর্তে।

সামরিক সামর্থ্যের বিবেচনায় মুসলমানেরা এখন অমুসলিমদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। বলা যায়—শত্রুর সাথে শক্তির বিচারে তাদের অবস্থান অসম। এমতাবস্থায় চিন্তাযুদ্ধের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে নেওয়ার প্রয়াসে লিপ্ত হওয়া মুসলমানদের জন্য পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিক জরুরি। সমরবিদেরা মনে করেন—যুদ্ধ এখন রণাঙ্গনে হয়ে থাকে বিশ ভাগ। আর যুদ্ধের আশি ভাগ সংঘটিত হয় মিডিয়াতে। এই যখন অবস্থা, তখন জমানার নাজুকতা, সময়ের প্রয়োজনীয়তা এবং নিজেদের আত্মরক্ষার বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই সম্পর্কে উদাসীন থাকা আমাদের জন্য কোনোভাবেই উচিত নয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্র—বিগত ৩০-৪০ বছর যাবৎ আরবের দেশগুলোতে স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করে আসছে। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গুরুত্বের সাথে এই শাস্ত্রের পাঠদান করা হয়। প্রফেসরগণ লেকচার তৈরি করেন, ক্লাসে সেমিনারে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। এই বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীরা সেখানে পিএচডিও করে থাকেন। বহু রচনা এবং পিএচডি থিসিস তাদের গ্রন্থভান্ডারে

যুক্ত হয়েছে বিগত বছরগুলোতে। কিন্তু আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নেওয়া হয়নি। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা দিয়ে সকল দীনি ও আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখনই বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্রের পঠন-পাঠন শুরু করা অতীব জরুরি।

১.১২: তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব এবং বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্রের মধ্যকার পার্থক্য

কিছু মানুষ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব এবং বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্র দুটিকে গুলিয়ে ফেলেন এবং উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যটা নির্ণয় করে উঠতে পারেন না। অথচ উভয়ের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। প্রাথমিক পর্যায়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে পৃথিবীর প্রচল বিভিন্ন ধর্মের পরিচয় তুলে ধরা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ইসলাম, ইহুদি, ক্রিশ্চিয়ান, হিন্দু প্রভৃতি ধর্মের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মতাদর্শ এবং তাদের ধর্মীয় চিন্তাভাবনা ও উপাসনার রীতি-প্রকৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হয়ে থাকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

বিপরীতে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্রে কোনো জাতির আকিদা বা বিশ্বাসগত আলোচনা মুখ্য নয়; বরং আলাপ-আলোচনা ও গবেষণা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সন্ধান করা হয়—আমাদের শত্রুপক্ষ কারা? কোন পথে তারা ইসলামের বিনাশ সাধনে ব্যাপৃত হয়েছে, ইসলামের মূল উপড়ে ফেলতে কোন কোন উপায় তারা অবলম্বন করেছে এবং তাদের চিন্তার গতিপ্রকৃতি কীরূপ—এসব নিয়েই আলোচনা করা হয় এই শাস্ত্রে।

১.১৩: সামরিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের মধ্যকার পার্থক্য

একাধিক বিবেচনায় সামরিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। এই নির্ণীত পার্থক্যগুলোর দিকে তাকালে আমাদের কাছে এও স্পষ্ট হয়ে যাবে, কোন যুদ্ধের প্রভাব কত গভীর এবং কোনটির ক্ষতি কত সুদূরপ্রসারী।

সামরিক লড়াই : শত্রু হয়ে থাকে পরিচিত এবং প্রকাশ্য।

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই : শত্রুর কোনো পরিচয় জানা থাকে না। উপরন্তু তার আক্রমণ হয়ে থাকে গোপনে। মুখ লুকিয়ে।

সামরিক লড়াই : শত্রুর প্রস্তুতি এবং শক্তিমত্তার পরিমাণ অনুমান করে নেওয়া সম্ভব হয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই : বিরোধীপক্ষের প্রস্তুতি কোন পর্যায়ের তা জানার কোনো উপায় থাকে না। এবং তার আক্রমণের গতিবিধি সম্বন্ধেও জানা যায় না কিছু।

সামরিক লড়াই : রক্ষণাত্মক প্রস্তুতি নিতে বেগ পেতে হয় না।

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই : প্রতিরোধ করা কঠিনতর হয়ে দেখা দেয়। সাধারণ মানুষ অনায়াসেই তাদের হামলার শিকার হয়ে পড়ে।

সামরিক লড়াই : প্রতিপক্ষের টার্গেটে নিশানা করা যায় সহজেই।

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই : টার্গেট সাধারণত চোখের আড়ালেই থাকে।

সামরিক লড়াই : সাময়িক হয়ে থাকে। দুই চারদিন, খুব বেশি হলে মাস কিংবা বছর অতিক্রান্ত হবার পর তা ক্ষান্ত হয়ে আসে।

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই : শতকের পর শতক ধরে চলতে থাকে।

সামরিক লড়াই : আক্রমণ হয় মানুষের দেহ, ভবন, স্থাপনা এবং সামরিক ঘাঁটিতে। ফলে ক্ষতি হয় কেবল বস্তুগত।

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই : দেহ নয়; বরং আঘাতটা নেমে আসে চিন্তা-চেতনা এবং মন ও মননের উপর। ক্ষতিও হয়ে থাকে সামরিক লড়াইয়ের চেয়ে তীব্র ও গভীর। চিন্তা, আদর্শ এবং বিশ্বাসে দৈন্য দেখা দেয়। আর বস্তুগত ক্ষতি তো হয়ই।

সামরিক লড়াই : নগর-বন্দর-রাষ্ট্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়। বেদখল হয়ে পড়ে ভূমি।

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই : ব্যক্তির চিন্তা ও আদর্শ ছিনতাই হয়ে যায়।

সামরিক লড়াই : শরীর রক্তাক্ত হয়, দেহ হয় লাশ।

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই : আক্রান্ত হয় রুহ ও আত্মা।

সামরিক লড়াই : শরীরের ক্ষত হয় দৃশ্যমান এবং তার প্রতিকারও সম্ভব হয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই : কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ক্ষতটা থাকে অদৃশ্য। এবং সেই ক্ষতের চিকিৎসার কোনো গরজ না আক্রান্তের অনুভূত হয়, না আর কারুর।

১.১৪: মুসলিম এবং অমুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের মধ্যকার পার্থক্য

উভয়ের এই লড়াই যদিওবা একই প্রকৃতির: বুদ্ধিবৃত্তির; তবু মোটাদাগে কিছু পার্থক্য আছে উভয়ের লড়াইয়ের মধ্যে।

আমাদের চিন্তার লড়াই দীনি দাওয়াতেরই একটি অংশ।

আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সেই মহান লক্ষ্য থেকে ভিন্ন নয়, যার বাস্তবায়নের জন্য নবী-রাসুল প্রেরিত হয়েছিলেন। জাতিগত, গোত্রগত, ব্যক্তিগত কিংবা অঞ্চলগত কোনো উদ্দেশ্য আমাদের চিন্তায় হাজির নেই। বরং আমাদের উদ্দেশ্য তো সেটাই, যা রুস্তমের সামনে রিবয়ী ইবনে আমের উচ্চারণ করেছিলেন :

> الله ابْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ وَمِنْ جَوْرِ الْاَدْيَانِ اِلَى عَدْلِ الْاِسْلَامِ، وَمِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا اِلَى سَعَتِهَا

> আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন, যেন আমরা তার বান্দাদের বান্দার গোলামি থেকে উদ্ধার করে বান্দার রবের গোলামির দিকে ফিরিয়ে দিই। এবং লোকদের যেন অলীক ধর্মের অবিচার থেকে উদ্ধার করে পৌঁছে দিই ইসলামের ন্যায়বিচারে। আর পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে মানুষের মুক্তি ঘটিয়ে তাদের নিয়ে যেতে পারি পৃথিবীর প্রশস্ততার দিকে।

ইসলামি চিন্তাযুদ্ধের উদ্দেশ্য থাকে এই চিন্তাধারার বিস্তার ঘটানো যে, পৃথিবীর বস্তুনিচয়ের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ তায়ালার। জীবন এবং জীবনযাপনের সবকিছু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানুষের কাছে প্রদত্ত আমানত। এই জীবন ও তা

যাপনের সকল মাধ্যম মানুষকে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তায়ালারই সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য। ব্যক্তিগত ইবাদতের পাশাপাশি মানুষ তার জীবন ও সম্পদ ব্যয় করবে আল্লাহ তায়ালার আরেক বান্দার কল্যাণে। পৃথিবীর শান্তি ও শৃঙ্খলা সুষ্ঠু রাখবার জন্য তার প্রতিটি পদক্ষেপ উত্থিত হবে 'আদ-দীন আন-নাসীহা' (কল্যাণকামিতাই হলো দীন) এই বিশ্বাস ও চিন্তাধারার আলোকে।

অপরদিকে অমুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই পরিচালিত হয় কেবল নিজেদের স্বার্থে। তাদের চিন্তা থাকে কেবল পৃথিবীর সম্পদ আয়ত্ত করা এবং সকল মানুষকে নিজেদের গোলামির শেকলে আবদ্ধ করা। এর বাইরে চিন্তাযুদ্ধের পেছনে তাদের ভিন্ন কোনো লক্ষ্য থাকে না।

মুখে তারা মানবতা, সহমর্মিতা, বিশ্বশান্তি এবং বৈশ্বিক কল্যাণের স্লোগান তোলে বটে; কিন্তু বাস্তবতা হলো—তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের উপর যদি গভীর দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে দেখা যাবে, পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ একটি নির্দিষ্ট জাতির কর্তৃত্বে আনার জন্যই তাদের সকল প্রচেষ্টা। আর এটাই হলো বৈধতা-অবৈধতার সীমা ভুলে গিয়ে তাদের তাবৎ নির্লজ্জ আচরণের রহস্য। তারা সম্পদ ও বিত্তের লোভ দেখিয়ে দুঃস্থ মানুষের সাথে ঈমানের সওদা করে। তারা শরাব এবং শাবাবকে ব্যাপক করে দিয়ে সমাজের ধ্বংসে মেতে ওঠে। ধোঁকা আর প্রতারণা ছাড়া চিন্তার লড়াইয়ে তাদের দ্বিতীয় কোনো অস্ত্র নেই। প্রয়োজনে তারা কাপুরুষের মতো রক্ত প্রবাহিত করতেও দ্বিধা করে না। এই হলো তাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয়।

আরেকটু গভীরে গিয়ে যদি তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে এই সত্য সামনে এসে দাঁড়াবে, তাদের তাবৎ চেষ্টাপ্রচেষ্টার লক্ষ্য কেবল কতিপয় জাতি কিংবা মুষ্টিমেয় সম্পদ কবজা করা নয়; বরং তারা সমস্ত পৃথিবীর উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার বাসনা লালন করে। যদিও অতীতে এমন হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবার নয়। অতীতে এদের চেয়ে বড় ও ক্ষমতাধর ফেরাউন 'আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু' আওয়াজ তুলেছিল। কিন্তু শেষমেশ তার নসিবে জোটে 'সমুদ্রে নিমজ্জন'। আল্লাহ তায়ালা তাকে নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত করে রেখেছেন কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল অত্যাচারী ও কর্তৃত্বকামী মানুষের জন্য।

গ্রন্থপঞ্জি

—আল-গাজউল ফিকরি, লাজনাতুল মানাহিজ, প্রথম অধ্যায় (দিরাসাত ফিস সাকাফাতিল ইসলামিয়্যাহ)।

—আল-গাজউল ফিকরি ওয়া ওয়াসায়িলুহু, শায়েখ আবদুল আজিজ বিন বাজ।

—আসালিবুল গাজবিল ফিকরি, ড. আলী মুহাম্মদ জারিশা ও উসতায মুহাম্মদ শরিফ জিবাক, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়্যা মদিনা মুনাওয়ারা।

—আল-গাজউল ফিকরি ফি মানাহিজিদ দিরাসাহ, উসতায আলী লাবান, দারুল ওয়াফা, ১৯৯২

—ইখতারুল গাজবিল ফিকরি, ডক্টর সাবের তায়িমা, আলিমুল কুতুব।

—তাহসিনু মুজতামাইল মুসলিম জিদ্দাল গাজবিল ফিকরি, ডক্টর হামুদ বিন আহমাদ রাহিলী।

—আল-গাজউল ফিকরি, শায়েখ মামদুহ ফাখরি, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়্যা মদিনা মুনাওয়ারা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ইতিহাস

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ইতিবৃত্ত

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই এবং সামরিক লড়াই—পৃথিবীতে দুটোর অবস্থানই সেই প্রাচীনকাল থেকে। সত্য মিথ্যা এবং হক বাতিলের লড়াই যেদিন থেকে শুরু, চিন্তা এবং সামরিক লড়াইয়ের সূচনাও সেদিন থেকে। আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার অব্যবহিত পরেই আল্লাহ তায়ালার সাথে বান্দার সম্পর্কচ্ছেদের মধ্য দিয়ে এই লড়াইয়ের সূত্রপাত ঘটে। শয়তান অস্বীকার করে বসলো আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে। পরিণামে অভিসম্পাৎ কপালে নিয়ে আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হলো সে। তাকে যখন তাড়িয়ে দেওয়া হয় রবের দরবার থেকে তখন সে আল্লাহ তায়ালার সামনে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে উচ্চারণ করে—সুযোগ হলে সমস্ত মানুষকে সে সত্য থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে। সবাইকে নিমজ্জিত করবে মিথ্যার অন্ধকারে।

لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا

যদি আপনি আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার (আদমের) বংশধরকে সমূলে নষ্ট করে দেব।[২]

কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আগত মানুষদের পরীক্ষা করবেন—এটা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা যেহেতু; তাই তিনি ইবলিসকে অবকাশ দিলেন :

وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا

তুই সত্যচ্যুত কর তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়াজ দ্বারা, স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের আক্রমণ কর, তাদের অর্থসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে শরিক হয়ে যা এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দে। ছলনা ছাড়া শয়তান তাদের কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় না।[৩]

পরক্ষণেই আল্লাহ তায়ালা ইবলিসকে এই সতর্কবার্তাও শুনিয়ে দিলেন :

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا

নিশ্চয় আমার যারা বান্দা, তাদের উপর তোর কোনো ক্ষমতা চলবে না। (তাদের) রক্ষকরূপে তোর প্রতিপালকই যথেষ্ট।[৪]

---

[২] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৬২

[৩] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৬৪

[৪] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৬৫

চিন্তাযুদ্ধের সূচনা তো সেই মুহূর্তেই ঘটে গিয়েছিল যখন ইবলিস তার কূটকৌশল ব্যবহার করে আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছিল। সে ফুঁসলিয়ে-ফাঁসলিয়ে তাদের সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল গলাধঃকরণ করানোর চেষ্টা করে। শপথবাক্য পাঠ করে তাদের সামনে প্রমাণ করতে উদ্যোগী হয়, সে তাদের ঐকান্তিক কল্যাণকামী।

এরপর জান্নাত থেকে আদম আলাইহিস সালামকে যখন পৃথিবীতে পাঠানো হলো অতঃপর তার বংশধারার বিস্তার শুরু হলো, শয়তান তখন তাদের প্ররোচিত করবার কাজে নেমে পড়ে। আদমের সন্তানদের সত্যবিচ্যুত করার জন্য সে সর্বত্র মিথ্যার জাল ছড়িয়ে দেয়। তখন আল্লাহ তায়ালা শয়তানের বিছানো জাল ছিন্ন করার লক্ষ্যে সময়ে সময়ে প্রেরণ করতে থাকেন তার পক্ষ থেকে বার্তাবাহক। যুগে যুগে পৃথিবীতে আগমন ঘটতে থাকে নবী, রাসুল ও পয়গাম্বরদের। তারা শত অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়ন উপেক্ষা করে সত্য পৌঁছে দিতে থাকেন প্রত্যেকের দোরগোড়ায়; প্রতিজন ব্যক্তির হৃদয়ের অলিন্দে। অপরদিকে শয়তান ও তার অনুসারী বিভ্রান্ত মানুষেরা কিন্তু থেমে থাকে না। তারা সমাজে তাদের বিকৃত চিন্তা ও ভ্রষ্ট বিশ্বাসের প্রচার করে যেতে থাকে। আর উভয় পক্ষের, হক ও বাতিলের এই দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে। নবী-রাসুলদের বিরোধিতায় চিন্তাযুদ্ধের নব নব সব কূটকৌশল ও চক্রান্ত আবিষ্কৃত হতে থাকে। অস্ত্রের মুখোমুখি হতে হয়েছে—এমন নবীর সংখ্যা কমই। হজরত মুসা, ইউশা বিন নুন, সুলাইমান ও দাউদ আলাইহিমুস সালামের সময়ে কিছু লড়াই সংঘটিত হয়ছিল বটে; কিন্তু চিন্তাযুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয়নি, বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের মোকাবেলা করতে হয়নি, এমন কোনো পয়গাম্বর পৃথিবীতে অতিক্রান্ত হননি। প্রতিজন নবী কিংবা রাসুলকেই তার সময়ে চিন্তাযুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

২.১: হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কাল

যুগ-যুগান্তরের চলমান বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এসে আরও ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করে। এই সময়টাতে চিন্তাযুদ্ধে এমন সব ঘটনার দৃশ্যায়ন হতে থাকে, যা অতীতকালে কখনো দেখা যায়নি। কুরআন কারিম সেই সময়কার চিত্রায়ণ করতে গিয়ে বলেছে :

وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا

তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে; যদি সম্ভব হয়।[৫]

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا

আহলে কিতাবদের অনেকেই হিংসাবশত চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদের কোনো রকমে কাফির বানিয়ে দেবে।[৬]

---

[৫] সুরা বাকারা, আয়াত ২১৭

দীন ও সত্যের পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য প্রতি যুগে নবী-রাসুল ও তাদের অনুসারীরা অবর্ণনীয় নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু দীনের জন্য, হকের কালিমা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যে অসহ্য নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছিলেন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম, তার দৃষ্টান্ত অতীতের কোথাও নেই। গালিগালাজ-কটুকথা তো শুনতে হয়েছেই; দীনের জন্য শারীরিক নির্যাতন, এমনকি ঘরবাড়ি পর্যন্ত ছাড়তে হয়েছে তাদের। আপনজন হয়ে গেছে শত্রু। প্রতিপক্ষের অনবরত অত্যাচারের মুখে জীবন হাতে করে যেন দীনের প্রচারপ্রসার করে গেছেন তারা। দীনের হেফাজতের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছেন। সবার কাছে ভাঙা অস্ত্র পর্যন্ত ছিল না, তবু তারা সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হয়েছেন। কেবল মক্কা আর মদিনা নয়; তাদের শত্রুরা ছড়িয়ে ছিল কিসরা-কায়সার তথা রোম-পারস্য পর্যন্ত। তৎকালীন পরাশক্তির মুখোমুখি হয়েছেন। এবং সেই অবস্থায় ইরানের রাজপ্রাসাদ থেকে শুরু করে দীনের আহ্বান তারা পৌঁছে দিয়েছেন সুদূর আফ্রিকার বনাঞ্চল পর্যন্ত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতে সত্য-মিথ্যার মধ্যকার লড়াই-সংঘাতের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করা এবং বিশেষ দৃষ্টিতে সেই সময়কার চিন্তাযুদ্ধের কলাকৌশল সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে সিরাত অধ্যয়ন করা এখন সময়ের দাবি। কেননা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীতেই আমাদের জন্য রয়েছে বর্তমান সময়ের মিথ্যাপন্থিদের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই-প্রতিরোধের উৎকৃষ্ট নির্দেশনা।

আমি এখানে খুবই সংক্ষেপে সেই সময়কার চিন্তাযুদ্ধের একটি চিত্র তুলে ধরছি। চিত্রটি আমি দুটি অংশে উপস্থিত করব : নবীজির মক্কার জীবন এবং মদিনার জীবন।

মক্কার জীবন

মক্কার জীবনে মুসলমানেরা ছিল দুর্বল। গুটিকয়েক মানুষ ছিল মাত্র ইসলামের সাহায্য করবার জন্য। বিপরীতে ইসলামের শত্রুরা সেখানে ছিল বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। অস্ত্র, ক্ষমতা, লোকবল, প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনো দিক থেকেই তাদের সাথে মুসলমানদের কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। কিন্তু অন্ধকারের চাদর ছিন্ন করে দিতে একটি আলোকবিন্দুই যথেষ্ট। সেই ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যেও ইসলাম আলো ছড়িয়ে যাচ্ছিল আপন বিভায়। মিথ্যার জনপদে সত্যের আপাত-ক্ষুদ্র একটি পতাকা উড্ডীন ছিল পতপত করে। সেই ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুর বিভা দারুন নাদওয়ার কাফিরদের হৃদয়ের জ্বলন আরো দ্বিগুণ করে তুলছিল। তাদের ক্রোধ, রাগ এবং হিংসার মাত্রা দিনদিন কেবল বেড়েই চলছিল। তারা একের পর এক কৌশল আঁটতে থাকে। ইসলামের বিকাশপথ রুদ্ধ করে দিতে, প্রোজ্জ্বল আলোকবিন্দুটি চিরদিনের মতো নিভিয়ে দিতে তারা ব্যয় করে চলছিল তাদের চিন্তা ও ভাবনার সবটুকু। চিন্তাযুদ্ধে তাদের গৃহীত পদক্ষেপের কয়েকটি হলো :

---

[৬] সুরা বাকারা, আয়াত ১০৯

পরামর্শসভা : মক্কার নেতৃস্থানীয় কাফিরেরা ইসলামের বিরোধিতার জন্য নিয়মিত পরামর্শ করত। দারুন নাদওয়ায় তাদের শলাপরামর্শের একমাত্র বিষয় ছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে নিত্যনতুন কৌশল খুঁজে বের করা। আবু জাহেল, আবু লাহাব, উমাইয়া বিন খালফ, উবাই বিন খালফ, ওয়ালিদ বিন মুগিরা, উকবা বিন মুয়ীত, নজর বিন হারেস প্রমুখ ছিল সেই পরামর্শসভার সভ্য।

সত্য-আহ্বানে সংশয় সৃষ্টি করা : নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যের প্রতি যে আহ্বান, তারা তাতে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির প্রয়াস চালায়। তারা সত্য দাওয়াতকে সাধারণ মানুষের কাছে সন্দেহপূর্ণ করে তুলতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যায়। তারা বলতে থাকে :

أَجَعَلَ ٱلْءَالِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ

সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।[7]

مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِى ٱلْمِلَّةِ ٱلْءَاخِرَةِ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا ٱخْتِلَٰقٌ

আমরা সাবেক ধর্মে এ ধরনের কথা শুনিনি। এটা মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়।[8]

উদ্ভট ব্যাখ্যা : তারা নিজেদের শিরক, বিদআত এবং ভ্রান্ত ধর্মচিন্তার পক্ষে উদ্ভট সব ব্যাখ্যা হাজির করত, যেন সাধারণ মানুষকে ভ্রান্তির উপর স্থির রাখা যায়। তারা বলতো :

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّه

আমরা তাদের ইবাদত এজন্যই করি, যেন তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।[9]

মিথ্যা প্রোপাগান্ডা : সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য প্রমাণের জন্য নানামুখী প্রোপাগান্ডার বিস্তার তারা করত। একটির কথা বলি—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন, তারা বলতো :

إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ

আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন।[10]

কিন্তু যখন কেউ তাদের জিজ্ঞাসা করে বসত যে, একজন নিরক্ষর মানুষ এমন অভিনব ও উৎকৃষ্ট মানের রচনা কীভাবে করতে পারে তখন তারা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দিত এই বলে যে إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر জনৈক ব্যক্তি তাকে শিক্ষা দেয়।[11]

---

[7] সুরা সোয়াদ, আয়াত ৫
[8] সুরা সোয়াদ, আয়াত ৭
[9] সুরা যুমার, আয়াত ৩
[10] সুরা নাহল, আয়াত ১০১

মিথ্যা অপবাদ এবং মন্দ উপাধির প্রচার : নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা মন্দ উপাধিতে পরিচিত করে তুলতে থাকে। তিনি ছিলেন মুহাম্মদ (চির প্রশংসিত)। কিন্তু তারা তাকে 'মুজাম্মাম' (নিন্দনীয়) বলে সমাজে পরিচিত করে তুলবার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। তাকে নিয়ে উপহাসে মেতে ওঠে। মিথ্যাবাদী, জাদুকর, কবি—একের পর এক এমনসব আজগুবি শব্দ যুক্ত করে দিতে থাকে নবীজির পবিত্র নামের সাথে।

وَقَالُواْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ

তারা বলল, হে ওই ব্যক্তি, যার প্রতি কুরআন নাজিল হয়েছে, আপনি তো একজন উন্মাদ।[১২]

بَلْ قَالُوٓاْ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍ بَلِ ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

এ ছাড়া তারা আরও বলে, (এগুলো) অলীক স্বপ্ন; না সে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, না সে এক কবি।[১৩]

قَالَ ٱلْكَٰفِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ مُّبِينٌ

কাফিররা বলতে লাগল, নিঃসন্দেহে এ লোক প্রকাশ্য জাদুকর।[১৪]

নৈরাশ্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান : ইসলামের দাঈদের নিরাশ করতে কখনো কখনো হতাশাব্যঞ্জক কথার প্রচার চালাতো। তারা বলত :

قُلُوبُنَا فِىٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِىٓ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَٱعْمَلْ إِنَّنَا عَٰمِلُونَ

আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদের দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্ণে আছে বোঝা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব, আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি।[১৫]

উদ্ভট সব দাবি-দাওয়া : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন :

وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا

এবং তারা বলে, আমরা কখনো আপনাকে বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্য একটি ঝরনা প্রবাহিত করে দেবেন।[১৬]

---

[১১] সুরা নাহল, আয়াত ১০৩
[১২] সুরা হিজর, আয়াত ৬
[১৩] সুরা আমবিয়া, আয়াত ৫
[১৪] সুরা ইউনুস, আয়াত ২
[১৫] সুরা হা-মীম সাজদা, আয়াত ৫
[১৬] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৯০

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَٰرَ خِلَٰلَهَا تَفْجِيرًا

অথবা আপনার জন্য খেজুরের ও আঙুরের একটি বাগান হবে, অতঃপর আপনি তার মধ্যে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত করে দেবেন।[১৭]

أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِىَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ قَبِيلًا

অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন, তেমনিভাবে আমাদের উপর আসমানকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে দেবেন অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন।[১৮]

মুসলমানদের শারীরিক এবং মানসিক নিপীড়ন : মুসলমানদের উপর শারীরিক অত্যাচার এবং মানসিক নিপীড়নও অব্যাহত রেখেছিল মক্কার মুশরিকরা। কোনোদিন নবীজির দরজার সামনে ময়লা আবর্জনা ফেলে রেখে যেত। চলার পথে তার মাথার উপর মাটি ছিটিয়ে দিত। এমনকি কোনো কোনো দিন হারাম শরিফে নামাজ ও তাওয়াফরত নবীজির পিঠের উপর রেখে যেত উটের নাড়িভুঁড়ি।[১৯]

হজরত বেলাল হাবশী, আম্মার বিন ইয়াসার, খাব্বাব ইবনুল আরাত, সুহাইব রুমী প্রমুখ সাহাবি ছিলেন তাদের অত্যাচার ও নিপীড়নের নিরীহ লক্ষ্যস্থল।[২০]

বংশীয় প্রভাব এবং হুমকি : মক্কার মুশরিকরা নবীজির চাচা আবু তালিবের শরণাপন্ন হয়ে আবদার করে, নবীজি যেন তার দাওয়াত থেকে বিরত থাকেন। কেবল আবদারই করেনি; বরং ধমকও দিয়ে আসে—যদি মুহাম্মদ বিরত না থাকে তবে এর পরিণতি সুখকর হবে না। কিন্তু নবীজি তাদের সকল হুমকিধমকি উড়িয়ে দিয়ে চাচার সামনে উচ্চারণ করেন সেই ঐতিহাসিক বক্তব্য—এই লোকেরা যদি আমার ডান হাতে এনে দেয় সূর্য আর বাম হাতে এনে রাখে চাঁদ, তবু আমি যে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি তা থেকে নিবৃত হবো না। আমি সত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান করেই যাব। হয়তো-বা আল্লাহ তায়ালা এই সত্য দীন বিজয়ী করবেন কিংবা আমার জীবন নিঃশেষ হয়ে যাবে এই দীনের প্রচারে।[২১]

অর্থবিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুন্দর রমণীর প্রলোভন : নবীজির সামনে বিভিন্ন লোভনীয় প্রস্তাবও রাখা হয়। অর্থবিত্ত, সুন্দর নারী এমনকি তাকে প্রস্তাব করা হয় আরবের নেতৃত্বের। বিনিময়ে তাদের প্রার্থনা ছিল কেবল এতটুকু—যেন দীনের দাওয়াত থেকে তিনি সরে দাঁড়ান। মানুষকে যেন তিনি আর আহ্বান না করেন সত্যের

---

[১৭] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৯১
[১৮] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৯২
[১৯] আর-রওজুল উনুফ, ২/৪০
[২০] সিরাতে ইবনে হিশাম, ১/৩৪২
[২১] আল-কামিল, ১/২৮৮, ২৮৯

প্রতি। কিন্তু তিনি তো ছিলেন আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত পুরুষ। কোনো পয়গাম্বর নেতৃত্ব বা বিত্তের লোভে সত্যের প্রতি আহ্বান থেকে সরে যাবেন, আপস করবেন মিথ্যার সাথে, তা কীভাবে হতে পারে![২২]

সমঝোতার প্রস্তাব : একবার এক অদ্ভুত সমঝোতার প্রস্তাব করে বসে মক্কার মুশরিকেরা। এক বছর তারা মুসলমানদের মতো করে ইবাদত করবে আর এক বছর মুসলমানদের পুজো করতে হবে মুশরিকদের মতো করে।[২৩]

সামাজিক বয়কট : নিপীড়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে মুসলমানদের বয়কট করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, মুসলমানদের সাথে মুশরিকরা না কোনো আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হবে আর না তারা তাদের সাথে সামাজিক কোনো কার্যকলাপ, বেচাকেনা ইত্যাদি করবে। মুসলমান এবং তাদের সহায়তার অপরাধে (!) বনি হাশেমকে তারা তিন বছরের জন্য আবুতালিব-উপত্যকায় নির্বাসিত করে রাখে।[২৪]

প্রোপাগান্ডা এবং মিথ্যার শোরগোল : মিথ্যার শোরগোল উচ্চকিত করে রাখার মাধ্যমে সত্যের আওয়াজ দমিয়ে দেওয়ার প্রয়াস তারা গ্রহণ করে। তারা একে অপরকে বলতে থাকে :

لَا تَسْمَعُوا۟ لِهَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا۟ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং এর আবৃত্তিতে হট্টগোল সৃষ্টি করো, যাতে তোমরা জয়ী হও।[২৫]

দেশান্তর : সকল প্রকারের কৌশল ও চক্রান্তের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের দেশত্যাগে বাধ্য করা। এবং তা-ই হয়। এতসব জুলুম-অবিচার-নিপীড়নের ফলে মুসলমানেরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়ে পড়েন। কিছু লোক হিজরত করেন হাবশায়। আর তার কয়েক বছর পর মুসলমানেরা হিজরত করে চলে যান মদিনা মুনাওয়ারায়।

চিন্তাযুদ্ধে মক্কার কাফিরদের গৃহীত যে পদক্ষেপগুলোর বিবরণ দিলাম, অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন, যুগে যুগে কাফিররা এই পদ্ধতিই প্রয়োগ করে এসেছে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনে।

২.২: মক্কার মুশরিকদের মোকাবেলায় মুসলমানদের পদক্ষেপ

এ তো গেল মক্কার মুশরিকদের পদক্ষেপের বিবরণ, যা তারা মুসলিমদের চিন্তা-দর্শনের বিস্তৃতি রোধে গ্রহণ করেছিল। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের বিরুদ্ধে মুসলমানেরা তিনটি 'অস্ত্র' প্রয়োগ করে :

---

[২২] সিরাতে ইবনে হিশাম, ১/২৯৫, ২৯৬

[২৩] সুরা কাফিরুন, তাফসিরে ইবনে কাসির

[২৪] আল-কামিল, ১/৫০৪

[২৫] সুরা হা-মীম সাজদা, আয়াত ২৬

১. আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপন।
২. সৃষ্টির কল্যাণকামিতা।
৩. নিজেদের ইলমি ও আমলি তথা জ্ঞান ও কর্মের প্রশিক্ষণ এবং প্রতিপালন।

স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক : মুসলমানেরা আল্লাহর সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে নিয়েছিল এবং প্রতি ক্ষণে তারা সেই সম্পর্কের নবায়ন করে নিতো। জিকির, দোয়া, তেলাওয়াত এবং ইবাদত ছিল রবের সাথে তাদের সম্পর্ক-স্থিতির মাধ্যম। তখনও নামাজের বিধান আসেনি। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরির উপায় ছিল কেবল এসকল ইবাদত।

তবে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের মোকাবেলার জন্য মুসলমানদের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র ছিল তাওহিদের কালিমা এবং কুরআন কারিম। কুরআন কারিম মুশরিকদের ভ্রান্ত দাবি ও অসার চিন্তা-বিশ্বাসের এমন জবাব দিত যে, তারা লা জবাব হয়ে পড়তো। কুরআন কারিম তার চিত্তাকর্ষক বর্ণনাশৈলী, তার বিস্ময়কর বাকরীতি এবং আসমানি সুরের মহত্ত্বে কঠিন হৃদয়বানেরও অন্তরে এমন প্রভাব বিস্তার করত, যার ফলে সে কুরআন কারিম নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য হয়ে পড়তো। প্রতিজন চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়ের অর্গল মুহূর্তেই খুলে দিত কুরআন কারিমের মোহন আয়াত।

সৃষ্টির কল্যাণকামিতা : সৃষ্টির প্রতি কল্যাণকামিতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিজন মুসলমান অপরের কেবল আবশ্যিক হকগুলো আদায় করতেন এমন নয়; বরং আবশ্যিক হক নয় এমনসব প্রয়োজনেও তারা একে অপরের প্রতি সহায়তার হাত প্রসারিত করে দিতেন। সকলের চেষ্টা থাকত বিপদে-আপদে একে অন্যের পাশে থাকবার। বিশেষ করে দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তির তাবৎ প্রয়োজনে মুসলমানেরা এগিয়ে যেতেন সর্বাগ্রে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়াও অন্যান্য সাহাবি, বিশেষ করে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, মানবসেবায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

মানবতার জন্য সর্বোত্তম কল্যাণকামিতা হলো একজন মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা এবং দীনের দাওয়াত সবার দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া। সে লক্ষ্যে প্রতিজন মুসলমান একনিষ্ঠভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন দীনের দাওয়াতের জন্য। তাওহিদের কালিমার দাওয়াত প্রথমে শুরু হয় গোপনে। তারপর প্রকাশ্যে। একাকী এবং দলবদ্ধভাবেও চলতে থাকে কালিমার প্রতি আহ্বান। পরামর্শভিত্তিক কার্যক্রম, প্রজ্ঞার সাথে দিনযাপন, চারিত্রিক উৎকর্ষ ও মানবিক বদান্যতার সাহায্যে সত্যের প্রতি আহ্বান এবং বিনিময়ে নিজেদের উপর আপতিত বিপদ-আপদ ও নিপীড়নে ধৈর্য অবলম্বন—মক্কার জীবনে কুরাইশ মুশরিকদের চিন্তাযুদ্ধের মোকাবেলায় এসবই ছিল মুসলমানদের 'অনন্য হাতিয়ার'।

জ্ঞান এবং কর্মের প্রশিক্ষণ : নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য ছিল তাদের চারিত্রিক উন্নতি এবং আত্মিক পরিশুদ্ধির বড় মাধ্যম। তার মহান সত্তাই ছিল তাদের জ্ঞান, কর্ম ও চারিত্রিক উৎকর্ষের কেন্দ্রবিন্দু।

দীনি ইলম এবং ওহীর সংরক্ষণের সূচনা সেই সময় থেকেই। মক্কার জীবনেও কুরআন কারিমের আয়াত মুখস্থ করা এবং একে অপরকে শোনানোর ধারা অব্যাহত ছিল। দীনি পরামর্শ এবং জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল দারুল আরকাম।

এই সকল প্রয়াস-প্রচেষ্টায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথিদের নির্ভরতার বিরাট একটি অংশ দখল করে ছিল কুরআন কারিম। প্রতি কদমে কুরআন কারিম তাদের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছিল (কুরআনের যে নির্দেশনাবলি আজও বর্তমান এবং কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে)।

মুশিরকরা যখনই ওহীর মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করত, আসমান থেকে তার জবাব চলে আসতো। কাফিররা মুসলমানদের মনোবল ভেঙে দিতে যখনই কোনো প্রোপাগান্ডার বিস্তার করত, আসমান থেকে তখনই ওহী এসে উজ্জীবিত করে তুলত প্রতিটি মুসলিম প্রাণকে। কুরআন কারিম সেই সময় মুসলমানদের সুসংবাদ দিতে থাকে আগত বিজয়ের এবং তাদের উদ্বুদ্ধ করে যেতে থাকে উত্তম ধৈর্য অবলম্বনের।

বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন বিষয়ক সামনের অধ্যায়গুলো পাঠকালে আমাদের সিরাতের এই অংশে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। কেননা দুর্বলতা এবং অক্ষমতার এই কালে নিজেদের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য সিরাতের এই অংশে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য নির্দেশনা বিদ্যমান। প্রয়োজন কেবল চিন্তা আর ভাবনার।

মদিনার জীবন

এ পর্বে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে কাফিরদের গৃহীত পাঁচটি পদক্ষেপের কথা জানা যায় :

মিডিয়া বা প্রচারমাধ্যম : সেই সময়কার মিডিয়া সীমাবদ্ধ ছিল কবিতা আব বক্তব্যের মধ্যেই। কবিতার মজলিস ও মাহফিল সাজানো হতো। বিখ্যাত সব কবি নিজেদের পূর্বপুরুষ ও গোত্রীয় শৌর্য কৌলীন্য ও বীরত্ব নিয়ে কাব্যগাথা আবৃত্তি করত। সেই কবিতা মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তো আরবের কোনায় কোনায়। কাফির কবিরা দীর্ঘ কবিতা রচনা করত মুসলমানদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করে। তাদের জবাবে মুসলিম কবিরা আবার আবৃত্তি করত দীর্ঘ পঙক্তিমালা। হাসসান বিন সাবিত এবং আবদুল্লাহ বিন রওয়াহার কবিতা উদ্বুদ্ধ করত মুসলমানদের। উজ্জীবিত হতো মুসলমানেরা তাদের কবিতা শুনে। মুসলিম কবিদের কবিতামালা সব দিক বিবেচনায় এতই উৎকৃষ্ট মানের হতো যে, তার জবাবে কাফির কবিদের মুখ খোলার অবকাশ হতো না।[২৬]

পঠন-পাঠন : আরবের মুশরিক সমাজে পঠন-পাঠনের কোনো রীতি প্রচলিত ছিল না। তবে আহলে কিতাবদের মধ্যে পঠন-পাঠনের প্রচলন ছিল। তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার কোনো কমতি রাখেনি। মদিনাতে তো ইহুদিদের নিয়মতান্ত্রিক বিদ্যালয়ই ছিল, যাকে বলা হতো 'বাইতুল মাদারিস'।[২৭]

---

[২৬] শামায়েলে তিরমিজী, হাদিস-২৪৭; আল-ইসতিয়াব, ১/২৭১; উসদুল গাবাহ, ২/১০৭

[২৭] সুনানে কুবরা বাইহাকী- ১০/১৮০

বিতর্ক : আহলে কিতাব, বিশেষ করে ইহুদিরা মুসলমানদের উপর আপত্তি উত্থাপনের কোনো সুযোগই হাতছাড়া করতে চাইত না। তাদের সর্বক্ষণের প্রচেষ্টা ছিল কীভাবে নবীজিকে বিপাকে (আল্লাহ মাফ করুন) ফেল যায়। সে উদ্দেশ্যে তারা উদ্ভট সব প্রশ্নের অবতারণা করত। রুহ, আসহাবে কাহাফ এবং জুলকারনাইন সম্বন্ধে তাদের প্রশ্নের বিবরণ কুরআন কারিমেও উল্লেখ আছে।[২৮]

নাজরানের ইহুদিরা তো একবার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়েই নবীজির কাছে এসে বিতর্কের অবতারণা করে। নবীজি তাদের উত্থাপিত সকল দলিলের যৌক্তিক প্রতিবিধান প্রদান করেন। অবশেষে নবীজির সাথে বিতর্কে পরাজিত হয়ে তারা মদিনা থেকে প্রত্যাবর্তন করে।[২৯]

নেফাক ও কপটতা : হকপন্থিরা যখন দুর্বল থাকে, মিথ্যার বাহকরা তখন অত্যাচার-নিপীড়নের পথে হাঁটে। আর যে সমাজে সত্যপন্থিরা থাকে বিজয়ী, এগিয়ে থাকে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির বিচারে, মিথ্যার ধ্বজাধারীরা তখন আশ্রয় নেয় নেফাকি ও কপটতার। নেফাকির আড়ালে তারা সত্য উচ্চারণকারীর দম বন্ধ করে দেবার তোড়জোড়ে মেতে ওঠে।

মক্কার জীবনে মুসলমানেরা ছিল দুর্বল, সামাজিকভাবে অসহায়। মুশরিকরা তাদের অসহায়ত্বের সুযোগে নিপীড়ন ও অবিচারের কোনো কমতি রাখেনি। কিন্তু মদিনার চিত্র ছিল ভিন্ন। মুসলমানেরা সেখানে রাজনৈতিকভাবে সামর্থ্যবান ও প্রভাবক শক্তি। শয়তান সে কারণে মুখোশ বদলে মদিনার মুসলমানদের সর্বনাশের ফন্দি আঁটতে শুরু করে। মুসলমানদের প্রতিরোধে সে গ্রহণ করে ভিন্ন কৌশল। মদিনার জীবনে শয়তানের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকারক অস্ত্র ছিল নেফাকি এবং কপটতা। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই ছিল কাফিরশক্তির সবচেয়ে বড় চালবাজ। ইহুদিদের সাথে ছিল তার গভীর বন্ধুত্ব আবার মক্কার মুশরিকদের সাথেও সে হার্দিক সম্পর্ক রেখে চলত।

মুনাফিকদের দ্বারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্তের অবতারণা হতে থাকে, যার মধ্যে কয়েকটি ছিল :

- সত্যের দাওয়াতে বিঘ্নতা সৃষ্টি করা।
- প্রতারণার উদ্দেশ্যে মুসলমান বেশ ধারণ করা।
- আত্মত্যাগের মুহূর্তগুলোতে নানা বাহানায় নিজেদের প্রাণ রক্ষায় মরিয়া হয়ে ওঠা।
- জিহাদের প্রতি অনীহা প্রকাশ করা।
- মুসলমানদের মধ্যে কলহ-বিবাদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করা।
- নবী-পরিবারের নামে কুৎসা রটানো।

---

[২৮] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা বনি ইসরাইল, সুরা কাহাফ

[২৯] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা আলে ইমরান

মুনাফিকদের কপটতার পালে তখনই হাওয়া লাগতো অধিক, যখন হক বাতিল চূড়ান্ত কোনো লড়াইয়ে মুখোমুখি হতো। উহুদযুদ্ধের কথাই ধরা যাক। খানিক বাদেই যুদ্ধ শুরু হবে। মুনাফিকেরা ঠিক সেই মুহূর্তে গিয়ে গাদ্দারি করে। মুসলমানদের আপাত-ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়ে তারা রণাঙ্গন থেকে পলায়নের মতো ঘৃণিত কাজ করে বসে। কেবল তা-ই নয়; তাদের কপটতার ফিরিস্তি বহু দীর্ঘ। গাজওয়ায়ে মুরাইসি থেকে ফেরার পথে মুহাজির এবং আনসার সাহাবিদের মধ্যে তারা লড়াই বাঁধিয়ে দেবার চেষ্টা করে। উম্মুল মুমিমিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার পূত চরিত্রে কালিমা লেপনের চেষ্টা করে নবী-পরিবারকে তারা কলঙ্কিত করবার ধৃষ্টতা দেখায়। তাবুকের যুদ্ধে তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্যন্ত হত্যার ফন্দি আঁটে।[৩০]

গুপ্তচরবৃত্তি : মক্কার মুশরিকদের ছাড়াও মদিনা মুনাওয়ারা তখন বিশ্বের দুই পরাশক্তি পারস্য এবং রোমের চক্ষুশূল। সে কারণে এটা অবান্তর কিছু ছিল না যে, সে-সব ইসলামবিরোধী শক্তি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার সবিশেষ অবগতির জন্য গুপ্তচর ছড়িয়ে দেবে মদিনার পথে পথে। এবং তারা দিয়েওছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুপক্ষের গুপ্তচরদের সম্বন্ধে বেখবর ছিলেন না। তার কাছে সব সংবাদই ছিল। যে কারণে কোথাও কোনো অভিযান প্রেরণের পূর্বে তিনি উদ্দিষ্ট স্থানের নাম প্রকাশ করতেন না। বরং যেখানে যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হবে তিনি তার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের খোঁজখবর নিতেন। নবীজির এই কর্মপদ্ধতি থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তৎকালে কাফিরদের গুপ্তচর মদিনাতে ছিল এবং নবীজি যাবতীয় তথ্যের সংরক্ষণের জন্য এমন কৌশল অবলম্বন করতেন।

তাবুকযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে হজরত কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মদিনাতে থেকে যাওয়া সংক্রান্ত যে দীর্ঘ ঘটনা, তার থেকেও আমাদের বক্তব্যের প্রমাণ মেলে।

কাব বিন মালিক, মুরারা বিন রাবি এবং হেলাল বিন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম; ওজরের কারণে তাবুকযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যুদ্ধে না গিয়ে তারা মদিনাতে রয়ে যান। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি মনঃক্ষুণ্ণ হন। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেও তারা তিরস্কার ও ভর্ৎসনার শিকার হন। এমনকি মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয় তাদের সাথে সকল প্রকারের সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করবার। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তিন সাহাবিকে একপ্রকার সামাজিক বয়কট যেন করা হয়। সে বড় দুর্বিষহ দিন ছিল তাদের জন্য। তাদের সেই কঠিন সময়ে ভিন্ন রাষ্ট্রের এক ব্যক্তি ব্যবসায়ীর বেশে সাক্ষাৎ করে কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে। সেই ছদ্মবেশী ব্যবসায়ী কাব বিন মালিকের

[৩০] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা আলে ইমরান, সুরা তাওবা, সুরা নুর, সুরা মুনাফিকুন; সিরাতে ইবনে হিশাম- ২/৬৪, ২৯৭

হাতে একটি পত্র ধরিয়ে দেয়। পত্রটি ছিল শামের খ্রিষ্টান বাদশাহর তরফ থেকে কাব বিন মালিকের প্রযত্নে। পত্রের বক্তব্য ছিল :

"শুনেছি তোমার বন্ধু তোমার সাথে নির্দয় আচরণ করছে। কামনা করি—আল্লাহ যেন তোমাকে অপমান ও লাঞ্ছনার মাঝে আর না রাখেন। তুমি আমাদের কাছে চলে এসো। যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার সাথে আমরা তোমাকে গ্রহণ করব।"

এটা কাব বিন মালিকের ঈমানের তেজস্বিতা ছিল যে, তিনি চিঠিটা (বর্তমান সময়কার গ্রিনকার্ডের স্থলবর্তী) তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত চুলোয় ছুঁড়ে ফেলেন।[৩১]

এ ঘটনায় চিন্তার যা—কাব বিন মালিককে সামাজিকভাবে বয়কট করবার সংবাদ এত অল্প সময়ের মধ্যে শামের বাদশাহর কানে কীভাবে পৌঁছুল? মদিনা এবং শামের মধ্যকার দূরত্ব ছিল প্রায় দুই সপ্তাহের। মদিনার কোনো সংবাদ শামে পৌঁছার জন্য এবং সেই সংবাদের ভিত্তিতে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তের সংবাদ পুনরায় মদিনাতে এসে পৌঁছানো—এত সবের জন্য কমপক্ষে চার সপ্তাহের প্রয়োজন ছিল। ঘটনার পূর্বাপর থেকে বোঝা যায় এ পত্র কাব বিন মালিকের হাতে এসে পৌঁছয় তাকে সামাজিকভাবে বয়কটের তিন চার সপ্তাহের মাথায়। এ থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মদিনাতে বহিঃরাষ্ট্রের কোনো গুপ্তচর অবস্থান করছিল। বয়কটের ঘোষণা প্রচারিত হতেই সে কাউকে দ্রুত শামে পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর সেই ব্যক্তি শাম থেকে বাদশাহর নির্দেশনাসংবলিত পত্র নিয়ে দ্রুতই মদিনাতে ফিরে আসে। আর এই আসা-যাওয়ার মাঝে তার সময় ব্যয় হয় সর্বমোট চার সপ্তাহ। এ থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, বহিঃশত্রুর গুপ্তচর থেকে মদিনা মুক্ত ছিল না। তারা মদিনাতেই অবস্থান করত, এবং বিশেষ কোনো সংবাদপ্রাপ্ত হওয়ামাত্র নিয়োগদাতা প্রভুর কাছে তা পৌঁছে দিত।

২.৩: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই এবং ইসলামের দাওয়াত ও জিহাদ-ব্যবস্থা

প্রারম্ভিককাল থেকেই ইসলাম তার অনুসারীদের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের উত্তম হাতিয়ার সরবরাহ করে এসেছে। জিহাদের মতো চিন্তাযুদ্ধেরও পরিপূর্ণ নির্দেশনা ইসলাম আমাদের প্রদান করেছে। শরিয়ত যেভাবে জিহাদের রীতিনীতি, পদ্ধতি ও বিধান বয়ান করেছে, তদ্রূপ বিস্তারিত আলাপ হাজির করেছে চিন্তাযুদ্ধের কৌশল নিয়েও। ইসলামের প্রাথমিককাল থেকে এই দাওয়াত ও মানুষকে সত্যের প্রতি আহ্বান-কার্যক্রমই মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে। অর্থাৎ, ইসলামে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই ভিন্ন কোনো বিষয় নয়; বরং ইসলামের যে দাওয়াতি প্রকল্প, তা তার বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইও। দুটো একই আন্দাজে পরিচালিত হয়।

মুসলমানেরা তাদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে অংশ নেয় আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে বিনিময়প্রাপ্তির প্রত্যাশায়। আখিরাতের প্রতিদানই এখানে প্রধান প্ররোচক। এমনকি ব্যক্তিগত কিংবা জাতি ও গোত্রগত কোনো স্বার্থ এখানে কোনো প্রকারের

[৩১] সিরাতে ইবনে হিশাম, ২/৫৩০, ৫৩২

ভূমিকা রাখে না। মানবসমস্তের কল্যাণকামনা তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে। তারা একনিষ্ঠতা এবং কল্যাণকামিতাকে অবলম্বন করে চিন্তার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এ যুদ্ধে তাদের প্রধান হাতিয়ার হয় আভিজাত্য, সততা, সৃষ্টির সেবা, বদান্যতা এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষার মতন অনন্য সব বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালার প্রতি আস্থা, তার শক্তিমত্তার প্রতি অনড় বিশ্বাস, ধৈর্য এবং সহনশীলতাকে তারা গ্রহণ করে প্রতিপক্ষের আঘাতের বিরুদ্ধে ঢালরূপে। তাদের আহ্বান হয় তাওহিদের কালিমার প্রতি। মুখে মুহুর্মুহু উচ্চারিত হতে থাকে রবের নাম। আল্লাহ নামের জিকির হয় তাদের রুহের খোরাক। কুরআন কারিমের আয়াত তাদের জবানে এমন ভাষা পায়, কোনো শ্রোতা তাতে প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারে না।

তারা তো আল্লাহর সৈনিক। যে কারণে শরিয়ত কখনো লঙ্ঘিত হয় না তাদের দ্বারা। যুদ্ধক্ষেত্রেও তারা মেনে চলে রবের নির্দেশ। শরিয়তের বিধান ভূলুণ্ঠিত করে আল্লাহর নারাজিকে তারা সাথি করতে চায় না। তাদের সর্বক্ষণের আরাধ্য থাকে রবের সন্তোষ অর্জন। সে কারণেই মিথ্যার আশ্রয় তারা গ্রহণ করে না। চিন্তাযুদ্ধে বাহ্যত জয়ের জন্য নীতিবিরুদ্ধ প্রোপাগান্ডায় কখনো লিপ্ত হয় না। তারা প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করে না। তারা ধোঁকাকে নিজেদের চিন্তার সাথে গুলিয়ে ফেলে না। তারা বরং সত্যের দ্বারা প্রভাবিত করে পৃথিবীকে। তারা কৃত্রিম চাকচিক্যের ঝলকানিতে মানুষকে মোহগ্রস্ত করে না। বরং অন্ধকার পথের যাত্রীকে সত্যের আলোকবিন্দুর সন্ধান দেয়। তারা মানুষকে মতিভ্রম করে দেয় না। বরং তাদের সুস্থির চিন্তার দিশা এনে দেয়।

প্রথম শতাব্দীর ইতিহাস সাক্ষী—কোনো জনপদে মুসলমান পৌঁছার পূর্বে পৌঁছে যেত ইসলামের দাওয়াত। দাঈদের কথার তুলনায় তাদের কর্ম ও আমলের বিভায় প্রভাবিত হয়ে মানুষ দলে দলে প্রবেশ করত ইসলামে।

ইসলামের আভিজাত্যের যারা বিরোধিতা করত, অস্বীকার করে বসত ইসলামের ঐতিহ্যের এবং সৌন্দর্যের, যারা বাধা তৈরি করত ইসলামের দাওয়াতি প্রকল্পে, জিহাদের তরবারি উঁচিয়ে সরিয়ে দেওয়া হতো তাদের পথের মাঝখান থেকে। জিহাদ ছিল ইসলামের দাওয়াতি-প্রকল্পের উত্তম সহায়ক এবং শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক।

২.৪: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই : খেলাফতে রাশেদা পর্ব

খেলাফতে রাশেদার সময়কার চিন্তাযুদ্ধের সূচনা ঘটে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের সাথে সাথেই। ইসলামকে সমগ্র আরবজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে দেখে যেসব ভ্রান্ত দল আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়েছিল, তারা নতুন করে সামনে আসে। ইসলামের সকল বিরোধীশক্তি মুসলমানদের এমন শোকতপ্ত ও অস্থির সময়ের পূর্ণ ফায়দা হাসিলের চেষ্টায় নামে। ইসলামি দুনিয়ায় সহসাই এমন কিছু ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য যা যথেষ্ট ছিল। দলে

দলে মানুষ দীন ত্যাগ করে মুরতাদ হতে থাকে। কিছু গোত্র জাকাতের বিধান অস্বীকার করে বসে। একই সময়ে নবুওয়াতের তিনজন মিথ্যা দাবিদার একসাথে আত্মপ্রকাশ করে। এটা একদমই স্পষ্ট যে, এমন পরিকল্পিত ও সম্মিলিত বিদ্রোহ কোনো প্রকার ভাবনা-চিন্তা ও কারুর পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভব নয়। চিন্তার দৈন্য এবং বিশ্বাসের সংশয় অকস্মাৎ ঘটে না কখনো। একদমই কারুর প্রয়াস-প্রচেষ্টা ছাড়া ভ্রান্ত চিন্তার আবির্ভাব অতঃপর মানুষের মগজে তার বিস্তার—অসম্ভব প্রায়। একটি বিন্যস্ত পরিকল্পনাই মানুষের মন-মগজে এমন বিবর্তন নিয়ে আসতে পারে কেবল। হ্যাঁ, সুযোগসন্ধানীরা লুফে নিতে পারে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের জন্য—এমন মুহূর্তেরও জন্ম হয় বটে। সে আলাপ ভিন্ন।

নবীজির তিরোধান না হতেই ভ্রান্তচিন্তার লোকেরা সেই সময়টাকে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। সে-সময় যদি আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের মাঝে আবু বকর সিদ্দিকের মতো সুস্থির চিন্তা, অদম্য সাহস এবং যোগ্য নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম ব্যক্তিকে নেতৃত্বের আসনে আসীন না করতেন, ইসলামের দুর্ভাগ্যের দাস্তান হয়তো-বা তখনই রচিত হয়ে যেত। সে আশঙ্কা ছিল বৈ কি!

অবিচলতা, আল্লাহ তায়ালার উপর অনড় বিশ্বাস এবং ঈমানি জজবার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তখন সিদ্দিকে আকবর। মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা ফেতনাগুলোর সামনে তিনি এমন দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান যে, নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে মিথ্যার সকল ক্ষমতা নিস্তেজ হয়ে আসে। ইসলাম তার নিজস্ব শক্তিমত্তা এবং সত্যতার বলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে মুক্তআকাশের নিচে।

হজরত উমরের খেলাফতকাল তো ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ। দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছিল ইসলামের আহ্বান। প্রতিদিন বিস্তৃত হয়ে চলছিল ইসলামের সীমানা। সেই সময় আড়ালে-আবডালে মুখ লুকিয়ে পড়ে থাকা ছাড়া ফেতনাবাজদের করার তেমন কিছু ছিল না। তারপরও ইসলামের বিপক্ষশক্তি একদমই কোনো চক্রান্ত-ছক আঁকেনি তা নয়; বিশেষ করে অমুসলিমেরা ইসলামের বিজয়গতি রুখে দেবার জন্য সময়ে সময়ে নানা বুদ্ধিবৃত্তিক ছল ও কৌশল নিয়ে হাজির হয়েছে।

হজরত উমরের শঙ্কা ছিল, অমুসলিমেরা মুসলিমদের কৃষ্টি-কালচার ও তাহজিব-তামাদ্দুন বিনষ্ট করার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবে না। সে কারণে প্রথম থেকেই তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মিদের জন্য স্বতন্ত্র বিধান প্রণয়ন করেন। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, তাদের বাহনজন্তু এমনকি তাদের বসতির সীমানাও আলাদা করে ফেলেন। অনারব ইসলামি অঞ্চলগুলোতে মুসলিম-অমুসলিম জনপদের মধ্যে এতটুকু দূরত্ব রাখা বাধ্যতামূলক করে দেন যে, মুসলমান এবং জিম্মি তারা যেন একে অপরের ঘরের আলোও দেখতে না পারে। এ সতর্কতা তিনি অবলম্বন করেছিলেন—যেন কাফিরদের কোনো কার্যকলাপ ও সংস্কৃতি মুসলিম-মানসে প্রভাব বিস্তার করবার অবকাশ না পায়।

এমনতর সব সতর্কতার কারণে হজরত উমরের সময়কালে ইসলামের শত্রুপক্ষ কোনোদিক থেকে ইসলামের ক্ষতি সাধনে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। ইসলামের বিরুদ্ধে কোনোদিক থেকেই কায়দা করে উঠতে না পেরে ইসলামের বিপক্ষশক্তি তাদের চলার পথের প্রাচীরই সরিয়ে দেয়। জনৈক ইহুদির হাতে শহিদ হতে হয় ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে।

২.৫: অনৈক্য সৃষ্টির প্রয়াস

খ্রিষ্টীয় হঠকারিতা এবং ইহুদিচক্রান্ত হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে এসে একাত্ম হয়ে যায়। এবং সাবায়ী গোষ্ঠীর ছদ্মাবরণে তারা নবরূপে ইসলামের বিনাশ সাধনের লক্ষ্যে মাঠে নামে, যার পরিণতিতে উসমান ইবনে আফফানের নামে কুৎসা রটানো হয়। আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসার নামে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির কাজ শুরু হয়ে যায়। এবং পরিশেষে ইসলামের তৃতীয় খলিফা এমনই এক ভ্রান্ত দলের হাতে নির্মমভাবে শহিদ হন। এর ফলে ইসলামের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যে ক্ষতি হয়ে যায়, তার ক্ষতিপূরণ আর কখনো সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে পরবর্তী এক দশক পর্যন্ত ইসলামি খেলাফত এবং মুসলিম-সমাজ তার বিরূপ ফল ভোগ করতে থাকে।

সেই বিরূপ পরিণামেরই ধারাবাহিকতা ছিল হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়কার জামাল এবং সিফফিনের যুদ্ধদুটি। আরও দুঃখজনক হলো—সিফফিনের যুদ্ধের ভয়াবহতা চিন্তা করে হজরত আলী এবং মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মধ্যে যখন সন্ধিচুক্তির একটি পরিবেশ তৈরি হলো, খারেজি নামে এক নতুন ফেতনার আবির্ভাব ঘটিয়ে মুসলমানদের আবারও দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলা হলো। হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্থলবর্তী হজরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের বদৌলতে হজরত মুয়াবিয়াকে যখন ইসলামি বিশ্বের খলিফা মনোনীত করা হলো তখন গিয়ে ইসলামি বিশ্বে স্থিরতা ফিরে এলো। মুসলমানেরা প্রবেশ করল বিজয় এবং সফলতার নতুন যুগে।

২.৬: বনু উমাইয়ার যুগে গৃহযুদ্ধের চেষ্টা

হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকালের পর ইসলামি রাজনৈতিক উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার একটি শঙ্কা দেখা দিয়েছিল। সেই অবস্থায় হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফা গমন করেন চলমান পরিস্থিতি শান্ত করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কারবালার প্রান্তরে তাকে শহিদ করে দেওয়া হয়। তার শাহাদাতের ঘটনা বিবদমান পরিস্থিতিকে আরও উসকে দেয় এবং নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়বার একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। ভ্রান্ত দলগুলো জেগে উঠতে থাকে নতুন উদ্যমে। আর মুসলিম-সমাজ ক্রমেই তলিয়ে যেতে থাকে দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও গৃহযুদ্ধের অতল অন্ধকারে। এবং গৃহযুদ্ধের অতলান্তে তলিয়ে যাবার এই ধারা অব্যাহত থাকে খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের সময়কাল পর্যন্ত। তারপর পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূলে আসে।

শাসনকালের মাঝের এবং শেষদিককার কিছু সময় বাদ দিলে উমাইয়া শাসনামলের পুরো সময়টা ছিল মুসলমানদের উত্থানকাল। বিভিন্ন ভ্রান্ত দল ও ফেরকার উদ্ভব সত্ত্বেও মুসলমানদের বিজয় এবং কর্তৃত্ব সমুন্নত ছিল। যেহেতু ফেরকাগুলো তখন মাত্র প্রকাশ্যে আসছে, সদস্যসংখ্যা তখনও সামান্য—যার ফলে ইসলামের বড় কোনো ক্ষতি তাদের দ্বারা সংঘটিত হবার সুযোগ তৈরি হয়নি।

এই যুগেই কুরআন কারিম, সিরাত এবং হাদিসের উপর খ্রিষ্টীয় জগতের আপত্তি উত্থাপিত হতে শুরু করে। কিন্তু তাদের অভিযোগ-আপত্তি তৎকালীন মুসলমানদের তেমন প্রভাবিত করতে পারে না।

২.৭: আব্বাসীযুগে দর্শনশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব : ইউরোপের প্রথম বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ

আব্বাসীযুগে পশ্চিমাজগৎ প্রথম সুযোগ পায় ইসলামি বিশ্বের উপর বুদ্ধিবৃত্তিক হামলা করার। এশিয়ামাইনর এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে মুসলমানদের অনবরত বিজয়াভিযানের সূত্রে মুসলমান ও ইউরোপিয়ান খ্রিষ্টানদের মধ্যকার ভূমির দূরত্ব কমে আসতে থাকে। বৃদ্ধি পেতে থাকে পারস্পরিক প্রমোদভ্রমণ এবং ব্যবসায়িক যাত্রার পরিমাণ। সেই অবসরে ইউরোপের প্রাচীন শাস্ত্র মুসলমানদের হাতে আসে। ইউরোপ থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় লেখাজোখার স্থানান্তর ঘটতে থাকে ইসলামি বিশ্বে। সেই সকল 'বৌদ্ধিক' জ্ঞান-বিদ্যা যেকোনো ধর্মীয় বিশ্বাসে অনাস্থার প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে—ততদিনে এ অভিজ্ঞতা গির্জার বেশ ভালোভাবেই অর্জিত হয়ে গিয়েছিল। তাদের বেশ ভালোই জানা ছিল, দর্শন-ফালসাফা চির ধরিয়ে দিতে পারে মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে। যে কারণে ধর্মযাজকেরা সে-সব বিদ্যার পঠন-পাঠনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছিল। কিন্তু আব্বাসীযুগে এসে দর্শন ও ফালসাফার সে-সব ভ্রান্তিপূর্ণ গ্রন্থাদি ইসলামি বিশ্বে অবাধে প্রবেশ করতে শুরু করে।

যখন ইসলামি বিশ্বে এসব গ্রন্থ পরিচিতি লাভ করে তখন কুরআন-সুন্নাহ এবং ফিকহের পাশাপাশি দর্শন ও ফালসাফাচর্চার নামে একশ্রেণির মুক্তবুদ্ধির চিন্তকের আবির্ভাব ঘটতে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে মুতাজিলা ফেরকা নামে তারা এক ভয়াবহ ফেতনার আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়।

হিজরি প্রথম শতাব্দীতেই বিদআতি ফেরকার আবির্ভাব ঘটে গিয়েছিল এবং তাদের আবির্ভাবের সূচনাকাল থেকেই উম্মাহর বড় বড় আলেম ও বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ তাদের ভ্রান্ত চিন্তা ও উদ্ভট যুক্তি-প্রমাণের উপযুক্ত জবাব দিয়ে আসছিলেন। বিদআতি ফেরকার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখেন যিনি, তিনি ইমাম আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-ফিকহুল আকবার' রচনার মাধ্যমে তিনি সঠিক আকিদা-বিশ্বাসের প্রচারে ভূমিকা রেখেছেন কেবল নয়; বরং উম্মাহকে রক্ষা করেছেন ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে। এবং সকল ভ্রান্ত চিন্তা ও বিশ্বাসের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণপূর্বক উম্মাহকে বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করে পরিচালিত

করেছেন সিরাতুল মুসতাকিমের পথে। অপরদিকে উম্মাহর আরেক রাহবার ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ 'আর-রিসালাহ' এবং 'কিতাবুল উম' প্রণয়নের মাধ্যমে কতক ভ্রান্ত দলের চিন্তা-বিশ্বাসের মূলে আঘাত হানেন।

পরবর্তীকালে হানাফী মতাবলম্বী ফকিহ ও মুহাদ্দিস ইমাম তহাবী রহিমাহুল্লাহ 'আল-আকিদাতুত তহাবিয়্যা' নামে ছোট্ট একটি পুস্তিকা রচনা করেন। আকিদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত তার রচিত সেই পুস্তিকাটি আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর আকিদা-বিশ্বাস এবং চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করছে। সেই সময়েই ইমাম বুখারী তার বিখ্যাত হাদিসগ্রন্থ 'আল-জামে আস-সাহীহ' সংকলন করেন। তিনি তার গ্রন্থের শিরোনাম এমনভাবে বিন্যস্ত করেন, শিরোনামের বিন্যাসেই ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের দলিলের খণ্ডন হয়ে যায়। তার অনুসরণে আরও কতক মুহাদ্দিস তাদের সুনান ও জামের[৩২] শিরোনাম তৈরি করতে গিয়ে বাতিল ফেরকার দলিল খণ্ডন করার বিষয়টি সামনে রাখেন এবং আহলে হকের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই সময়ে আবির্ভাব ঘটে মুতাজিলাদের। খলিফা হারুনুর রশিদের সময়কালে এমন কতক চিন্তাবিদের প্রকাশ ঘটতে থাকে, যারা তাদের চিন্তা ও কর্মধারায় জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) আলেমের বিরোধিতা করে বসে। কিন্তু সুখের খবর হলো—তৎকালে ইসলামি বিশ্বের কাজিউল কুজাত বা প্রধানবিচারপতি ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ। তার ব্যক্তিত্বের সামনে ভ্রান্ত চিন্তার মানুষেরা তেমন সুবিধা করতে পারেনি।

মুতাজিলা-সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয় হারুনুর রশিদের ইনতেকালের পর। তার তিরোধান হয়ে গেলে খেলাফতের মসনদে বসেন তার পুত্র মামুনুর রশিদ। নতুন খলিফা ছিলেন 'মুক্তচিন্তা'র সমর্থক। মুক্তচিন্তার চর্চা তিনি পছন্দ করতেন মনেপ্রাণে। পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহ ছিল বিপুল। সে-সময়ে এশিয়ামাইনর (আনাতোলিয়ার) অঞ্চলগুলোতে রোমানদের সাথে মুসলমানদের লড়াই চলছিল। চলমান সেই যুদ্ধে মাঝেমধ্যে সন্ধির অবকাশও এসে যেত। মামুনের গোচরে এলো যে, রোমে দর্শন ও ফালসাফার বিরাট সংগ্রহ অর্গলবদ্ধ পড়ে আছে। তিনি রোমের বাদশাহর কাছে দূত পাঠিয়ে সেইসব দর্শন ও ফালসাফার সংগ্রহ চেয়ে বসেন। বাদশাহ তার সভাসদ ও রাজযাজকদের সাথে পরামর্শ করলে প্রায় সকলেই দর্শনের সংগ্রহশালা মামুনের হাতে তুলে দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। যাজকদের মধ্যে একজন ছিলেন যুগসচেতন। তিনি জানতেন, নিছক বুদ্ধিমত্তার উপর ভিত্তি করে

---

[৩২] সুনান ও জামে মুহাদ্দিসদের দুটো বিশেষ পরিভাষা। সুনান দ্বারা উদ্দেশ্য হাদিসের ওই সমস্ত গ্রন্থ, যেগুলো ফিকহের অধ্যায়ের বিন্যাস অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন : ইমাম নাসায়ী রহ. এর সংকলিত হাদিসগ্রন্থ সুনানে নাসায়ী। পক্ষান্তরে জামে বলা হয় সেই সমস্ত হাদিসগ্রন্থকে, যেগুলোতে দীনের মৌলিক ৮টি বিষয় : আকায়েদ, সিয়ার, তাফসির, আহকাম, আদব, ফিতান, রিকাক ও মানাকিব অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন : ইমাম তিরমিজী রহ. এর সংকলিত হাদিসগ্রন্থ জামে তিরমিজী।

রচিত এই গ্রন্থমালা যেকোনো ধর্মের বিশ্বাসের মূলে সংশয়ের ঘুণপোকার জন্ম দিতে পারে। ক্রমেই সে ঘুণপোকা ভেতর থেকে খোকলা করে দিতে পারে ক্ষমতার মসনদও। তিনি বাদশাহকে পরামর্শ দেন মুসলমানদের এই অজ্ঞতার সুযোগ লুফে নেওয়ার জন্য। অতঃপর রাজ-যাজকের পরামর্শে দর্শনের গ্রন্থাদি বাগদাদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে মামুনুর রশিদ রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে সে-সব দার্শনিক ও ফিলোসফিকাল গ্রন্থের অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন। আবু সাঈদ আন্দালুসি তার তাবাকাতুল উমাম গ্রন্থে লেখেন :

> মামুনুর রশিদ রোমের বাদশাহর কাছে গ্রিকদার্শনিকদের গ্রন্থাদি চেয়ে পাঠান। বাদশাহ প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হিপোক্রাটিস, গ্যালেন, ইউক্লিড, টলেমি প্রমুখের রচনাবলি মামুনের কাছে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দেন। মামুন অত্যন্ত যত্নের সাথে সে-সবের অনুবাদ করান এবং মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন সেগুলোর অধ্যয়ন ও চর্চার প্রতি। তার সময়ে গ্রিকদর্শনের গ্রন্থাবলি ব্যাপকহারে প্রকাশিত হতে থাকে এবং পৌঁছে যায় মানুষের হাতে হাতে। ইসলামি বিশ্বে গ্রিকদর্শনের উত্থানযুগ বলা চলে মামুনের শাসনকালকে। খলিফা মামুনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে মেধাবী এবং শিক্ষিত তরুণেরা দর্শন ও ফালসাফার চর্চায় আত্মনিয়োগ করে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার দরুন অল্প দিনেই সে-সব তরুণ বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে গ্রিকদর্শনশাস্ত্রে।[৩৩]

এই দর্শনশাস্ত্র, যার উৎপত্তি প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের হাতে, তা মূলত ছিল ভ্রান্তির আয়োজন। ইউরোপের অদূরদর্শী কিছু চিন্তক সেসবের প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েছিল। হ্যাঁ, দর্শনশাস্ত্রে মানুষের স্বভাব-চরিত্র, তাদের সামাজিক আচার-আচরণ, এবং রাজনৈতিক নীতিমালা সম্বন্ধীয় ভালো ও উপকারী কিছু আলাপ ছিল; কিন্তু সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্কিত দর্শনের যে দীর্ঘ বয়ান, তা মূলত তৈরি হয়েছিল কিছু উদ্ভট চিন্তা, শয়তানি প্ররোচনা এবং ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে। এটা তো আর বানান করে বোঝানোর প্রয়োজন পড়ে না যে, মহান স্রষ্টা সম্বন্ধে সামান্য সৃষ্টি নিজের অপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার আলোকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে তা সমস্যাশূন্য হতে পারে না। তাতে ত্রুটি রয়েই যাবে। এখন সেই ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্তকেই যদি 'মুহাক্কাম উলুম' (চিরন্তন জ্ঞান)-এর মর্যাদা দেওয়া হয়, তবে এটাকে বোকামি ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে! সৃষ্টিকর্তা এবং তার অদৃশ্য কার্যাবলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দেওয়া যেতে পারে কেবল সেই জ্ঞানের আলোকে, যা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে। আর সেই জ্ঞান মুসলমানদের কাছে সংরক্ষিত ছিল কুরআন ও হাদিসের মারফত। সেজন্য সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধীয় রহস্য উদঘাটনের জন্য গ্রিকদর্শনের দ্বারস্থ হবার কোনো প্রয়োজন ছিল না মুসলমানদের। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে দর্শনের গ্রন্থগুলো যখন আরবি ও ফারসি ভাষায় অনূদিত হতে শুরু করে, অল্প দিনের মধ্যে মুসলিম জ্ঞানচর্চাকারীদের একটি শ্রেণি দর্শন ও ফালসাফার চর্চায় তুমুল আগ্রহী হয়ে পড়ে।

[৩৩] তাবাকাতুল উমাম, পৃষ্ঠা : ৪৭

দেখা যায়—দর্শন ও ফালসাফার প্রতি তারাই আগ্রহী হয়ে উঠছে, মুক্তচিন্তা এবং নতুন বিশ্বাসের প্রতি যারা আজন্ম আসক্তি পোষণ করে আসত। তাদের মধ্যে খারেজিদের চিন্তার প্রতিবিম্ব দেখা যেত। উত্তরসূরি ও সালাফের চিন্তাভাবনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিপরীতে তাদের ঝোঁক ছিল নিজেদের মতামতের উপর। আমার চিন্তাই সঠিক—এই ব্যাধিতে তারা আক্রান্ত ছিল। তাদের জ্ঞান ও ইলমের পরিধি তো ছিল অনেক; কিন্তু গভীরতা বলতে কিছু ছিল না। এমন আলেমরা যখন গ্রিকদর্শন হাতে তুলে নিল তখন তারা তার জালে এমনভাবে বন্দি হয়ে পড়ল যে, দর্শনের আষ্টপৃষ্ঠ থেকে আর বেরোতে পারল না। তারা দর্শন ও ফালসাফার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে চিরন্তন আকিদা-বিশ্বাসের উপর প্রশ্ন তুলতে আরম্ভ করে। ইসলামের প্রমাণিত বিশ্বাস ও আকিদাকে পরিমাপ করতে থাকে বুদ্ধি-বিবেক ও নিছক চিন্তার নিক্তিতে। আল্লাহ্ তায়ালার রুইয়াত, আরশে তার সমাসীন হওয়া, আল্লাহ্র কালাম এবং তাকদিরের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ও তারা তাদের ভ্রান্ত যুক্তিবাদের মুখোমুখি দাঁড় করাতে থাকে। এই বিবেকপূজারি দলটিই 'মুতাজিলা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

খলিফা মানুনুর রশিদ ইতোমধ্যে গ্রিকদর্শনে প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। পাশাপাশি দীনের প্রচার-প্রসারের প্রতিও তার ছিল অপরিসীম আগ্রহ। সে কারণে মুতাজিলারা তার থেকে অভূতপূর্ব আনুকূল্য অর্জন করতে সমর্থ হয়। মামুনের ধারণা ছিল দীনের দাওয়াত সবার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য এবং প্রতিটি জাতির কাছে দীন গ্রহণযোগ্য করে তুলবার জন্য মুতাজিলাদের চিন্তাভাবনা ও দাওয়াতি রীতিপদ্ধতি অধিক কার্যকর।

মামুনের আনুকূল্যে মুতাজিলাসম্প্রদায় অল্পদিনের মধ্যেই খলিফার দরবারে প্রভাবক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং তাদের প্রসিদ্ধ ইমাম আহমাদ বিন আবু দাউদ বাগদাদের প্রধানবিচারপতির পদ বাগিয়ে নেয়। সে 'আকিদায়ে খালকে কুরআন তথা কুরআন আল্লাহ্ তায়ালার কালাম নয়; বরং তার মাখলুক'—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে তার দলের মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে হকপন্থি আলেমদের উপর বিচারের নামে প্রহসন চালাতে থাকে। বিবেকপ্রসূত আকিদা-বিশ্বাসের বিপরীতে কুরআন ও সুন্নাহকে আকড়ে থাকা সত্যপন্থি আলেমগণ সে যুগে খলিফার রোষানলে পতিত হন।

মামুন তার মৃত্যুর চার মাস পূর্বে আকিদায়ে খালকে কুরআনের পক্ষে এতটাই শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন যে, তিনি ঘোষণা দিয়ে বসেন—খালকে কুরআনের আকিদা যে লালন করবে না, তার কোনো প্রকার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি খালকে কুরআনের ভ্রান্ত আকিদা যারা পোষণ করত না, মামুন তাদেরকে তার রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে রেখে আসার নির্দেশ প্রদান করেন।

সেই সময়ে সভাসদ ও রাষ্ট্রের প্রতি মুতাজিলাসম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সাধারণ মানুষেরা মনে করত মুতাজিলা মতবাদে বিশ্বাসীরা তীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী, সমাজ ও যুগসচেতন এবং বাস্তববাদী। সাধারণ মানুষ তাদের গবেষণা ও

মতামতকে মনে করত নিরপেক্ষ এবং অধিক নির্ভরযোগ্য। বিপরীতে সত্যপন্থি আলেমদের মনে করত—তারা প্রাচীনপন্থি, সেকেলে, গোঁড়া, যুগসম্পর্কে অসচেতন এবং কালের ভাষা উপলব্ধিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

তারপরও এই সময়ে ইমাম আহমাদ বিন হামবল, ইমাম আবুল হাসান আশআরী, ইমাম আবদুর রহমান প্রমুখের মতো ব্যক্তিত্ব বর্তমান ছিলেন, যারা প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও সাহসিকতার সাথে ভ্রষ্ট মুতাজিলাদের ভ্রান্ত চিন্তা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

ইমাম আহমাদ বিন হামবল রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ২৪১ হিজরি) ছিলেন বিখ্যাত ফকিহ এবং মুহাদ্দিস। তিনি মুতাজিলাসম্প্রদায়ের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস অসার বলে ঘোষণা করেন এবং প্রকাশ্যে তাদের চিন্তা-বিশ্বাসের প্রতি তার ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি জনসম্মুখে প্রচার করতে থাকেন যে, কালামুল্লাহ, রুইয়াতুল্লাহ এবং এ ধরনের মাসআলাতে সালাফ যে অভিমত প্রদান করে আসছেন তা-ই সঠিক। এসব মাসআলায় সালাফের মতের পরিবর্তে দার্শনিক কোনো বিচার-বিশ্লেষণ গ্রহণীয় নয়। সালাফ যেমন বলেছেন, এসব বিষয়ে সেভাবেই ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরি। তাদের মতাদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে দার্শনিকদের চিন্তা গ্রহণ করা স্পষ্ট ভ্রান্তি বৈ নয়। এই সত্য উচ্চারণের খেসারতস্বরূপ মামুনের স্থলবর্তী খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ তাকে কারাগারে পাঠায়। খলিফার দরবারে ডেকে নিয়ে মুতাজিলাদের সাথে তাকে বিতর্কও করতে বলা হয়। বিতর্কে মুতাজিলাদের তিনি নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন। কিন্তু সত্য উপলব্ধি করবার পরও তারা তাকে জবরদস্তি করেন মুতাজিলাদের আকিদা গ্রহণ ও তাদের সমর্থন প্রদানের জন্য। কিন্তু মহান ইমাম তাদের প্রস্তাব একবাক্যে নাকচ করে দেন। পরিণামে তার উপর নেমে আসে অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ। কিন্তু সত্যের সিংহাসন থেকে তাকে একবিন্দু অপসারণ করা সম্ভব হয়নি। তিনি তার হক ও সত্য মতাদর্শ আকড়ে থাকেন বিপুল অপার্থিব শক্তি-বলে।

ইমাম বুখারীর উসতাদ আলী ইবনুল মাদিনী এই মহান ইমামের কথা স্মরণ করতে গিয়ে কী চমৎকার বলেছেন—দীনের মহত্ত্ব, বড়ত্ব ও ঐতিহ্য রক্ষায় আল্লাহ তায়ালা তার দুজন বান্দাকে এমনভাবে কবুল করেছেন যে, তাদের সাথে দ্বিতীয় কাউকে (তাদের সময়ে) শরিক পর্যন্ত করেননি; ইরতিদাদের ফেতনার সময় হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এবং খালকে কুরআনের ফেতনার সময় ইমাম আহমাদ বিন হামবলকে।[৩৪]

মুতাসিম বিল্লাহর পর ওয়াসেক বিল্লাহ দীর্ঘ সময় মুতাজিলাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং নিজেও খালকে কুরআন আকিদায় বিশ্বাস পোষণ করতে থাকেন। কিন্তু শামের আজদ নগরীর বিখ্যাত আলেম আবু আবদুর রহমান আজদী, যিনি ইমাম আবু

[৩৪] তারিখে বাগদাদ, খতিব বাগদাদী- ৪/৪২১

দাউদ এবং ইমাম নাসায়ির উসতাজ ছিলেন, ভরা দরবারে প্রধানবিচারপতি মুতাজিলাদের মুখপাত্র কাজী আহমাদ বিন আবু দাউদকে তর্কবিতর্কের মাধ্যমে নাকানিচুবানি খাওয়ালে ওয়াসেক বিল্লাহর কাছে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এবং চিরতরে খালকে কুরআনের আকিদা ত্যাগ করে তিনি মুতাজিলাসম্প্রদায়ের সংসর্গ থেকে ফিরে আসেন।[৩৫]

ওয়াসেক বিল্লাহর পর খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন মুতাওয়াক্কিল। তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের চিন্তাচেতনা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। মুতাজিলা মতবাদ এবং দার্শনিক চিন্তাবিশ্বাসের স্থলে সমাজে পুনঃস্থাপিত করেন কুরআন-সুন্নাহর মতামতের গুরুত্ব ও মর্যাদা। রাষ্ট্রীয় সহায়তায় ফের মুতাজিলা মতবাদ এবং দার্শনিক চিন্তাভাবনার জয়যাত্রা থামিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য এরপরও ইলমি মজলিসে এবং জ্ঞানীদের আলোচনা-সমালোচনায় দর্শনের চর্চা রয়ে গিয়েছিল; সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু সমাজে ভ্রান্ত চিন্তার যে শোরগোল উচ্চকিত হয়েছিল, তা অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে।

কাজী ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ তাইমীর বক্তব্য হলো :

> তিনজন খলিফা বিস্ময়কর কাজ করে দেখিয়ে গেছেন : এক আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি ইরতিদাদের ফেতনা সমূলে উপড়ে ফেলেছিলেন। আরেক হলেন হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ, যিনি মৃতপ্রায় উম্মাহর মাঝে এনে দিয়েছিলেন প্রাণের সঞ্চার। তৃতীয়জন খলিফা মুতাওয়াক্কিল, যিনি বিদআত মিটিয়ে সুন্নাহর পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিলেন।[৩৬]

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর শেষ এবং চতুর্থ শতাব্দীর শুরুর দিকের কথা। ইমাম আবুল হাসান আশআরী (মৃত্যু : ৩৩৪ হিজরি), যিনি একজন মুতাজিলি আলেম ছিলেন, নিজের পূর্বেকার ভ্রান্ত চিন্তা ও মতবাদ পরিত্যাগ করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মুখপাত্রে পরিণত হন। আর কেবল ইলম এবং জ্ঞানের ময়দানেই নয়; বরং সাধারণ পরিমণ্ডলেও ইসলামের বিরুদ্ধে এই বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের পোক্ত জবাব দিতে থাকেন। তিনি মুতাজিলাদের প্রতিহত করবার জন্য তাদের সাথে তাদেরই ভাষায় কথা বলেন এবং মুহাদ্দিস ও মুতাজিলাদের মধ্যে সংলাপের জন্য এক অভিনব ও মধ্যপন্থি বাকপদ্ধতি অবলম্বন করেন, যাতে মুতাজিলাদের মতো চিন্তা ও বিবেকবুদ্ধিকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়নি আবার মুহাদ্দিসদের মতো বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক আলাপ একদমই এড়িয়ে যাওয়া হয়নি। তিনি দার্শনিক আলাপ-সংলাপের বিরোধী ছিলেন না। বরং তার কথা ছিল—দর্শন ও ফালসাফা বাছবিচার করে গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে তাকে সমালোচনার কাঠগড়ায় হাজির করা হবে। তিনি মনে করতেন—বিরোধীদের সাথে তাদেরই ভাষা ও

---

[৩৫] আল-ইতিসাম, শাতেবী, পৃষ্ঠা : ৩২৪

[৩৬] তারিখে বাগদাদ, খতিব বাগদাদী।

পরিভাষায় কথা বলতে পারা অধিক কার্যকরী। আবু মুসা আশআরী তার বিভিন্ন বিতর্ক এবং রচনার মাধ্যমে বুদ্ধি ও বিবেকপূজারিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে তৎকালীন মনস্তাত্ত্বিক লড়াই প্রতিহত করতে এবং মুসলিম-মানসকে সেই ভ্রান্ত চিন্তার সয়লাবে ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হন।

তারই অন্যতম শাগরেদ ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী (মৃত্যু : ৩৩২ হিজরি); ইসলামি বিশ্বে যিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন কালামশাস্ত্রের সবচেয়ে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ আলেম হিসেবে। অনেক দিন মুতাজিলাদের সান্নিধ্যে কাটানোর পরিণামে আবু মুসা আশআরীর গৃহীত কার্যপদ্ধতির মধ্যে কিছু কঠোরতার প্রকাশ ঘটে যেত, যা অনেক সময় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিভিন্ন মাসআলা ও আকিদাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলত। মাতুরিদী সে সমস্যাগুলো দূর করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পথ ও পন্থা আরও পাকাপোক্ত ও সুসংহত করে তোলেন। ইমাম মাতুরিদীর পর কাজী আবু বকর বাকিল্লানী (মৃত্যু : ৪০৩ হিজরি) এবং শায়েখ আবু ইসহাক ইসফারায়িনীর (মৃত্যু : ৪১৮ হিজরি) মতো বিদগ্ধ ইসলামি দার্শনিকবৃন্দ মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। হারামাইন শরিফাইনের ইমাম জুয়ানী (মৃত্যু : ৪৬৮ হিজরি) রহিমাহুল্লাহুও কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন তার কালের মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক হামলার মোকাবেলার জন্য। তিনি একজন দার্শনিক ও বিতার্কিক হবার পাশাপাশি একজন বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং মুফাসসিরও ছিলেন। হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে বাগদাদের মাদরাসায়ে নিজামিয়া আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের চিন্তাধারার লোকদের সবচাইতে বড় মোর্চা এবং দুর্গে পরিণত হয়। সেলজুক সাম্রাজ্যের মালিক শাহের উজির নিজামুল মুলক তুসী এটাকে প্রতিষ্ঠা করেন। আর মাদরাসাটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আবু ইসহাক সিরাজী (মৃত্যু : ৪৭৬ হিজরি)। বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় মাদরাসায়ে নিজামিয়ার ভূমিকা ছিল অনন্য সাধারণ।[৩৭]

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত উদ্ভূত ভ্রান্ত মতবাদ ও ফেতনার 'কানমলা' দেওয়ার জন্য ইলম ও জ্ঞানজগতে গবেষণাধর্মী ও বিশ্লেষণাত্মক বেশ কিছু কাজ হয়, যা পরিণামে কল্যাণকর হয়েও দেখা দিয়েছিল। এই কালের আলেমদের প্রয়াস-প্রচেষ্টার ফলে হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে সৃষ্ট আরও কিছু ভ্রান্ত আকিদা ও মতবাদ যেমন, খারেজি, মুরজিয়া, কাদরিয়্যা, জাহমিয়্যি ইত্যাদি তৃতীয় শতকের পর একদমই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মুতাজিলা ফেতনার প্রকোপও কমে আসে এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতই ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র—প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাবকশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ভ্রান্ত মতাদর্শী বলতে রয়ে যায় কেবল শিয়াসম্প্রদায়, যারা একের পর এক নিত্যনতুন অভিনব সব ফেতনার জন্ম দিয়ে যাচ্ছিল।

---

[৩৭] তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপিত : ১/৯৪-১১৮

২.৮: মুসলিম দার্শনিকদের ফেতনা

কিন্তু এতকিছুর পরও বাতিল শক্তি নিশ্চুপ বসে থাকে না। তাদের ক্রীড়নকেরা ভেতরে ভেতরে ঠিকই তাদের কাজ করে যেতে থাকে। এই যুগে দ্বিতীয়বারের মতন তাদের হাতিয়ার হয় দর্শন ও ফালসাফা। কিন্তু এবারে তাদের কর্মপদ্ধতি হয় পূর্বের থেকে কিছুটা ভিন্ন। তারা নতুন তরিকায় দর্শন ও ফালসাফার ব্যবহার শুরু করে। বিগত শতাব্দীতে দর্শনকে তারা নিয়েছিল একটি মতবাদ ও মাজহাব হিসেবে। এবং মতাদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তারা দর্শন-ফালসাফার আলোচনা করছিল। আকল ও বিবেকপূজারি মুতাজিলি আলেমরা যদিও বিবেকবুদ্ধির বিচার-আচারের জয়গান গাইছিল, তবু তারা কুরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামি ফিকহের আদেশ-নিষেধ মানত। গুনাহ থেকেও যথাসাধ্য বেঁচে থাকত। তাদের প্রচেষ্টা কেবল এতটুকু ছিল যে, তারা কামনা করত দীন ও বুদ্ধি-বিবেক-যুক্তি পরস্পরে এমনভাবে সহাবস্থান করুক যেন গ্রিকদর্শন ইসলামের সহায়ক হয়ে দেখা দেয়। যদিও তাদের এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। এবং দর্শনকে ইসলামের সহায়তায় ব্যবহারের বদলে নিজেরাই মনস্তাত্ত্বিক দৈন্যের শিকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু তারপরও তারা 'ঈমানদার'ই ছিল। আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শক্ত মনোভাব রাখতেন—এমনকি হকপন্থি আলেমরা পর্যন্ত তাদের কেবল 'বিদআতি' সম্প্রদায় হিসেবেই আখ্যা দিয়েছেন। তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে—তাদের ব্যাপারে এমন সিদ্ধান্ত কেউ দেননি।

কিন্তু হিজরি চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে ফালসাফা ও দর্শনের দরিয়ায় উন্মাতাল এক নয়া ঢেউ উথলে ওঠে। যার তোড়ে দীন ও ইসলামকে দুর্বল করার; বরং বলা ভালো নিশ্চিহ্ন করে দেবার মনোবাসনা এমন উদগ্রভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে জেগে ওঠে যেমন বাসনা ক্রিয়াশীল ছিল গ্রিকদার্শনিকদের চিন্তাচেতনায়। এই নয়া চিন্তা ও দর্শনের লাগাম এমন সব মুসলিম দার্শনিকের হাতে আসে, গ্রিকদর্শনের অনুবাদের মধ্যেই যাদের দর্শনচর্চা সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তারা সে-সবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেও উদ্যোগী হয়। এ সকল মুসলিম দার্শনিকের মধ্যে আবু ইয়াকুব কিন্দি (মৃত্যু : ২৫৮ হিজরি) এবং আবু নাসর আল-ফারাবীর (মৃত্যু : ৩৩৯ হিজরি) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আল-ফারাবী অ্যারিস্টটলের দর্শনকে নতুন এক মনোহর আকৃতিতে হাজির করেন। ইসলামি দুনিয়ায় অ্যারিস্টটলের সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যকার হিসেবে তিনি আবির্ভূত হন। তিনি অ্যারিস্টটলের দর্শনে ভয়ঙ্কর রকম প্রভাবিত হয়ে পড়েন। যার ফলে অ্যারিস্টটলীয় দর্শনের সমালোচনার কোনও প্রকার প্রয়াসেই তাকে উদ্যোগী হতে দেখা যায় না। বরং কেবল অনুকরণীয় পদ্ধতিতেই তিনি অ্যারিস্টটলের দর্শন ও চিন্তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রচার-প্রসারের কাজ করে যেতে থাকেন। তিনি মানতেক, ফালসাফা ও দর্শনকে ঢেলে সাজিয়ে তাকে এমন আকর্ষক রূপ দান করেন যে, অজস্র আলেম বিমুগ্ধ হয়ে তার চর্চায় নিবৃত হয়ে পড়ে। এজন্যই ফারাবীকে বলা হয় গ্রিকদর্শনের দ্বিতীয় গুরু।

তারপরে আসেন হিজরি পঞ্চম শতকের বিখ্যাত চিন্তক ও দার্শনিক বু আলী ইবনে সিনা (মৃত্যু : ৪২৮হিজরি)। এই কালে দর্শনচর্চার দায়িত্ব অর্পিত হয় যেন তার কাঁধে। লেখালেখি এবং গ্রন্থরচনার মাধ্যমে গ্রিকদর্শন-চিন্তাকে তিনি বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। ইবনে সিনা চিকিৎসাশাস্ত্রে যে বিরাট কর্মযজ্ঞ সমাধা করে দেখিয়েছেন তা উপেক্ষা করবার উপায় নেই। এবং তার এই মহান কর্মযজ্ঞ ও তার কল্যাণের স্বীকৃতি দিতেই হবে। কিন্তু সেই সাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে, দর্শন ও ফালসাফার মাধ্যমে ইসলামি বিশ্বে তিনি সন্দেহ-সংশয় এবং ইলমে ওহী বিবর্জিত মুক্তচিন্তার যে বীজতলা তৈরি করেছেন, তাতে নৈরাজ্য ও ধর্মহীনতা ছাড়া ভিন্ন কোনো ফসল উৎপন্ন হয়নি।

দার্শনিকদের এই শ্রেণি যদিও প্রকাশ্যে দীন ও ধর্মের অস্বীকারকারী ছিল না; কিন্তু কার্যত দীন-ধর্মকে তারা বেকার জ্ঞান করত। এবং অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর অনুকরণে আকল ও বুদ্ধি-বিবেককেই একমাত্র পরিপূর্ণ ও মহত্তম মনে করত। সবচাইতে বড় কথা হলো, এরা দর্শন ও ফিলোসফিকে দীনের বিপরীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং পরিপূর্ণ একটি জীবনপদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। আর কেবল স্বভাব-প্রকৃতি ও যাপিত জীবনের কথাই বলছি কেন! বরং রাজনীতি, আখলাক থেকে শুরু করে আকিদা-বিশ্বাস এবং রুহানিয়্যাতের ক্ষেত্রেও দর্শন ও ফালসাফাই ছিল তাদের কাছে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ রাহনুমা।

লোকেদের মধ্যে ফালসাফা এবং দর্শনচর্চার আগ্রহ যত বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাদের মন ও মনন ততই আল্লাহ-রাসুল, দীন-ধর্ম এবং শরিয়তের ভালোবাসা থেকে মুক্ত হয়ে পড়ছিল। এমনকি মানুষের ইবাদত-বন্দেগি ও আমলি জিন্দেগিতেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে পাপ, অন্যায় ও গুনাহের অন্ধকার।

২.৯: ইখওয়ানুস সাফা মাদরাসা

হিজরি পঞ্চম শতকে যেভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সবচাইতে বড় দুর্গ হয়ে উঠেছিল বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসা, ঠিক তেমনি নাস্তিক এবং ধর্মবিদ্বেষীদের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বাগদাদেরই এক গোপন মাদরাসা 'ইখওয়ানুস সাফা'। এই মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় হিজরি চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। প্রতিষ্ঠানটির ম্যানুফেস্টো বা ঘোষণাপত্রে উল্লেখ ছিল :

ان الشريعة الاسلامية قد تنجست بالجهالات واختلطت بالضلالات ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها الا بالفلسفة

কোনো সন্দেহ নেই—ইসলামি শরিয়ত মূর্খতা আর অজ্ঞতায় ছেয়ে গেছে। শরিয়তকে এসব মূর্খতা ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করবার জন্য ফালসাফা ও দর্শনের আশ্রয়গ্রহণের বিকল্প নেই।

এই মাদরাসার 'চিন্তাবিদেরা' তাদের কার্যক্রম চালাতো খুবই গোপনে। আর দল ভারী করবার জন্য তারা কেবল তরুণ ও সমচিন্তার লোকদেরই খুঁজে বের করত।

কেননা পোক্ত চিন্তার মুসলমান কিংবা বয়সের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মানুষদের তাদের এইসব ভ্রান্ত ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তা গেলানো সহজ ছিল না।

প্রতিষ্ঠানটির কর্তাব্যক্তিরা বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয়ে ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করে, সব মিলিয়ে যার সংখ্যা বায়ান্নটি। এই ছোট পুস্তিকাগুলো খোরাসান থেকে আন্দালুস পর্যন্ত আধুনিক-মনস্কতা, নাস্তিক্যবাদ এবং সংশয়বাদের বীজ বুনে চলছিল।

২.১০: বাতিনিয়্যাত (নিগূঢ়তত্ত্ব) তত্ত্বের হামলা

হিজরি পঞ্চম শতকে আরেক নতুন চিন্তা ইসলামের ভিত্তিমূলে ফাটল সৃষ্টি করবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। এই নতুন চিন্তার নাম দেওয়া হয় বাতিনিয়্যাত। ইসলামের বিপক্ষশক্তির কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইসলামের তাবৎ বিধিবিধান এবং কায়দাকানুন কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহে ইসলামিতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং দালিলিকভাবে বর্তমান। এবং সেগুলোকে ভুল প্রমাণ করবার জন্য তাদের শত বছরের চলমান সকল প্রয়াস বারবার ব্যর্থ হয়ে আসছে। তখন তারা বেশ ভালোভাবেই বুঝে নেয়, দীন ও শরিয়তের উৎসমূল কুরআন-সুন্নাহ অক্ষত থাকতে তাদের কোনো প্রচেষ্টাই সফল হবার নয়। এখন কুরআন-সুন্নাহর 'আলফাজ' ও টেক্সট বিনষ্ট করবার কোনো ধরনের এখতিয়ার বা অথরিটি তো তাদের ছিল না। সে সুযোগ কারুরই নেই। সে কারণে তারা এমন এক চিন্তা ও দর্শনের আবির্ভাব ঘটায়, যা কুরআন-সুন্নাহর আলফাজ থেকে মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা দূর করে দিতে পারে। এই নতুন চিন্তা ও দর্শনই হলো বাতিনিয়্যাত। এই দর্শনের সার ছিল—প্রতিটি শব্দেরই দুটি অর্থ থাকে। একটি জাহের আরেকটি বাতেন : আক্ষরিক এবং নিগূঢ়। আলেমরা কেবল শব্দের জাহেরি বা আক্ষরিক অর্থটিই জানেন। আর শব্দের বাতেনি ও নিগূঢ় অর্থের জ্ঞান কেবল প্রতি কালের ইমামদেরই থাকে। বাতেনি অর্থটাই হলো একটি শব্দের প্রকৃত অর্থ। সেজন্য কুরআন-সুন্নাহর কোনো শব্দ থেকে যে বিধানই সাব্যস্ত হোক না কেন, কালের ইমাম যদি তার বিপরীত বিধান বর্ণনা করেন, তবে সে অনুযায়ী আমল করাই আবশ্যক হয়ে পড়বে। কেননা একজন 'ইমাম' শব্দের বাতেনি অর্থের দিকে লক্ষ রেখে বিধান বর্ণনা করেন, বাহ্যিক দুনিয়া যে বাতেনি অর্থ সম্বন্ধে বেখবর।

এই দর্শনচিন্তার জনক ছিল ইসমাইলি শিয়াসম্প্রদায়, যারা মিশরে 'ফাতেমি খেলাফত' নামে আলাদা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। তারা তাদের দর্শনচিন্তার প্রচারে ইসলামের প্রতিটি পরিভাষা ও তার অর্থ নিজেদের মতো করে রং চড়িয়ে বিকৃত করে যেতে থাকে। যেমন, তাদের ইমামদের ব্যাখ্যা অনুসারে পবিত্রতা হলো বাতিনিয়্যাত ছাড়া অন্যসকল ধর্মবিশ্বাস এবং চিন্তা-দর্শন থেকে মুক্ত হওয়া। জাকাতের অর্থ হলো, নিজেদের দর্শনচিন্তা অর্থাৎ বাতিনিয়্যাত তত্ত্বের প্রচার ও প্রসার। হজ হলো, বাতেনি ইলমের তালাশ। জান্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য—সকল বাতেনি জ্ঞান ও নিগূঢ় তত্ত্ব। জাহান্নাম দ্বারা উদ্দেশ্য—জাহেরি ও আক্ষরিক ইলম, যা মুহাদ্দিস ও ফকিহরা ধারণ করে। কা'বা দ্বারা মসজিদুল হারাম কেন্দ্রিক কাবা উদ্দেশ্য নয়।

বরং কা'বা দ্বারা উদ্দেশ্য তো স্বয়ং নবী। আর বাবে কাবা বা কাবার দুয়ার দ্বারা হজরত আলী উদ্দেশ্য। জিবরিল দ্বারা কোনো সত্তার অস্তিত্ব উদ্দেশ্য নয়; বরং জিবরিল হলো কুওয়্যাতে কুদসিয়্যা বা পবিত্রতম শক্তিমত্তার সয়লাব। বাতিনিয়্যাত এভাবেই ইসলামের প্রতিটি পরিভাষা বিকৃত করবার মধ্য দিয়ে দীন ও ইসলামেরই আমূল উৎপাটনের ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। তাদের এই ঘৃণিত কাজের জন্যই মুসলমানেরা তাদের 'মুলহিদিন' বা 'মালাহিদা' সম্বোধনে স্মরণ করে থাকে।[৩৮]

হাসান বিন সাব্বাহ ছিল এই দর্শন ও চিন্তার সবচেয়ে বড় প্রচারক। সে শরিয়তের প্রসিদ্ধ সব পরিভাষা ও অর্থ অস্বীকার করে হালাল-হারামের সীমারেখা মিটিয়ে দেয়; জায়েজ করে দেয় সবধরনের কামনা ও প্রবৃত্তির পূজা। সে ইসলামেরই নামে ইসলামের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক এক 'ধর্ম' হাজির করে সমাজের সামনে। এর চেয়েও ভয়াবহ যে কাজটি সে করে—একদল খুনি তৈরি করে গোপনে তাদের হাতে ইসলামের বড় বড় আলেমদের শহিদ করে দিতে থাকে। এই জঘন্য কাজের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি বিশ্বকে চরম মাত্রার ব্যক্তিত্ব ও আলেম-খরায় ফেলে দেওয়া। এবং এই কাজে তাকে মোটামুটি 'সফল'ই বলা যায়।

হিজরি প্রথম শতক থেকে শুরু করে হিজরি ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়কালব্যাপী মা'বাদ আল-জুহানি, জাহাম বিন সাফওয়ান, জাহেজ, ইয়াকুব কিন্দি, আবু বকর রাজী, ইবনে রাওয়ান্দী, ইবনুল মুকাফফা, আবু ঈসা ওয়াররাক, আবুল আলা মাআররী, উমর খৈয়াম, ফারাবী, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ এবং শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী এমন কিছু নাম, যারা ফালসাফা, দর্শন এবং আধুনিক-মনস্কতার শিরোনামে ইসলামি বিশ্বে ভ্রান্ত চিন্তার অনুপ্রবেশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর সময়কালের মানুষ। তিনি ছিলেন শামের বিখ্যাত ফিলোসফার বা দার্শনিক। সেই সাথে তিনি একজন ভালো কবি ও সাহিত্যিকও ছিলেন। যুবসমাজ তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ছিল। শেষমেশ নিজের নাস্তিক্যবাদী চিন্তা ও দর্শনের কারণে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর হাতে তাকে নিহত হতে হয়।

এখানে একটি কথা বলে রাখার প্রয়োজন বোধ করছি। শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রহিমাহুল্লাহ, যিনি তাসাওউফের বিখ্যাত সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা, তিনিও কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর সময়কালেরই। তবে তিনি এবং দার্শনিক শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী, সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী যাকে হত্যা করেন, দুজন ভিন্ন।

২.১১: প্রতিরোধ-চেষ্টা

দার্শনিক এবং নাস্তিকদের জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে আলেমগণ বিপুল অধ্যবসায় এবং দারুণ সচেতনতার স্বাক্ষর রাখেন। এই শ্রেণির আলেমদের মধ্যে সর্বাধিক সুখ্যাতি লাভ করেন ইমাম গাজালী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৫০৫ হিজরি)। তিনি একদিকে 'ফাজায়িহুল

[৩৮] মুলহিদিন বা মালাহিদা শব্দটি মুলহিদ শব্দের বহুবচন, যার অর্থ অবিশ্বাসী, নাস্তিক। -অনুবাদক

বাতিনিয়্যাহ' এবং 'মাওয়াহিবুল ইবাহিয়্যাহ' গ্রন্থ রচনা করে বাতেনি আকিদা ও চিন্তা-বিশ্বাসের পোক্ত সমালোচনা করেন এবং অন্যদিকে 'তাহাফাতুল ফালাসিফা' প্রণয়ন করে ফালসাফার ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত হানেন। ইমাম গাজালী রহিমাহুল্লাহ এই আবশ্যিক কর্মটি সমাধা দেওয়ার লক্ষ্যে ফালসাফা-দর্শনকে তার গভীর থেকে অধ্যয়ন করেন। এতে করে দর্শন-ফালসাফার দুর্বলতা ও গোঁমর সম্বন্ধে অবগতি লাভ তার জন্য অনায়াস হয়ে যায়। যার ফলে সব ধরনের প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে ফালসাফা-দর্শনের সেইসব কায়দাকানুন ও মূলনীতির সংশোধনের চ্যালেঞ্জ করে উঠতে তিনি সমর্থ হন, তখন পর্যন্ত ইসলামি বিশ্বে যা অক্ষরে অক্ষরে অনুসৃত হয়ে আসছিল। তিনি প্রমাণ করে দেখান যে, ফালসাফা ও দর্শন আল্লাহ, রাসুল, দীন-ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা এবং নবুওয়াত সম্বন্ধে যেখানেই মুখ খুলেছে সেখানেই স্খলনের শিকার হয়েছে। ফালসাফা-দর্শনের এইসব আলোচনা-পর্যালোচনা তার কায়দাকানুন ও মূলনীতি-সমেতই স্পষ্ট ভুল ও ভ্রান্ত।

ইমাম গাজালী রহিমাহুল্লাহর এই জবরদস্ত রচনাসমস্তের একেকটি আধুনিক-মনস্ক মুক্তচিন্তকদের হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে রাখে এবং গ্রিকদর্শনের বাহ্যিক চাকচিক্যকে একদমই নিশ্চিহ্ন করে ছাড়ে।

এর এক শতক পরের ঘটনা। ইবনে রুশদ (মৃত্যু : ৫৯৫ হিজরি) নামে আন্দালুসে ফালসাফার এক নতুন ভাষ্যকারের জন্ম হয়, যিনি 'তাহাফাতুত তাহাফা' নামে ইমাম গাজালীর চিন্তার খণ্ডন করার প্রয়াস চালান এবং অ্যারিস্টটলের প্রতিনিধিত্বপূর্বক প্রাণান্তকর পরিশ্রম শেষে দর্শনশাস্ত্রে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে সমর্থ হন। কিন্তু তার চেষ্টা-পরিশ্রমের 'প্রাসাদ' বেশি কাল স্থায়িত্ব পায় না। অল্পদিনের মধ্যেই আবুল বারাকাত বাগদাদি 'আল-মু'তাবার' প্রণয়ন করে অ্যারিস্টটলের অধিকাংশ চিন্তাই যে ভ্রান্ত—আরও একবার তা প্রমাণ করে দেখান। আর তারপরে আবির্ভাব ঘটে হকপন্থিদের মুখপাত্র মহান ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী রহিমাহুল্লাহর। তিনি তার নানামুখী রচনা, বিশেষ করে তার বিখ্যাত তাফসিরগ্রন্থ 'মাফাতিহুল গাইব' রচনার মধ্য দিয়ে ফালসাফা ও দর্শনের উপর পোক্ত ও মজবুত আপত্তি উত্থাপন করে হকপন্থি দার্শনিকদের তরফ থেকে হক আদায় করে দেন।

৫০ বছর পর। প্রসিদ্ধ শিয়া দার্শনিক এবং জ্যোতির্বিদ খাজা নাসিরুদ্দীন তুসি ফের কোমর বেঁধে নামে অ্যারিস্টটলের প্রতিনিধিত্ব করবার মানসে। সে তার সর্বশক্তি ব্যয় করতে থাকে ফালসাফা, মানতেক এবং গ্রিকদর্শনের হারানো 'ঐতিহ্যে'র পুনরুদ্ধারে। আজকাল দেখি খাজা নাসিরুদ্দীন তুসিকে ইসলামি ইতিহাসের একজন সফল বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্মরণ করা হয়, যেখানে সে ছিল মূলত ইসলামি বিশ্বের সবচাইতে ভয়ঙ্কর দুশমন ও ধ্বংসাত্মক শাসক হালাকু খানের উপদেষ্টা এবং মুসলিম নামধারী এক বিশ্বাসঘাতক। বাগদাদে খেলাফতে আব্বাসিয়ার পতনের পেছনে তার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। সেই সাথে খাজা নাসিরুদ্দীন তুসি ইলমের জগতে

মুসলমানদের এই পরিমাণ বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হয় যে, ইরাক এবং খোরাসানে নিখাদ ইসলামি ইলম ও জ্ঞানচর্চা দুর্লভ হয়ে পড়ে। এবং সর্বত্র মানতেক-ফালসাফার পঠন-পাঠন চালু হয়ে যায়। তার দুই শিষ্য কুতুব উদ্দীন সিরাজী এবং কুতুব উদ্দীন রাজী মানতেক ও ফালসাফায় নতুন গতির সঞ্চার করে। আর সেই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ইসলামি দুনিয়ার আলেমগণ আরও একবার নতুন করে নিজেদের বন্দি করে ফেলেন দর্শন ও ফালসাফার ভয়ঙ্কর ফাঁদে।

অবস্থা যখন এমনই শোচনীয়, পরম করুণাময় তখন এই উম্মতকে উদ্ধারের জন্য ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহকে (মৃত্যু : ৭২৮ হিজরি) নির্বাচন করেন। তিনি তার দুটি কালজয়ী গ্রন্থ 'আর-রদ্দু আলাল মানতিকিয়্যীন' এবং 'মিনহাজুস সুন্নাহ' রচনা করে মানতেক ও ফালসাফার তুলোধুনো করে ছাড়েন। আর এর মাধ্যমে আকল ও বুদ্ধি-বিবেকের উপর দীন ও শরিয়তের কর্তৃত্ব আরও একবার প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। এবং ইসলামি বিশ্বে পূর্বেকার মতন দীনি ইলম ও শরয়ি জ্ঞানকেই সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হয়।

ইমাম গাজালী, ইমাম রাজী এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুমুল্লাহর পোক্ত তাহকিক ও গবেষণার বদৌলতে গ্রিকদর্শনের জ্ঞানজগৎ মৃতবৎ হয়ে পড়ে। তারপর হিজরি একাদশ শতক পর্যন্ত ইসলামি বিশ্বে ভ্রান্ত গ্রিকদর্শন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। উলটো তার জায়গায় গড়ে ওঠে ফিকহ, হাদিস এবং তাসাউফশাস্ত্রের দৃষ্টিনন্দন সব প্রাসাদ। এবং একের পর এক আবির্ভাব ঘটতে থাকে ইবনে কাইয়ুম, আল্লামা আইনী, ইবনে হুমাম, জালালুদ্দীন সুয়ুতী, ইবনে খালদুন, মুজাদ্দিদে আলফেসানী এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবীর মতন বিরলপ্রতীম আলেমদের, ইসলামের ইতিহাস যাদের নিয়ে আজও গর্ব করে।

২.১২: গুরুত্বপূর্ণ ফল

মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের যে ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হলো, তা থেকে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয় :

১. এই শতাব্দীগুলোয় মুসলমানদের ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মনস্তাত্ত্বিক হামলার চেয়ে ভেতরকার লোকদের সৃষ্ট ভ্রান্ত চিন্তা ও আকিদা-বিশ্বাসেরই মোকাবেলা করে যেতে হয় অধিক। মুসলমানদের মধ্য থেকেই বিভিন্ন চিন্তার মানুষের আবির্ভাব ঘটে, যারা ইসলামি সমাজে প্রত্যহ নিত্যনতুন চিন্তা হাজির করতে থাকে। এই ভ্রান্ত চিন্তার আমদানিকারকদের গোলমেলে বুদ্ধিজীবিতার তিনটি প্রধান কারণ আমরা চিহ্নিত করতে পারি :

(ক) আত্মম্ভরিতা।

(খ) পূর্বসূরি ও সালাফের প্রতি অনাস্থা।

(গ) গ্রিকদর্শনের প্রতি অযৌক্তিক মুগ্ধতা এবং বিবেকবুদ্ধিকে দীন ও শরিয়তের উপর প্রভাবক জ্ঞান করা।

২. ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলো আমাদের সামনে এটাও স্পষ্ট করে তুলে ধরে যে, এই শতাব্দীগুলোয় বিস্তৃত হওয়া বিভ্রান্তির উৎসমুখ যদিও গ্রিকদর্শন, সেখান থেকেই এই বিভ্রান্ত চিন্তাসমস্তের আমদানি; কিন্তু তখনও পর্যন্ত ইউরোপ মুসলমানদের চিন্তাচেতনার উপর সরাসরি কুঠারাঘাত শুরু করেনি। হ্যাঁ, তবে খেলাফতে রাশেদার সময়কালে যেসব ইহুদি ও অগ্নি-উপাসক মুসলমানের বেশ ধরে মুসলমানদের পরস্পরে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে জড়িয়ে দিয়েছিল, তারা এইসব মনস্তাত্ত্বিক লড়াই ও বুদ্ধিবৃত্তিক চক্রান্তে শামিল ছিল। এমনকি কিছু ইউরোপিয়ান শাসক বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রদ্রোহী এবং ভ্রান্ত চিন্তার আন্দোলনকারীদের আর্থিক প্রণোদনাও দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তারপরও বলতে হবে—এই কয়েক শতাব্দীজুড়ে কোনো অমুসলিম শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের পরিকল্পিত ও অনবরত চক্রান্তের মারফত তাদের বিভ্রান্ত করবার অবস্থায় ছিল না।
৩. এই প্রকারের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ফলে বিভিন্ন স্থানে যদিও মুসলমানদের নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়; তবু ব্যাপকভাবে তখন পর্যন্ত গোমরাহী ও বিভ্রান্তি মুসলিম-সমাজকে আক্রান্ত করেনি। বিস্তৃত পরিমণ্ডলে ব্যাপকভাবে তখনও তারা বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের শিকার হয়নি। শত্রুদের চক্রান্ত কিছু নতুন উপদল সৃষ্টিতে সহায়তা করে, কিছু বিদ্রোহের দাবানল উসকে দেয়; তবে তার বেশি তেমন কিছু করে উঠতে পারেনিই বলা যায়। মুসলমানদের প্রায় সকলেই তখনও 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি'র প্রতিচ্ছবি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা, জীবনদর্শন এবং চিন্তাধারার উপর অবিচল ছিল। অন্যভাবে বললে—তখন পর্যন্ত কৃত চক্রান্তগুলো রাজনৈতিকভাবে মুসলমানদের কিছুটা বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হয় ঠিকই; কিন্তু আকিদা-বিশ্বাস ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে মুসলমানদের তেমন কোনো স্খলনের শিকার করতে পারে না।

২.১৩: বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণকারীদের ব্যর্থতার কারণ

বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণকারীদের ব্যর্থতা এবং মুসলমানদের সাফল্যের প্রধান যে কারণগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে :

১. আল্লাহ এবং তার রাসুলের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক মজবুত ছিল। কুরআন-সুন্নাহর সাথে সম্পর্ক এবং নিজেদের দীন-ধর্মের প্রতি ভালোবাসার উত্তাপ অবশিষ্ট ছিল। তারা নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল এবং তাদের গর্ব ছিল নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে। সাহাবা এবং নেককার পূর্বসূরিদের প্রতি তাদের আস্থা ছিল অটুট। কোনো বিপর্যয়ের কবলে না পড়বার পেছনে এটাই ছিল তৎকালের মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কারণ।
২. বিদ্যা ও জ্ঞানগত বিবেচনায় বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণকারীরা নিজেরাই ছিল দুর্বল। বিপরীতে মুসলমানদের পোক্ত দখল ছিল ইলমের প্রতিটি শাখায়। মুসলিম-

সমাজে এমন ব্যক্তিত্ব বর্তমান ছিলেন, যারা মনস্তাত্ত্বিক যেকোনো হামলাকারীর দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার সামর্থ্য রাখতেন।

৩. রাজনৈতিকভাবে মুসলমানেরা ছিল প্রভাবশালী। ক্ষমতাধর। যে জাতি রাজনৈতিকভাবে প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে থাকে, মনস্তাত্ত্বিকভাবে তারা নিজেদের প্রাগ্রসর জ্ঞান করতে থাকে। যার কারণে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তাদের পদানত করা সহজ হয় না। ফলে অমুসলিমদের কোনো চক্রান্তই সফলতার মুখ দেখে না।

৪. এইকালে মুসলিম শাসকেরা স্বয়ং দীনের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ভূমিকা পালন করতেন এবং নিজেদের দীন-ধর্ম সম্বন্ধে ছিলেন প্রবল অনুভূতিপ্রবণ। এবং দীন ও ইসলাম বিরোধী সকল অপতৎপরতা রুখে দিতে থাকতেন বদ্ধপরিকর ও সদাতৎপর। যেমন সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর কথা স্মরণ করতে পারি, যিনি নাস্তিক্যবাদের প্রচারক সোহরাওয়াদীকে হত্যা করেছিলেন।

কখনো কোনো শাসক যদি সত্য পথ থেকে বিচ্যুতও হয়ে যেত তাহলে তার পরবর্তী শাসক দ্রুতই তার বিচ্যুতির ফলে সৃষ্ট ত্রুটিসমস্তের সংশোধন করে নিতেন। উদাহরণত বলা যেতে পারে খলিফা মামুনুর রশিদ ও মু'তাসিম বিল্লাহর কথা। তাদের প্রসারিত মুতাজিলা ফেতনার বিষক্রিয়া খলিফা মুতাওয়াক্কিলের নিখাদ ইসলামি পলিসির তোড়ে সম্পূর্ণরূপে ভেসে যায়।

৫. মুসলমানদের কর্মকাণ্ড ও নেক আমল তাদের অনেক বড় হাতিয়ার ছিল। তাদের আখলাক, তাদের ব্যক্তিক ও সামাজিক আচার-আচরণ অনেক সময় বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণকারীদের পর্যন্ত প্রভাবিত করে ছাড়ত। যার ফলে তারা বাধ্য হতো ইসলামি চিন্তার সামনে আত্মসমর্পণ করতে।

গ্রন্থপঞ্জি

—সিরাতে ইবনে হিশাম, ১ম ও ২য় খণ্ড
—মুখতাসার সিরাতুর রাসুল, শায়েখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নাজদী
—তাফসিরে ইবনে কাসির, হাফেজ ইবনে কাসির
—আল-কামেল ফিত তারিখ, ২য় ও ৩য় খণ্ড, খেলাফতে রাশেদার যুগ, বনু উমাইয়ার যুগ, বনু আব্বাসের যুগ (হারুনুর রশিদ থেকে মুতাওয়াক্কিল পর্যন্ত), আল্লামা ইবনুল আসির জাযারী
—তারিখে ইবনে খালদুন, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড, আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে খালদুন
—তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত, ১ম খণ্ড (পৃষ্ঠা ৮৪-১১৮), মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী
—আল-গাজউল ফিকরি ওয়া ওয়াসায়িলুহু, শায়েখ আবদুল আজিজ বিন বাজ
—তাহসীনু মুজতামাইল মুসলিম জিদ্দাল গাজউয়ীল ফিকরি, ড. হামুদ বিন আহমাদ রহিলী

তৃতীয় অধ্যায়

ক্রুসেড

বর্তমানকালে ইসলামের শত্রুপক্ষ যে পদ্ধতিতে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, তার ছায়া দেখতে পাওয়া যায় হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে (খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দী) শুরু হওয়া ক্রুসেডে। এইজন্য পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে ক্রুসেডের উপর সামান্য আলোকপাত করে নেওয়া জরুরি বোধ করছি।

৩.১: সংজ্ঞা

ক্রুসেড—একটি বিশেষ পরিভাষা। অজস্র লড়াই সংঘটিত হয়েছে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে; কিন্তু তার সবটাকেই ক্রুসেড বলা হয় না। ক্রুসেডের পারিভাষিক পরিচিতি হলো :

الحروب الصليبية التى دعا اليها رجال دين النصارى والقساوسة ضد المسلمين باسم الصليب وتحت رأيته

ক্রুসেড সেই যুদ্ধ, খ্রিষ্টান পাদরি ও ধর্মযাজকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যার আহ্বান করে থাকে। এবং ক্রুশের নামে জীবন-মরণ পণ করে যেই যুদ্ধ লড়ে যাওয়া হয়।

৩.২: ক্রুসেডের সময়কাল

হিজরি ৪৮৯ সালে শুরু হয়ে ৬৯০ সাল পর্যন্ত প্রায় দুই শতাব্দীকালজুড়ে চলমান থাকে এই যুদ্ধ। তবে এর পরিকল্পনার শুরু মূল ক্রুসেড শুরু হবার প্রায় দেড় শতাব্দীকাল পূর্বে। আব্বাসী খেলাফতের দুর্বলতার রূপ ধরেই মূলত ক্রুসেডের প্রথম অনুঘটক তৈরি হয়ে যায়। এটা হিজরি চতুর্থ শতকের কথা। আব্বাসী খলিফারা ক্ষমতা হারিয়ে দাইলামী শিয়া আমিরদের খেলার পুতুলে পরিণত হয়ে পড়েন। আর ইসলামি বিশ্ব বহুধাবিভক্ত হয়ে ক্রমেই দুর্বল হতে থাকে।

মুসলমানদের এই দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগায় তৎকালীন রোম সম্রাটের প্রধানসেনাপতি নেকোফোর্স (তিগফুর)। ইসলামি বিশ্বের সীমান্তে সে অভিযান শুরু করে। এমনকি শাম-তীরবর্তী অঞ্চল সে নিজের দখলে নিয়ে নেয়। কেবল একজন মুসলিম শাসক, সাইফুদ্দৌলা তার মোকাবেলায় টিকে থাকেন এবং প্রাণপণ জিহাদ চালিয়ে যান। ৩৫৬ হিজরিতে সাইফুদ্দৌলার ইনতেকাল হলে খ্রিষ্টীয় শক্তির দুঃসাহস আরও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ৩৬১ হিজরি নাগাদ দিয়ারে বকর পর্যন্ত অঞ্চল তাদের দখলে চলে যায়।

এই যুদ্ধগুলোকে ক্রুসেড বলা হয় না যদিও; কিন্তু ক্রুসেডের ভূমিকা বা সূচনাপর্ব হিসেবে তাকে অভিহিত করা যেতেই পারে। খ্রিষ্টীয় শক্তি যদিও-বা এইসব বিজয় থেকে তেমন কোনো লাভ তাদের ঘরে তুলতে পারে না, মুসলমানেরা অল্পদিনের

বিরতিতেই তাদের হারানো ভূমি পুনরুদ্ধার করে নেয়; তবু এই যুদ্ধগুলোতে মুসলমানদের ক্ষতি যা হয়, খ্রিষ্টানশক্তির প্রবল বিশ্বাস জন্মে যায় যে, মুসলমান কোনো অপরাজেয় শক্তি নয়। তাদেরও পতন সম্ভব এবং তা শুরু হয়ে গেছে। আর এর পরপরই হিজরি পঞ্চম শতকের শেষদিকে মূল ক্রুসেড শুরু হয়। সুতরাং বোঝাই যায়, এই আত্মবিশ্বাসটুকু অর্জন সাফল্য হিসেবে খ্রিষ্টানশক্তির জন্য কম কিছু ছিল না।

৩.৩: ক্রুসেডের কারণসমূহ

খেলাফতে রাশেদার সময়ে মুসলমানেরা রোমান সাম্রাজ্যে আঘাত হেনে খ্রিষ্টানদের ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত উমরের সময় থেকে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিও মুসলমানদের আয়ত্তে থাকে। খ্রিষ্টীয় ধারণা অনুসারে আল-কুদস হলো হজরত ঈসা মাসিহের পবিত্র মাজার। যার ফলে তাদের কাছে পবিত্রতম স্থান হিসেবে তা পরিগণিত হয়ে আসছিল। খ্রিষ্টানরা তাদের এই পবিত্র ও ধর্মীয় কেন্দ্রভূমির পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখে আসছিল শত বছর ধরে। কিন্তু মুসলমানদের উপর তাদের কোনো কৌশলই কাজে আসছিল না। তা ছাড়া হিজরি প্রথম শতকের আঘাত রোমান ও বাইজান্টাইনদের অনুভূতিতে তখনও জাগরূক ছিল। আবার মুসলমানদের উন্নতি, অগ্রগতি ও সাফল্যও তাদের মধ্যে হিংসার বারুদ তপ্ত করে তুলছিল। তারা মনেপ্রাণে কামনা করছিল—কোনো উপায়ে যদি সে-সব নেয়ামত তাদের দখলে চলে আসত! শত বছরের প্রতিশোধপরায়ণ মানসিকতা এবং সম্পদ ও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষাই ছিল ক্রুসেডযুদ্ধের প্রধান অনুঘটক। এই প্রধান অনুঘটকের সাথে যখন আরও কিছু কার্যকারণ যুক্ত হয়ে পড়ল তখন ক্রুসেডের আগুন টগবগিয়ে উঠল। আর যুদ্ধের সেই আগুনে হাওয়া দেবার পেছনে তাৎক্ষণিক যেই কার্যকারণগুলো উপস্থিত ছিল :

১. দুই শতাব্দীকাল ধরে মিশর ও উত্তর আফ্রিকাতে শিয়াগোত্রীয় বনু উবাইদের শাসন চলে আসছিল, যারা খেলাফতের দাবি করে নিজেদের শাসনব্যবস্থার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছিল ফাতেমি খেলাফত নামে। তখন শাম থেকে খোরাসান পর্যন্ত যে-সকল সেলজুক সুলতান ও আব্বাসী খলিফা (যারা সকলেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের চিন্তা-বিশ্বাসের লালনকারী ছিলেন) শাসন করছিলেন, বনু উবাইদ তাদের কট্টর বিরোধী হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই বিরোধিতার সূত্র ধরেই ৪৬২ হিজরিতে উবাইদি শাসকেরা ক্রুসেডারদের ফুসলাতে থাকে শামে আক্রমণ করবার জন্য, যাতে তাদের বিরোধীশক্তি সেলজুক শাসকগোষ্ঠী দুর্বল হয়ে পড়ে।
২. ৪৬৩ হিজরি সনে সেলজুক সাম্রাজ্যের বাহাদুর সুলতান আলপ আরসালান রোমান শাসক রোমানোস ডায়োজিনিসকে এমন বেকায়দায় ফেলেন যে, কনস্টান্টিনোপলের সম্মান-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি মাটির সাথে মিশে যায়। তারপর থেকে রোমানরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে—কখন মুসলমানদের থেকে এই লাঞ্ছনার বদলা নেওয়া যায়।

৩. ইসলামপূর্বকাল থেকেই খ্রিষ্টানেরা দুটি ধর্মীয় কেন্দ্রে বিভক্ত ছিল; এশিয়ার খ্রিষ্টানেরা কনস্টান্টিনোপল-চার্চের অনুসরণ করত, যাকে বলা হতো পূর্বাঞ্চলীয় চার্চ, আর ইউরোপের খ্রিষ্টানরা রোমান-চার্চের অনুসরণ করে চলত, যাকে বলা হতো পশ্চিমাঞ্চলীয় চার্চ। রোমানোসের পরিণতি দেখে কনস্টান্টিনোপলের আরেক শাসক অ্যালেক্সিয়াজ প্রথমবারের মতো দুই গির্জার মাঝে ঐক্যের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি রোমান যাজকের কাছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে আবেদন করলে তা গৃহীত হয়। এবং এভাবেই একটি দীর্ঘ সময়কালের ব্যবধানের পর কেবল মুসলমানদের বিরোধিতার লক্ষ্যে খ্রিষ্টানদের দুই পক্ষ নিজেদের অভ্যন্তরীণ মতভেদ ভুলে সংঘবদ্ধ হয়।

৪. ৪৭৯ হিজরি মোতাবেক ১০৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মরক্কোর শাসক ইউসুফ বিন তাশফিন আন্দালুসের ঝাল্লাকা রণাঙ্গনে এক ঐতিহাসিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ইউরোপের খ্রিষ্টানদের জবরদস্ত শিক্ষা দেন। এবং আন্দালুস খ্রিষ্টানদের দখলে প্রায় চলে গেছে—এমন পরিস্থিতিতে তাকে রক্ষা করেন। এরপরে ইউরোপের খ্রিষ্টানদের মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে, সেই পরাজয়ের বদলা তারা এশিয়ার মাটিতেই নেবে।

৫. অকর্মণ্য এবং উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপনকারী খ্রিষ্টান শাহজাদাদের ব্যয়ভার বহনের জন্য নয়া জায়গির দরকার ছিল। ইউরোপের ব্যবসায়ীরাও দীর্ঘদিন ধরে তাদের ব্যবসার জন্য নতুন বাজারের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তাদের সেইসব প্রত্যাশা পূরণের পথ উন্মুক্ত করবার একটি 'ভালো' বাহানা হিসেবে কাজ করে।

৬. ৪৮৪ হিজরিতে ভূমধ্যসাগরের মধ্যস্থিত মুসলিম অধ্যুষিত সিসিলি দ্বীপ খ্রিষ্টানরা দখল করে নেয়। এই বিজয়ের ফলে মুসলমানদের পরাজিত করবার স্বপ্ন খ্রিষ্টান দুনিয়ায় নতুন করে জেগে ওঠে।

৭. সেলজুক সাম্রাজ্যের অধিপতি মালিক শাহ—যার দাপটে সারা দুনিয়া ছিল কম্পমান—অকস্মাৎ তার ক্ষমতা খর্ব হয়ে পড়লে শামের সেলজুক সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে খ্রিষ্টানদের গ্রাসে পরিণত হয়। এবং এর অবধারিত ফল যা হয়—খ্রিষ্টীয় শক্তি শামে হামলা করবার মতো সাহসী হয়ে ওঠে এবং ক্রুসেডের সকল পথ হয়ে ওঠে সুগম ও মসৃণ।

৮. খ্রিষ্টানদের একটি মৌলিক আকিদা হলো তাদের 'অরিজিনাল সিন' বা জন্মগত পাপের ধারণা। এই বিশ্বাস তাদের প্রতিজনের মধ্যে সারাক্ষণ অপরাধ ও পাপের এক ধরনের অনুশোচনাবোধ জাগিয়ে রাখে। এবং বাস্তবেও তৎকালে তাদের মধ্যে চারিত্রিক অপরাধের কোনো কমতি ছিল না। গির্জার পাদরি ও যাজকেরা যুদ্ধের বারুদ উসকে দেবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেয় যে, এই যুদ্ধে অংশ নেওয়ার 'বরকতে' তাদের সকলের সমস্ত পাপ একদমই ঝরে পড়বে। পাপের আর

কোনো কালিমাই থাকবে না তাদের গায়ে। এভাবেই নেতারা নিজেদের বাস্তবিক উদ্দেশ্য আড়াল করে ধর্মের মিথ্যা বয়ান সামনে এনে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

৩.৪: ক্রুসেডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই যুদ্ধের পেছনে ইউরোপিয়ান নেতাদের সামনে নিম্নযুক্ত উদ্দেশ্যগুলো হাজির ছিল:

১. এশীয় অঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত ভূমিগুলো দখলে নেওয়া।
২. আল-কুদসের পুনরুদ্ধার।
৩. মুসলমানদের থেকে অতীত দিনের পরাজয়ের বদলাগ্রহণ।
৪. স্পেন দখল।
৫. ইসলামি বিশ্বের ব্যবসায়িক রুট, উৎপাদিত পণ্য, খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অর্থনৈতিক উপকরণাদির উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা।
৬. ইহুদিজাতির আল-কুদস ফিরে পাবার যে আকাঙ্ক্ষা, তা বাস্তায়িত করা।

(ইহুদিরা এই যুদ্ধে প্রকাশ্যে শরিক ছিল না। কিন্তু তাদের আশা ছিল—এই যুদ্ধের মারফতেই সলোমান মন্দির পর্যন্ত তাদের পৌঁছানোর রাস্তা খুলে যাবে। সেই স্বপ্নেরই বাস্তবায়নে প্রথম থেকেই টেম্পলারের বেশে খ্রিষ্টানদের সহায়তায় তাদের গোপন মিশন চলমান ছিল।)

৩.৫: ক্লারমন্ট কনফারেন্স

খ্রিষ্টান পাদরিরা নিজেদের সম্প্রদায়কে উসকে দেবার উদ্দেশ্যে এই প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দেয়, মুসলমানেরা আল-কুদসে আমাদের পবিত্র নিদর্শনাবলির অপমান করছে এবং ইউরোপিয়ান দর্শনার্থীদের সাথে যাচ্ছেতাই আচরণ করছে। তাদের বর্ণিত এই 'যাচ্ছেতাই আচরণ'-এর বাস্তবতা কেবল এতটুকু ছিল যে, ইউরোপিয়ান দর্শনার্থীদের একটি সুশৃঙ্খল নিয়মের আওতায় আনবার উদ্দেশ্যে মুসলিম কর্তাব্যক্তিরা কিছু আইনের উপর সাময়িক জোর দিচ্ছিলেন।

এমন অবস্থায় ইউরোপের এক পাগল যাজক পিটার আল-কুদস সফর করে। এবং সফর শেষে ইউরোপ ফিরে গিয়ে সে তার অগ্নিগর্ভ উত্তেজক বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষ উগড়ে দিয়ে সমস্ত ইউরোপকে উসকে দিতে থাকে। স্বয়ং পোপও তার কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

পোপ আরবান দ্বিতীয় জুলকাদা ৫৮৮ হিজরিতে (নভেম্বর ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) ফ্রান্সের ক্লারমন্ট শহরে বিরাট এক ধর্মীয় কনফারেন্স আহ্বান করে ইউরোপিয়ান শাসকদের আল-কুদস পুনরুদ্ধারের জন্য উত্তেজিত করে তোলে। আর তাদের উদ্দেশে বলে, যে ব্যক্তি ক্রুশ উর্ধ্বে তুলে এই লড়াইয়ে অংশ নেবে না, সে খ্রিষ্টের অনুসারী হিসেবে আর গণ্য হবে না। ইউরোপিয়ান শাসকেরা পাদরিদের এমন

উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৫ আগস্ট শুক্রবার ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দে[৩৯] পোপ আরবান দ্বিতীয় ভ্যানিসে (Venice) বসে প্রথম ক্রুসেডের ঘোষণা দিয়ে দেয়।

৩.৬: মুহাম্মদ আসাদের বিশ্লেষণ

নওমুসলিম মুহাম্মদ আসাদ তার বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ The Road to Mecca এর ভূমিকাতে লিখেছেন—ইউরোপের ইসলাম-বিদ্বেষের ম্যানুফেস্টো সেই কনফারেন্সেই লেখা হয়ে গিয়েছিল। আর ইসলাম-বিদ্বেষের সেই রক্তই তখন থেকে আজ পর্যন্ত ইউরোপিয়ানদের শিরা-উপশিরায় চলমান। মুহাম্মদ আসাদ লিখেছেন :

> ক্রুসেডযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইউরোপিয়ানদের ধর্মীয় বন্ধন উন্নীত হয় এক নতুন সমতলে, যা সকল ইউরোপীয়রই সাধারণ লক্ষ্য: 'খ্রিষ্টান রাজের' রাষ্ট্রীয়-ধর্মীয় ধারণা। পরিণামে তা-ই জন্ম দেয় ইউরোপভিত্তিক সাংস্কৃতিক চেতনার। ১০৯৫ সালের নভেম্বরে পোপ দ্বিতীয় আরবান তার ক্লারমন্টের বিখ্যাত বক্তৃতায় যখন পবিত্র ভূমি দখল করে রাখা 'পাষণ্ড জাতির' বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন তখনই তিনি সম্ভবত তার নিজের অজান্তেই পাশ্চাত্য সভ্যতার চার্টার বা সনদ ঘোষণা করে দেন এবং তার দৃষ্টিভঙ্গিও হাজির করে বসেন।"[৪০]

৩.৭: প্রথম ক্রুসেড

প্রথম দফার আক্রমণে পাদরি পিটার ১৩ লাখ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে আনাতোলিয়ার সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু কোনিয়ার শাসক কিলিজ আরসালান এই অসংগঠিত বাহিনীর সামনে রুখে দাঁড়ান এবং তাদের পরাজিত করে আনাতোলিয়া সীমান্ত থেকে তাড়িয়ে দেন।

এরপর ফ্রান্সের রাজা গডফ্রের নেতৃত্বে ১০ লাখ সৈন্যের সুবিন্যস্ত বাহিনী মুসলিম সীমান্ত অভিমুখে রওনা করে। এই বাহিনী ৪৮৯ হিজরিতে (১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দ) ইসলামি বিশ্বের সীমান্তে প্রবেশ করতে সমর্থ হয় এবং রজব ৪৯২ হিজরিতে বাইতুল মাকদিস অবরোধ করে নেয়। ৪২ দিনের অবরোধ শেষে ৪৯২ হিজরির শাবান মাসে (জুলাই ১০৯৯) ক্রুসেডাররা সক্ষম হয় বাইতুল মাকদাসের বুকে তাদের পতাকা উড়িয়ে দিতে। সে বড় নির্মম দৃশ্য ছিল! কেবল মসজিদে আকসার অভ্যন্তরেই ৭০ হাজার মুসলমানকে ক্রুসেডাররা নির্দয়ভাবে শহিদ করে দেয়। শহিদদের রক্তে ক্রুসেডারদের ঘোড়ার খুর পর্যন্ত নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

শামের এই খ্রিষ্টীয় কর্মযজ্ঞ ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে থাকে এবং সমগ্র শাম উপকূলের বড় বড় অঞ্চলজুড়ে খ্রিষ্টীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়; আর তার প্রধান কেন্দ্র হয় জেরুসালেম (আল-কুদস)।

---

[৩৯] মূল বইয়ে ১০৮৫ খ্রিষ্টাব্দ উল্লেখ রয়েছে। বোধ করি এটা মুদ্রণজনিত ভুল। -অনুবাদক

[৪০] দ্য রোড টু মক্কা, পৃষ্ঠা : ৬

৩.৮: ইমাদুদ্দীন জিনকী

বাইতুল মাকদিস হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় সমস্ত ইসলামি বিশ্বে হা-হুতাশ ও মাতম শুরু হয়ে যায়। কিন্তু মুসলিম শাসকগণ তার পুনরুদ্ধারে দীর্ঘদিন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে উঠতে পারেনি। বাইতুল মাকদিস পতনের ২৬ বছর পর ৫১৮ হিজরি মোতাবেক ১১২৪ খ্রিষ্টাব্দে ইমাদুদ্দীন জিনকী নামে একজন অপরচিত 'কর্মকর্তা' ওয়াসিত এবং বসরার জায়গিরপ্রাপ্ত হন। ৫২৪ হিজরি সনে তিনি ফিরিঙ্গিদের মজবুত দুর্গ 'হিসনে আসারিব' দখল করে নেন। তার অব্যবহিত পরেই তিনি হারিমে হামলা করে বসেন। হারিমের গভর্নর বছরান্তে উসুলকৃত শুল্কের অর্ধেক দেওয়ার শর্তে সন্ধি করে নেন ইমাদুদ্দীন জিনকীর সাথে। এবং এই সন্ধির মধ্য দিয়ে সেখানকার মুসলমানদের খ্রিষ্টান জালিমদের নাগপাশ থেকে বের করে আনতে তিনি সমর্থ হন।

ইমাদুদ্দীন জিনকী ৬ জামাদিউস সানি ৫৩৯ হিজরিতে (২৩ ডিসেম্বর ১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) রাহাও জয় করে নেন, ঐতিহাসিকগণ যে বিজয়কে অভিহিত করেছেন ফাতহুল ফুতুহ বা মহাবিজয় বলে। এই বিজয় ছিল দীর্ঘ বিরতির পর ক্রুসেডারদের শক্তিতে এক শক্ত চপেটাঘাত। তারা জিনকীর বিজয়াভিজানে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে বড় কোনো যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। কিন্তু তার আগেই ইমাদুদ্দীন জিনকীর ইনতেকাল হয়ে যায়।

৩.৯: নুরুদ্দীন জিনকী এবং দ্বিতীয় ক্রুসেড

ইমাদুদ্দীন জিনকীর পুত্র সুলতান নুরুদ্দীন জিনকী তার পিতার শুরু করে যাওয়া জিহাদের ধারা অব্যাহত রাখেন। এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লাগাতার বেশ কটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। জীবনাচার ও কর্মের বিবেচনায় নুরুদ্দীন জিনকী ইসলামি ইতিহাসের একজন মহত্তম শাসক। তার কালে ইসলামের পতাকা আরেকবার নতুন করে সমুন্নত হতে শুরু করে। আল-কুদসের পুনরুদ্ধারই ছিল নুরুদ্দীন জিনকীর জীবনের প্রধান স্বপ্ন ও লক্ষ্য।

জিনকী-পরিবারের বিজয়যাত্রার লাগাম টেনে ধরবার জন্য ইউরোপে আরও একবার ক্রুসেডযুদ্ধের নাকারা বেজে ওঠে। ৫৪২ হিজরিতে (১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দ) সেইন্ট বার্নাট ষষ্ঠ লুইয়ের নেতৃত্বে কয়েক লাখ জার্মান ও ফরাসি সৈন্য এশিয়ামাইনর (আনাতোলিয়া) সীমান্ত দিয়ে শামে প্রবেশ করে। আর এর মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় ক্রুসেডের সূচনা ঘটে যায়। নুরুদ্দীন জিনকী এবং তার সহোদর সাইফুদ্দীন গাজী দামেশকের শাসক মুঈনুদ্দীন আনজীর সহায়তার জন্য পৌঁছে যান। ফলে মুসলিম শাসকদের ঐক্যের বদৌলতে ৫৪৪ হিজরিতে (১১৪৯ খ্রিষ্টাব্দ) ক্রুসেড বাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

৩.১০: সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী এবং আল-কুদসের পুনরুদ্ধার

নুরুদ্দীন জিনকীর ইনতেকালের পর সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী মিশর এবং শামকে একত্র করে বৃহত্তর আইয়ুবী সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামের এই মহান বীর রবিউস সানি ৫৮৩ হিজরিতে হিত্তিনের যুদ্ধে বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে শামের খ্রিষ্টান-শক্তি ধুলোয় মিশিয়ে দেন। এবং ২৭ রজব ৫৮৩ হিজরিতে (সেপ্টেম্বর ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) বাইতুল মাকদিস জয় করে তিনি সমগ্র মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সম্মানের আসন পাকাপোক্ত করে নেন।

৩.১১: তৃতীয় ক্রুসেড

আল-কুদস হাতছাড়া হয়ে গেছে, এই ঘটনায় ইউরোপজুড়ে বিরাট হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়। আল-কুদসের বিশপ পাদরি দ্বিতীয় উইলিয়াম একদল বিশপ ও শাসককে সাথে করে সামরিক শোকপ্রকাশের পোশাক পরিহিত অবস্থায় রোম পৌঁছে এবং প্রধান পোপের তত্ত্বাবধানে সমস্ত ইউরোপ সফর করে। সে মুসলিম নিপীড়নের কল্পকাহিনি শুনিয়ে বরফশীতল ইউরোপকে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত করতে থাকে।

এই সময় সে কবিতা-শোকগাথা এবং ট্রাজিক গল্পকাহিনির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে উসকে চলছিল কেবল নয়; বরং চিত্রশিল্পীদেরও সে ব্যবহার করছিল সমাজে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্ধ বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে। চিত্রশিল্পীদের মাধ্যমে সে মুসলমানদের এমন এক রূপ চিত্রিত করে, যে চিত্রে জনৈক আরবকে ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে যুদ্ধরত দেখা যায়। আবার কিছু চিত্রে দেখানো হয় যে, ঈসা আলাইহিস সালাম সেই আরব ব্যক্তির হাতে নির্মমভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন। তার শরীর থেকে অঝোরধারায় রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে আর তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। লোকেরা এইসব মর্মান্তিক চিত্র দেখে ব্যথাতুর হয়ে পড়তো যখন, তখন পাদরি তাদের বলতো 'চিত্রের এই লোকটি হলো আরবের নবী। দেখো, কেমন নির্দয়ভাবে সে মাসিহকে প্রহার করছে। তার হাতেই মাসিহর জান চলে গেছে।' পাদরির মুখে এমন কথা শুনে লোকেরা শিশুর মতো হাউমাউ করে কেঁদে উঠত।

এই ধরনের ড্রামাবাজিতে সুরের[৪১] শাসক কনার্ড মারকুইসের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। সে ইউরোপজুড়ে মুসলিম-বিদ্বেষের আগুনে হাওয়া দেবার জন্য এক নতুন অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। খ্রিষ্টান দুনিয়ার চোখে আল-কুদসের সেন্ট জন চার্চ ছিল তাদের আকিদা-বিশ্বাসের প্রধানকেন্দ্র। এই চার্চেই একটি কাল্পনিক কবর আছে। তাদের ধারণামতে কবরটি হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের। তাদের আকিদা হলো, হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে শূলিতে চড়ানোর পর এখানেই দাফন করে দেওয়া হয়। (নাউযুবিল্লাহ)

---

[৪১] সুরের আরেক নাম টায়ার। সুর বা টায়ার বর্তমানে লেবাননের একটি শহর।

মারকুইস ইউরোপের সাধারণ মানুষদের উত্তেজিত করবার জন্য বিরাট এক চিত্র তৈরি করে। যেই চিত্রে দেখা যায়—একজন মুসলিম অশ্বারোহী মাসিহের কবরের উপর উঠছে এবং ঘোরার খুড়ের আঘাতে কবরের মাটি পিষে দিচ্ছে। শেষে ঘোড়া প্রস্রাব করে দিচ্ছে সেই কবরের উপর। দানবের মতন দেখতে এই চিত্রটি ইউরোপের নানা প্রান্তের ছোট-বড় জলসায় প্রদর্শিত হতে থাকে। এই ধরনের কল্পিত চিত্র মূর্তিপ্রেমী খ্রিষ্টানদের ভীষণভাবে উত্তেজিত করে তোলে।

শেষমেশ ৫৮৫ হিজরিতে (১১৮৯ খ্রিষ্টাব্দ) ইউরোপ থেকে ক্রুসেডার বাহিনী স্রোতের মতন বেরিয়ে শামের সীমান্তে আছড়ে পড়ে। লাগাতার চার বছর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী যেই মাত্রার সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার সাথে এই ধ্বংসাত্মক লড়াইয়ের মোকাবেলা করেন, ইতিহাসের পাতায় তা চিরকাল ভাস্বর থাকবে। আক্কা উপকূল থেকে নিয়ে বাইতুল মাকদিসগামী প্রধান সড়ক পর্যন্ত অসংখ্য মুজাহিদ শাহাদাতের অমীয় সুধা মুখে তুলে নেন; কিন্তু খ্রিষ্টান বাহিনীকে পবিত্র ভূমি পর্যন্ত পৌঁছতে দেননি। অবশেষে যুদ্ধের ফল দাঁড়ায়—ক্রুসেড সেনাপতি রিচার্ডকে যথোচিত জবাব দেওয়া হয় এবং ইউরোপিয়ান শক্তি বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়ে শাবান ৫৮৮ হিজরিতে (সেপ্টেম্বর ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দ) ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

৩.১২: চতুর্থ ক্রুসেড

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর পর আইয়ুবী সাম্রাজ্যের শাসন-ক্ষমতায় আসেন তার ভাই আল-মালিকুল আদিল। তার শাসনকালে রোমান পোপের উসকানিতে জার্মান শাসক হেনরি ষষ্ঠ চতুর্থ ক্রুসেডের পতাকা উড়িয়ে দেয় এবং ৫৯১ হিজরিতে (১১৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) শামে হামলা করতে উদ্যোগী হয়; কিন্তু আক্কা পৌঁছতেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। যার ফলে এই অভিযান আর সংঘর্ষ পর্যন্ত গড়ায় না। এবং তাদের এই চেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

৩.১৩: পঞ্চম ক্রুসেড

৬১৮ হিজরিতে আরও একবার ক্রুসেডের আগুন জ্বলে ওঠে। ইউরোপিয়ান বাহিনী এবারে অভিযানের জন্য নতুন রুট নির্বাচন করে। তারা পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল ধরে মিশরের গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ দিময়াত দখলে নিয়ে নেয়। দিময়াত ক্রুসেডারদের দখলে চলে গেলে সমস্ত মিশর এবং শাম খ্রিষ্টানদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবার শঙ্কা দেখা দেয়। এদিকে আবার যুদ্ধ চলাকালে মুসলিম শাসক আল-মালিকুল আদিলের ইনতেকাল হয়ে গেলে অবস্থা আরও বেগতিক হয়ে পড়ে। কিন্তু তার সন্তান আল-মালিকুল কামিল, আল-মালিকুল মুয়াজ্জাম এবং আল-মালিকুল আশরাফ পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন এবং সম্মিলিত হামলার মাধ্যমে তারা ক্রুসেডারদের উচিতশিক্ষা দিতে সমর্থ হন।

৩.১৪: ষষ্ঠ ক্রুসেড

ষষ্ঠ ক্রুসেড সংঘটিত হয় হিজরি ৬২৪ সালে (১২২৮ খ্রিষ্টাব্দ)। এবার জার্মানির শাসক দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের নেতৃত্বে খ্রিষ্টানেরা মোর্চাবন্দি হয়। এই সময়টাতে মিশর এবং ফিলিস্তিনের শাসক আল-মালিকুল কামিল ও তার ভাই, দামেশকের শাসক আল-মালিকুল মুয়াজ্জামের মধ্যে বিবাদ চলছিল। এই কারণে ক্রুসেডারদের রণপ্রস্তুতির সংবাদে মুসলিমশিবিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আল-মালিকুল কামিল যুদ্ধ থেকে বাঁচতে আল-কুদসকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জার্মানদের আয়ত্তে রাখতে চুক্তিবদ্ধ হন। তার এই সিদ্ধান্ত মুসলিমবিশ্বে শোকের অন্ধকার ছায়া হয়ে নেমে আসে।

৩.১৫: আল-কুদসে আরও একবার

আঠারো বছর পর্যন্ত বাইতুল মাকদিস অযোগ্য মুসলিম শাসকদের রাজনৈতিক খেল-তামাশার ঘুঁটি হয়ে থাকে। তারা মুসলমানের প্রথম কেবলা ব্যবহার করে খ্রিষ্টীয় শক্তিকে খুশি রাখার মধ্য দিয়ে নিজেদের ক্ষমতার মসনদকেই কেবল পোক্ত করতে থাকে। বারবার খ্রিষ্টানশক্তির সাথে এই প্রতিশ্রুতির নবায়ন করাতে থাকে যে, বিপদের দিনে তারা তাদের পাশে থাকবে। ৬৩১ হিজরি নাগাদ অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয়ে পড়ে, খ্রিষ্টানেরা তাদের খ্রিষ্টীয় আদব-লেহাজেরও জলাঞ্জলি দিয়ে স্থানীয় মুসলমানের নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে মসজিদুল আকসায় ঘণ্টাধ্বনি বাজাতে এবং কুব্বাতুস সাখরায় বসে মদপান করতেও দ্বিধা করে না; কিন্তু তাদের বাধা দেবার মতন কেউ ছিল না।

এই হৃদয়বিদারক ঘটনা মিশরের বীর শাসক আল-মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দীনের আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলে। তিনি নিজে একটি বাহিনী প্রস্তুত করে সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের বংশধরদের কাছে খাওয়ারিজম বাহিনীর সামরিক সহায়তা চেয়ে পাঠান। খাওয়ারিজমি বাহিনী ৬৪২ হিজরিতে (১২৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) নিজেদের সেনানায়কদের নেতৃত্বে ফুরাত নদী পার হয়ে ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং বাইতুল মাকদিস নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। আর এভাবেই সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর আমানত 'মুক্ত বাইতুল মাকদিস' ফের মুসলমানদের হাতে আসে।

শামের খ্রিষ্টান রাজনীতিবিদরা যখন এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল তখন এই ঘটনাকে ধর্মীয় বিজয় আখ্যা না দিয়ে ভূমিদখলের যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে। এবং দামেশক ও অন্যান্য শহরের মুসলমান শাসকদেরকে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে এক নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। এই সময় আল-মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দীন তার প্রধান সেনাপতি রুকনুদ্দীন বাইবার্সকে বাহিনী-সমেত খাওয়ারিজমিদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দেন। জুমাদাল উলা ৬৪২ হিজরিতে গাজায় তিনি এক সফল অভিযান পরিচালনা করেন। সেই অভিযানে খাওয়ারিজমি এবং মিশরীয়রা সম্মিলিতভাবে খ্রিষ্টান ও তাদের মিত্র মুসলিমদের নিদারুণভাবে পর্যুদস্ত করে।

খ্রিষ্টান ও মুসলিম জোট বাহিনী গাজার রণাঙ্গনে ৩০ লাখ সৈন্যের মৃতদেহ রেখে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। আর এরই মধ্য দিয়ে বাইতুল মাকদিস-কেন্দ্রিক খ্রিষ্টানদের নাপাক স্বপ্ন ধুলোর সাথে মিশে যায়।

৩.১৬: সুলতান বাইবার্স এবং সপ্তম ক্রুসেড

খ্রিষ্টান দুনিয়ার হৃদয় একদমই চুর হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় এক উন্মাদ রাজা তাদের আরও একবার ক্রুসেডযুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ফ্রান্সের এই উন্মাদ রাজার নাম ছিল নবম লুইস। তবে লোকে তাকে সেন্ট লুই হিসেবেই চিনত। সে রোমান পোপের প্ররোচনায় ১২৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সপ্তম ক্রুসেডের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে মিশর উপকূল অভিমুখে রণযাত্রা শুরু করে।

৬৪৭ হিজরিতে (১২৪৯ খ্রিষ্টাব্দ) সে মিশরের বন্দরনগরী দিময়াতে পৌঁছে তা অবরোধ করে ফেলে। সে-সময়ে মিশরের অবস্থা ভালো ছিল না। মিশরের বাদশাহ আল-মালিকুস সালিহ ভয়াবহ রকম অসুস্থ ছিলেন। যুদ্ধের মাঝামাঝি ১৫ শাবান ৬৪৮ হিজরিতে (১৬ এপ্রিল ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ) তার ইনতেকাল হয়ে যায়। তার ইনতেকালের পর তার স্ত্রী শাজারাতুদ দুর অসীম সাহসিকতার সাথে ক্রুসেডারদের মোকাবেলা করে যান। তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলতে হবে। কারণ, রুকনুদ্দীন বাইবার্সের মতন একজন সেনানায়ক তার বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। মুসলিমবাহিনী ক্রুসেডারদের চোখে শর্ষে ফুল দেখিয়ে দেয়। অবশেষে ২ মহররম ৬৪৮ হিজরিতে স্বয়ং সেন্ট লুই মানসুরাতে পরাজয় মেনে নিয়ে মুসলিমবাহিনীর হাতে বন্দি হয়। সেই সময় আল-মালিকুস সালিহের পুত্র আল-মালিকুল মুয়াজ্জাম তুরান শাহ পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ক্ষমতার মসনদে বসেন। কিন্তু প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি নিহত হন। তার মৃত্যুর পর শাজারাতুদ দুর মিশরের শাসনক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। এবং আগামী ১০ বছর ফ্রান্স থেকে কোনো যুদ্ধাভিযান বের হবে না—এই শর্তে ৬৪৮ হিজরিতে বড় অঙ্কের ফিদিয়া গ্রহণ করে ফ্রান্সের রাজা সেন্ট লুইকে তিনি মুক্ত করে দেন।

১১ মাসের ব্যর্থ অভিযান, বন্দিত্ব বরণ, লাগাতার রোগ-শোক, তারও বেশি পরাজয়ের গ্লানি ফ্রান্সের রাজা সেন্ট লুইকে বাধ্য করে সবকিছু নতুন করে চিন্তা করতে। সে মুক্তিপ্রাপ্তির পর ফ্রান্সে ফিরে না গিয়ে বেশভূষা বদলে চার বছর ফিলিস্তিনে পড়ে থাকে। আর নিজের শোকতপ্ত হৃদয় জুড়ানোর সাথে সাথে মুসলমানদের সফলতার রহস্য ও তাদের দুর্বলতার অনুসন্ধানে নিরত থাকে। সেই সাথে সে শামের দুর্গগুলো, যা তখনও তাদের আয়ত্তে রয়ে গিয়েছিল, আরও মজবুত করতে উদ্যোগী হয়। চার বছরের গোপন মিশন শেষে সে ইউরোপ ফিরে গিয়ে নিজের ক্ষমতা বুঝে নেয়।

এই সময়টাতে মিশরের নতুন শাসক রুকনুদ্দীন বাইবার্স শাম উপকূলীয় অঞ্চলের অবশিষ্ট খ্রিষ্টান শাসকদের অস্তিত্ব নির্মূল-অভিযান অব্যাহত রাখেন। এবং তাদের সবচাইতে মজবুত দুর্গ আনতাকিয়া দখল করে নেন। আনতাকিয়া হাতছাড়া হলে সমগ্র ইউরোপজুড়ে ফের মাতম শুরু হয়ে যায়।

৩.১৭: অষ্টম ক্রুসেড

প্রতিশোধপ্রবণ সেন্ট লুই ১৮ বছরের ব্যবধানে আরও একবার ক্রুসেডের অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। ৬৬৮ হিজরিতে (জুলাই ১২৭০ খ্রিষ্টাব্দ) সে অভিযান চালায়। কিন্তু ভাগ্য এবারেও তার সহায় হয় না। পরিস্থিতি থাকে তার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তিউনিসের একটি ব্যর্থ অবরোধ ছাড়া তার দ্বারা তেমন কিছুই আর হয়ে ওঠে না। উপরন্তু অবরোধকালে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তার সাহায্যে আগত ইংল্যান্ডের প্রিন্স অ্যাডওয়ার্ড ৬৭০ হিজরিতে (১২৭২ খ্রিষ্টাব্দ) কায়সারিয়ায় মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নেয়। এবং অষ্টম ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘোষণা দিয়ে ইংল্যান্ড ফিরে যায়।

সেন্ট লুইয়ের পর ইউরোপের আর কোনো শাসকের হিম্মত হয়নি ক্রুসেডের নামে অস্ত্র হাতে নেওয়ার। ফলে অষ্টম ক্রুসেডে খ্রিষ্টানদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ক্রুসেড তার সমাপ্তিতে পৌঁছে।[৪২]

এরও পরে, ৬৯০ হিজরিতে (১২৯১ খ্রিষ্টাব্দ) মিশরের বাদশাহ আল-মালিকুল খালিল সমগ্র শাম থেকে খ্রিষ্টান রাজ্যগুলো নিশ্চিহ্ন করে দিলে পঞ্চম হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত চলমান ক্রুসেডের নাম ও নিশানা সম্পূর্ণতই নিঃশেষ হয়ে যায়।

৩.১৮: সেন্ট লুই : ইউরোসেন্ট্রিক চিন্তাযুদ্ধের প্রতিষ্ঠাতা

এই ধারাবাহিক পরাজয়ের পর ইউরোপের চিন্তাভাবনায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। প্রথমবারের মতো ইউরোপ চিন্তা করতে শুরু করে, কেবল অস্ত্রের লড়াইয়ে মুসলিমদের পরাজিত করা একটু কঠিনই। সেন্ট লুইকে বলা হয় এই চিন্তার জনক। ধারাবাহিক পরাজয়ের মুখে সে এমনটা ভাবতে একপ্রকার বাধ্যই হয়ে পড়ে যে, মুসলমানদের উপর কর্তৃত্বের ছড়ি ঘোরানোর জন্য তাদের উপর মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণের বিকল্প নেই। আর তার জন্য দরকার দীর্ঘ পাঠপ্রস্তুতি এবং গভীর জ্ঞান ও জাগতিক সমৃদ্ধি।

সেন্ট লুই কেবল একজন শাসকই ছিল না; বরং উঁচুমাপের একজন চিন্তকও ছিল। বহু চিন্তাভাবনার পর সে একটি মেনিফেস্টো তৈরি করে যায়, যা তার অসিয়তনামা হিসেবে আজও প্যারিস মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। সেই মেনিফেস্টো বা ইশতেহারে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সফল হবার জন্য চারটি পদক্ষেপের কথা সে উল্লেখ করে :

১. মুসলিম শাসকদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা।
২. তাদের মধ্যে দৃঢ় আকিদা পোষণকারী এবং পোক্ত ঈমানের অধিকারী কোনো দল গড়ে উঠতে না দেওয়া।
৩. পাপাচার, বেহায়াপনা ও অর্থনৈতিক অনাচারের মাধ্যমে মুসলিম-সমাজকে অন্তঃসারশূন্য করে ফেলা।

---

[৪২] দ্য ক্রুসেডস, হ্যারল্ড ল্যাম্ব, পৃষ্ঠা : ৪৪৬ থেকে ৪৫৬। 'সালিবি জঙ্গ' নামে গ্রন্থটির উরদু সংস্করণ প্রকাশ করেছে এদারায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া।

৪. গাজা থেকে আনতাকিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে একটি ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।[৪৩]

সেন্ট লুই তার অসিতনামায় পরবর্তীপ্রজন্মের মধ্যে এই অনুভূতি জাগিয়ে দিয়ে যেতে সমর্থ হয়—আমরা এক দীর্ঘ সময় ধরে মুসলমানদের পরাভূত করার প্রয়াসে লেগে রয়েছি। কিন্তু কঠিন আঘাতের পরও আমরা তাদের পরাজিত করতে পারিনি। তার কারণ, যুদ্ধের সময় মুসলমানদের অন্তরে এমন এক উদ্যম তৈরি হয়ে যায়, আমরা যার মোকাবেলা করতে পারি না। সেজন্য জরুরি হলো, আমাদেরকে নতুন পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে হবে। যুদ্ধকে রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির নতুন ক্ষেত্রে।

এভাবে ক্রুসেডের ফল বিবেচনায় ইউরোপিয়ান খ্রিষ্টানদের চিন্তাজগতে এক ব্যাপক পরিবর্তন আসে। জ্ঞান এবং চিন্তার চর্চা সেখানে নতুন এক গতি লাভ করে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে চিন্তাজগতে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে নতুন পথ ও পন্থার অনুসন্ধান শুরু হয়ে যায়। আরম্ভ হয়ে যায় জ্ঞান ও মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্রের উদ্ভব। এবং বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়ে যায় তখনই।

এই তাবৎ প্রয়াস-প্রচেষ্টা, প্রস্তুতি এবং গবেষণা-অনুসন্ধানের পেছনে প্ররোচক হিসেবে কাজ করছিল ঘৃণা এবং প্রতিশোধপরায়ণ মানসিকতা। যেই মানসিকতা ইউরোপকে বাষ্পের মতো শক্তি যুগিয়ে যাচ্ছিল প্রবল গতিতে এগিয়ে যেতে। এটা হলো সেই ঘৃণা ও শত্রুতা, যার কারণে ইসলাম ও মুসলমানের সত্যিকারের চেহারা দেখতে এবং তাকে গভীর থেকে বুঝে নিতে ইউরোপ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কোনো উদ্যোগ করে উঠতে পারে না। এবং সেই সুযোগে ইউরোসেন্ট্রিক বুদ্ধিজীবীরা ইসলামের উপর ইউরোপিয়ানদের অজ্ঞতার পর্দা আরও প্রসারিত করে যেতে থাকে।

মুহাম্মদ আসাদ চমৎকার লিখেছেন :

বিভিন্ন ক্রুসেডে যে ক্ষতি হলো, তা অস্ত্রের ঝনঝনানির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রথমত এবং সর্বাগ্রে এ হচ্ছে এক মনোজাগতিক ক্ষতি। আর তা হলো, ইসলামের শিক্ষা এবং আদর্শের একটি ইচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যার মাধ্যমে পাশ্চাত্য মনকে মুসলিমজগতের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলা। কেননা ক্রুসেডের আহ্বানের যৌক্তিকতা বজায় রাখতে হলে মুসলমানদের নবীকে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা ছাড়া এবং তার ধর্মকে জঘন্য ভাষায় চিত্রিত করে তাকে লাম্পট্য ও বিকৃত রুচির উৎসরূপে প্রমাণ করা ছাড়া তাদের সামনে কোনো বিকল্প ছিল না। ইসলাম কেবল অনুষ্ঠানাদি পালনের একটি স্থূল ইন্দ্রিয়পরায়ণ ধর্ম; চিত্ত-শুদ্ধির ধর্ম নয় এবং পাশবিক হানাহানির প্ররোচনা দিয়ে যাওয়াই এই ধর্মের সার—এমন হাস্যকর একটা ধারণা ক্রুসেডের আমলেই পাশ্চাত্য-মানসে গেঁথে দেওয়া হয় এবং এই ধারণা আজ পর্যন্ত সেখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। (দ্য রোড টু মক্কা, পৃষ্ঠা ৭)

---

[৪৩] এই অঞ্চলই হলো বর্তমান ফিলিস্তিন, ইজরাইল ও সিরিয়া।

গ্রন্থপঞ্জি

—আল-কামিল ফিত তারিখ, ইবনুল আসির ইজ্জুদ্দীন, পৃষ্ঠা : ৬২০-৬৭০
—তারিখে ইবনে খালদুন, আবদুর রহমান ইবনে খালদুন, ৫/২২৩-২৮০
—কিতাবুর রাওজাতাইন, শিহাবুদ্দীন মাকদেসী, ১/১০০-১৪০ এবং ২/২৫৪-২৬৪
—বিদায়া ওয়া নিহায়া, হাফেজ ইবনে কাসির ৭/৭৬০-৭৯২
—উরদু দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়্যাহ ৬/৬৩৪-৬৩৫
—আসালিবুল গাজবিল ফিকরি, প্রথম অধ্যায়।
—দ্যা রোড টু মক্কা, মুহাম্মদ আসাদ।
—দ্যা ক্রুসেডস, হ্যারল্ড ল্যাম্ব (সালাহুদ্দীন আইয়ুবী নামে উরদুতে অনূদিত, অনুবাদক-মুহাম্মদ ইউসুফ আব্বাসী)।
—সালাদীন অ্যান্ড দ্যা ফল অব দি কিংডম অব জেরুসালেম, স্টেনলে লেনপুল।
—আননুজুমুজ জাহেরা, আল্লামা ইবনে তাগরিবিরদী।
—আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার, আবুল ফিদা।
—কিতাবুল ই'তিবার, উসামা ইবনে মুনকিজ।
—আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়্যাহ, বাহাউদ্দীন ইবনে শাদ্দাদ।
—তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী, প্রথম খণ্ড।

চতুর্থ অধ্যায়

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রসমূহ

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় ছিল আমাদের মূল আলোচ্যের ভূমিকা। পক্ষান্তরে বর্তমান অধ্যায়টি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অংশে আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক নানা ক্ষেত্রের উপর আলো ফেলব। বর্তমানে এই লড়াইয়ের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো হলো :

১. ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যতত্ত্ব।
২. উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ।
৩. গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন।
৪. ধর্মান্তরকরণ।

ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যতত্ত্ব : ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যতত্ত্ব বলা হয়—অমুসলিমদের ইসলাম, মুসলিম ও প্রাচ্য নিয়ে চর্চাকে। এই চর্চার অধীনে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মাঝে ইসলাম ও প্রাচ্যতত্ত্বে বিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তি তৈরি করা হয়। ইসলামি চিন্তাচেতনা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে একেবারেই আস্থাহীন ও অবিশ্বাস পোষণকারী এই 'বিদ্বান' মানুষগুলো যখন তাফসির, হাদিস, ফিকহ কিংবা ইসলামের ইতিহাস নিয়ে কাজ করে তখন তারা ভয়ঙ্কর সব ফেতনা ও নৈরাজ্যের জন্ম দিয়ে বসে।

উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ : কলোনিয়ালিজম বা উপনিবেশবাদ হলো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা দ্বারা পশ্চিমাশক্তির ইসলামি বিশ্বকে নিজেদের কর্তৃত্বাধীন করে নেওয়া। এই অধ্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের এই ক্ষেত্রটির লক্ষ্য, চক্রান্ত এবং তাদের পদক্ষেপ সম্বন্ধে আলোচনা হবে, যার মাধ্যমে পেছনের চার শতকে ইসলামের বিপক্ষশক্তি এবং ইসলামের উপর মনস্তাত্ত্বিক হামলাকারীরা ধীরে ধীরে কর্তৃত্ব লাভ করেছে।

গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন : গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন হলো সমগ্র বিশ্বকেই এক ও অভিন্ন অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমাজনীতির আওতাভুক্ত করবার জন্য মার্কিন ও ইহুদি লবির একটি সমন্বিত প্রয়াস।

ধর্মান্তরকরণ : এর অর্থ—মুসলমানদের ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আহ্বান করা। তাওহিদি বিশ্বাস থেকে বিমুক্ত করে তাদের মুরতাদ বানিয়ে ফেলা।

৪.১: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের প্রথম ক্ষেত্র
ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যতত্ত্ব

৪.১.১: প্রাচ্যতত্ত্বের আভিধানিক অর্থ

আরবি ভাষায় প্রাচ্যতত্ত্বকে বলা হয় ইসতিশরাক। শব্দটি উদ্ভূত আরবি শব্দমূল শারক থেকে। শারক কিংবা Orient শব্দ দ্বারা সেই অঞ্চল উদ্দেশ্য, পৃথিবীর যেই অঞ্চলে সবার আগে সূর্য ওঠে। শব্দটি 'পূর্ব' অর্থে ব্যবহৃত হয়। আরবি শব্দ ইসতিশরাক-এর আভিধানিক অর্থ—পূর্ব বা প্রাচ্যকে জানা। আভিধানিক অর্থ 'প্রাচ্যকে জানা' হলেও শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য—প্রাচ্যদেশীয় অঞ্চলগুলোর জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যকে জানা। এবং এই অর্থেই শব্দটির ব্যবহার।

এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকার তথ্যানুসারে Orientalism শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ Oriens থেকে, যার অর্থ সূর্যোদয়। হয়তো-বা জ্ঞানের দ্যুতিকে আলোকরশ্মির সাথে সাদৃশ্য কল্পনা করে প্রাচ্য সম্পর্কিত জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা বোঝাতে শব্দটির প্রয়োগ শুরু হয়ে থাকবে।

এখানে একটা বিষয় ভালো করে জেনে রাখা দরকার, ইউরোপে কিন্তু প্রাচ্য শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথম অর্থ অনুসারে প্রাচ্য দ্বারা উদ্দেশ্য সেইসব অঞ্চল, যা ইউরোপ থেকে পূর্ব দিকে অবস্থান করে। এই অর্থ অনুযায়ী সমস্ত এশিয়া প্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। আর দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে প্রাচ্য বলা হয় ভূমধ্যসাগরের এপারের অঞ্চলগুলোকে। আর এই অর্থ অনুসারে এশিয়া ছাড়াও প্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে ইউরোপের উত্তরে অবস্থিত আফ্রিকাও।

৪.১.২: প্রাচ্যতত্ত্বের পারিভাষিক সংজ্ঞা

আরবের আলেমগণ প্রাচ্যতত্ত্বের Defination বা সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন :

> دراسة الغربيين للشرق الاسلامي حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وتاريخه وثقافاته وعاداته،
>
> প্রাচ্যতত্ত্ব হলো পাশ্চাত্যের লোকদের পূর্বাঞ্চলীয় ইসলামি দুনিয়ার সভ্যতা-সংস্কৃতি, দীন-ধর্ম, ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং প্রথা ও আচার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।

৪.১.৩: প্রাচ্যতত্ত্বের পশ্চিমা ধারণা

এনকার্টা ডিকশনারিতে (Encarta Dictionary) প্রাচ্যতত্ত্বের (Orientalism) সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—The study of the Civilizations of Eastern Asia. অর্থাৎ, পূর্ব এশিয়ার সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, প্রাচ্যতত্ত্বের সীমা আরও বিস্তৃত। এবং সমগ্র ইসলামি বিশ্ব ও প্রতিটি ইসলামি সমাজ, সেটা প্রাচ্যে হোক কিংবা প্রতীচ্যে, সেটাই প্রাচ্যতত্ত্বের টার্গেট। যদিও প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা হিন্দুদর্শন, বৌদ্ধমতসহ সমস্ত প্রাচ্য সম্বন্ধেই পড়াশোনা করে; কিন্তু প্রাচ্যতত্ত্বের সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত তাদের মূল টার্গেট কেবল ইসলাম এবং মুসলিমরাই ছিল। কেননা ইউরোপ সেই শুরু থেকেই ইসলাম ও মুসলমানকেই তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করে আসছে। এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিশোধপরায়ণ মানসিকতা থেকেই প্রাচ্যতত্ত্বের সূচনা।

৪.১.৪: প্রাচ্যবিদ

প্রাচ্যতত্ত্ব নিয়ে যারা কাজ করে, তাদেরই প্রাচ্যবিদ বা Orientalist বলা হয়। বর্তমান সময়ের আরব আলেমগণ প্রাচ্যবিদের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার সারকথা হলো- 'প্রাচ্যবিদ ওই পশ্চিমা বিদ্বান, যে ধর্মীয় গোঁড়ামির ভিত্তিতে ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করে আর এই চর্চার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে—ইসলামের জ্ঞানগত ভিত্তিমূলে সংশয় সৃষ্টি করা। ইসলামের রুহকে প্রভাবিত করে দেওয়া এবং তার গতি-প্রকৃতি ও আকৃতি পালটে ফেলে তার সম্মান, মর্যাদা ও শ্রদ্ধার জায়গা কলঙ্কিত করে ফেলা।'

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহিমাহুল্লাহ প্রাচ্যবিদের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন :

> "সাধারণত তাদের প্রাচ্যবিদ বা Orientalist বলা হয়, যারা নিজেদের জ্ঞানের গভীরতা, গবেষণার প্রখরতা এবং প্রাচ্যতত্ত্বে গভীর পাণ্ডিত্যের কারণে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের জ্ঞান ও রাজনীতির মজলিসগুলোয় বিশেষ সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত হয়ে থাকে। এবং পশ্চিমের ইসলামি সভা-সেমিনার ও আলোচনায় যাদের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ, থিসিস ও চিন্তাকে চূড়ান্ত এবং শেষকথা মনে করা হয়।"[৪৪]

কিন্তু এরই সাথে তিনি প্রাচ্যবিদদের কাজের দ্বিতীয় দিকে আলো ফেলে উল্লেখ করেন :

> "সাধারণত প্রাচ্যবিদেরা হলেন বিদ্বানসমাজের সেই হতভাগা এবং চিরবঞ্চিত দল, যারা কুরআন, হাদিস, সিরাত, ফিকহে ইসলামি এবং তাসাউফের সমুদ্রে বারবার ডুব দিয়েছে। এবং একদম খালিহাতে ও শূন্য আঁচলে ফিরে এসেছে। উলটো তাদের হঠকারিতা, ইসলাম থেকে দূরত্ব এবং সত্য অস্বীকার করার মনোভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তার একটি বড় কারণ—ফল সব সময় উদ্দেশ্যের অনুগামী হয়। সাধারণভাবে সেইসব প্রাচ্যবিদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ইসলামের আপাতদুর্বল দিকগুলো খুঁজে বের করা এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেগুলো তুলে ধরা ও ফুটিয়ে তোলা। যে কারণে পরিচ্ছন্নকর্মী-দলের অফিসারের মতন তাদের নজর একটি বাগান ও জান্নাতসম শহরের কেবল অস্বাস্থ্যকর ও আবর্জনাযুক্ত জায়গাতে গিয়েই পড়ে।"[৪৫]

---

[৪৪] মাগরিবি মুসতাশরিকিন কে ফিকর ও ফালসাফা কা আসার, পৃষ্ঠা : ১

[৪৫] মাগরিবি মুসতাশরিকিন কে ফিকর ও ফালসাফা কা আসার, পৃষ্ঠা : ২

৪.১.৫: প্রাচ্যবিদের প্রকারভেদ

আকিদা-বিশ্বাস এবং চিন্তাভাবনার বিবেচনায় প্রাচ্যবিদদের কয়েকটি প্রকার আছে। এদের মধ্যে ইহুদি-খ্রিষ্টান যেমন আছে; তেমনি আছে কম্যুনিস্ট এবং সেক্যুলার চিন্তাধারার মানুষজনও। অধিকাংশ প্রাচ্যবিদই প্রাচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞান এবং ইসলামি ইতিহাস, ঐতিহ্য ও তার উৎসমূল নিয়ে কাজ করতে গিয়ে নিজেদের জাতি, নিজেদের চিন্তা এবং নিজেদের দলের স্বার্থ ও নিজেদের প্রতিষ্ঠানের নির্ধারণ করে দেওয়া বিশেষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখেই কাজ করে যায়। নিরপেক্ষভাবে প্রাচ্য নিয়ে গবেষণা করে এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্তই কম।

মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী রহিমাহুল্লাহ প্রাচ্যবিদদের ধর্মবিশ্বাসের কথা বলতে গিয়ে লেখেন : "প্রাচ্যবিদদের অধিকাংশই পাদরি ও ধর্মযাজক। আবার তাদের একটি বড় অংশ জন্ম ও ধর্মগতভাবে ইহুদি।"[৪৬]

এ বিষয়ে ড. মুসতফা সিবায়ীর পর্যবেক্ষণ হলো, প্রাচ্যতত্ত্বের স্রোত উৎসারিত হয়েছে চার্চ থেকে। আর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোয় গির্জা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের সহায়তা করে যায়।[৪৭]

৪.১.৬: প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাস

প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাস (History of Orientalism) বহু পুরোনো। কোনো দিন মাস তারিখ বছর দিয়ে তার সূচনাকাল নির্ধারণ করা যাবে না। তবে খ্রিষ্টপূর্ব সময়কালে প্রাচ্যতত্ত্বের একটি রূপের সন্ধান আমরা পাই। এশিয়া-জয়ী গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার গ্রেট নিজের উপদেষ্টা এবং সাম্রাজ্যের বিদ্বান ব্যক্তিদের নির্দেশ দেন প্রাচ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর পড়াশোনা করতে, যাতে তারা প্রাচ্যের দুর্বল দিকগুলো খুঁজে বের করতে পারে, যার মারফত প্রাচ্যের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। এটা প্রাচ্যতত্ত্বের একটি প্রাথমিক রূপরেখা ছিল। কিন্তু আমরা যেই প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাস জানতে চাই তা হলো ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠা পাওয়া প্রাচ্যতত্ত্ব। প্রাচ্যতত্ত্বের এই ধারার সূচনা যদিও ক্রুসেডের অব্যবহিতকাল পরে তবু এর শেকড় আমরা ইসলামের প্রাথমিক যুগেও দেখতে পাই। কিছুটা গভীরভাবে উপলব্ধির জন্য প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাস আমরা চারটি পর্বে ভাগ করে দেখতে পারি।

প্রথম পর্ব : পহেলা হিজরি থেকে সাতশ হিজরি পর্যন্ত

এই পর্বটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনা হিজরত থেকে আরম্ভ করে ক্রুসেডের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং বলা যায় এই পর্বের ব্যাপ্তি সাত শতাব্দীকাল।

---

[৪৬] মাগরিবি মুসতাশরিকিন কে ফিকর ও ফালসাফা কা আসার, পৃষ্ঠা : ২

[৪৭] আল-মুসলিমুনা ওয়াল ইসতিশরাক, পৃষ্ঠা : ৮৮

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ইতিহাস অধ্যায়ে আপনারা জেনে এসেছেন যে, ইহুদি-খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের মদিনায় হিজরতের পর ইসলাম সম্বন্ধে অবগত হয়েই তার উপর আপত্তি উত্থাপনের ধারা শুরু করে। তাদের সকল আপত্তি-অভিযোগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—কুরআন কারিম যে আল্লাহ তায়ালার মোহন কালাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহ তায়ালার সত্যনবী—এই বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় তৈরি করে দেওয়া।

খেলাফতে রাশেদার সময়ে শাম এবং মিশর বিজয়ের পর মুসলমান এবং এশিয়ার কিতাবিদের মধ্যকার ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচে আসে; এবং একই দেশের বাসিন্দা হবার কারণে তাদের পরস্পরে লেনদেন, কথাবার্তা এবং ভাবেরও আদানপ্রদান ঘটতে থাকে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবস্থা চলতে থাকে এমনই। এই সময়টাতে ইহুদি আলেম এবং খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের তরফ থেকে কিছুটা ধীরগতিতে ইসলামের উপর আপত্তি উত্থাপনের ধারা অব্যাহত থাকে।

সেইকালে ইউহান্না দামেশকি (John of Damuascus) নামে এক খ্রিষ্টান পাদরি ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণা শুরু করে এবং তারই ধারাবাহিকতায় সে 'হায়াতে মুহাম্মদ' এবং 'হিওয়ার বাইনা মাসিহ ওয়া মুসলিম' নামে দুটি পুস্তিকা রচনা করে। ইউহান্না তার পুস্তিকা-দুটির মাধ্যমে খ্রিষ্টানদের সামনে ইসলামের বিরুদ্ধে যুক্তিপ্রমাণ সরবরাহ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার এই উদ্যোগে মুসলমানেরা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয়নি। এমনকি খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা পর্যন্ত তার এই প্রচার-প্রচারণায় তেমন কোনো আগ্রহ দেখায়নি। এর কারণ চিহ্নিত করতে গিয়ে মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশেমী লেখেন :

> বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের কঠোরতা ও জুলুম-অবিচারের বিপরীতে মুসলমানদের সহনশীলতা এবং স্বাধীনতা বিজিত অঞ্চলগুলোর অমুসলিম জনপদের সামনে এমন এক দৃশ্যের অবতারণ করেছিল যে, সেখানকার জনগণ মুসলিমবিজেতাদের আগমনকে 'আল্লাহর বিশেষ রহমত' হিসেবে ব্যক্ত করতে থাকে। এবং নিজেদের ধর্মান্ধ কঠোর ধর্মীয় নেতাদের প্রতি সামান্যই ভ্রুক্ষেপ করে। সেইকালে মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এর সামনে মিশর এবং শামের খ্রিষ্টান ধর্মযাজক এবং ইহুদি আলেম ও ধর্মনেতাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।[৪৮]

মোটকথা, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সেই সময়কার সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হয় এবং তাদের অধিকাংশই বুঝে নেয় যে, বর্তমান সময়ে আপত্তি অনুসন্ধান ও উত্থাপনের উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদিস অধ্যয়নের প্রয়াস অনর্থক। যে কারণে তারা কুরআন-হাদিসের ছিদ্রান্বেষণের ব্যর্থ প্রয়াস ছেড়ে দিয়ে চিকিৎসা, রসায়ন, গণিত, কৃষি এবং সাহিত্যের মতন জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখায় মুসলমানদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। নিঃসন্দেহে এই জমানায় মুসলমানেরা সমগ্র দুনিয়ার জন্যই শিক্ষকের ভূমিকায়

---

[৪৮] মুসতাশরিকিন কা তরিকায়ে কার, পৃষ্ঠা : ২

অবতীর্ণ হয়েছিল। আর প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বিদ্বানেরা শিক্ষার্থীর মতন হাত বেঁধে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সামনে। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ রাখত তাদের একটি বড় অংশ বাগদাদ থেকে নিয়ে কর্ডোভা পর্যন্ত মুসলমানদের সমকালীন জ্ঞানবিজ্ঞানের বিদ্যাপীঠে কোনো প্রকার বাধা-বন্ধন ছাড়া অনায়াসে জ্ঞানচর্চা করতে থাকে। শিক্ষা সমাপনান্তে তাদের সমাজে একজন চিকিৎসক, রসায়নবিদ এবং গণিতজ্ঞ হিসেবে চোখ বুজে গ্রহণ করা হতো। তাদের একটি বড় অংশ সরকারি অফিস-আদালত ও প্রতিষ্ঠানে মুনশি এবং কেরানির মতন পদ অলংকৃত করে বড় বড় দায়িত্ব সম্পাদন করবারও সুযোগ পেত।

এই ছিল ইসলামি বিশ্বের চিত্র। আর ইউরোপের কথা যদি বলতে হয়—এই শতাব্দীগুলোতে শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতিতে তা ছিল অন্ধকার ও পিছিয়ে পড়া সমাজের এক বাস্তব নিদর্শন। জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখায় ছিল গির্জার পবিত্রতার নামে কঠোর প্রহরা। পাদরিরা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা এবং গবেষণার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছিল। অবরুদ্ধ রাখা হয়েছিল অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর দর্শনসহ সকল প্রকারের নতুন জ্ঞান ও চিন্তার প্রবেশপথ।

প্রাচ্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতাগণ

কিছু পাদরি ও ধর্মযাজক গির্জার এইসব নিষেধাজ্ঞা ও পাবন্দির বিরোধিতা করতেন। প্রচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি এরা ছিলেন যথেষ্ট অনুরাগী। তাদের আমরা ইউরোপে প্রাচ্যতত্ত্বের উদ্ভাবক হিসেবে গণ্য করতে পারি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কজন হলেন :

হার্বার্ট ডি অরালিয়াক (৯৩৮-১০০৩) Herbert de Oraliac : তিনি ছিলেন বেনেডিক্ট মতবাদের ফরাসি যাজক। জ্ঞানার্জনের জন্য আন্দালুস গিয়েছিলেন এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের নানান শাখায় বিচরণ করে দেশে ফিরে আসেন। তার যোগ্যতার কারণে ৯৯৯ সালে তাকে পোপ হিসেবে মনোনীত করা হয়। ইতিহাসে তিনি পোপ দ্বিতীয় সেইলভেস্টার (Pope Sylvester II) নামে প্রসিদ্ধ। তিনিই প্রথম পোপ, যিনি ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। এই শ্রেণির পোপেরা আগ্রহের সাথে নিজেরাই ইসলামি বিশ্ব থেকে আরবি বইপত্র আনিয়ে গভীর অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকতেন।

মাননীয় পিটার ১০৯৪-১১৫৬ (Prerre le venerable) : উনিও বেনেডিক্ট মতাদর্শী খ্রিষ্টান ছিলেন এবং ছিলেন রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রধান। তিনি ১১৪৩ সালে নিজেই আরবি শিখে আরবি ভাষার ল্যাটিন অনুবাদ করেন, যা তৎকালে ইউরোপের জ্ঞানচর্চার প্রধান ভাষা ছিল। এরপর রবার্ট অব কেটন (robert of Ketton) তার ল্যাটিন অনুবাদেরই ইংরেজি ভাষান্তর করেন। পিটার একদল অনুবাদক তৈরি করেছিলেন এবং তাদের নিযুক্ত করেছিলেন আরবি বইপত্রের অনুবাদের কাজে। এবং এটাকেই তার সবচাইতে বড় কাজ হিসেবে স্মরণ করা হয়।

জেরার্ড ডি গ্রেয়মনা ১১১৪-১১৮৭ (Gerard de Gremona) : ইটালির পাদরি ছিলেন। জ্ঞানার্জন করেছিলেন আন্দালুসের টলেডো গিয়ে। আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে তিনি দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং আরও কতিপয় শাস্ত্রে ৮৭টিরও অধিক আরবি গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এ সকল অনুবাদকর্মের মাধ্যমে ইউরোপিয়ানদের প্রাচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি মনোযোগী করে তুলতে তিনি সমর্থ হন।

ইউহান্না সেভিলা (Juan de Sevilla) : খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠা এই ব্যক্তি জন্মসূত্রে ছিলেন ইহুদি। কিন্তু নিজেকে তিনি খ্রিষ্টান বলে পরিচয় দিতেন। তিনিও ভাষান্তরের কাজে বেশ সুনাম অর্জন করেন। জ্যোতির্বিদ্যায় দারুণ পারদর্শী ছিলেন। তারকারাজির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তার ভালো জানাশোনা ছিল।

রজার বেকন (১২১৪-১২৯৪) Roger Bacon : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির এই স্কলার ছিলেন ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং দার্শনিক। প্যারিস ইউনিভার্সিটিতেও তিনি পড়াশোনা করেন। দর্শনের একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে তাকে গণ্য করা হয়। তিনি মিরআতুল কিমিয়ার অনুবাদ করেন।

দান্তে ১২৬৫-১৩২১ Dante Alighieri : দান্তে ছিলেন বিখ্যাত ইটালিয়ান রাজনীতিজ্ঞ এবং চিন্তাবিদ। লেখাপড়া করেন ফ্লোরেন্স, বোলোনিয়া এবং পাদোয়া ইউনিভার্সিটিতে। আরবি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন এবং ছিলেন একজন ভালো কবি। পশ্চিম তাকে বিশ্বের অন্যতম সেরা কবি মনে করে। তার সবচাইতে বিখ্যাত গ্রন্থ দ্যা ডিভাইন কমেডি মূলত ইবনুল আরাবির রচনা থেকে টুকলিফাই করা।

প্রাথমিক যুগের প্রাচ্যবিদদের কাজ

এই প্রাথমিক যুগে ইউরোপে ইসলামি বিশ্বের নির্বাচিত ২০টি বইয়ের অনুবাদ করা হয়। টলেডোর বড় পাদরি ১১৩০ সালে কিছু আরবি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। ইটালি এবং ফ্রান্সে প্রসিদ্ধ দার্শনিক বু আলী ইবনে সিনা, নামজাদা রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়ান, মানতেকশাস্ত্রের গুরু আল-ফারাবী এবং প্রসিদ্ধ ফিলোসফার ইবনে রুশদের বইপত্র স্থানীয় ভাষায় রূপান্তরিত হতে থাকে। কিন্তু অনুবাদকেরা লেখকদের নাম বিকৃত করে তাদের পরিচয় প্রায় গোপন করে ফেলেন। বু আলী ইবনে সিনাকে আভিসেনা, ইবনে রুশদকে আভিরোস। জাবির ইবনে হাইয়ানকে জেবার এবং আল-ফারাবীকে ফারাবিয়াস নামে পরিচিত করানো হয়। বহু শতক ধরে ইউরোপিয়ানরা তাদের স্বগোত্রীয় বলে জেনে এসেছে। এইসব অনূদিত গ্রন্থ ইউরোপে একটি নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পঠিত হতে থাকে।

এই যুগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই যুগেই প্রথমবারের মতো ইউরোপিয়ানদের খেয়াল জাগে ইসলামি বিশ্বের আদলে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করার। প্রথম ক্রুসেডের পরিণতিতে যখন ইউরোপিয়ান আক্রমণকারীদের আল-কুদসসহ

শামের কিছু শহরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় তখন মুসলমানদের জ্ঞানরাজ্য ও শিক্ষানিকেতনের উন্নতি-উৎকর্ষ তাদেরকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। যার ফলে প্রথম ক্রুসেডের অব্যবহিতকাল পরেই ইটালির শহর বোলোনিয়ায় ইউরোপের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ৫০-৬০ ষাট বছর পর খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে (১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ) ফ্রান্সের প্যারিস ইউনিভার্সিটির ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয় এবং তারপর তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দেওয়া হয়। ১১৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং ১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ইটালির মোডেনা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে স্পেনের খ্রিষ্টীয় শাসনামলে প্যালেন্সিয়া ইউনিভার্সিটি, ১২০৯ সালে ব্রিটেনের ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি, ১২১৮ সালে স্পেনের খ্রিষ্টীয় নগরী টলেডোর পশ্চিমাঞ্চলের সালামানকা ইউনিভার্সিটি এবং ১২২২ সালে ইটালিতে পাদোয়া ইউনিভার্সিটির যাত্রা শুরু হয়। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্ব ছাড়াও আইন, চিকিৎসা এবং কলা ও ফাইন আর্টসসহ নানান প্রকার বিদ্যা ও শাস্ত্রের পাঠদান হতো। বাইরে থেকে আগত শিক্ষার্থীদের আবাসন-ব্যবস্থা ছিল একদম ইসলামি বিদ্যালয়গুলোর আদলে। ইতঃপূর্বে ইউরোপের কোনো বিদ্যাপীঠে আবাসিক হোস্টেলের কথা কল্পনাও করা যেত না। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এমন লোক তৈরি করতে থাকে, যারা পরবর্তীতে প্রাচ্যতত্ত্বের প্রকৃত মুখপাত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

প্রাচ্যতত্ত্বের দ্বিতীয় পর্ব : ১৩০০-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রাচ্যতত্ত্বের প্রথম পর্ব ছিল কেবলই একটি ভূমিকা। বলা যায়—প্রাচ্যতত্ত্বের মূল সময়কাল ছিল এই দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্ব ক্রুসেডের সমাপ্তিকাল থেকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের সময় পর্যন্ত ব্যাপৃত। আপনারা ক্রুসেডের অধ্যায়ে পড়ে এসেছেন যে, নবম লুইয়ের চিন্তাধারা থেকে ইউরোপে রেনেসাঁর সূত্রপাত। ইউরোপিয়ান বিদ্বান চিন্তাবিদ ও গবেষকেরা সেইসব গেরো খুলবার জন্য অস্থির ছিল, যা চার্চের কড়াকড়ি এবং সংকীর্ণতার কারণে সমস্ত ইউরোপকে আবদ্ধ করে রেখেছিল। এবং যেই সীমাবদ্ধতার উপস্থিতিতে জ্ঞানবিজ্ঞান ও গবেষণার কোনো পথ উন্মোচিত হওয়া সহজ ছিল না।

এইসকল চিন্তাবিদ ও গবেষকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন র‍্যামন লাল (Ramon Llull) (১২৩৫-১৩১৪)। তিনি ১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৭৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট নয়টি বছর ব্যয় করেন আরবি ভাষা এবং কুরআন কারিম শেখার পেছনে। এরপর রোমে গিয়ে তিনি পোপকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন ইউরোপিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আরবি জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইসলামি শাস্ত্রের পঠন-পাঠন শুরু করবার জন্য, যাতে করে খ্রিষ্টান বিদ্বানেরা ইসলাম ও মুসলমানের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক

লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবার উদ্দেশ্যে জ্ঞানগত অস্ত্রে নিজেদের সজ্জিত করে তুলতে পারে। পোপ সহজেই তার প্রস্তাব মেনে নেন এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা করতে আরম্ভ করেন। যার ফলে অত্যন্ত দ্রুত গতির সাথে এই চিন্তার প্রসার ঘটতে থাকে।

ক্রুসেডের সমাপ্তির বছরকয়েক পর ১৩১২ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপের চিন্তাবিদ ও গবেষকদের একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেই কনফারেন্সে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, প্রাচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞানকে নিজেদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে। এটা ছিল প্রাচ্যতত্ত্বের দিকে ধাবিত প্রথম নিয়মতান্ত্রিক পদক্ষেপ।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাঁচটি ইউরোপিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় : প্যারিস ইউনিভার্সিটি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, বোলেনিয়া ইউনিভার্সিটি (ইটালি), সালামানকা ইউনিভার্সিটি (স্পেন) এবং পাদোয়া ইউনিভার্সিটিতে (ইটালি) ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞান অনুষদ চালু করে দেওয়া হয়।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাচ্যতত্ত্ব চর্চার সীমানা বিস্তৃত হয়ে ধীরে ধীরে ফ্রান্স, ইটালি, হল্যান্ড, জার্মানিসহ সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় ইউরোপিয়ানরা স্পেনের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র এবং লাইব্রেরিগুলো থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হতে থাকে। নিজেদের থেকে অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকার দূর করবার জন্য তারা যেন উঠেপড়ে লাগে। জ্ঞানচর্চার এই শোরগোলের পরিণামে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়। জ্ঞানচর্চার আসবাব-উপকরণ সহজলভ্য হয়ে ওঠে। যার মধ্যে প্রেসের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ে ইউরোপিয়ান শাসকেরা প্রাচ্যতত্ত্বকে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে কল্যাণকর বিবেচনা করে নিয়মতান্ত্রিকভাবেই তার পৃষ্ঠপোষকতা আরম্ভ করে। এই বিষয়ে খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের ফরাসি শাসক চতুর্দশ লুইয়ের প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি বড় অংকের পারিশ্রমিক দিয়ে প্রাচ্যবিদদের মাধ্যমে আরবি বইপত্রের ভাষান্তর করান এবং আরবদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপর নতুন গ্রন্থ প্রণয়ন করান। তার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত গ্রন্থাবলিতে আরবজাতীয়তাবাদের প্রতি উৎসাহপ্রদানের প্রয়াস স্পষ্টই চোখে পড়ে। এ ধরনের কাজের পেছনে তাদের লক্ষ্য একটাই ছিল—আরব অঞ্চলের জনগণের মধ্যে তুরস্কের উসমানি খেলাফতের প্রতি বিতৃষ্ণা তৈরি করা। কেননা উসমানি খলিফারা ছিলেন অনারব। আর তাদের অব্যাহত বিজয়ধারার কারণেই সমস্ত ইউরোপ কম্পমান ছিল। ফলে আরবজাতীয়তাবাদের ঢেউ তুলে খেলাফতকে দুর্বল করাই ছিল তাদের অনুবাদকর্মের মূল লক্ষ্য।

এই পর্বের কতক প্রাচ্যবিদ নিজেদের পূর্বসূরিদের কাজের সমালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণও করেন। এবং ইসলামের উপর তাদের উত্থাপিত কতক আপত্তিকে দুর্বল বলেও আখ্যা দেন। কিন্তু এর পাশাপাশি তারা ইসলামের উপর কিছু নতুন আপত্তি আরোপ করে বসেন, যেগুলো তাদের বিবেচনায় অনেক 'ওজনদার' ছিল।

তৃতীয় পর্ব : ১৮০১-১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ

প্রাচ্যতত্ত্বের তৃতীয় পর্বের উত্থান ঘটে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থানের সমান্তরালে। এটা সেই সময়ের কথা, যে-কালে ইউরোপ শিল্পোন্নয়নের চূড়ায় আরোহণ করছিল। বস্তুপূজার উন্মাদনা চার্চের সাথে বিদ্রোহের পরিবেশ ব্যাপক করে দিয়েছিল। এবং এরই সাথে পশ্চিমাদের আকিদা-বিশ্বাসের প্রান্তর হয়ে পড়েছিল একেবারে বিরান-বধ্যভূমি। সেই পরিস্থিতিতে ইউরোপের জ্ঞানতাত্ত্বিকেরা এটাই কল্যাণকর মনে করল যে, প্রাচ্যতত্ত্বের আন্দোলন তারা আরও বিস্তৃত করবে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের উপর তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও জ্ঞানগত আক্রমণ আরও বেগবান করে তুলবে, যাতে ইউরোপের সাধারণ্যের কাছে সময়-সুযোগ ও অবকাশ না থাকে নিজেদের আকিদা-বিশ্বাস এবং ধর্মগ্রন্থের দুর্বলতার দিকে ফিরে তাকাবার ও সেসবের প্রতি আপত্তি তুলবার। বিপরীতে তারা ইসলাম এবং মুসলমানের ভুলত্রুটির সন্ধানে এবং তা নিয়ে তর্জন-গর্জনেই নিরত থাকে।

আমি সেই জমানার কথা বলছি, যখন ইউরোপের সেনারা মুসলিমভূমিতে অবতরণ করে তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছিল এবং সুদূর মরক্কো থেকে হিন্দুস্থান পর্যন্ত মুসলমানদের ক্ষমতা খর্ব করে চলছিল। সেজন্যই প্রাচ্যতাত্ত্বিক আন্দোলন দখলীকৃত প্রতিটি ভূমিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জন্য পথ সুগম করবার দায়িত্বও কাঁধে তুলে নেয়। এই পর্বে এটা সুস্পষ্টই প্রতিভাত হচ্ছিল যে, প্রাচ্যতাত্ত্বিক আন্দোলন এটা জ্ঞানগত আন্দোলন কেবল নয়; বরং ইউরোপিয়ান শক্তির রাজনৈতিক স্বার্থের সংরক্ষকও। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রাচ্যবিদদের সহায়তায় উপনিবেশিত দেশগুলোর জ্ঞান আহরণে ব্যস্ত ছিল। প্রাচ্যবিদদের প্রচেষ্টায় ইউরোসেন্ট্রিক রাজনীতিবিদরা উপনিবেশিত জাতির জ্ঞানবিজ্ঞান, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল, কাব্য ও সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি ও কালচার সম্বন্ধে অবগতি লাভ করে যাচ্ছিল। যার মাধ্যমে তারা প্রতিনিয়ত ওয়াকিফহাল হচ্ছিল উপনিবেশিত জাতির বৈশিষ্ট্য এবং দুর্বলতা সম্বন্ধে। এবং তারই বদৌলতে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে তাদের শাসন করে যেতে পারছিল।

এই জমানায় প্রাচ্যবিদেরা ইসলামের ইতিহাসের বদলে আরবের ইতিহাস রচনার কাজ আরম্ভ করে। তাদের রচনাবলিতে আরবের গোত্রপ্রীতির সমর্থন, অনারব বিশেষত তুর্কিদের চরিত্র হনন এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইরত মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে তাচ্ছিল্য করবার মতন ঘটনা স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছিল। হাদিস এবং হাদিস বর্ণনাকারী রাবিরাও তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হতে থাকে। ইসলামি বিশ্বের নানা দল ও মতের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও বিরোধ উসকে দেবার উদ্দেশ্যে ইসলামের নামে নানা দল-উপদল নিয়েও তারা কাজ করে। এ ছাড়াও অজস্র ইসলামি বইপুস্তক ইউরোপের প্রসিদ্ধ সব ভাষায় অনুবাদ হতে থাকে।

এই শতাব্দীতে প্রাচ্যবিদদের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের একটা ধারাও বেশ গতির সাথে চালু হয়। সর্বপ্রথম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসে। সেদিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক যত সভা-সেমিনার ও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা তারই অনুকরণ মাত্র।

এই যুগে কতক প্রাচ্যবিদ এমন বিষয়ের উপরেও কাজ করেছেন, মুসলমান গবেষক ও বিদ্বান-সমাজও যার প্রশংসা করেছে। তারা প্রায় বিশটির মতো দুর্লভ পাণ্ডুলিপির উপর গবেষণা ও বিশ্লেষণের কাজ করে সেগুলো নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন। আহমাদ বিন আবু ইয়াকুবের তারিখে ইয়াকুবী মুসলমানদের কাছে তো এক অপরিচিত নামে পরিণত হয়েছিল। প্রাচ্যবিদদের প্রচেষ্টায় ১৮৮৩ সালে গ্রন্থটি লেইডেন থেকে দ্বিতীয়বার ছাপা হয়ে মুসলমানদের হাতে আসে। তাবাকাতে ইবনে সা'দ তো বহু বছর চোখের আড়ালে ছিল। জার্মানির প্রাচ্যবিদেরা ১৮৯৮ সালে তাকে অত্যন্ত যত্নের সাথে বারোটি ভলিউমে প্রকাশ করে। এভাবে ইসলামি ইতিহাসের প্রসিদ্ধ উৎসগ্রন্থ ফুতুহুল বুলদান এবং ইয়াকুত হামাবির ভৌগোলিক এনসাইক্লোপিডিয়া মু'জামুল বুলদানও এই যুগেই ইউরোপ থেকে ছাপা হয়ে দৃশ্যমান হয়।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই গ্রন্থগুলো অনুসন্ধান করে দ্বিতীয়বার প্রকাশ করা প্রাচ্যবিদদের এক বিরাট কাজ। কিন্তু সেই সাথে এটাও ভুলে গেলে চলবে না, ইসলামি বিশ্বের এই যে জ্ঞানজাগতিক অধঃপতন তার পেছনে ইউরোপিয়ান শক্তিই দায়ী। ইউরোপিয়ান শক্তি যেভাবে মুসলিম দেশগুলো থেকে ধনসম্পদের খাজানা লুট করে নিজেদের প্রাসাদ এবং জাদুঘরগুলো সাজিয়ে তুলেছিল সেভাবে ইসলামি দেশগুলোর জ্ঞানরাজ্যেও তাদের লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালু রেখেছিল। তাদের সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞে অগণন ইসলামি কুতুবখানা ধুলোয় মিশে যায়। ইসলামি বিশ্বের, বিশেষ করে আরব অঞ্চলের, অসংখ্য হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সাধারণ হতদরিদ্র মানুষদের থেকে নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে, কারুর থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে এবং কোথাও লাইব্রেরি থেকে চুরি করে ইউরোপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর এভাবেই অজস্র মূল্যবান বইপুস্তক নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় ইউরোপের গ্রন্থাগারগুলো। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের লাইব্রেরিগুলোতে যে গ্রন্থের হদিস পাওয়া গেছে তার সংখ্যা ৫০ হাজারেরও অধিক। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে বহুগুণ বেশি। এবং তার সাথে নিয়মিত আরও গ্রন্থাদি যুক্ত হতে থেকেছে।

প্রসিদ্ধ পাকিস্তানি চিকিৎসক এবং গবেষক মরহুম হাকিম মুহাম্মদ সাঈদ, সারা পৃথিবী চষে বেড়িয়ে, বিভিন্ন লাইব্রেরি নিয়ে গবেষণা ছিল যার আগ্রহের বিষয়, নিজের ভ্রমণকাহিনিতে লিখেছেন—পৃথিবীজুড়ে মুসলিম-লেখক এবং গবেষকদের প্রস্তুতীকৃত প্রায় তিন লাখ পাণ্ডুলিপি রয়েছে, আজ পর্যন্ত যা অপ্রকাশিতই রয়েছে। এবং সে-সবের বড় অংশ আজও ইউরোপের লাইব্রেরিগুলোয় সংরক্ষিত আছে।

আল্লামা ইকবালও এই চরম বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। এ কারণেই তার জন্য উচ্চারণ করা সম্ভব হয়েছে :

পূর্বসূরিদের জ্ঞান-ভরা গ্রন্থরাজি;
হৃদয়বিক্ষত হলো,
সে-সব ইউরোপের গ্রন্থাগারে পড়ে আছে দেখে।

চতুর্থ পর্ব : ১৯২৫-১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ

চতুর্থ পর্বটি প্রাচ্যতত্ত্বের এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়। এইকালে প্রাচ্যতত্ত্বে মৌলিক পরিবর্তন যা আসে তা হলো, ইসলামের উপর নানা রঙিন আপত্তি তুলে তাকে দুর্বল করবার পরিবর্তে প্রাচ্যবিদেরা এক নতুন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াসে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। মূলত বিগত দুই শতাব্দীর প্রাণপণ চেষ্টাপ্রচেষ্টার পর তারা বুঝে নিয়েছিল যে, তাদের কর্মপদ্ধতির একটি মৌলিক সমস্যা হলো, তারা ইসলামের পোক্ত ও দুর্ভেদ্য দুর্গের উপর সরাসরি হামলা করছে। প্রকৃতপক্ষে যাকে পরাভূত করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তা ছাড়া ইসলামের উপর তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন স্বয়ং মুসলমানদেরই জাগিয়ে তুলেছে এবং তারা প্রাচ্যবিদদের প্রতিরোধ ও মোকাবেলার লক্ষ্যে তাদের উত্থাপিত সকল আপত্তির জবাব ও প্রতিউত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়েছে।

এই সমস্যার সমাধানে প্রাচ্যবিদেরা তাদের কৌশল ও চক্রান্তে খানিক বদল নিয়ে আসে। ইসলামের উপর সরাসরি হামলা পরিত্যাগ করে তারা নিজেদের মুসলমানের বন্ধু ও ইসলামের নিবেদিতপ্রাণ সুহৃদ প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়। নিজেদের এই অবস্থান ও পরিচয় কাজে লাগিয়ে তারা এক নতুন ইসলামের অবকাঠামো তৈরিতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে, যেখানে ইসলামের যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যাখ্যা করা হবে। এমন এক ইসলাম অস্তিত্বে আনা হবে, যা পশ্চিমের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে। আর তাকেই মুসলমানদের নিকট ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হবে। প্রাচ্যবিদদের একটি ছোট্ট অংশ ব্যতিরেকে তাদের অধিকাংশই পেছনের প্রায় পৌনে এক শতক ধরে অনবরত এই 'সংগ্রামেই' নিরত রয়েছে। এই সময়কালজুড়ে তাফসির, হাদিস, ফিকহ, সিরাত এবং ইসলামের ইতিহাসের উপর তাদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত তথ্যাবলির মাধ্যমে ইসলামের একটি নতুন রূপ; বরং একটি নতুন ভবন প্রতিষ্ঠা পেতে যাচ্ছে, যার নকশা ও প্রতিকৃতি নবী, সাহাবা, মুজতাহিদ ইমাম এবং সালাফের নিপাট ইসলাম থেকে বহুদূরের।

প্রাচ্যতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গির এই বড় বদলের এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল রাজনৈতিক। এই পর্যন্ত এসে ইউরোপিয়ান শক্তি ইসলামি বিশ্বে তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণে সাফল্য লাভ করে উঠেছিল। তাদের পথের সবচাইতে বড় কাটা ছিল

উসমানি খেলাফত। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে তাকে শেষ করে দেওয়া হলে মুসলমানদের শাসন করতে ইউরোপের সামনে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। তা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের রূপ ধরে এক নয়া প্রতিদ্বন্দ্বীশক্তি ইউরোপ ও আমেরিকার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, যে কারণে ইউরোপের তাবৎ পুঁজিপতিকে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাদের সকল সাধ্য ও ক্ষমতা একত্র করবার পেছনে। এ নতুন যুদ্ধের কারণে প্রাচ্যবিদদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও সাময়িকভাবে দিক বদল করে। এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে প্রাচ্যবিদদের লব ও লাহজা তথা আচরণ ও উচ্চারণ কিছুটা কোমল হয়ে আসে। এতকিছুর পরও ক'জন প্রভাবক প্রাচ্যবিদ এই সময়েও নিজেদের খোলস ছেড়ে বের হতে পারে না। এবং পূর্বের মতোই ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে যেতে থাকে।

এই সময়ে ইলমি মাধ্যমগুলোর সহজলভ্যতা এবং বিদ্যালয়ের আধিক্য সমস্ত প্রাচ্যীয় ও ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদদের জ্ঞানের পরিধি আরও বিস্তৃত করে দেয়। তাফসির, হাদিস, সিরাত, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, উসুলে হাদিস, ইলমে আরুজ (কাব্যরীতি), ইলমুল মাআনি, বালাগাত এবং মুসলিমবিশ্বের ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর বিস্তর কাজ আরম্ভ হয়। ইতিহাস তো পূর্ব থেকেই প্রাচ্যবিদদের চর্চার বিশেষ ক্ষেত্র ছিল। এখন তাতে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। ইসলামি দল-উপদল ও মাজহাব-কেন্দ্রিক নানা শ্রেণি-উপশ্রেণি এবং বিভিন্ন আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস নিয়েও কাজ হয়। প্রাচ্যবিদদের হাতে নির্ঘণ্ট ব্যবহারের সূচনা ঘটে। এবং এ বিষয়ে তাদের দ্বারা এমন কিছু কাজ সংঘটিত হয় যার ফলে মুসলমান আলেম পর্যন্ত তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে বাধ্য হন। যেমন : বলা যেতে পারে, প্রাচ্যবিদদের একটি দল ড. ফিনসিনক (Arent Jan Wensinck)-এর তত্ত্বাবধানে হাদিসে নববীর সূচিগ্রন্থ বিন্যস্ত করেন। সাত খণ্ডব্যাপী বিশাল কলেবরের সেই ঐতিহাসিক কর্মযজ্ঞটি 'আল-মু'জামুল মুফহারিস লি আলফাজিল হাদিসিন নাবাবিয়্যি' নামে জগৎখ্যাত।

এই পর্যায়ে এসে প্রাচ্যবিদদের আন্দোলন অত্যন্ত সহানুভূতিপ্রবণ হয়ে মুসলমানদের মনে এই অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয় যে, তাদের মধ্যে দীনি সংস্কারকের (Reformers) আবির্ভাব প্রয়োজন, যারা ইসলাম এবং পাশ্চাত্যের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে আনতে পারবে। প্রাচ্যবিদদের এই প্রয়াস এতদূর সফল বলা যায় যে, বিগত কয়েক শতাব্দী ইসলামি বিশ্বের সংশোধন, সংস্কার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে যাদের নেতৃত্ব দিতে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ অধিকাংশই প্রাচ্যবিদদের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। এবং দেখা গেছে, সংস্কার ও জাগরণের নামে তারা মূলত ইসলাম ও মুসলমানকে পশ্চিমমুখী করতেই প্রয়াসী হয়েছে।

অনুকরণমূলক প্রাচ্যতত্ত্ব

এই পর্বের শেষদিকে এসে প্রাচ্যতত্ত্বের চর্চায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রাচ্যবিদেরা প্রাচ্যচর্চাকে তাহকিকি উসলুব বা গবেষণামূলক ধারা থেকে সরিয়ে তাকলিদি উসলুব বা অনুকরণমূলক ধারার দিকে আনার প্রচেষ্টা আরম্ভ করে। আসলে এই পর্বে এসে প্রাচ্যবিদদের মনে একটি আশঙ্কা তৈরি হয়। তাদের মনে শঙ্কা জাগে যে, প্রাচ্যতত্ত্বের চর্চা করতে গিয়ে আবার এমন লোক তৈরি না হয়ে যায়, যারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণের পর মুসলমানের চিন্তা-দর্শন সংশয়পূর্ণ করবার বদলে উলটো নিজেদেরই চিন্তা ও দর্শনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে যাবে এবং নিজেদেরই কাজ ও দলিল-প্রমাণের খণ্ডন আরম্ভ করে দেবে! এমন হলে তো প্রাচ্যতত্ত্বের উদ্দেশ্যই মুখ থুবড়ে পড়বে!

এই আশঙ্কার পথ বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে আমেরিকা এবং ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রাচ্য-অনুষদে এমন এক পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া হয়, যার ফলে ইসলাম এবং প্রাচ্য সম্বন্ধে নতুন স্বাধীন কোনো গবেষণা এবং পুরোনো গবেষণার খণ্ডন করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। ধরা যাক, পিএইচডি গবেষণারত কোনো গবেষক নিজের প্রবন্ধে গোল্ড জিহারের পক্ষ থেকে কুরআনের উপর উত্থাপিত কোনো আপত্তির খণ্ডন করতে চায়। তাহলে তার সেই প্রবন্ধ হয়তো প্রত্যাখ্যাত হবে কিংবা তার সাহস ও প্রাণশক্তির এই পরিমাণ অবদমন করা হবে যে, সে তার গবেষণা ও অধ্যয়ন মাঝপথেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিজন শিক্ষার্থী একপ্রকার বাধ্য হয়ে পড়ে অতীত প্রাচ্যবিদদের অন্ধ অনুকরণে কিংবা কমপক্ষে তাদের খণ্ডন ব্যতিরেকে কোনো বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আলাপ না তুলে গবেষণা কাজ শেষ করতে।

পঞ্চম পর্ব : ১৯৭৩-২০০০ খ্রিষ্টাব্দ

যেহেতু প্রাচ্যতাত্ত্বিক নেতৃবৃন্দের কর্মের পরিধি বিস্তৃততর হয়ে উঠছিল এবং তাদের বিশ্বজনীন প্রকল্পের সামনে স্বয়ং 'প্রাচ্যতত্ত্ব' শব্দটিও তার নিজস্ব অর্থে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছিল, সেজন্য ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক কনফারেন্সে প্রাচ্যতত্ত্ব পরিভাষাটি বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবং তার স্থলে Globalization বা বিশ্বায়ন পরিভাষার প্রচলন ঘটানো হয়। গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলাপ পরবর্তীতে স্বতন্ত্র এক পরিচ্ছেদে আসবে। তারপরও সাধারণ পরিমণ্ডলে প্রাচ্যতত্ত্ব পরিভাষাটি আজও ব্যবহৃত হয়। এবং সে ধরনের পশ্চিমা গবেষক আজও বর্তমান, যারা প্রাচ্যতত্ত্বের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই কাজ করতে পছন্দ করেন।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আমেরিকা যখন সারা পৃথিবীতে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কোমর বেঁধে নামে তখন পথের কাঁটা হিসেবে মুসলমানরাই তাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কেননা তৎকালে মুসলমানই এমন শক্তি, যাদের ঈমানি চেতনা ও জজবার মুখে সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচ্যবিদেরা আরও একবার ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে তাদের কর্মযজ্ঞ শুরু করে দেয়।

বর্তমান পর্ব : আমেরিকান এবং ইহুদি প্রাচ্যবাদ

বর্তমান সময়ের প্রাচ্যতত্ত্ব হলো আমেরিকান ও ইহুদি প্রাচ্যবাদ। এবং তাদেরই সমন্বয়ে এই চর্চা অব্যাহত রয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এর পর থেকে প্রাচ্যতত্ত্বের লাগাম পুরোপুরিভাবেই আমেরিকান ইহুদিদের হাতে। ১৯৭৩ সালে প্যারিস কনফারেন্সে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাচ্যতত্ত্ব আরও বিস্তার লাভ করে গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নের রূপ ধারণ করেছে। এবং ইসলামের উপর সর্বাত্মক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

মিশনারি কার্যক্রম থেকে নিয়ে ফ্রিম্যাসনারি পর্যন্ত বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টকারী প্রতিটি উদ্যোগই প্রাচ্যতত্ত্বের অংশ। বর্তমান সময়ের প্রাচ্যবিদেরা পোক্ত চিন্তার মুসলমানদের মৌলবাদী, নেক আমলে উৎসাহী মুমিনদের গোঁড়াপন্থি এবং কাফিরদের প্রসারিত বন্ধুত্বের (!) হাত প্রত্যাখ্যানকারী মুসলমানদের জঙ্গী-সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে বসেছে। তারা প্রত্যহ ইসলামের মূল আকৃতিকে বিকৃত করে চলেছে। তারা ইসলামের একটি নতুন রূপ দাঁড় করিয়েছে, যেই নয়া ইসলামের 'রুহ' ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের গোলামি কবুল বৈ আর কিচ্ছু নয়। তারা কেবল তাদেরকেই মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যারা আমেরিকার রীতিনীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রদান করে। বাকি মুসলমানদের তারা মানুষ পর্যন্ত মনে করতে রাজি নয়।

৪.১.৭: প্রাচ্যতত্ত্বের আন্দাজ ও শৈলী

প্রাচ্যবিদদের গবেষণা এবং কর্মযজ্ঞের বিশ্লেষণে যদি আমরা যাই তাহলে তাদের কর্মপদ্ধতির তিনটি ধরন আমাদের সামনে ধরা পড়ে। সেগুলোকে 'প্রাচ্যতত্ত্বের স্তর' হিসেবেও আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। কেননা সাধারণ মানুষ সাধারণত তাদের কাজে ওই তিন ধাপেই প্রভাবিত হয়। এবং ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে তাদের ফাঁদে ফেঁসে যায়। তাদের কার্যপদ্ধতির সেই ধাপ বা স্তরগুলো নিম্নরূপ :

গবেষণা এবং বিশ্লেষণ : এই পদ্ধতির অধীনে প্রাচ্য এবং ইসলামের সাথে সম্পর্কিত এমনসব বিষয়ের গবেষণা ও বিশ্লেষণ করা হয়, ইসলাম কিংবা ইউরোপের বাস্তবেই যার প্রয়োজন রয়েছে। এমনসব রচনার জন্য পরিশ্রম করা হয়, যার শাস্ত্রীয় ও জ্ঞানগত ফায়দা স্পষ্ট। এই ধাপকে বলা হয় গবেষণা ও বিশ্লেষণ। কারণ, এই ধাপে সরবরাহকৃত উপাদানে বাহ্যত গবেষণা-বিশ্লেষণ এবং জ্ঞানবিকাশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দৃষ্টিগোচর হয়। মুসলমান কিংবা প্রাচ্যের প্রতি কোনো প্রকারের হিংসা-দ্বেষ নজরে পড়ে না। যার ফলে পাঠক-হৃদয় সেইসব গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

এই প্রথম ধাপে প্রাচ্যবিদেরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এমনসব উপাদান হাজির করে, যাতে কোনো ব্যক্তি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ এবং যাচাই-বাছাইয়ের পরও কোনো প্রকারের বিদ্বেষমূলক কিছু পায় না। যেমন ধরা যাক, বাগদাদের প্রাচীন লাইব্রেরিগুলোর হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহ খুঁজে বের করা। শত বছরের অধিক আয়ুপ্রাপ্ত মুহাদ্দিসদের নিয়ে চরিতাভিধান প্রণয়ন করা। ইসলামপূর্বকালে আরব ও ইউরোপের মধ্যকার বাণিজ্যপথের অনুসন্ধান করা। কওমে সামুদের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত বইপত্র পড়ে ওঠার প্রয়াস করা... এই ধরনের অজস্র ইলমি ও অ্যাকাডেমিক কাজ প্রাচ্যবিদদের রয়েছে, যা আমরা করে উঠতে পারিনি বা যেগুলো করবার কোনো প্রয়োজন আমরা বোধ করিনি। এখন যখন কোনো প্রাচ্যবিদের কলম থেকে সে-সব বিষয়ে গবেষণা ও তথ্যনির্ভর রচনা আমাদের সামনে আসে তখন আবশ্যিকভাবে তাদের গবেষণার প্রভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে।

এই ধরনের বহুগ্রন্থ কেবল এজন্য লেখা হয়, যাতে করে মুসলমানদের সম্পর্কে ইউরোসেন্ট্রিক গবেষক ও রাজনীতিবিদেরা একটা পোক্ত গাইডলাইন পেয়ে যায়। কেননা সে-সব বইপত্র রচিত হতো ইসলামের স্বর্ণকালে মুসলমানদের বিজয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বিষয়ে। প্রাচ্যবিদেরা তাতে বর্ণনা করেন—মুসলমানদের বিস্ময়কর সব বিজয়ের মূল কারণ কী ছিল; মুসলিমবাহিনীর পরিবহণ-যাতায়াত এবং রসদ বহনের জন্য কী কী পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো; মুসলিমবাহিনীর অস্ত্র কেমন ছিল; তারিক বিন জিয়াদ এবং মুসা বিন নুসাইর যখন আন্দালুসের বিভিন্ন শহরে হামলা করেন তখন তারা কোন রাস্তা অবলম্বন করেছিলেন; সমগ্র বিশ্বকে কর্তৃত্বাধীন করবার পেছনে মুসলমানদের সফলতার অভ্যন্তরীণ এবং চারিত্রিক উপকরণ কী ছিল; মুসলমানদের কাছে এমন কোন আচার ছিল, যা তাদের সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল; কোন বৈশিষ্ট্য তারা ধারণ করত, যার ভিত্তিতে একটি জাতি বিশ্বজয়ী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল—তা কি তাদের স্বেচ্ছা-অর্জিত কোনো ক্ষমতা ছিল, না তা ছিল তাদের ধর্মীয় জজবা! তা কি কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল, না তা ছিল তাদের জাতিগত গোঁড়ামি বা সাম্প্রদায়িকতা!

এই ধরনের গবেষণার মাধ্যমে অধিকাংশ সময়ই প্রাচ্যবিদেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতো যে, মুসলমানদের সফলতার পেছনে মূলশক্তি তাদের ধর্মীয় সততা, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য এবং তাদের পোক্ত ঈমান। কিন্তু এই সত্য অনুধাবনে সক্ষম অধিকাংশ প্রাচ্যবিদও ঈমান গ্রহণ করত না। কেননা সাধারণত তারা হতো গোঁড়াপন্থি। তাদের মধ্যকার পরিশ্রমী ও কঠোর অধ্যবসায়ী গবেষকেরও গবেষণার উদ্দেশ্য থাকত কেবলই গবেষণা। সত্য খুঁজে পেয়ে পরকালীন সাফল্য লাভ এবং সত্যধর্মের স্পর্শে আত্মিক প্রশান্তি অর্জন তাদের গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল না।

মিশ্রণ-শৈলী : এই পদ্ধতিতে কৃত গবেষণা ও রচনার পরিমাণ সবচাইতে বেশি। যার মধ্যে মিশ্রণ এবং অদলবদল ও সংমিশ্রণের আধিক্য লক্ষ করা যায়। গবেষণা হয় বটে; কিন্তু সেইসাথে পরোক্ষে মুসলমানের আকিদা-বিশ্বাস এবং চিন্তাচেতনার উপর সূক্ষ্মভাবে হামলা চালানো হয়। এবং ধীরে ধীরে কৌশলে ইসলামি জ্ঞানভান্ডার এবং ইসলামি ব্যক্তিত্বের প্রতি সাধারণ মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা ও সুধারণা দুর্বল করে তোলার চেষ্টা করা হয়। বিগত শতাব্দী এবং বর্তমান শতাব্দীর অধিকাংশ প্রাচ্যবিদের কার্যপদ্ধতি এটাই।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী লেখেন :

অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ বিষ ঢালার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের দিকে লক্ষ রাখে। এবং খেয়াল রাখে যেন সেই পরিমাণটা ছাড়িয়ে না যায় এবং পাঠকের মনে তাদের প্রতি ঘৃণা না জন্মে। এদের রচনাই অধিক ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেয় এবং একজন সাধারণ মধ্যম পর্যায়ের ব্যক্তির জন্য তাদের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।[৪৯]

এই শৈলীর অধীনে মুসলিম শাসকদের সাহসিকতা, বীরত্ব এবং কৃতিত্বের কথা বলতে বলতে অকস্মাৎ তাদের ব্যক্তি-জীবনের আলোচনা আরম্ভ করা হয় এবং তাদের চিত্রিত করা হয় ব্যক্তি-জীবনে খারাপ ও মন্দ স্বভাবের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনকারী হিসেবে। মাঝেমধ্যে মুজাহিদদের ভূমিকা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করে ঠিকই; কিন্তু পরোক্ষণেই বিজয়ের পেছনের কারণ হিসেবে কোনো ভ্রান্ত ব্যাখ্যা জুড়ে দেয়। যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সাহায্যকে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আঙ্গিকে। যেমন : বর্ণনায় এসেছে, সাহাবিগণ একবার এক যুদ্ধে গেলেন এবং আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুললেন। ফলে শহরের প্রাচীর ধসে পড়ে। প্রাচ্যবিদেরা এই ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে যে, তাকবিরধ্বনি ও শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি বা ভলিউমের উচ্চতার কারণে প্রাচীর ধসে পড়েছে। সুপারসনিক বিমান অতিক্রমের কারণে যেভাবে অনেক সময় প্রাচীর ধসে পড়ে। আর এভাবেই 'কারামতের প্রতি ঈমানে'র মতন আকিদা-বিশ্বাসের এক স্তম্ভকে বস্তুগত ব্যাখ্যার আড়ালে লুকিয়ে ফেলা হয়।

অধিকাংশ সময়ই ইসলামের সাফল্যের এমন বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে, যার ফলে পাঠকের মনে এই সংশয় তৈরি হয় যে, ইসলামের প্রাথমিক কালের সফলতার পেছনে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার সন্তোষের কোনো অংশ ছিল না। বরং তাদের সফলতার পেছনের প্রধান কারণ ছিল তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং তাদের অনন্য সাহসিকতা।

এভাবেই ইসলামি শাসকদের শান-শওকত বয়ান করতে গিয়ে তারা নির্দ্বিধায় বলে বসে, ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কেবল তরবারির জোরে। লোকদের

[৪৯] মাগরিবি মুসতাশরিকিন কে ফিকির ওয়া ফালসাফা কা আসার, ১৬

জোরজবরদস্তি ইসলামগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে। অথচ বাস্তবতা হলো, ইসলামে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করানোর মতন কোনো ঘটনার কল্পনাও সম্ভব নয়। কিন্তু যে-সকল লোক প্রথম ধাপের (গবেষণা ও বিশ্লেষণ) বইপত্র পড়ে প্রাচ্যবিদদের গবেষণায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে, তারা নির্দ্বিধায় তাদের এই স্লো পয়জন আকণ্ঠ পান করে চলে এবং ইসলামি বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বিপরীতে বিক্ষিপ্ত ধারণার শিকার হয়ে পড়ে। সাধারণত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সালাফ ও পূর্বসূরি এবং পোক্ত চিন্তার অধিকারী আলেমদের মতামত সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে।

প্রকাশ্য শত্রুতা-শৈলী : এই স্তরের জন্য তৈরীকৃত উপাদান হয়ে থাকে ইসলামের বিপক্ষে প্রাচ্যবিদদের প্রকাশ্য শত্রুতার প্রতিবিম্ব। এই স্তরে এসে প্রাচ্যবিদেরা ইসলামি বিশ্বাস এবং শরিয়তে মুহাম্মদীর উপর প্রত্যক্ষ হামলা করে বসে। বরং কোনো কোনো সময় তারা রহমতের নবী, সাহাবা এবং ইসলামের নিদর্শনাবলি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ-উপহাসে পর্যন্ত মেতে ওঠে।

এই প্রকারের উপাদান মূলত সেই শ্রেণির মুসলমানের জন্য তৈরি করা হয়ে থাকে, যাদের ঈমান ইতোমধ্যে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। অনুভূতিসম্পন্ন মুসলমান নিশ্চিতভাবেই এই বিষের তীব্রতা ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু কম বুদ্ধির যেসব লোক ইতোমধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের বইপত্র পড়ে প্রাচ্যবিদদের অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তারা এই স্তরের বিকৃতিগুলোও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে নেয়। ফল এই দাঁড়ায় যে, এই স্তরের বিষয়গুলো আস্থার সাথে পাঠ করে পাঠকগোষ্ঠী অনেক সময় নিজেরাই ইসলামের উপহাসে মেতে ওঠে এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। কমপক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে এতটুকু ক্ষতি তো তাদের হয়ই যে, ইসলাম জীবনের সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ইসলামকে সাথে রাখতে হবে—এই অনুভূতি তাদের থেকে দূর হয়ে যায়। তারা ইসলামকেও অন্যান্য ধর্মের মতোই একটি ধর্ম মনে করতে আরম্ভ করে।

এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, যিনি যৌবনে প্রাচ্যবিদদের কর্মযজ্ঞে অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। বিভ্রান্তিমূলক নানা গ্রন্থ পাঠের পর সিরাতুন-নবী সম্বন্ধে লিখিত প্রাচ্যবিদের এমন একটি বই তার হাতে আসে, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত ভীতিকর এক চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল। যেহেতু তখনও তিনি প্রাচ্যবিদদের অন্ধের মতো বিশ্বাস ও অনুকরণ করে যাচ্ছিলেন তাই সেই মুহূর্তে নবীজির অমন চিত্রায়ণ দেখে লেখক ও প্রকাশকের উপর বিতৃষ্ণ হবার বিপরীতে স্বয়ং নবীজির উপরই বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েন (নাউযুবিল্লাহ)। এবং বিতৃষ্ণ হয়ে ইসলাম ছেড়ে দেন। বহু বছর পর আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিদের সংস্পর্শে তার আত্মার ব্যাধির নিরাময় হলে নতুনভাবে ইসলামে ফিরে আসেন।

প্রাচ্যবিদেরা তাদের এই তৃতীয় ধাপের উপাদান দ্বারা কেবল যে নিজেদের অন্ধ অনুসারীদের বাস্তবিক ইসলাম থেকে পরিপূর্ণভাবে দিগ্‌ভ্রান্ত করে ছাড়ে তাই নয়; বরং এই বিভ্রাটের মাধ্যমে তারা হকপন্থিদের মোকাবেলা ও তাদের সাথে বিতর্ক করবার উপাদানেরও যোগান দিয়ে যায়। সাধারণত আপনারা যখন কোনো নাস্তিক কিংবা ধর্মবিদ্বেষীকে ইসলামের বিরুদ্ধে আলেমদের সাথে বিতর্ক করতে ও প্রমাণাদি হাজির করতে দেখবেন, লক্ষ করবেন যে, তারা মূলত এই শ্রেণির প্রাচ্যবিদদের পান করানো বিষই উগড়ে দিচ্ছে।

এই তৃতীয় ধাপের উপাদান উপকরণের উদ্দিষ্ট সেইসব অমুসলিমও, যাদের ব্যাপারে ঝুঁকি (!) থাকে ইসলামের কাছাকাছি হয়ে পড়বার। এই প্রকারের উপাদানের মাধ্যমে প্রাচ্যবিদেরা তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে বিতৃষ্ণ করে হক ও সত্য পর্যন্ত তাদের উপনীত হবার সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়।

৪.১.৮: প্রাচ্যতত্ত্বের প্রেরণা

যখন আমরা পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে নিয়ে মরক্কোর উপকূল এবং আটলান্টিক মহাসাগরের তীর পর্যন্ত অজস্র প্রাচ্যবিদকে ইসলামি বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত অগণিত ইলমি ও অ্যাকাডেমিক বিষয়ে মাথা ঘামাতে এবং অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী হয়ে জীবন উৎসর্গ করতে দেখি তখন বিপুল বিস্ময়ের সাথে একটি প্রশ্ন আমাদের মনে দেখা দেয়; তা হলো, কোন জজবা কিংবা উৎসাহ ও প্রেরণা ইসলামি বিশ্ব এবং প্রাচ্যকে তাদের কাছে এমন আগ্রহ ও গুরুত্বের বিষয় করে তুলেছে? কেন তারা প্রাচ্যের প্রতি এত আগ্রহী?

ভালো করে চিন্তা করলে যা বুঝতে পারি—প্রাচ্যবিদদের আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং প্রেরণার পেছনে পাঁচটি উদ্দীপক বিষয় রয়েছে:

১. ক্রুসেডীয় প্ররোচনা।
২. রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশিক প্ররোচনা।
৩. আত্মরক্ষামূলক প্ররোচনা।
৪. ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক প্ররোচনা।
৫. জ্ঞানচর্চার প্ররোচনা।

ক্রুসেডীয় প্ররোচনা

প্রাচ্যবিদদের সবচাইতে প্রভাবক উদ্দীপক বলা যায় তাদের ক্রুসেডীয় প্ররোচনাকে। এটা তাদের এমনই এক উদ্যম, যা তাদের প্ররোচিত করে ক্রুসেডযুদ্ধের জন্য এশিয়া পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল। যখন অস্ত্রের লড়াইয়ে তাদের অনবরত ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে হচ্ছিল তখন তারা সেই জজবা-প্রেরণা এবং সেই একই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে মুসলমানদের বিপক্ষে জ্ঞানের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। তারা নিজেদের ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং জোশ ও প্রেরণার ভিত্তিতে প্রাচ্যতত্ত্বকে ইসলামের বিপরীতে এক

হাতিয়ারের মতন ব্যবহার করে আসছে এবং খ্রিষ্টবাদের বিজয়ের মানসে নিজেদের অধ্যবসায় অব্যাহত রেখেছে।

ক্রুসেডীয় প্রেরণার অধীন কর্মরত প্রাচ্যবিদদের গবেষণার লক্ষ্য হয়ে থাকে খ্রিষ্টবাদের বিজয়। এই শ্রেণির প্রাচ্যবিদেরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে। কেউ কুরআন মাজিদ আল্লাহ তায়ালার কালাম নয়—সেই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যায়। কেউ নিজেদের শ্রম ব্যয় করে হাদিসের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির কাজে। আর কেউ লেগে আছে মুসলমানদের ইতিহাস কলঙ্কিত করবার প্রয়াসে।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহিমাহুল্লাহ লেখেন :

"এদের (প্রাচ্যবিদদের) প্রধান উদ্দেশ্য খ্রিষ্টবাদের প্রচার ও প্রসার এবং ইসলামের এমন এক আকৃতি বিশ্বের সামনে হাজির করা, যাতে করে খ্রিষ্টবাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাধান্য আপনা-আপনিই প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। এবং নতুন শিক্ষাধারায় বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মনে খ্রিষ্টবাদের জন্য একটা সেন্টিমেন্ট বা কোমল আগ্রহ তৈরি হয়। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচ্যবাদ এবং খ্রিষ্টধর্মের প্রচার একসাথেই চলে।"[৫০]

আমরা যদি ক্রুসেডীয় প্রেরণায় উদ্দীপ্ত প্রাচ্যবিদদের কাজের বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যে, তারা নিম্নযুক্ত উদ্দেশ্যগুলোয় অধিক জোর ও তাগিদ দিয়ে থাকে :

বর্তমান ইসলাম ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম থেকে উদ্ভূত—এমন দাবি তোলা : প্রাচ্যবিদেরা এই লক্ষ্যে কাজ করবার উদ্দেশ্যে কখনো কখনো বন্ধুত্বের রূপ ধরেও হামলা চালিয়েছে। তারা বলে যে, ইসলাম, ইহুদি ও খ্রিষ্টীয় ধর্ম—মূলত সব একই। এই দাবি প্রমাণ করবার জন্য তারা কুরআন ও হাদিসের ভাষ্যের মনমতো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরু করে। তাদের তরফে এমনও বলা হতে থাকে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে কিতাবদের থেকে ইলম শিখেছেন আর ইসলামধর্ম মূলত পূর্ববর্তী ধর্মসমূহেরই পুনরাবৃত্তি। তারা পৃথিবীকে এই ধোঁকা দেয় যে, তারা ইহুদি-খ্রিষ্টান ও ইসলামধর্মের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে আনছে। এবং মতবিরোধের ক্ষেত্র সংকুচিত করবার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা মূলত নিজেদের মিথ্যা প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে মুসলমানদের নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে সন্দিহান করে তুলছে এবং সকলে এক উম্মত—এই প্রচারণায় তাদের মধ্যে হীনম্মন্যতা তৈরি করে চলছে। হীনম্মন্যবোধ তৈরি করবার জন্য মুসলমানদের মধ্যে তারা এই অনুভূতি ফুঁকে দেয় যে, তাদের ধর্ম কোনো বৈশ্বিক ধর্ম বা সর্বশেষ ধর্ম নয়; বরং এটা পূর্বতন ধর্মেরই এক নয়া সংস্করণ মাত্র (নাউযুবিল্লাহ)। তারা দাবি করে, আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত পয়গাম খ্রিষ্টানদের কাছে আর বাইবেলের শিক্ষাই ইসলামের মূলভিত্তি। এভাবে ইসলামের অভিমুখ অন্য ধর্মের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে পরোক্ষে ইসলামের হাকিকতই বিনষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে।

---

[৫০] মাগরিবি মুসতাশরিকিন কে ফিকির ওয়া ফালসাফা কা আসার, ২

তাদের সব আলোচনা-পর্যালোচনার শেষকথা এটাই হয়ে থাকে যে, ইসলাম মূলত কোনো ধর্মই নয়। পরিণামে তাদের বইপুস্তক ও লেখাজোখার উপর নির্ভরকারী ধর্ম-গবেষণার নামে খ্রিষ্টবাদ এবং ইহুদিবাদের জালে চরমভাবে ফেঁসে যায়। কোনো কোনো সময় আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রিষ্টধর্মই গ্রহণ করে নেয়। কিংবা ইসলাম থেকে বের হয়ে নাস্তিক হয়ে পড়ে। কমপক্ষে এতটুকু ক্ষতি তো হয়ই, ইসলামের উপর তাদের আস্থা ও বিশ্বাস কমে আসে।

রিসালাত ও নবুওয়াত সম্বন্ধে সংশয় তৈরি করা : প্রাচ্যবিদেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ও নবুওয়াত সম্বন্ধে ঠিক সেভাবে সন্দেহ-সংশয় তৈরি করে আসছে, নবীজির নবুওয়াতকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করবার জন্য তৎকালে মক্কার মুশরিক এবং মদিনার ইহুদিরা যেভাবে করে থাকত। প্রাচ্যবিদদের লিখিত অধিকাংশ সিরাতগ্রন্থে সেই বিষই উগড়ে দেওয়া হয়েছে। সাবলীল ভাষা, আধুনিক বিন্যাস এবং চিত্তাকর্ষক শৈলীতে লেখার পরও এইসব সিরাতগ্রন্থ কেবল এভাবে নবীজিকে চিত্রিত করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সফল চিন্তানায়ক, বিচক্ষণ নেতা এবং একজন সৎ মানুষ তো ছিলেন; কিন্তু একজন সত্য রাসুল ছিলেন কি না—তা নিশ্চিত নয়।

এ ধরনের ঈমানবিধ্বংসী কথাবার্তা তারা এমন চিত্তাকর্ষক শৈলী ও জাদুকরী ভাষায় উপস্থাপন করে যে, ভালো ভালো পোক্ত চিন্তার মানুষও তাতে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব-চরিত্র, তার বোধ ও প্রজ্ঞা, নেতৃত্বদানের যোগ্যতা এবং স্বজাতির সেবার বৈশিষ্ট্যকে সুন্দর ও মনোরমভাবে উপস্থাপন করবার পাশাপাশি এটাও বলে যে, মুসলমানদের রাসুলের নিজের রিসালাতের উপর তার নিজেরই পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না। যে কারণে ইসলামের নবীর নবুওয়াত সংশয়পূর্ণ হয়ে পড়ে (নাউযুবিল্লাহ)। আর এটাই অধিক চিন্তার। এই বিষয়ে তারা এমন সব যুক্তি-তর্ক হাজির করে, একজন সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি যেগুলোকে অনেক মজবুত বলে ধরে নেয়।

এই ধরনের আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের পক্ষে সেই সকল উন্মুক্ত দলিল, যা ইতিহাস এবং সিরাতগ্রন্থগুলোর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে, অত্যন্ত শৈল্পিকভাবে এড়িয়ে যায়। তাদের বর্ণনাভঙ্গি এমন মোহন এবং তাদের কৌশল এত সূক্ষ্ম হয়ে থাকে যে, সাধারণ পাঠকদের সামান্যও উপলব্ধ হয় না, প্রাচ্যবিদেরা সিরাতের শিরোনামে কীভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

কুরআন কারিম সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় তৈরি করা : শতবর্ষ ধরে প্রাচ্যবিদেরা এই লক্ষ্য নিয়েও কাজ করে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে সাধারণত তারা যে বিষয়টি প্রমাণ করবার জন্য উঠেপড়ে লাগে—কুরআন কারিম নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

রচনা; কোনো আসমানি গ্রন্থ নয়। অধিকাংশ সময়ই তারা কুরআন কারিমের উপর সমালোচনামূলক; বরং বলা ভালো হিংসাত্মক আলোচনার অবতারণা করে। এবং বিভিন্ন ধরনের খুঁটিনাটি বিষয় ধরে তার সত্যতা, ফাসাহাত-বালাগাতকে সংশয়পূর্ণ করবার অপপ্রয়াস চালিয়ে থাকে। যেমন সুরা ইউসুফের (৪৯নং) আয়াত-

ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ

তারপর আসবে এমন একটি বছর যখন মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং তখন তারা আঙুরের রস নিংড়াবে।

এখানে يُغَاثُ শব্দটির উপর অতীতের এক প্রাচ্যবিদ আপত্তি তুলে বলেছিল যে, দুনিয়ার ব্যাপারে কুরআন-রচয়িতা মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অজ্ঞতার এটি একটি নিদর্শন যে, তিনি মিশরের দুর্ভিক্ষের জন্য কারণ হিসেবে বৃষ্টির উল্লেখ করে দিয়েছেন। কিন্তু তার জানা ছিল না যে, মিশরের সকল প্রকারের চাষাবাদ নির্ভর করত নীলদরিয়ার পানির উপর। সেখানকার খেতখামারের শস্য-শ্যামলতার সাথে বৃষ্টির কোনো প্রকারের সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং বৃষ্টি না হওয়ার কারণে দুর্ভিক্ষ; বৃষ্টি হলে দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যাবে—এ কথা ভুল।

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীর মাধ্যমে প্রাচ্যবিদদের এই আপত্তি সম্বন্ধে অবগত হলে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, মিশরের চাষাবাদ বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল না হলেও নীলদরিয়ার পানির যে উৎস তাতে নিশ্চয় বৃষ্টির প্রভাব থাকবে। তা ছাড়া يغاث মুজারে' মাজহুলের শব্দ, যা غوث (সাহায্য) শব্দ থেকেও উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে; যার অর্থ সাহায্য করা। প্রাচ্যবিদদের এই ধারণা করে নেওয়া ঠিক নয় যে, শব্দটা غيث (মেঘ) শব্দ থেকেই উদ্ভূত।

হাদিসের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা : প্রাচ্যবিদদের বড় নিশানা হলো হাদিসে নববী। এই ব্যাপারে তাদের ঝুলিতে কিছু নির্দিষ্ট আপত্তি রয়েছে। হাদিসে নববী সম্বন্ধে সেই নির্দিষ্ট আপত্তিগুলো নিয়ে 'হাদিসগবেষক' প্রতিজন প্রাচ্যবিদ এমন হৈ-হুল্লোড় ও হাঙ্গামা করে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এই সকল আপত্তি প্রথমবার তার মাথাতেই এসেছে। এবং সেগুলোর কোনো প্রকার জবাব দেওয়া অসম্ভব। অথচ বাস্তবতা হলো আলেমগণ তাদের এইসব অমূলক আপত্তির জবাবে ভূরিভূরি গ্রন্থ রচনা করে রেখেছেন।

উদাহরণত তাদের একটি প্রসিদ্ধ আপত্তি হলো, হাদিসের সকল গ্রন্থ হিজরি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত। তাহলে সেগুলোর উপর ভরসা কীভাবে করা যেতে পারে! অসংখ্যবার তাদের এই আপত্তির দলিলসমৃদ্ধ জবাব দেওয়া হয়েছে। তাদের বহুবার বোঝানো হয়েছে যে, হাদিসের সংকলন, সংরক্ষণ এবং লিখনের কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়েই শুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রাচ্যবিদেরা এই জবাব জেনেও ফের বছরকয়েক পর লিখিত কোনো বইয়ে এই আপত্তিরই পুনরাবৃত্তি করে বসে।

বর্তমান সময়ে হাদিস অস্বীকারকারীদের কাছে হাদিসকে ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণের যত নতুন কিংবা পুরোনো আপত্তি আছে, তার সবই প্রাচ্যবিদদের রচনাবলি থেকে গৃহীত। হাদিস অস্বীকারকারীরা সেগুলোকে নিজেদের আবিষ্কার দাবি করে অজ্ঞদের বাহবা ও প্রশংসা কুড়োচ্ছে। সেটা অন্য আলাপ।

জাল বর্ণনা এবং দুর্বল হাদিস দ্বারা দলিল উপস্থাপন এবং সেগুলোর প্রসার ঘটানো : প্রাচ্যবিদেরা একদিকে হাদিসের নির্ভরযোগ্য সব উৎসকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা থেকে নিবৃত হয় না, অন্যদিকে তারা দুর্বল বরং জাল বর্ণনাগুলোকে নিজেদের গবেষণার দলিল ও প্রমাণ হিসেবে নির্দ্বিধায় হাজির করছে। এটা প্রাচ্যবিদদের একটা নির্লজ্জতা, যা তাদের গবেষণার অসারতা এবং তাদের দ্বিচারিতার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ফিকহে ইসলামির উপর হামলা : এভাবে তারা ফিকহে ইসলামির উপরও সন্দেহ-সংশয় তৈরি করেছে যে, এটা মূলত রোমান ল'। রোমান আইন। পরবর্তীকালে মুসলমানেরা সেখান থেকে বইপত্র আনিয়ে সেই রোমান ল'কে ইসলামি ফিকহে রূপান্তরিত করেছে।

ত্রিত্ববাদের প্রসার ঘটানো : প্রাচ্যবিদদের অধিকাংশই খ্রিষ্টান। আর দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী বানানো—এটাই হলো প্রাচ্যবিদদের সর্বশেষ লক্ষ্য। দেখা গেছে, অধিকাংশ প্রাচ্যবিদই কোনো-না-কোনো মিশনারি সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত এবং নিজেদের লেখাজোখার বিষয়বস্তুও মিশনারিদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তারা প্রস্তুত করে থাকে।

রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশিক প্ররোচনা

প্রাচ্য নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে অধিকাংশ প্রাচ্যবিদেরই প্ররোচক হলো রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশিক। তাদের অধিক সংখ্যকই পাশ্চাত্য রাজনীতিজ্ঞ এবং ঔপনিবেশিক শক্তির ঘৃণ্য উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজ করে থাকে। এবং তাদের দেওয়া লক্ষ্য পূর্ণ করবার জন্যই ব্যতিব্যস্ত থাকে। দেখা যায়—তাদের মধ্যকার অনেকেই আক্ষরিক অর্থেই ঔপনিবেশিক শাসনের কর্মকর্তা এবং সাধারণত তারা পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মরত। ঔপনিবেশিক শক্তির অধীন যারা কাজ করে, তাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টার একটা বড় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে—ইসলামি বিশ্বের উপর পশ্চিমা শক্তির কর্তৃত্ব কোনোভাবেই দুর্বল হতে না দেওয়া। তাদের সকল কর্মকাণ্ডের প্রধান লক্ষ্যই হয়ে থাকে পশ্চিমাদের স্বার্থরক্ষা; যেখানেই যাই ঘটে যাক পশ্চিম যেন তাদের কর্তৃত্ব ধরে রাখতে পারে। এই উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে প্রাচ্যবিদেরা সাধারণত নিম্নযুক্ত কাজগুলো করে থাকে :

ইসলামি সমাজব্যবস্থার অধ্যয়ন : প্রাচ্যবিদের একটি দল ইসলামি সমাজের সভ্যতা-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও কৃষ্টি-কালচারের নিয়মতান্ত্রিক জ্ঞান অর্জন করে, যাতে তাদের চিন্তা-দর্শন, জীবনাচার, রীতিনীতি এবং শক্তি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আঞ্চলিক পার্থক্যভেদে নিজেদের শাসন-ব্যবস্থার নির্দেশনা দিয়ে যেতে পারে।

প্রাচ্যবিদদের সরবরাহকৃত তথ্যের আলোকে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী মুসলমানদেরকে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে সরিয়ে ইসলামি দুনিয়ায় পশ্চিমা কালচার প্রতিষ্ঠা করবার পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করে ওঠে।

ইসলামি দুনিয়ার ভাষা শেখা : এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রাচ্যবিদেরা ইসলামি দুনিয়ায় প্রচলিত ভাষা (আরবি, উরদু, তুর্কি, বাংলা, ফারসি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, পশতু ইত্যাদি) শিখে থাকে। এইসব ভাষায় রচিত সাহিত্যের গভীর অধ্যয়ন করে। এবং তারপর সেগুলোকে নিজেদের হাতিয়ার বানিয়ে মুসলিমবিশ্বে কাজ করে। কূটনীতি, দূতালি, বাণিজ্যিক সম্পর্ক, ব্যক্তিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক প্রচার, মিশনারি লক্ষ্য, মিডিয়ার প্রচারণা এবং গুপ্তচরবৃত্তির মতন উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় ভাষিক দক্ষতাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ থমাস অ্যাডওয়ার্ড লরেন্স জাজিরাতুল আরবে আরবজাতীয়তাবাদের স্ফুলিঙ্গ উসকে দিয়ে সেখানে উসমানি খেলাফতের বিরুদ্ধ পরিবেশ তৈরি করতে সমর্থ হয়। সে তার লক্ষ্যে খুব দ্রুত সফলতার দেখা পেয়েছিল; কারণ, আরবি ভাষায় তার দক্ষতা ছিল কল্পনাতীত।

প্রাচ্যবিদেরা ইসলামি বিশ্বের ভাষার সাথে নিজেদের ভাষার সংমিশ্রণের প্রয়াসও করে থাকে। এবং অনেক সময় এক অঞ্চলের মানুষের মাঝে আরেক অঞ্চলের ভাষার প্রতি ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজও তারা করে।

আরবি ভাষার উপর হামলা : আরবি ভাষা যেহেতু কুরআন ও হাদিসের ভাষা, সে কারণে এই ভাষা মুসলমানদের ঈমান, আমল এবং ধর্মীয় জীবনের হেফাজতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আরবি ভাষা শেখা ছাড়া ইসলামের কোনো উৎস পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক এবং ঔপনিবেশিক আন্দোলনে নিরত প্রাচ্যবিদেরা মুসলমানদের তাদের উৎসমূল থেকে দূরে রাখবার উদ্দেশ্যে আরবি ভাষার সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে চায়। তাদের চেষ্টা থাকে মুসলমান যেন কুরআন, হাদিস, ফিকহ, সিরাত এবং ইসলামি ইতিহাস ও সাহিত্য আরবি ভাষায় পড়বার বদলে ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ এবং ইটালিয়ান ভাষায় পড়ে ওঠে। যখন কোনো ব্যক্তি আলেমদের গ্রন্থের বদলে প্রাচ্যবিদদের রচিত তাফসির, সিরাত ও ইতিহাস পাঠ করবে তখন আবশ্যিকভাবে সে যেটা শিখবে তা হলো প্রাচ্যবিদদের ইসলাম। প্রকৃত ইসলাম সম্বন্ধে সে অনবহিতই রয়ে যাবে।

এ ছাড়াও প্রাচ্যবিদেরা আরবি ভাষার পরিধি সীমিত করে আনবার অপচেষ্টাতেও লেগে আছে। এবং নানাবিধ পন্থায় তারা আরবি ভাষার উপর হামলা অব্যাহত রেখেছে। তারা জানে যে, আরবি ভাষা ইরাক থেকে নিয়ে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত জনপদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ভাষা। এ ভাষা মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক এবং সমগ্র ইসলামি দুনিয়ার মধ্যকার ধর্মীয় বন্ধন সুদৃঢ় রাখবার একটি প্রভাবক ও কার্যকর সূত্রও বটে। এইজন্যই প্রাচ্যবিদেরা নানা প্রকারের আঘাত অব্যাহত রাখে

আরবি ভাষাকে প্রাচীন ও সেকেলে প্রমাণ করতে, বর্তমান দুনিয়ার আধুনিক আবিষ্কার ও পরিভাষার বিপরীতে তাকে সংকীর্ণ দেখাতে, তার সাবলীলতার উপর আপত্তি তুলতে এবং তার মধ্যে সীমাতিরিক্ত পশ্চিমা শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তার মূল রূপ বিকৃত করে দিতে উঠেপড়ে লেগেছে।

আরবি ভাষার প্রাণমূল বিক্ষত করবার জন্য জুরজি যায়দানের মতন প্রাচ্যবিদেরা এমন লোকেদের তৈরি করেছে, যারা আরবি ভাষা এবং সাহিত্যে দক্ষ হবার পরও সেই ভাষার ধর্মীয় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। যেমন ডক্টর তহা হুসাইন এবং তার সমচিন্তার লোকেদের কথা বলা যেতে পারে, যারা আরবি ভাষার ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য নিঃশেষ করে দেওয়ার সমস্ত চেষ্টা চালিয়ে গেছে, যাতে আরবি ভাষা তার প্রাচীন ধর্মীয় ভাবধারা এবং তার দীনি অবস্থান থেকে বিমুক্ত হয়ে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতোই সাধারণ একটি ভাষায় পরিণত হয়ে যায়।

প্রাচ্যবিদদের কতক সহায়ক এই কথার প্রচার করে থাকে যে, ফাসিহ ও বিশুদ্ধ আরবিকে কেবল কুরআন ও হাদিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হোক। আর জীবনের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সাধারণ আরবির প্রচল ঘটানো হোক।

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ জামালুদ্দীন আফগানীর বক্তব্য হলো, উসমানি খেলাফতের পতনের একটি কারণ এও ছিল যে, উসমানি খেলাফতের প্রশাসনিক ভাষা আরবি ছিল না। এ কারণে 'আরব' ও 'তুর্কি' এই পৃথক জাতির শিরোনামে স্লোগান তোলা সম্ভব হয় এবং বিশাল উসমানি খেলাফতের ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ হয়।[৫১]

বর্তমান সময়ে আরববিশ্বে এমন চিন্তাবিদের সংখ্যা অনেক, যারা জোর গলায় বলে বেড়ায় যে, কুরআন-হাদিসের 'ফাসিহ ও বিশুদ্ধ আরবি' বর্তমানের চাহিদাপূরণে অসমর্থ। জ্ঞানচর্চা, পত্রপত্রিকা এবং সাহিত্যে তার পরিবর্তে স্থানীয় ভাষা এবং আঞ্চলিক কথ্যরীতির প্রচলন করা হোক। এবং আমরা দেখছি—সেই সাথে আরবি হরফের স্থানে ল্যাটিন হরফ লেখার প্রচলন শুরু করবার কথাও প্রচারিত হচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এর মাধ্যমে আরবের প্রতিটি অঞ্চল বরং প্রতিটি শহর ভাষিক বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়বে। বিচ্ছিন্নতা এবং বিভেদ পৌঁছে যাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে। তারা বঞ্চিত হয়ে পড়বে নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান-সমুদ্রের অবগাহন থেকেও।

আরববিশ্বে আরবির বদলে সেখানকার প্রাচীন পরিত্যক্ত ভাষার প্রচলন ঘটানো : আরববিশ্বের নিজস্ব পরিচয় ধ্বংস করে দিতে এবং সেখানে জাহিলি সময়কার অজ্ঞতা ও ইসলামপূর্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রসারের লক্ষ্যে আরব-দুনিয়ার সেই প্রাচীন ভাষাগুলো ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, যা বহু শতাব্দীকাল ধরে পরিত্যক্ত হয়ে আছে। এবং বর্তমান সময়ে যার কোনো তাৎপর্য কিংবা গুরুত্ব অবশিষ্ট নেই। যেমন বলা যেতে পারে—মরক্কো এবং আলজেরিয়ায় বারবারি, মিশরে ফেরাউনি এবং ইরাকে

[৫১] আল-আ'মালুল কামিলা লি জামালুদ্দীন আল-আফগানী, ড. মুহাম্মদ ইমারাহ, পৃষ্ঠা : ২১৯, কায়রো

অ্যাসিরিয়ান ভাষা এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচলন ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। যদি তাদের এই উদ্যোগ সফল হয় তাহলে আশঙ্কা আছে যে, এক-দেড় শতাব্দী পর সে-সব অঞ্চলে আরবি ভাষাভাষি লোক খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দেখা দেবে। যেমন আজ থেকে দেড় শতাব্দীকাল পূর্বে হিন্দুস্থানে ফারসি ভাষার প্রচলন ছিল। কিন্তু ইংরেজরা হিন্দুস্থানকে মোগল শাসনামলের প্রভাবমুক্ত করবার উদ্দেশ্যে ফারসির ব্যবহার এমনভাবে বন্ধ করেছে যে, বর্তমানে এ অঞ্চলে দু চারজন ফারসিভাষী খুঁজে বের করাও অত্যন্ত কঠিন।

অনারব দেশগুলোতে স্থানীয় অমুসলিমদের ভাষা এবং বাজারি উচ্চারণের প্রতি উৎসাহ প্রদান : প্রাচ্যবিদেরা আরব দেশ ছাড়াও অন্যান্য মুসলিম দেশকেও তাদের ষড়যন্ত্রের নিশানা বানিয়েছে। যেসব অনারব দেশে মুসলমানদের স্থানীয় ভাষার বিপরীতে অমুসলিমদের কোনো ভিন্ন ভাষা বর্তমান আছে, প্রাচ্যবিদেরা সেই ভাষাটিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে নিয়েছে এবং তার প্রশিক্ষণ ও পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে। সেই ভাষার কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের সামনে হাজির করে দিয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। যেমন : হিন্দুস্থানে মুসলমানদের ভাষা উরদুর বিপরীতে হিন্দি ভাষার প্রচলনে প্রাচ্যবিদেরা ভারতের প্রশাসন, রাজনীতিবিদ এবং ভাষা ও সাহিত্য ইনস্টিটিউটগুলোর সহায়তা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশেও হিন্দি ভাষার প্রচলনের চেষ্টা খুব সফলভাবেই চলছে।

আর যেইসব ইসলামি দেশে এমন প্রচেষ্টা সফল হবার কোনো সুযোগ নেই, সেখানে বাজারি ও বারোয়ারি একসেন্ট ছড়িয়ে দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যের একটি বড় অংশে সফলতা লাভ করছে। যেমন : পাকিস্তানে প্রশাসনিকভাবে তো উরদুর বিপরীতে হিন্দির প্রচলন সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতীয় মিডিয়ার মারফত পাকিস্তানে বারোয়ারি উচ্চারণ প্রচলন করে দেওয়া গেছে। এবং আমরা দেখছি যে, মাত্র কয়েক বছরে ২০টিরও অধিক হিন্দি শব্দ কোনো রকম দ্বিধা-সংশয় ছাড়াই আমাদের দৈনন্দিনকার আলাপচারিতার অংশ হয়ে উঠেছে।

ইসলামি বিশ্বে ইউরোপিয়ান ভাষার প্রসার ঘটানো : ঔপনিবেশিক প্রাচ্যবিদেরা ইসলামি বিশ্বের স্থানীয় ভাষা অধিককাল জীবন্ত রাখবার পক্ষপাতি নয়। যার কারণে, যেই ঔপনিবেশিক শাসকেরা যেখানে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে, সেখানে নিজেদের ভাষাকে সর্বপ্রথম দাপ্তরিক আর পরবর্তীতে জাতীয় ভাষা করবার উদ্যোগ করেছে। মরক্কোয় স্প্যানিশ, আলজেরিয়ায় ফরাসি, লিবিয়ায় ইটালিয়ান এবং পাক-ভারত উপমহাদেশসহ অধিকাংশ মুসলিম দেশে সেই উদ্দেশ্যেই ইংরেজি ভাষার প্রসার ঘটানো হয়েছে।

এই প্রচার-প্রসারের কারণেই ইসলামি বিশ্বের স্থানীয় ভাষা ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে আছে। অধিকাংশ স্থানিক ভাষা ইউরোপিয়ান শব্দাবলির আঘাতে মারাত্মকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। পাকিস্তানে বর্তমানে এমন লোকের সংখ্যা অতি নগণ্য, ইংরেজি ভাষার প্রতি যাদের কোনো মুগ্ধতা নেই। প্রায় সবাই ইংরেজি ভাষায়

প্রভাবিত। ইংরেজি ভাষার অজস্র শব্দ, যা ইতোমধ্যে সাধারণ আলাপচারিতার অংশ হয়ে গিয়েছে, তা এখন গদ্য-কবিতা ও সাহিত্যেও জায়গা করে নিয়েছে। 'আধুনিক মনস্ক' মানুষজন ছাড়াও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত প্রতিজন সদস্য, মিডিয়াজগৎ এবং শিক্ষিতসমাজের জলসা-মাহফিলে উরদুর সাথে এই পরিমাণ ইংরেজি শব্দের মিশ্রণ দেখা যায় যে, উরদুর বদলে একটি নতুন ভাষা অস্তিত্ব লাভ করে বসেছে। যখন কোনো জাতি নিজেদের ভাষা ছেড়ে দিয়ে ভিনদেশি সম্প্রদায়ের ভাষা গ্রহণ করবার মধ্যে গৌরববোধ করতে থাকে তখন তাদের স্বকীয়তা এবং নিজস্ব পরিচয় বলতে কিছু বাকি থাকে না। সব মিটে যেতে শুরু করে।

মুসলিমদের বিভিন্ন জাতি, গোত্র, রাষ্ট্র, দেশ এবং বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা উসকে দেওয়া : প্রাচ্যবিদেরা যখন ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, জাতি এবং সমাজের ইতিহাস রচনা করে তখন তাদের সেই গবেষণাকর্মের খুব প্রশংসা করা হয়। তারা খুব বাহবা কুড়ায়। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায়—সেই গবেষণাকর্মের শিরোনামে তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এমন কিছু বিষয়ও হাজির করে, যা ইসলামি বিশ্বের এক সমাজকে আরেক সমাজ থেকে, এক ভাইকে আরেক ভাই থেকে এবং এক দেশকে আরেক দেশ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। তাদের পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা উসকে দেয়।

এই ধরনের বিষয় যদি সত্যিও হয় তবু মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির মহান লক্ষ্য সামনে রেখে সেগুলো প্রকাশ্যে আনা সমীচীন নয়। কিন্তু এভাবে চিন্তা করে একটি জাতির কল্যাণকামী সদস্যরা। প্রাচ্যবিদেরা সে-সবের পরোয়া কেন করবে! তাদের তো উদ্দেশ্যই—মুসলমানেরা যেন পারস্পরিক বিরোধ-বিসম্বাদে ব্যস্ত থাকে। এবং রাজনৈতিকভাবে কখনো সংঘবদ্ধ হতে না পারে।

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে গভীর যে চক্রান্ত চলছে—যে-সকল মুসলিম দেশে অঞ্চলভেদে একাধিক ভাষা প্রচলিত আছে, সেখানে জাতিগত ভাষার বিপরীতে আঞ্চলিক ভাষার প্রচলন ঘটানো হচ্ছে। অত্যন্ত জোরেশোরে মিডিয়ায় প্রচার চালানো হচ্ছে যে, আঞ্চলিক ভাষাকেই রচনা, লেখালেখি এবং মিডিয়ার ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া হোক।

এই ধরনের প্রয়াস-প্রচেষ্টার পরিণতিতে মুসলিম দেশগুলোয় আঞ্চলিকতাপ্রীতি বৃদ্ধি লাভ করছে। আরবি, যা কিনা কুরআন ও হাদিসের ভাষা, তার কথা না-হয় নাই-বা বললাম; দেশের জাতিগত ভাষাকে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। ইসলামি ঐক্যের কল্পনা তো দূরের কথা, দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি ধরে রাখাও কঠিন হয়ে পড়ছে। প্রতিটি জেলায়; বরং প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ ইসলাম এবং স্বজাতির কল্যাণ পেছনে রেখে নিজের ভাষা, নিজের সভ্যতা-সংস্কৃতির সুরক্ষা ও প্রসারকেই একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে নিয়ে আন্দোলন করে যাচ্ছে। যার ফলে পাকিস্তান, ইরাক, আফগানিস্তানসহ বহু মুসলিমরাষ্ট্রের টুকরো টুকরো হয়ে পড়বার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এবং জেলাগুলো আরও ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত হবার পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে।

পশ্চিমকে চাকচিক্যময় করে পরিবেশন করা এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা : প্রাচ্যবিদেরা ইসলামি বিশ্বকে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার প্রতি সন্ত্রস্ত রাখবার উদ্দেশ্যে তাদের লেখাজোখার স্থানে স্থানে পশ্চিমের কবিতার উল্লেখ করে এবং তাদেরকে দেখা যায় পশ্চিমের উন্নতি-অগ্রগতির স্বীকারোক্তি প্রদান করতে। প্রাচ্যবিদদের বইপত্র পাঠ করে একজন সাধারণ মুসলমান এই ধারণা লাভ করে যে, প্রাচ্যে তারা মানুষের মধ্যে নয়; বরং প্রাণিজগতে বাস করে। প্রকৃত মানুষ তো সব ইউরোপে। সেইসাথে প্রাচ্যবিদদের রচনায় পোক্ত চিন্তার মুসলমান, ইসলামি বিশ্বের দীনদারশ্রেণি এবং আলেমদের তাচ্ছিল্যের সাথে হাজির করা হয়। ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক যারা আমল করে, জীবন পরিচালিত করে, তাদেরকে গোঁড়া, মৌলবাদী এবং গোয়ার শব্দে অভিহিত করে মুসলমানদের মস্তিষ্ক ধোলাই করা হয় যে, তারা যেন দীনদারি এবং দীনদারদের থেকে দূরে থেকে পশ্চিমের অন্ধ-অনুকরণকেই নিজেদের জন্য সম্মানজনক ও মর্যাদাকর বলে মনে করে।

মুসলমানদের দুর্বল এবং মূর্খ প্রমাণ করা : অধিকাংশ প্রাচ্যবিদই নিজেদের চেহারা মুসলমানদের প্রতি সহমর্মিতার মুখোশে ঢেকে জেনে-বুঝে নৈরাশ্য বিস্তার করে যেতে থাকে। তাদের সাহিত্য পড়ে একজন মুসলমান চিন্তা করে যে, বিশ্বের বুকে ইসলামি দুনিয়ার কোনো অবস্থান নেই। মুসলমানদের মাটিতেই সমস্যা। মুসলমান এমন এক জাতি, যাদের সংশোধন হবার নয়। প্রাচ্যবিদদের উদ্দেশ্যও এই, মুসলমানেরা যেন পশ্চিম সম্বন্ধে ভীত হয়ে নিরাশা ও হতাশার জগতে পড়ে থাকে। আর শেষমেশ পশ্চিমের প্রেমে আসক্ত হয়ে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে বসে।

ইসলামের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি এবং জিহাদের অপব্যাখ্যা করা : পশ্চিমের মনে সব সময়ই মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্যের ভয় কাজ করে। সেই কারণে, প্রাচ্যবিদেরা নিরত থাকে মুসলমানদের ইসলামের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং জিহাদ থেকে দূরে রাখবার প্রয়াসে। সেই কাজে তারা কয়েকটি পদ্ধতি ব্যবহার করে :

- কখনো কখনো জিহাদ বিষয়ে মুজতাহিদসুলভ আলাপের অবতারণা করে জিহাদের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য বদলে ফেলে। ফলে মুসলমানদের যেই শ্রেণি প্রাচ্যবিদদের বইপত্রে বুঁদ হয়ে থাকে, জীবনেও তারা জিহাদের প্রকৃত সংজ্ঞা বুঝে উঠতে পারে না। এরাই কেবল প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের পক্ষে প্রমাণ হাজির করে ইসলামের আক্রমণাত্মক (ইকদামি) জিহাদ অস্বীকার করে বসে।
- কখনো কখনো জিহাদ সম্পর্কিত নুসুস বা টেক্সটের এমন বিভ্রান্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা হাজির করা হয়, যার পরিণামে জিহাদের বাস্তবতা হারিয়ে যায়। এবং আক্ষরিক অর্থে মুসলমানদের মধ্যে জিহাদ বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকে না। যেমন তাদের লেখাজোখা ও কথাবার্তায় প্রতিটি সংশোধনমূলক প্রচেষ্টা এবং প্রত্যেক কল্যাণকাজকেই জিহাদ ব্যক্ত করা হয়ে থাকে।

- অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ এই হুল্লোড় করে যেতে থাকে যে, ইসলাম তরবারির জোরে প্রসারিত হয়েছে। এবং সেই সিদ্ধান্ত আমলে নিয়ে জিহাদের এই পরিমাণ বদনাম করতে থাকে, অবুঝ মুসলমানেরা নিজেদের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য তরবারির জিহাদকেই অস্বীকার করে বসে।
- মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ এবং মুসলিম-বিজেতাদের পক্ষে গুটিকয়েক প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করে তাদের বদনাম এবং কর্মকাণ্ডের অপব্যাখ্যায় মুখে ফেনা তুলে ফেলাও প্রাচ্যবিদদের একটা ভয়াবহ ব্যাধি। যার ফলে মুসলমানেরা মুজাহিদদের প্রতি বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ হয়ে জিহাদ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

যে-সকল প্রাচ্যবিদ ঔপনিবেশিক এবং রাজনৈতিক প্ররোচনায় কাজ করে, তারা উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলো সামনে রাখে। আর সেগুলো বাস্তবায়ন করে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী এবং রাজনীতিবিদদের তরফে বিরাট খেদমত আনজাম দিয়ে যেতে থাকে।

আত্মরক্ষামূলক প্ররোচনা

ইসলামের সৌন্দর্য চিরকাল সুস্থ বুদ্ধির লোকদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করে থাকে। প্রতি যুগে, প্রতি অঞ্চলে এমন লোকের দৃষ্টান্ত দেখা গেছে, যারা চিন্তাভাবনা এবং বিচার-বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের ইচ্ছায় ইসলাম কবুল করে এসেছে। জ্ঞান এবং তথ্যের মাধ্যমগুলোর উন্নতি-অগ্রগতির সাথে সাথে পশ্চিমাদের ইসলাম কবুলের এই গতিও দিন-দিন আরও বেগবান হতে থেকেছে। এই ঘটনাও প্রাচ্যবিদদের নিজেদের ঘৃণিত কাজে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য একটা বড় প্ররোচনা। তারা এই চিত্রের চিত্রায়ণ বন্ধ করবার লক্ষ্য নিয়ে নিজেদের সকল প্রয়াস-প্রচেষ্টা ব্যয় করে চলেছে। তারা নিয়মিত চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদের স্বজাতিকে ইসলাম সম্বন্ধে অনবহিত রাখবার জন্য, যাতে তারা ইসলামের নিকটবর্তী হতে না পারে। ইসলামের সান্নিধ্য যেন তারা না পায় এবং তাদের মুসলমান হবার সকল সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। এই লক্ষ্যে তারা বৃহৎ পরিসরে এমন সব সাহিত্য প্রচার করতে শুরু করে, যা পাঠ করবার পর একজন খ্রিষ্টানের মন কোনোভাবেই আর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

এ ছাড়াও প্রাচ্যবিদেরা এমনসব অঞ্চলেও নজর রাখে, যেখানে এখনো ইসলাম পৌঁছয়নি। সেখানে ইসলাম সম্বন্ধে বিদ্বেষমূলক লিটারেচার ছড়িয়ে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য—সেখানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছার পথ যেন রুদ্ধ করে দেওয়া যায়। এইসব এলাকায় মিশনারিদের কাজও খুব জোরেশোরে চলমান থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদেরা এটাকেই নিজেদের জন্য বড় সাফল্য হিসেবে দেখে যে, লোকেরা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ না করুক, আপত্তি নেই; কিন্তু তারা যেন ইসলাম কবুল করে না নেয়। ইসলাম যেন তাদের কাছে অপরিচিতই থেকে যায়।

বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক প্ররোচনা

বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থও প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞানবিজ্ঞান এবং ইসলামের প্রতি প্রাচ্যবিদদের আগ্রহ তৈরীর একটি বিশেষ উদ্দীপক। পশ্চিমা প্রকাশকেরা জানে যে, ইউরোপ এবং এশিয়ার দেশগুলো ইসলাম ও প্রাচ্যতত্ত্ব নিয়ে রচিত বইপত্রের এক বিরাট মার্কেট, যেখান থেকে বিপুল পরিমাণ মুনাফা ঘরে তোলা সম্ভব। সুতরাং তারা ব্যবসায়িক মুনাফার বিষয়টা সামনে রেখে প্রাচ্যসম্বন্ধীয় লেখাজোখা ও গবেষণায় পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে এবং বই প্রকাশ করে পৃথিবীজুড়ে বিক্রি করে। আর এর ফলে তাদের বিপুল পরিমাণ আর্থিক মুনাফা লাভ হয়।

অনেক প্রাচ্যবিদ স্রেফ আর্থিক মুনাফার জন্যই ইসলামি বিশ্ব এবং তৎসম্বন্ধীয় বিষয় নিয়ে গবেষণা করে। কেননা এই পরিশ্রমের বদৌলতে প্রকাশক কিংবা গবেষণাপ্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল পরিমাণ রয়্যালিটি বা মশোহারা তার লাভ হয়।

প্রাচ্যবিদদের আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রণোদনার আরও একটি আকৃতি আছে, যা আরও অধিক ভয়াবহ। পশ্চিমারা প্রাচ্যে নিজেদের বাণিজ্যের বিস্তৃতি এবং অর্থনৈতিক জয় নিশ্চিতীকরণের লক্ষ্যে জরুরি মনে করে যে, তাদের প্রাচ্য, বিশেষ করে ইসলামি বিশ্বের সেই সকল নতুন ও পুরোনো বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হবে, যা তাদের বাণিজ্যিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজে আসবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রাচ্যবিদদের একটা টার্গেট ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় যে, তারা প্রাচ্যের কাঁচামাল (Resource), খনিজসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, সেখানের চাহিদা, সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা এবং তাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত রিপোর্ট করবে।

বর্তমান সময়ে এই ধরনের গবেষণার জন্য স্বতন্ত্র গবেষণাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি কোনো দেশে নিজেদের বাণিজ্যিক পলিসি নির্ধারণের প্রাক্কালে বিপুল অর্থের বিনিময়ে সে-সব গবেষণাপ্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। এই কোম্পানিগুলোই বর্তমানে ইসলামি বিশ্বের কাঁচামালের উপর নিজেদের দখলদারি কায়েম করতে উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের জাল ছড়ানো রয়েছে দুনিয়াজুড়ে। এবং বলা যায়—একপ্রকারে ইসলামি বিশ্বের কাঁচামাল সব তারা জব্দ করে নিয়েছে।

জ্ঞানচর্চার প্ররোচনা

কিছু কিছু প্রাচ্যবিদ বাস্তবেই প্রাচ্য এবং ইসলামি বিশ্ব সম্বন্ধে জানার আগ্রহ হৃদয়ে লালন করেন। এবং নিজেদের আগ্রহ ও রুচির কাছে পরাজিত হয়ে প্রাচ্যতত্ত্বকে নিজের গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করে নেন। আর সাধারণত এই শ্রেণির প্রাচ্যবিদদের গবেষণার লক্ষ্য হয়ে থাকে কোনো প্রকারের গোঁড়ামি ও হঠকারিতা বিমুক্ত থেকে কেবল নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ। যে কারণে তাদের গবেষণালব্ধ ফল অন্য যেকোনো

প্রাচ্যবিদের চেয়ে 'ভালো' হয়ে থাকে। কেননা তাদের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো সত্য গোপন করবার কিংবা বিকৃত করবার প্রচেষ্টা থাকে না। তারপরও এই সকল গবেষকের গবেষণাকর্ম চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করে নেওয়া অনুচিত। কেননা শত চেষ্টা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃতভাবেই কোনো লেখক কিংবা গবেষকের দ্বারা ভুল হয়েই যেতে পারে। হ্যাঁ... তবে তাদের গবেষণাকর্ম যদি জ্ঞানগত বিবেচনায় ত্রুটিহীন হয় তবে আমাদেরও উচিত কোনো প্রকারের হঠকারিতার বশবর্তী না হয়ে সেটাকে গ্রহণ করে নেওয়া।

বাস্তবে দেখা গেছে যে, এই সকল একনিষ্ঠ প্রাচ্যবিদের কলমে বৃহৎ কলেবরের রচনা অস্তিত্বে আসে, যা থেকে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অসংখ্য বিদ্বান ও গবেষক সীমাহীন উপকৃত হয়ে থাকে। যেমন : ডক্টর ফিনসিক (Arent Jan Wensinck)-এর 'আল-মু'জামুল মুফহারিস লিল আহাদিসিন নাবাবিয়্যাহ' এবং 'মিফতাহু কুনুযিস সুন্নাহ' গ্রন্থ-দুটি সমস্ত ইসলামি বিশ্বের ইলমি মজলিসের প্রশংসা কুড়িয়েছে। তেমনিভাবে স্টেনলি লেনপুল (Stanley Lane-Poole)-এর 'সালাহুদ্দীন' গ্রন্থটিকে স্বীয় বিষয়ে দুনিয়ার সেরা গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। এসব ছাড়া আরও কিছু ইসলামি উৎসগ্রন্থ, ঐতিহাসিকগ্রন্থ ও রেফারেন্স বুক তাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টার বদৌলতে প্রথমবার প্রকাশের মুখ দেখেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই শ্রেণির প্রাচ্যবিদেরা ইসলামের সৌন্দর্য অন্তর থেকেই স্বীকার করে নেন। তাদের মধ্যকার কতককে আল্লাহ তায়ালা ইসলাম কবুলের সৌভাগ্য পর্যন্ত দিয়েছেন।

এখানে একটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করে রাখা জরুরি মনে করছি। তা হলো, নিরপেক্ষ মানসিকতাসম্পন্ন প্রাচ্যবিদদের আন্তরিক গবেষণালব্ধ রচনাবলির কল্যাণ আপন স্থানে ঠিক আছে; কিন্তু রচনাবলির এই ভান্ডার যখন আমাদের থেকে এই স্বীকারোক্তি আদায় করে নিতে সমর্থ হবে যে, ইসলামি বিষয়ে পশ্চিমা গবেষকদের বিপুল দক্ষতা রয়েছে তখন তা থেকে মুসলিম-সমাজে প্রাচ্যবিদদের সেইসব বইপুস্তকের প্রবেশেরও দ্বার উন্মুক্ত হয়ে পড়বে, যা বিষযুক্ত। কেননা সবার পক্ষেই পার্থক্য করে ওঠা সম্ভব নয়—কোন প্রাচ্যবিদ হঠকারী আর কোন জন হঠকারী নয়। কোন রচনা পরিচ্ছন্ন অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি আর কোনটা লেখা হয়েছে ক্রুসেডীয় বা ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। কেননা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না—প্রাচ্যবিদদের গ্রন্থালয়ে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের পরিমাণই অধিক। ফলে সাধারণ মুসলমানদের তা এড়িয়ে চলাই ভালো।

৪.১.৯: প্রাচ্যবিদদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য

এত সময়ের আলোচনায় প্রাচ্যবিদদের বেশ ক'টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আমাদের সামনে চলে এসেছে। কিন্তু দুটি লক্ষ্য তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ :

ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস ও শরিয়তকে নির্মূল করে দেওয়া : তাদের এতসব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য বলা যায়, ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস এবং ইসলামি শরিয়তকে মূল থেকে উপড়ে ফেলা। আসলে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা এবং পশ্চিমা

রাজনীতিজ্ঞদের প্রধান শত্রুতা ইসলামের সাথেই। ইসলামই একমাত্র চিন্তাধারা ও জীবন-দর্শন, যার বিকল্প কিংবা বিপরীত কিছু হাজির করতে পশ্চিম সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। ইসলামের সৌন্দর্য এবং তার প্রভাবক ক্ষমতা নিয়ে তারা বিপুল পরিমাণ শঙ্কিত থাকে। আর সেই কারণেই তারা চায় ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস এবং শরিয়তকে চিরদিনের জন্য দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দিতে।

পশ্চিমকে ইসলাম থেকে দূরে রাখা : পশ্চিম তার আপন পরিমণ্ডলে ইসলামের প্রসার নিয়ে ভয়ানকভাবে শঙ্কিত। এ কারণে প্রাচ্যতত্ত্বের মাধ্যমে নিজ পরিমণ্ডলে ইসলামের অগ্রগতি রুখে দেবার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৪.১.১০: প্রাচ্যতত্ত্বের উপকরণ

প্রাচ্যবিদেরা তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সব ধরনের উপায়-উপকরণ ও মাধ্যমেরই প্রয়োগ করে থাকে। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে আমরা তাদের প্রয়োগকৃত উপকরণগুলোকে দুই ভাগ করে নিতে পারি।

১. প্রত্যক্ষ উপকরণ (Direct Resources)
২. পরোক্ষ উপকরণ (Indirect Resources)

প্রত্যক্ষ উপকরণ

প্রত্যক্ষ উপকরণের অধীনে নিম্নযুক্ত বিষয়গুলো সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

বইপত্র : প্রাচ্যবিদেরা ইসলাম এবং প্রাচ্যের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে অজস্র গ্রন্থ রচনা করেছে, যার মধ্যে ৪০-৫০ পৃষ্ঠার চটি বই থেকে শুরু করে একাধিক ভলিউমের বৃহৎ কলেবরের গবেষণাগ্রন্থও রয়েছে। এসব লেখাজোখার অধিকাংশই সম্পাদিত হয়েছে ইংরেজি ভাষায়। ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়ানসহ আরও নানাবিধ ভাষায় তাদের বহু রচনা রয়েছে।

অনুবাদ : প্রাচ্যবিদদের বইপত্র ইসলামি বিশ্বের বহু ভাষায় অনুবাদ করেও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। আর তার জন্য অনুবাদের বড় বড় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার এটিও একটি বড় কারণ যে, অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ আরবি-ফারসি এবং অন্যান্য এশিয়াটিক ভাষা মুখে খুব বলতে পারলেও লেখার ক্ষেত্রে ততটা দক্ষ নয়। এবং প্রাচ্যের ভাষায় নিজেদের রচনা লিখতে সমর্থ নয়। সেই কারণে তাদের অধিকাংশই নিজেদের গবেষণাকর্ম নিজেদের মাতৃভাষাতেই (জার্মান, ফরাসি কিংবা ইংরেজি) সম্পন্ন করে। এরপর এটা অনুবাদ অনুষদের কৃতিত্ব যে, চোখের পলকেই তাদের সদ্য রচিত বইপত্র নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। অনুবাদের সর্বাধিক কাজ হয় আরবি ভাষায়।

অনুবাদক টিমের মাধ্যমে মুসলিমবিশ্বের বইপত্রও ইউরোপিয়ান ভাষায় রূপান্তর করে নেওয়া হয়, যাতে প্রাচ্যবিদদের কাজ সহজ হয়ে যায় আর আরবি উরদু ফারসি ভাষার দুর্বলতা তাদের 'গবেষণা'র কাজে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি করতে না পারে।

ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকা এবং জার্নাল : প্রাচজনদের হাজারো মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রতিদিন প্রকাশ হয়। ম্যাগাজিন ও পত্রপত্রিকার এক প্লাবন পরিচালিত হয় তাদের দ্বারা, যা নিখাদ ইসলামের উপর সবেগে হামলে পড়ে। অধিকাংশ ম্যাগাজিন ও পত্রপত্রিকা একাধিক বিষয়ের সমন্বয়ে হলেও কিছু পত্রিকা আবার একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধ ও রচনা প্রকাশ করে। এইসব পত্রপত্রিকা ও জার্নাল ইসলামি বিশ্বের সকল গ্রন্থালয় এবং ইনস্টিটিউশনে পৌঁছে যায়। এবং মুসলমানদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন সাধনের প্রয়াস জারি রাখে।

সভা-সেমিনার এবং কনভেনশন : পৃথিবীর নানা স্থানে প্রাচ্যবিদেরা নানাবিধ ইলমি ও অ্যাকাডেমিক শিরোনামে কনফারেন্স, সেমিনার এবং কনভেনশনের আয়োজন করে থাকে। সে-সব সভা-সেমিনারে ইসলামি বিশ্বের প্রখ্যাত ব্যক্তিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়। গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী আলেমদের অবশ্য উপেক্ষা করা হয়। তবে তাদের সমচিন্তার মুসলিম-গবেষক ও চিন্তকদের গুরুত্বের সাথেই তাতে শামিল করা হয়। এই ধরনের সভা-সেমিনারে প্রাচ্যবিদেরা কোনো বিশেষ বিষয়ে মুসলিম-দুনিয়ার সামনে নিজেদের চিন্তা হাজির করে। এবং কনফারেন্সগুলো তারা ব্যবহার করে থাকে ইসলামি বিশ্বে নিজেদের জ্ঞানগরিমার প্রভাব বিস্তার করবার লক্ষ্যে ও ইসলামি দুনিয়ার ইলমি মজলিসগুলোতে গ্রহণযোগ্যতা পাবার উদ্দেশ্যে। বিগত বছরগুলোর কাজের পরিসংখ্যান এবং সামনের বছরের পরিকল্পনা করবার জন্যও প্রাচ্যবিদেরা সভা-সেমিনার করে থাকে। এ ধরনের সম্মেলন প্রাচ্যবিদদের মধ্যে উদ্দীপনা যোগাতে মাইলফলকের ভূমিকা পালন করে থাকে।

বিশ্বকোষ ও এনসাইক্লোপিডিয়া : মুসলিম আলেমগণ জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় জ্ঞানকোষ ও অভিধান প্রণয়ন করে আসছেন বহুকাল পূর্ব থেকে। তাদের থেকে উদ্দীপ্ত হয়ে পশ্চিমা বিদ্বানসমাজ এনসাইক্লোপিডিয়া প্রণয়নের ধারণা লাভ করে। প্রাচ্যবিদেরা তাদের এই ধারণা কাজে লাগিয়ে বিগত কয়েক শতাব্দীজুড়ে ইসলাম এবং প্রাচ্যের নানা বিষয়ে বহু ধরনের এনসাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেছে, যা বর্তমান সময়ে ইসলামি বিশ্বেও যেকোনো ধরনের রচনা ও গবেষণাকর্মের জন্য মৌলিক আকরগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে বসেছে। বহুসংখ্যক প্রাচ্যবিদের বহুবছরের সম্মিলিত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে সম্পাদিত হয় একেকটি এনসাইক্লোপিডিয়া।

বর্তমান সময়ের বিখ্যাত কিছু এনসাইক্লোপিডিয়া হলো :

1. Encyclopedia of Islam
2. Encyclopedia of Social Sciences
3. Short Encyclopedia of Islam
4. Studies in history
5. Encyclopedia of Religion and Ethic

ইলেকট্রনিক মিডিয়া (রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট) : বর্তমান সময়ে প্রাচ্যবিদ এবং খ্রিষ্টান মিশনারিদের তত্ত্বাবধানে অনেক সংখ্যক রেডিওস্টেশন, টেলিভিশন চ্যানেল এবং ইন্টারনেটে অসংখ্য ওয়েবসাইট সরগরম রয়েছে। সেখানে প্রাচ্যসম্বন্ধীয় বিষয়ের আলাপ-আলোচনা করা হয়। সমসাময়িক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে সামাজিক বিষয়াদি এবং ধর্মীয় চিন্তা-বিশ্বাসও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আলোচ্য বিষয়। আর এসব আলোচনা-পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে দর্শক, শ্রোতা ও ইন্টারনেট ব্রাউজারদের পরিকল্পনা-মাফিক মগজধোলাই করা হয়ে থাকে।

পরোক্ষ উপকরণ

এই পন্থাটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। কেননা এই পদ্ধতিতে শত্রু লুকিয়ে হামলা করে। তাদের অস্তিত্ব কারুর চোখে পড়ে না। ফলে মুসলমান অজান্তেই তাদের হামলার শিকার হয়ে পড়ে।

এই প্রকারের অধীন নিম্নযুক্ত মাধ্যমগুলো উল্লেখযোগ্য :

১. প্রাচ্যবিদদের বিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউট।
২. পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইসলামি ও প্রাচ্যবিষয়ক অনুষদ।
৩. প্রাচ্যবিদদের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

প্রাচ্যবিদদের ইনস্টিটিউট : ইউরোপ-আমেরিকায় ইসলামি এবং প্রাচ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের উঁচু দীক্ষা প্রদানের জন্য একাধিক প্রসিদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলো পরিচালিত হয় প্রাচ্যবিদদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে। স্কলারশিপ প্রদানের মাধ্যমে মুসলিমবিশ্বের মেধাবী এবং যোগ্য শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য সেখানে ডেকে নেওয়া হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের ফাঁকে ফাঁকে এক বিশেষ পন্থায় তাদের মগজধোলাই করা হয়ে থাকে। যার পরিণতিতে তারা কেবল ইসলামের অধিকাংশ মীমাংসিত মাসআলাতেই নয়; বরং ইসলামের মৌলিক বিষয়াদিতেও মুজতাহিদ ইমাম, সালাফে সালেহিন, আলেম-ওলামা এবং জমহুর মুসলিম উম্মাহর চিন্তাচেতনার বিপরীত মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। ফেরার সময় তারা মুসলমান এবং ইসলামি দুনিয়া সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফিরে আসে। এবং সর্বত্র সেখান থেকে আমদানিকৃত চিন্তাচেতনারই প্রসার ঘটাতে থাকে।

পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইসলামি ও প্রাচ্যবিষয়ক অনুষদ : অধিকাংশ পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়েই ইসলামি জ্ঞানচর্চার জন্য পৃথক অনুষদ চালু আছে। এসব ইসলামি জ্ঞান অনুষদও নিজেদের ক্ষতিকর প্রভাব প্রসারের ক্ষেত্রে প্রাচ্যতাত্ত্বিক ইনস্টিটিউশন থেকে কোনো অংশে কম নয়। এটা তো সহজ কথা, যখন কোনো মুসলমান ক্যামব্রিজ বা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির নির্লজ্জ পরিবেশে কোনো খ্রিষ্টান বা ইহুদি প্রফেসরের থেকে হাদিসের লেকচার শোনে তখন তার হাদিসের হাকিকতের

কী অর্জন হয়? এই ধরনের শিক্ষা তথ্যগত বিবেচনায় নির্ভুল হলেও সেখানে আমলের প্রতি কোনো আগ্রহ তৈরি করা হয় না। উলটো নেক আমলের ক্ষমতা নিঃশেষ করে দেওয়া হয়। এই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়মতান্ত্রিকভাবে অত্যন্ত কৌশলে মুসলিম শিক্ষার্থীদের খ্রিষ্টবাদ ও ইহুদিবাদের কাছাকাছি নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। পরোক্ষভাবে এইসব বিদ্যালয়ে খ্রিষ্টবাদের প্রচারের কাজটিও করা হয়ে থাকে। আর যদি তাদের আকিদা-বিশ্বাস পরিবর্তন করা নাওবা যায়, তবু তাদের শিক্ষকরা কৌশলে তাদের প্রস্তুত করতে থাকে প্রাচ্যতত্ত্বের বিশেষ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করবার জন্য।

প্রাচ্যবিদদের শিক্ষার্থীবৃন্দ : ইসলামি বিশ্বের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল এবং আধুনিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে প্রাচ্যতাত্ত্বিক ইনস্টিটিউট ও পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইসলামি অনুষদকে খুব বড় করে দেখা হয়ে থাকে। এ কারণে সে-সব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাসমাপনকারী মুসলিম স্কলারগণ ইসলামি বিশ্বে বিবেচিত হয়ে থাকে অত্যন্ত সমীহের নজরে। এবং ত্বরিতগতিতে তাদের রাষ্ট্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, যেমন ইসলামি আইন বাস্তবায়ন বিভাগ, শিক্ষামন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। প্রাচ্যবিদদের দীক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্বানদের মধ্যে এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্তই সামান্য, যারা নিরাপদভাবে নিজেদের দীন এবং ঈমান নিয়ে ফিরে আসতে পারে। অধিকাংশই সাথে করে ইসলামের নামে বিভ্রান্তি নিয়ে আসে। তাদের একটা বড় অংশ সব ধর্মকে একরকম মনে করে। আবার কেউ ভেতরে ভেতরে খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ করে নেয়। কেউ আবার ইসলাম এবং খ্রিষ্টবাদের মধ্যকার সংশয়পূর্ণ কোনো এক অভিনব স্তরে বাস করে।

এই ধরনের প্রাচ্যতাত্ত্বিক শিক্ষার্থীরা অনেক সময় ইসলামি দুনিয়ার জন্য খোদ প্রাচ্যবিদদের চেয়েও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। মুসলমানদের মতো নাম হওয়ার কারণে দুনিয়া তাকে মুসলমানই মনে করতে থাকে। ইসলামি বংশধারার অন্তর্ভুক্ত হবার কারণে সমাজে তাদের কখনো সেইভাবে সন্দেহ-সংশয়ের নজরে দেখা হয় না, যেভাবে কোনো প্রাচ্যবিদ কিংবা মিশনারিকে দেখা হয়ে থাকে। যার ফলে সে নিশ্চিন্তে সাধারণ মানুষের চিন্তাচেতনা ও আকিদা-বিশ্বাস ধ্বংস করে যেতে সমর্থ হয়। অতীতে মিশরের ডক্টর ত্বহা হুসাইন এবং উপমহাদেশের গোলাম আহমদ পারভেজ আর বর্তমানকালের জাবেদ আহমদ গামেদী প্রাচ্যবিদদের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের 'জনাকয়েক নমুনা'।

৪.১.১১: ইসলামি বিশ্বে প্রাচ্যবিদদের গ্রহণযোগ্যতা, সম্মান, মর্যাদা এবং অবস্থান

বিগত দুই শতাব্দীকালের অনবরত প্রয়াস-প্রচেষ্টার ফলে প্রাচ্যবিদেরা কী পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছে এবং ইসলামি বিশ্বের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পেরেছে, তা এই বিষয় দ্বারাই বুঝে নেওয়া যেতে পারে যে, ইসলামি দুনিয়ার

বড় বড় বিদ্যালয়ে ইসলামি এবং প্রাচ্যীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের পাঠদানের জন্য মুসলিম বিদ্বান ও চিন্তাবিদের বদলে কোনো প্রাচ্যবিদকে পেয়ে যাওয়াই গর্ব ও আনন্দের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ইসলামি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ইলমি সংস্থা ও বিদ্যালয়গুলোয় প্রাচ্যবিদদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছে। দামেশকের মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ (Arab Academy of Damascus) হোক, কিংবা মিশরের মাজমাউল ইলমি আল-আরাবি হোক কিংবা হোক ইরাকের মাজমাউল ইলমি আল-আরাবি (Iraqi Academy of Sciences), সবখানেই বিশেষ সংখ্যক প্রাচ্যবিদ বিদ্যমান। তাফসির, হাদিস ও সিরাতের সাথে সম্পর্কিত বৈশ্বিক কনফারেন্সগুলোতে প্রাচ্যবিদদের অংশগ্রহণ নিজেদের জন্য সম্মানের মনে করা হয়ে থাকে। এবং তাদের প্রবন্ধ পঠিত ও শ্রুত হয়ে থাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে।

ইসলামি বিশ্বের বড় বড় গবেষক ও চিন্তকদের অবস্থা হলো, তারা সালাফ ও পূর্বসূরি আলেমদের রচনা ও গবেষণায় নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তাদের মন প্রশান্ত হয় না। প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণাপ্রবন্ধ পড়া অবধি কোনো বিষয়ে তাদের নিশ্চিন্ততা আসে না। প্রাচ্যবিদদের উপস্থাপিত বিষয় বাস্তবে যত দুর্বলই হোক না কেন, এই লোকেরা তাদের চিত্তাকর্ষক শৈলী, যুক্তির ধরন, সিদ্ধান্তের সৌন্দর্য এবং রেফারেন্স ও তথ্যসমৃদ্ধির জাদু থেকে বেরই হতে পারে না।

৪.১.১২: প্রাচ্যবিদদের আক্রমণ-পদ্ধতি এবং আলোচনা-শৈলী

চলুন, এবার প্রাচ্যবিদদের রচনাশৈলী এবং তাদের গবেষণাপদ্ধতির উপর নজর বুলানো যাক। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাদের উপস্থাপিত বিষয়গুলো অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, সুবিন্যস্ত এবং জাদুকরী। কিন্তু সারবত্তা এবং বাস্তবতার আলোকে সেগুলো তেমন উঁচু পর্যায়ের নয়। তাদের গবেষণা-পদ্ধতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হলো, যা থেকে তাদের আক্রমণ-পদ্ধতি অনুধাবন করে নেওয়া সহজ হবে :

* প্রাচ্যবিদেরা সর্বপ্রথম গবেষণার একটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে নেয়। যেমন 'মুসলমানদের সামনে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে উপস্থাপন করে তাদের পূর্বসূরিদের ব্যাপারে ঘৃণা তৈরি করা' অথবা 'খ্রিষ্টান ও ইহুদি সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা।'
* এরপর সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোনো উপযুক্ত বিষয় নির্বাচন করা হয়। যেমন, 'উমাইয়া শাসনামলে অনারব মুসলমানের চেয়ে আরব মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ' কিংবা 'হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যকার বিরোধ'।
* নির্ধারিত বিষয়ে লেখার পূর্বে লেখক পাকাপোক্ত সিদ্ধান্তই করে নেন যে, তিনি তার দাবি কোনো-না-কোনোভাবে প্রমাণ করেই ছাড়বেন। নতুবা তার গবেষণার উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে!

* লেখক তার উদ্দেশ্য সামনে রেখে ধর্মীয় গ্রন্থাদি অর্থাৎ, কুরআন, হাদিস ও ফিকহ থেকে শুরু করে ইতিহাস, সাহিত্য, কবিতা এমনকি ভ্রমণকাহিনি পর্যন্ত সবখানে তার লেখার বিষয়বস্তুর অনুকূলে তথ্যানুসন্ধান করতে থাকে। তার সামনে তো গ্রন্থের বিরাট ভান্ডার প্রস্তুতই থাকে। সেই ভান্ডার থেকে সে এমন সকল তথ্য গ্রহণ করে নেয়, যা তার দাবির প্রমাণে কোনো-না-কোনোভাবে কাজে আসবে; তার সেই গৃহীত তথ্য সনদ ও মানের বিচারে যতই নিম্নপর্যায়ের হোক না কেন!
* উদ্দেশ্যপূরণে সহায়ক তথ্যভান্ডার সংগৃহীত হয়ে যাবার পর সে অত্যন্ত চতুরতার সাথে নিজের পরিকল্পিত ভবনের কাঠামো প্রস্তুত করে। এরপর তথ্যের এই বিক্ষিপ্ত ভান্ডার তার সেই পরিকল্পিত অবকাঠামোর চুন-সুড়কি, সিমেন্ট এবং ইট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই কাঠামো স্রেফ গবেষকের চিন্তাপ্রসূত। বাস্তবের দুনিয়ায় তার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু এটা নিতান্তই লেখকের কৃতিত্ব যে, সে এদিক-সেদিক থেকে কুড়িয়ে আনা তথ্যগুলোকে অত্যন্ত মনোহর রূপে রূপায়িত করে পাঠকের কল্পনায় এমন শৈল্পিকভাবে হাজির করে যে, পাঠক যেন তার চোখের সমুখেই সেগুলো বাস্তব দেখে ওঠে।
* অবকাঠামো দাঁড়িয়ে যাবার পর লেখক তার সংগৃহীত তথ্যাবলির একটি বিশেষ অংশ সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিপাটি করে। এবং এ কাজে সে তার লেখনীশক্তি ও সৃজনশীল ক্ষমতার সবটা ঢেলে দেয়। একটা ভিত্তিহীন কথাও রংচঙা প্রলেপ দিয়ে এমন জাঁকজমক ও চাকচিক্যের সাথে উপস্থাপন করে যে, প্রভাবিত না হয়ে পাঠকের বিকল্প থাকে না। লাইনে লাইনে বয়ে যায় রেফারেন্সের জোয়ার, যা দেখে শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে পড়ে। আর একথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না, কার হাতেই-বা এত সময় থাকে যে, প্রতিটা রেফারেন্স যাচাই করে দেখবে।
* এই উপস্থাপনের মারফত লেখক তার উদ্দিষ্ট চিন্তাধারা পাঠকের সামনে এমনভাবে চিত্রিত করে, যেন সে সবকিছু তার চোখের সামনে বাস্তবে ঘটতে দেখছে।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহিমাহুল্লাহ প্রাচ্যবিদদের কর্মপদ্ধতির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে লেখেন :

"তারা অধিকাংশ সময় একটি মন্দ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে। এবং সেটাকে চিন্তাজগতে স্থায়ী করতে অত্যন্ত উদারভাবে আলোচিত ব্যক্তি বা বস্তুর কমপক্ষে দশটি ভালো দিক নিয়ে আলোকপাত করে, যাতে পাঠক তাদের ইনসাফ, হৃদয়ের প্রশস্ততা এবং নিরপেক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে সেই একটি মন্দ (যা সকল ভালোর উপর পানি ঢেলে দেয়) গ্রহণ করে নেয়। তারা কোনো ব্যক্তি বা দাওয়াতের পরিপার্শ্ব, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ঐশ্বরিক এবং প্রাকৃতিক কার্যকারণ এবং প্রণোদনার চিত্র এমন দৃষ্টিনন্দন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ শৈলীতে চিত্রায়ণ করে থাকে (যদিও তা নিছক বানোয়াট), মস্তিষ্ক তাকে গ্রহণ করে বসে। এবং তার ফলে পাঠক মনে করে ওই ব্যক্তি বা দাওয়াত সেই

পরিপার্শ্বেরই আবশ্যিক প্রতিক্রিয়া কিংবা অবধারিত কোনো প্রাকৃতিক ফল। আর এই চিন্তা করে পাঠক তার সম্মান-মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা কিংবা কোনো অতি মানবীয় উৎসের সাথে তার সম্পর্ক ও যোগাযোগের বিষয়টা সম্পূর্ণই অস্বীকার করে বসে।[৫২]

৪.১.১৩: প্রাচ্যবিদদের অ্যাকাডেমিক দক্ষতার কয়েকটি নমুনা

প্রাচ্যবিদেরা যদিও ইসলাম এবং প্রাচ্যবিষয়ক রচনার স্তূপ তৈরি করে ফেলেছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের জ্ঞানগত দক্ষতা সাধারণত নিম্নগামী। তাদের গবেষণায় বিস্তৃতি থাকে বটে; কিন্তু গভীরতা একদমই অনুপস্থিত। তারা তাদের সীমাবদ্ধ চিন্তাধারা; বরং বলা ভালো, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি সাথে করে সঠিক ও যথার্থ অর্থে তাফসির, হাদিস, সিরাত এবং ইসলামের ইতিহাস বুঝতে পারে না। বাস্তবতা হলো, বহুসংখ্যক প্রাচ্যবিদ শুদ্ধ উচ্চারণে আরবি ভাষা বলবার সামর্থ্য পর্যন্ত রাখে না। অভিধান এবং ভাষ্যগ্রন্থের সাহায্যে আরবি তথ্যসমগ্র কিছুটা বুঝে নিতে পারলেও লিখতে পারার দক্ষতা সামান্যই। নিজেদের লেখাজোখার আরবি ভাষান্তর ভাড়া-খাটা অনুবাদকদের দ্বারা করিয়ে নেয়। তা ছাড়া তাদের ইসলামবিষয়ক জানাশোনা সাধারণত একটি বিশেষ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। অধিকাংশ প্রাচ্যবিদকেই নিজেদের বিশেষ ও নির্দিষ্ট বিষয়ের বাইরে অন্য ইসলামি জ্ঞানের ক্ষেত্রে একদমই অজ্ঞ ও মূক বলা চলে।

নিচে তাদের ইলমি দক্ষতার কিছু নমুনা হাজির করা হলো, যেন তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতার খানিক অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে।

প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ফোগাল (Fogel) ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে কুরআন কারিমের নির্বাচিত কিছু শব্দ নিয়ে বৃহৎ কলেবরের একটি 'কুরআন শব্দকোষ' সংকলন করেন, যাতে ৪৯টি শব্দেরই উৎসের (মাদ্দাহ) ভুল নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন :

أَثَرْنَ শব্দের উৎস বলা হয়েছে أثر; অথচ এর মূল হলো ث-و-ر

اَلْمَخَاض এর মূল বলা হয়েছে خوض; অথচ এর মূল হলো م-خ-ض

إِسْتَبِقُوْا এর মূল বলা হয়েছে بقي; অথচ এর মূল হলো س-ب-ق

وَقَرْنَ এর মূল বলা হয়েছে قرن; অথচ এর মূল হলো ق-ر-ر

مَقِيْلًا এর মূল বলা হয়েছে قول; অথচ শব্দটির মূল হলো ق-ي-ل

লন্ডন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক প্রফেসর ডেনিস সুরা একজন প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তারিখুল আদয়ান' তার প্রসিদ্ধ রচনা। গ্রন্থটি প্রাচ্যবিদদের কাছে খুবই সমৃদ্ধ গবেষণাগ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়ে থাকে। সে গ্রন্থে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয় উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন :

> "ধর্মের মহান প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্য থেকে সম্ভবত মুহাম্মদই এক এমন ব্যক্তি, যার ব্যক্তিত্ব ঐতিহাসিকভাবে পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট। কোনো ধরনের ঐতিহাসিক বিকৃতি তার ব্যক্তিত্বকে আচ্ছাদিত করতে পারেনি।"

---

[৫২] মাগরিবি মুসতাশরিকিন কে ফিকির ওয়া ফালসাফা কা আসার, পৃষ্ঠা : ১৬

কিন্তু পরক্ষণেই নিজের অজ্ঞতা ও মূর্খতার প্রমাণ দিয়ে তিনি লেখেন :

"আরবের লোকেরা জিন এবং আত্মার পূজা করত—এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই। এবং তারা আরও বিশ্বাস করত যে, আত্মা পাথরের মূর্তির মধ্যে গিয়ে অবস্থান করে। আরবের প্রতিটি গোত্রের নিজস্ব মূর্তি ছিল। ইসলাম সেই সকল মূর্তির অস্তিত্ব মিটিয়ে দিয়েছে। কেবল এক হাজরে আসওয়াদ রেখে দিয়েছে। সম্ভবত হাজরে আসওয়াদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার পেছনে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন উদ্দেশ্য ছিল। কিংবা তা করা হয়েছিল কোনো রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বিবেচনায়। এর মাধ্যমে আরবের পারস্পরিক ঐক্য বজায় রাখা উদ্দেশ্য ছিল।"

কেবলই কি তাই! তাদের মূর্খতার স্মারক আমরা আরও দেখি—খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রাচ্যবিদদের একটি বড় অংশ বলত, লিখত এবং সাধারণ্যে প্রচার করত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের যে মূর্তি কাবার ভেতর তৈরি করে গেছেন, প্রতিবছর হজ করতে গিয়ে মুসলমানেরা সেই মূর্তিরই সেজদা করে। নাউযুবিল্লাহ।

প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ লুই ওয়ান্ডার ম্যান এই আপত্তি তুলেছেন যে, হজরত যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু অধিকাংশ সময় হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে যাতায়াত করতেন। আর কখনো কখনো সেখানে ঘুমিয়েও পড়তেন। আর উম্মুল মুমিনিন তার মাথায় চিরুনি করে দিতেন। অথচ ইসলামে এ ধরনের সম্পর্ক বৈধ নয়।

কিন্তু দুঃখজনক হলো, লুই ওয়ান্ডার ম্যানের এতটুকু জানা ছিল না যে, হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন হজরত যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর আপন ফুফু। তার গায়রে মাহরাম কেউ ছিলেন না।

বিখ্যাত ইহুদি প্রাচ্যবিদ ডক্টর গোল্ড জিহার তার মাজাহিবুত তাফসিরিল ইসলামিতে (Schools of Koranic Commentators) দৃঢ়ভাবে লেখেন যে, কুরআনের একটি শব্দের শুদ্ধতাও নির্ভরযোগ্য নয়। তিনি তার এই দাবির পক্ষে দলিল দিয়েছেন, যখন শুরুতে কুরআন লিপিবদ্ধ করা হলো তখন তাতে নুকতা ছিল না। সেজন্য দৃঢ়ভাবে বলা যায় না, লোকেরা তখন কী লিখেছে আর মানুষ এখন কী পড়ছে!

গোল্ড জিহারের এই দলিল অত্যন্ত আফসোসজাগানিয়া একটি দৃষ্টান্ত। প্রথম কথা হলো, সেইকালে কেবল এক কুরআন কারিমই নয়; বরং আরবি ভাষার সকল লেখা (চিঠিপত্র, প্রশাসনিক দলিল-দস্তাবেজ, অঙ্গীকারনামা ইত্যাদি) ছিল নুকতাবিহীন। তা সত্ত্বেও সে-সব সঠিকভাবেই পাঠ করা হতো। কখনো কোনো সংশয়-সন্দেহ বা অস্পষ্টতার সামান্য প্রশ্নও দেখা দেয়নি। নুকতা উমাইয়া শাসনামলে সেইসব নওমুসলিমের কল্যাণে আবিষ্কার করা হয়েছিল, যারা আরবি ভাষা জানতো না।

দ্বিতীয়ত কুরআন কারিমের সংরক্ষণ সেই প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত মৌখিকভাবে মুখস্থ রাখার মাধ্যমেই হয়ে আসছে। এবং কুরআন কারিম সর্বদা মানুষের সিনায় এমনভাবে সংরক্ষিত থেকেছে যে, লিখিত সংস্করণে একটি হরফ; বরং জবর-জের-

পেশের পরিবর্তনও মুহূর্তেই ধরা পড়ে গেছে। গোল্ড জিহার হয়তো-বা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। যার ফলে এই সুস্পষ্ট বিষয়টিও তিনি বুঝতে পারেননি। নতুবা জেনে-বুঝে ইচ্ছা করেই অন্যকে ভ্রান্ত করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

এই গোল্ড জিহারেরই আরেকটা দাবি হলো, হাদিসে নববীর উদ্ভাবন হিজরি তৃতীয় শতকে। অথচ হাদিস সংকলন ও সংরক্ষণ বিষয়ে আলেমদের অসংখ্য বইপত্র বিদ্যমান, যার মাধ্যমে সকল সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে যায়। কিন্তু প্রাচ্যবিদ এবং তাদের হাদিস অস্বীকারকারী শিক্ষার্থীরা গোল্ড জিহারের শেখানো এই আপত্তি আজও 'লা-জওয়াব' মনে করে গোঁ ধরে আছে।

গোল্ড জিহার তার রচনাবলির এক স্থানে ইমাম আবু হানিফার সমালোচনা করে লেখেন, "আবু হানিফাও জানতেন না বদরযুদ্ধ উহুদের আগে সংঘটিত হয়েছিল না পরে!"

এই 'আবিষ্কার' প্রমাণের জন্য তিনি আল্লামা দিময়ারী রচিত হায়াতুল হায়াওয়ান পেশ করেছেন। অথচ এই গ্রন্থের নাম দেখেই বুঝে নেওয়া যায়, গ্রন্থটি হাদিস বর্ণনাকারী রাবিদের চরিতাভিধান নয়। বরং প্রাণিকুলের উপর লিখিত একটি গ্রন্থ।

গোল্ড জিহার ইমাম মুহাম্মদ ইবনে শিহাব জুহরির উপর আপত্তি উত্থাপন করেন যে, তিনি উমাইয়া খলিফাদের খুশি করবার জন্য হাদিস তৈরি করতেন। এই দাবির পক্ষে কেবল এই একটি প্রমাণই তিনি দিতে পেরেছেন যে, ইমাম জুহরি উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সমসাময়িক ছিলেন। দলিল হিসেবে এর অবস্থান যে কী—তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কার্ল ব্রোকেলম্যান (Carl Brocklmann) তারিখুশ শুউবুল ইসলামিয়্যা গ্রন্থে (History of the Islamic Peoples) দাবি করেছেন যে, আরব শাসকেরা অনারব মুসলমানদের ভেড়া-বকরির পালের মতন মনে করত। তিনি তার দাবির পক্ষে প্রমাণ হাজির করে বলেছেন, তারা অনারব মুসলমানদের رعية বলে সম্বোধন করত, যার অর্থ ছাগলের পাল।

কার্ল ব্রোকেলম্যান এতটুকু বুঝতে পারেননি যে, আরব শাসকেরা কেবল অনারব মুসলিমদেরই নয়; বরং তাদের অধীন সবাইকেই رعية শব্দেই সম্বোধন করত। যদি শব্দটি তুচ্ছতাজ্ঞাপকই হতো তাহলে আরব-অনারব সবাইকে সেই শব্দে কেন সম্বোধন করা হতো! অভিধান থেকে জানা যায়, আরবদের কাছে رعية শব্দের অর্থ শুধু ছাগলের পালই নয়; বরং শব্দটি অধীনস্থ অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা হাদিসে দেখি :

الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته،

"সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৫৩]

---

[৫৩] মিশকাত শরিফ

যেভাবে এই হাদিসে راعي এর অর্থ রাখাল করা সঠিক হবে না, তেমনি رعية এর অর্থ বকরির পাল করাও সঠিক হবে না। যখন শব্দটির প্রয়োগ মানুষের ক্ষেত্রে হবে তখন অধীনস্থ ব্যতীত শব্দটির ভিন্ন কোনো অর্থ গ্রহণ করা সম্ভবই নয়।

প্রাচ্যবিদ মার্গোলিথের ধারণা, আরবের লোকেরা বালাগাত ও বক্তৃতাশাস্ত্র রপ্ত করবার জন্য বিশেষ আয়োজন করত। হতে পারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই শাস্ত্রে বিপুল দক্ষতা অর্জন করে ভাষার ক্ষেত্রে অকল্পনীয় অবস্থান লাভ করেছেন। এটা একেবারেই অসম্ভব কিছু নয় (সহজভাবে বললে, এই বক্তব্য দ্বারা তার উদ্দেশ্য, কুরআন কোনো আসমানিগ্রন্থ নয়। নবীজি ভাষাশাস্ত্রে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে মু'জিয[৫৪] কুরআন রচনার মতো যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছেন। নাউযুবিল্লাহ)।

এ ধরনের অবান্তর ও অবাস্তব ধারণার জবাব তো খোদ কুরআন فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ (পারলে এর মতন একটি সুরা বানিয়ে দেখাও)[৫৫] উচ্চারণ করে চোদ্দশ বছর পূর্বেই দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সন্দেহের ব্যাধিতে আক্রান্ত ফিরিঙ্গি বুদ্ধিজীবীদের তা চিন্তা করার সময় কোথায়!

এত সময় যার আলোচনা করা হলো, তা ছিল কতক বিখ্যাত প্রাচ্যবিদের গবেষণাকর্মের সামান্য নমুনা। এ থেকেই অনুমান করে নেওয়া সম্ভব তাদের বিদ্যা ও বুদ্ধির দৌড় কতটুকু!

প্রাচ্যবিদদের এইসব সন্দেহ-সংশয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ফরাসি নওমুসলিম প্রাচ্যবিদ নাসিরুদ্দীন আদ-দীনিয়াহ (Nasreddine Dinet)-এর মন্তব্য উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করছি। তিনি বলেন :

> "প্রাচ্যবিদেরা সিরাত এবং ইসলামের ইতিহাসকে নিজেদের রুচি এবং বোধ অনুসারে যাচাই করবার চেষ্টা করেছে। এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই তার সমালোচনা করেছে। আর এটাই তাদের বিভ্রান্তির মূল কারণ। অথচ বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ উলটো। ইউরোসেন্ট্রিক প্রাচ্যবিদেরা নিজেদের তৈরীকৃত মানদণ্ডে নবী-রাসুলদের ব্যাপারে কোনোভাবেই সঠিক ফল বের করতে সমর্থ হবে না।"

এরপর তিনি আরও লেখেন, "যদি আমরা তাদের (প্রাচ্যবিদদের) পরস্পরবিরোধী মত একত্র করতে চাই, তাহলে আমাদের দীর্ঘকালের অনুসন্ধানের পরও কোনো এক বিষয়ের চূড়ান্তে পৌঁছা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সে কারণে আত্মপ্রশান্তির জন্য আরবদের বইপত্রের অভিমুখী হওয়া ছাড়া আমাদের সামনে কোনো বিকল্প নেই।"

---

[৫৪] মুজিয একটি বিশেষ পরিভাষা। এর অর্থ হলো, কুরআন এমন গ্রন্থ, যা সবাইকে অক্ষম করে দিয়েছে তার মতন আরেকটি গ্রন্থ রচনা করতে। অর্থাৎ, কারুর সামর্থ্য নেই কুরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করবে। এটাই কুরআন কারিমের এ'জায।

[৫৫] সুরা ইউনুস, আয়াত ৩৯

৪.১.১৪: প্রাচ্যবিদদের দুর্বলতা এবং বিভ্রান্তির মূল কারণ

প্রাচ্যবিদদের দুর্বলতা এবং বিভ্রান্তির মূল কারণ হলো :

- দীন ও শরিয়তের নির্ভরযোগ্য ভাষ্যকারদের সিদ্ধান্তের বদলে নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা অনুযায়ী ব্যাখ্যা প্রদান করা।
- প্রতিটি ধর্ম এবং প্রতিটি সভ্যতার মাঝে পশ্চিমা চিন্তাধারা এবং পশ্চিমা ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ সন্ধান করা। এমন বিষয়াদিকে প্রাধান্য দেওয়া, যেখানে পাশ্চাত্যের আধুনিকতার রং নজরে আসে।
- আকিদা-বিশ্বাসকে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা।
- ভাষার অধ্যয়নে জোর দেওয়া এবং শব্দ ও ভাষার বিচারেই আকিদা-বিশ্বাস ও আহকামের ব্যাখ্যা করা।
- ধর্মকে বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা।
- স্রেফ গবেষণার জন্যই গবেষণা করা। অকারণে তথ্য-উপাত্ত নেড়েচেড়ে দেখা; তা থেকে কোনো ফল বের হোক কিংবা না হোক।
- খুঁজে খুঁজে প্রাচীন গ্রন্থগুলো প্রকাশ করা। আদৌ তার মধ্যে কোনো দীনি কল্যাণ আছে কি না—সেটা অনুধাবনেরও কোনো প্রয়োজন মনে না করা! ধর্মীয় বিষয়াদিতে গল্পকাহিনির বইপত্রও রেফারেন্স হিসেবে হাজির করা।
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধর্মের অধ্যয়নের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া।
- দীন এবং তাসাউফকে দর্শন জ্ঞান করা।
- গ্রিকদর্শনকে দীনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং প্রাচ্যের ধর্মগুলোকে গ্রিকদর্শনের আলোকে বিচার করা।
- স্বয়ং খ্রিষ্টধর্ম বরং পশ্চিমা সভ্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র খোঁজখবর না রেখেও প্রাচ্যের প্রতিটি বস্তুর উপর আঙুল তোলার হিম্মত করা।
- প্রাচ্যের মেধা জমাটবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বিপরীতে পশ্চিমের মেধা ও মনন ক্রমেই কেবল উন্নত হয়ে চলেছে। এবং উন্নত হতেই থাকবে—এই ধারণা নিজেদের অধ্যয়ন ও গবেষণার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা।[৫৬]

৪.১.১৫: প্রাচ্যবিদদের সফলতার কারণ

এই পর্যন্তের আলাপ-আলোচনা এবং পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রশ্নটি উঠে আসে—বিষয়বস্তুর এমন দুর্বলতা এবং দলিল-প্রমাণের এমন অসারতার পরও প্রাচ্যবিদদের জ্ঞানজাগতিক কর্মকাণ্ড কীভাবে সফল হচ্ছে—এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে বিষয়গুলো সামনে আসে :

মুসলমানদের অজ্ঞতা : প্রাচ্যবিদদের পথ মসৃণ হবার সবচেয়ে বড় কারণ মুসলমানদের শিক্ষিতশ্রেণির নিজেদের দীন ও ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা। মুসলমানদের এই শ্রেণির

[৫৬] মুহাম্মদ হাসান আসকারি রচিত 'মাগরেব কে জেহনি ইনহেতাত কি তারিখ' গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপিত

অধিকাংশ সদস্যই শিক্ষিত হবার দাবি করা সত্ত্বেও ধর্মীয় জ্ঞান সম্বন্ধে একেবারেই মূর্খ হয়ে থাকে। যার ফলে অনায়াসেই তারা প্রাচ্যবিদদের শিকার হয়ে পড়ে।

ইংরেজি ভাষার প্রতি মুগ্ধতা : বর্তমানে মুসলিম-সমাজে ইংরেজিকে জ্ঞানের সমার্থক; বরং জ্ঞানের সবচাইতে বড় মানদণ্ড মেনে নেওয়া হয়েছে। কলেজ-ভার্সিটির শিক্ষার্থীরা আরবি ভাষা তো জানেই না, উপরন্তু নিজের মাতৃভাষাতেও কোনো দীনি বইপত্রের অধ্যয়নকে তাদের 'স্ট্যান্ডার্ডে'র পরিপন্থি বিবেচনা করে। কিন্তু প্রাচ্যবিদের অধিকাংশ বইপত্র, যা ইংরেজি ভাষায় রচিত, তাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হয়। এবং তারা কোনো আলেমের কাছ থেকে মাসআলা শেখার বদলে 'পশ্চিমা শিক্ষকদের' উপরই নির্ভর করতে অধিক পছন্দ করে। আর এই নির্ভরতার পরিণামে তারা ভ্রান্তির একেবারে অতলে গিয়ে পৌঁছে।

মুসলমানদের আলেম ও বিদ্বানশ্রেণির নীরবতা : মুসলমানদের বিদ্বানশ্রেণি আলেমসমাজ, যারা প্রাচ্যবিদদের এই মুখোশ উন্মোচনের যোগ্যতা রাখেন, সাধারণত প্রাচ্যতাত্ত্বিক ফেতনাসম্বন্ধেই তারা ওয়াকিফহাল নন। অধিকাংশ আলেম প্রাচ্যতত্ত্ব এবং প্রাচ্যবিদের সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু ছাড়া তাদের সম্বন্ধে বলতে গেলে আর কিছুই জানেন না। প্রাচ্যতত্ত্বসম্বন্ধীয় বইপত্র অধ্যয়নের সুযোগ হয়েছে—এমন আলেমের সংখ্যা তো অতি সামান্য।

এর একটি বড় কারণ, প্রাচ্যবিদদের অধিকাংশ বইপত্র ইংরেজি বা অন্য কোনো ইউরোপিয়ান ভাষায় রচিত, অধিকাংশ আলেমেরই যে ভাষাগুলোতে দখল নেই। যদিও তাদের রচনাবলির একটি বড় অংশ আরবি ভাষায় ভাষান্তরিত হয়ে গেছে; কিন্তু সে-সবের অধ্যয়নের মতো সময়, অবকাশ ও সুযোগেরও তো দরকার আছে, যে অবকাশ আলেমদের হাতে নেই বললেই চলে। কেননা একদিকে তো তাদের পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, মেহরাব-মিম্বারের খেদমত এবং দাওয়াত ও তাবলিগের বিপুল দায়িত্ব রয়েছে। অন্যদিকে দেশ ও সমাজের আরও নানামাত্রিক বিষয় এবং শাসকদের চক্রান্ত থেকে দীনি প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের হেফাজত-প্রচেষ্টাতেও তাদের নিরত থাকতে হয়। এই সকল নিত্য-নৈমিত্তিক হাঙ্গামা এবং তাৎক্ষণিক মনোযোগের হকদার ফেতনা-ফাসাদের বাইরে তাদের আর অবসর হয় না এমন ফেতনার মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হতে, যে ফেতনা কেবল গ্রন্থালয়ে বইপত্রের আশ্রয়ে নীরবে নিভৃতে কাজ করে যাচ্ছে।

পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহের অভাব : আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো, যেসব আলেম প্রাচ্যতত্ত্বের অধ্যয়ন করেছেন এবং তাদের ধোঁকাবাজির অ্যাকাডেমিক জবাব দেবারও সামর্থ্য রাখেন, তাদের কাছে কাজ করবার উপযুক্ত উপকরণ থাকে না। মুসলিম শাসকদের পক্ষ থেকেও তারা কোনো ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা পান না। অধিকাংশ আলেম সেই বইপত্র জোগাড় করেই উঠতে পারেন না, যার সহায়তায় তারা কোনো মানসম্মত কাজ আনজাম দেবেন। তাদের সমচিন্তার কোনো

গবেষণাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা হয় না। জীবনোপকরণ রোজগারের দুশ্চিন্তাও তাদের জন্য একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। তারা যেন নিশ্চিন্তে কোনো বিষয় নিয়ে ডুবে থাকতে পারেন এবং প্রাচ্যবিদদের জবাব দেবার দায়িত্ব আনজাম দিয়ে যেতে পারেন—সে লক্ষ্যে কোনো প্রকাশক তাদের কাজের উপযুক্ত বিনিময় প্রদান করে জীবনোপকরণ রোজগারের দুশ্চিন্তা থেকে তাদের মুক্তি দেবার আয়োজন করতে পারেন না।

কখনো কখনো আল্লাহর কোনো বান্দা স্ব-উদ্যোগে প্রাচ্যবিদদের কোনো বিষয়ে কলম ধরে তার জবাব দিতে চেষ্টা করেও যদি, তাহলে পদে পদে তাকে নিরুৎসাহের মুখোমুখি হতে হয়। আর তার রোজকার সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিশেষে ভগ্নহৃদয়ে কাজ বন্ধ করে সে হাত গুটিয়ে বসে পড়ে। এত প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে বহু কমসংখ্যক আলেমই নিজের গবেষণাকর্ম শেষ করে উঠতে পারেন। আর এতকিছুর পর সেই গবেষণাকর্ম যখন তিনি প্রকাশ ও প্রচার করতে যান, আরও গভীর ঘন নিরাশার অন্ধকারে তাকে তলিয়ে যেতে হয়। বাজারে এর চাহিদা নেই—এ কথা বলে অধিকাংশ প্রকাশক তার গবেষণাকর্ম ও পাণ্ডুলিপিটি ছাপতেই অস্বীকার করে বসে। ফলে, নতুন কোনো গবেষণার ইচ্ছা তার মনের গভীরে আর জেগে ওঠে না।

প্রাচ্যবিদদের সুযোগ-সুবিধা এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা : অপরদিকে প্রাচ্যবিদেরা অধিকাংশ কাজই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে করবার সুযোগ পায়। এক বিষয়ের এক অধ্যায়ে দীর্ঘ সময় ব্যয় হবার কোনো পরোয়া তাদের থাকে না। কেননা তারা যেই ইনস্টিটিউটের অধীনে গবেষণাকর্মে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়, তার পক্ষ থেকে তাদের বিপুল পরিমাণ আর্থিক প্রণোদনা মেলে। আবার রাষ্ট্রের তরফ থেকেও তাদের পূর্ণ সহায়তা করা হয়। গবেষণার প্রয়োজনে যত ধরনের তথ্য দরকার হয়, তার সবই তাদের সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

তা ছাড়া অধিকাংশ প্রাচ্যবিদের বইপত্রের প্রকাশ হয়ে থাকে খুব ধুমধামের সাথে। যার ফলে বইপ্রকাশের সময় এই পরিমাণ পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি তাদের লাভ হয়, যাতে করে নিজেদের পরিশ্রমের 'মিঠা ফল' তাদের ঝুলিতে চলে যায়। আর দুনিয়াজুড়ে কেবল প্রাচ্যবিদদের মজলিসেই নয়; বরং মুসলিম বিদ্বানশ্রেণির তরফ থেকেও তাদের কাজের প্রশংসা জানানো হয় এবং তাদের ভাসিয়ে দেওয়া হয় বাহবা ও স্তুতির জোয়ারে। সাধারণত দু-চারটি বইই কোনো প্রাচ্যবিদের জীবনভর স্বাবলম্বী ও বিখ্যাত থাকবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। যার কারণে প্রাচ্যবিদেরা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে দিনরাত কেবল সামনেই এগিয়ে চলছে। সেখানে মুসলমানদের জন্য তাদের বর্তমান আলস্যের পরিস্থিতিতে প্রাচ্যবিদদের মোকাবেলা করা বেশ কঠিনই। আরব আলেমদের ব্যাপারে যতদূর জানা যায়, তারা প্রাচ্যবিদদের মোকাবেলায় মোটামুটি ভালো রকমের কাজ করে উঠেছেন। কিন্তু পাক-ভারত উপমহাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে সেদিকটায় তেমন নজর দেওয়া হচ্ছে না। ফলে, মোকাবেলার ক্ষেত্র তৈরি করতে হলে আমাদের এই বর্তমান চিত্র ও চরিত্র পরিবর্তনের বিকল্প নেই।

৪.১.১৬: প্রাচ্যতত্ত্বের বিষয়সমূহ

প্রাচ্যবিদেরা তাদের লেখালেখি, প্রবন্ধ এবং বক্তৃতায় যেই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে তাদের ভ্রান্তির বিস্তার করে থাকে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হলো :

আল্লাহ তায়ালার সত্তা : প্রাচ্যবিদেরা আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের ব্যাপারে দার্শনিক আলোচনা তুলে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে এবং এসব আলোচনার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে অনেক সময় কুফুরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

নবীজির রিসালাত : প্রাচ্যবিদেরা সবচাইতে অধিক আলোচনা করে নবীজির রিসালাত নিয়ে। সিরাতের কোনো কোনো অংশের নেতিবাচক অর্থ বের করে তারা সন্দেহের প্রসার করে থাকে। রিসালাতের অবস্থান ও মর্যাদার ব্যাপারে মানসিক ভ্রান্তি তৈরি করে সাধারণ মানুষকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের অস্বীকারকারী বানিয়ে ফেলে।

কুরআন কারিম : কুরআন কারিমের সত্যতা, সংরক্ষণ এবং সংকলনের উপর প্রশ্ন তুলে এবং বিভ্রান্তি ছড়িয়ে এটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যে, কুরআন মানবীয় রচনা। এবং এই গ্রন্থ বর্তমানে তার মূল আকৃতিতে আর নেই।

হাদিসে নববী : হাদিসের সংকলনকে সন্দেহপূর্ণ প্রমাণ করা। নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণনাকারীদের আখলাক এবং কর্মকাণ্ডের উপর আঙুল তুলে তাদের ব্যাপারে মন্দ ধারণার জন্ম দেওয়া। কখনো আবার কোনো সহিহ সনদের হাদিস নিয়ে তা নির্ভরযোগ্য হবার ব্যাপারে ধোঁয়াশা তৈরি করা এবং প্রমাণাদি একত্র করা যে, এটা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য নয়। সহিহ হাদিসকেও বানোয়াট হাদিসের অন্তর্ভুক্ত করে হাদিসের বর্ণনাকারী রাবি, জরাহ-তাদিলে প্রাজ্ঞ আলেম এবং হাদিসশাস্ত্রের সকল পরিশ্রমকে সন্দেহপূর্ণ করে দেওয়া।

ফিকহে ইসলামি : ইসলামি ফিকহকে সমালোচনার বিষয় বানিয়ে নানাভাবে তাকে আক্রমণ করে চলে। যেমন, ফকিহগণ রোমান ল' অধ্যয়ন করে তাকে ইসলামি ফিকহে রূপায়িত করেছেন। কুরআন-হাদিসে ফিকহের কোনো প্রমাণ নেই। এটা ফকিহদের অনুমান, ফিকহি মাসায়েল ইসলামের মৌলিক উৎস কুরআন এবং সুন্নাহর সাথে সংঘাতপূর্ণ। পরস্পরবিরোধী। ইমাম আবু হানিফা হাদিস জানতেন না। এবং মুহাদ্দিসদের কাছে তিনি সমালোচিত, মাজরুহ। উদার মানসিকতা ও মুক্তচিন্তার যেসব মানুষ চার ইমাম এবং ফিকহে ইসলামির উপর আপত্তি উত্থাপন করে থাকে, তাদের প্রমাণাদি সাধারণত প্রাচ্যবিদদের থেকেই নেওয়া।

কুরআনের ভাষা : কুরআনের ভাষা তথা আরবি ভাষার সমালোচনা করা। তাকে সেকেলে এবং প্রাচীন তকমা দেওয়া। এবং তার স্থানে হিব্রু ও সুরিয়ানি (Syriac)

ভাষার গুরুত্ব প্রমাণ করে মুসলমানকে তার দীনের উৎসমূল থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করা প্রাচ্যবিদদের প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত একটি বিষয়।

সিরাতুন নবী : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত ও জীবনচরিতের সম্মান-মর্যাদাকে প্রভাবিত করা এবং তার মধ্যে ছিদ্র খুঁজে বের করাও তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

ইসলামের ইতিহাস : প্রাচ্যবিদেরা ইসলামের গৌরবময় সময়কে লুকিয়ে অধঃপতনের সময়টাকে সামনে নিয়ে আসে। মুসলমানের গৌরবময় অতীতকে অপছন্দনীয় করে তোলার এবং মহান ইসলামি ব্যক্তিত্বের চরিত্রে দাগ লাগাবার কোনো সুযোগ তারা হাতছাড়া করে না, যাতে মুসলমান নিজেদের পূর্বসূরিদের সম্বন্ধে অনবহিত থেকে যায় বরং তাদের ঘৃণা করতে থাকে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে।

ইসলামি দল-উপদল : বিভিন্ন ইসলামি দল-উপদলের সমালোচনা করা। তাদের পরস্পরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ উসকে দিয়ে মুসলমানদের পরস্পরে লড়াই বাধিয়ে দেওয়া। আর ভ্রান্ত দলের ইতিহাসকে বাড়িয়ে-চড়িয়ে, রং লাগিয়ে উপস্থিত করা প্রাচ্যবিদদের অতি পছন্দের এক কাজ।

মুলিম শাসকবৃন্দ : প্রাচ্যবিদেরা বিভিন্ন ইসলামি দেশের অতীত ও বর্তমানের আলোচনা তুলে তাদের পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা তৈরি করে। গবেষণার নামে এক দেশের প্রতি আরেক দেশের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় তৈরি করে দেয়, যাতে তারা একে অপরের কাছাকাছি হতে না পারে। এবং ইসলামি বিশ্ব সংঘবদ্ধ হবার অবকাশ না পায়।

ইসলামি আন্দোলন : প্রাচ্যবিদেরা ইসলামি আন্দোলনগুলো নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা করে থাকে। এবং তার মধ্যে যেটাকে বিশুদ্ধ ইসলামি চিন্তার প্রতীক বলে মনে করে 'লাঠি হাতে করে' তার পেছনে পড়ে যায়। তার মেনিফেস্টোর ভুল ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের তার থেকে দূরে সরাবার চেষ্টা করে। এবং আন্দোলনের নেতৃত্বে যারা থাকে, তাদের নামে বদনাম রটিয়ে দেয়। বিপরীতে যেই আন্দোলন নিজেদের জন্য কল্যাণকর এবং মুসলমানদের পুনরুত্থানের পথে অন্তরায় মনে করে, সেটাকে ইসলামের প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়ে।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহিমাহুল্লাহ ইসলাম-বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের কর্মযজ্ঞের বিশ্লেষণ শেষে লেখেন :

"কুরআন, সিরাতে নববী, ফিকহ, কালাম, সাহাবি, তাবেয়ি, মুজতাহিদ ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকিহ, মাশায়েখ, সুফি, হাদিসের রাবি, জরাহ-তাদিলশাস্ত্র, রিজালশাস্ত্র, হাদিসের প্রামাণ্যতা, হাদিসের সংকলন, ইসলামি ফিকহের উৎস, ইসলামি ফিকহের বিবর্তন... এ সকল বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের যত রচনা ও

গবেষণা, তাতে সংশয়পূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যের পরিমাণ এত বেশি যে, ইসলাম সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জানাশোনা নেই এমন যেকোনো পাঠককে ইসলামবিমুখ করবার জন্য তা যথেষ্ট।"[৫৭]

৪.১.১৭: প্রাচ্যতত্ত্বের মোকাবেলার পন্থা

এতকিছু জানবার পর আবশ্যিকভাবে যে প্রশ্নটি দেখা দেয় তা হলো, এই প্রাচ্যতত্ত্বের মোকাবেলার উপায় কী? বলার অপেক্ষা রাখে না, এই পরিকল্পিত আগ্রাসনের মোকাবেলার জন্য অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম এবং গভীর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। বর্তমান সময়ের মুসলিম স্কলারগণ এই বিষয়ে যে সুপারিশ করেছেন, তার সারাংশ কিছুটা পরিমার্জন ও সংযুক্তির পর হাজির করা হলো :

- ইসলামি দুনিয়ার শাসকবৃন্দ, ইনস্টিটিউট এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রাচ্যতত্ত্বের ফেতনা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন—বিষয়টাকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইসলামি বিশ্বের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা।
- প্রাচ্যতত্ত্বের মোকাবেলার জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। প্রাচ্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াকু সেনা তৈরীর লক্ষ্যে দীনি এবং সাধারণ—উভয় ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই বিশেষ অনুষদ চালু করা।
- এইসব প্রতিষ্ঠান ও অনুষদে প্রথম পর্যায়ে এমন ব্যক্তি তৈরি করতে হবে, যারা এই প্রতিরোধের জন্য সবধরনের যোগ্যতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সমৃদ্ধি অর্জন করবে।
- এই সকল গবেষকের প্রাথমিক কাজ হবে ইতিবাচক গবেষণা। অর্থাৎ প্রাচ্যবিদদের কোনো প্রকার জবাব ও প্রতিউত্তর ব্যতিরেকেই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণাকর্ম হাজির করা।

ইতিবাচক গবেষণার দুটি স্তর হবে : প্রথম স্তরে আমাদের শিক্ষার্থীদের সেই বিষয়গুলো নিয়ে অধিকতর শ্রেষ্ঠ পন্থায় কাজ করে দেখাতে হবে যেসব বিষয়ে বিগত দুই শতকে আমাদের পূর্বে প্রাচ্যবিদেরা কাজ করে উঠেছে। তাফসির, হাদিস, ফিকহ, সিরাত এবং ইসলামের ইতিহাসে এমন অজস্র বিষয় রয়েছে, যাতে মুসলমানের গবেষণা ও লেখাজোখার চাইতে প্রাচ্যবিদদের গবেষণার অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের সেইসব বিষয়ে এমন মানোত্তীর্ণ কাজ করে দেখাতে হবে, যাতে প্রাচ্যবিদদের কাজ আড়ালে চলে যায়। সেজন্য আমাদের কেবল সেইসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করাই যথেষ্ট হবে না, যা প্রাচ্যবিদদের গবেষণাকর্মে দেখা যায়। বরং অভিনবত্ব ও নান্দনিকতায় তাদের থেকে দুই ধাপ অগ্রসর হতে হবে।

ইতিবাচক গবেষণাকর্মের দ্বিতীয় স্তরে এমন সব নতুন প্রকল্প নিয়ে কাজ করতে হবে, যা বৈশ্বিকভাবে কল্যাণকর হবে এবং প্রাচ্যবিদদের শাস্ত্রীয় দক্ষতার ভেল্কিবাজি একেবারে নিঃশেষ করে দেবে।

---

[৫৭] মাগরিবি মুসতাশরিকিন কে ফিকর ওয়া ফালসাফা কা জায়েযা, পৃষ্ঠা : ১৬

- গবেষণা প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপ হবে নেতিবাচক। অর্থাৎ, প্রাচ্যবিদদের ষড়যন্ত্র, বিভ্রান্তি এবং অজ্ঞতা ও মূর্খতাকে অকাট্য দলিল-প্রমাণের সাহায্যে স্পষ্ট করে দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় তাদের মূল বইপত্রের (অনুবাদের নয়) শব্দে শব্দে রেফারেন্স উল্লেখ করা এবং তারপর তার খণ্ডনে বিষয়বস্তুর চাহিদামাফিক আসল উৎসগ্রন্থ থেকে প্রমাণ দেওয়া জরুরি। এটা পরিষ্কার করতে হবে যে, ইসলামি জ্ঞানের টেক্সটকে পাঠ ও অনুধাবন করতে গিয়ে প্রাচ্যবিদদের ঠিক কোথায় এবং কী ভুলটা হয়েছে। অনুবাদ এবং ব্যাখ্যায় তারা ঠিক কোথায় হোঁচট খেয়েছে আর কোথায় তারা প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। কোন কোন স্থানে তারা অনির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং কোথায় কোথায় রেফারেন্স ভুল উল্লেখ করেছে।

জবাব এমন পরিচ্ছন্ন হতে হবে যে, যদি কোনো প্রাচ্যবিদ বাস্তবেই ভুল বুঝে থাকেন তাহলে তা দূর হয়ে যাবে। আর যদি তিনি ইচ্ছাকৃত ভুল করে থাকেন তাহলে তার প্রতারণা সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

শৈলী হবে জজবা এবং পক্ষপাতমুক্ত। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ আন্দাজে কাজ করে যেতে হবে এবং কোনো প্রকার অযৌক্তিক বিতর্কের আশ্রয় নেওয়া যাবে না। শক্ত প্রমাণ হাজির করে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিকে হক এবং প্রতিপক্ষের দাবি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল বলে সাব্যস্ত করতে হবে।

গবেষণাকর্ম ইতিবাচক হোক কিংবা নেতিবাচক, সর্বাবস্থায় তার গ্রহণযোগ্যতা তৈরির জন্য নিম্নযুক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি :

- সর্বপ্রথম বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা, তাৎপর্য, উপকারিতা এবং চাহিদার পরিমাপ করে নিতে হবে।
- কাজের ক্ষেত্রে গবেষণার রীতিনীতি সর্বতোভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- অধ্যয়নের বিস্তৃতি এবং গবেষণার মৌলিকতার (Originality) উপর বিশেষ খেয়াল রাখা। সরাসরি মূল আকরগ্রন্থের সহায়তা নেওয়া এবং তার গভীর অধ্যয়ন করা। রেফারেন্স দিতে হবে একেবারে নির্ভুল।
- তাড়াহুড়াপ্রবণ মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে। দরকার হলে বহুবছর চলে যাক; তবু কাজটা হতে হবে সামগ্রিক।
- এক ব্যক্তির একই সময়ে একের অধিক প্রকল্পে কাজ না করা।
- গবেষণার পাশাপাশি রচনাশৈলী সাহিত্যমানে উত্তীর্ণ হওয়াও জরুরি। বক্তব্য যেন এমন রুক্ষ না হয়, যাতে পাঠকের বিরক্তি চলে আসে। বরং মার্জিত, সাবলীল এবং চিত্তাকর্ষক হওয়া জরুরি।
- আবার এও লক্ষ রাখতে হবে—সাহিত্যপনা যেন এত বেশি না হয়ে যায় যে, গবেষণার বিপরীতে গল্প-উপন্যাস, কলাম কিংবা কবিতার আবহ চলে আসে।
- প্রতিটি কথাই পোক্ত, ভারিক্কি এবং কল্যাণকর হওয়া। কোনো অনুচ্ছেদ বরং একটি বাক্যও যেন হালকা ও লঘু না হয়।

- বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের জন্য নান্দনিক বিন্যাস, অধ্যায়ীকরণ এবং সারণি প্রস্তুতসহ সেই সকল সৌন্দর্য হাজির রাখা, যা প্রাচ্যবিদদের বইপত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।
- ফন্ট, কম্পোজ, টাইটেল, নামলিপি, বাঁধাই—সবকিছু উন্নতমানের হওয়া।
- গবেষণাকর্ম নানা ভাষায়, বিশেষ করে ইংরেজি ও আরবি ভাষায় অনুবাদ করানো।
- গবেষককে যথাসাধ্য উপায়-উপকরণ, বেতন-ভাতা, রয়্যালিটি এবং সামাজিক ইজ্জত-সম্মান দেওয়া, যাতে সে নিশ্চিন্ত মনে নিষ্ঠার সাথে এই ময়দানে কাজ করে যেতে পারে। এবং তার উচ্চাশা ও সাহস উচ্চকিত থাকে। অন্যথায় জীবিকা নির্বাহের চিন্তা তাকে শীঘ্রই এমন ব্যস্ততায় জড়িয়ে দেবে, যাতে পরিশ্রম কম তবে রোজগার অনেক। তার গবেষণাকর্ম আমাদের হারাতে হবে।

যদি এই আন্দাজে কাজ চালিয়ে যাওয়া যায় তাহলে আশা করা যেতে পারে যে, প্রাচ্যতত্ত্বের ফেতনার সামনে একটি মজবুত দুর্গ দাঁড়িয়ে যাবে কেবল নয়; বরং নিজেদের প্রয়াস-প্রচেষ্টা বিফল ও ব্যর্থ হতে দেখে একসময় প্রাচ্যবিদদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নিঃশেষ হয়ে আসবে।

৪.১.১৮: কতক বিখ্যাত প্রাচ্যবিদের পরিচিতি

ভেটর (মৃত্যু : ১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দ) (Vetter) : ফ্রান্সের অধিবাসী ছিলেন। ইবনে সিনার 'আমরাজে আকলিয়্যাহ' এবং আল্লামা তুগরায়ীর 'লামিয়া'সহ আরবিভাষার বেশ কিছু গ্রন্থ তিনি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন।

সিলভেস্টার ডি সাসি (১৭৫৮-১৮৩৮) Silvester de Sacy : প্যারিসে জন্ম। আরবি, ফারসি এবং তুর্কি ভাষা শেখার পর ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রাচ্যীয় পাণ্ডুলিপির প্রকাশ ও প্রসারের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। প্রাচ্য-ভাষার শিক্ষক হিসেবে ফ্রান্সের বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে দায়িত্ব পালন করেন। নাহুশাস্ত্রে ফরাসি ভাষায় একটি বইও লেখেন তিনি, যা ইতোমধ্যে ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ফরাসি প্রশাসনের কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন কিছু দিন। তার সময়ে ফ্রান্সকে প্রাচ্যবিদদের কেন্দ্রভূমি বলা হতো।

জর্জ উইলহেম ফ্রেইট্যাগ (১৭৮৮-১৮৬১) George Wilhelm Freytag : এই লোক প্রাচ্যদেশীয় ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। শিক্ষালাভ করেছেন জার্মানি এবং প্যারিসের বিদ্যাপীঠ থেকে। দীর্ঘ সময় ধরে দায়িত্ব পালন করেন বোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-ভাষা অনুষদে। তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন চার খণ্ডে 'কামুসুল আরাবি আল-লাতিনি' সংকলনের জন্য। ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির আকরগ্রন্থ 'মু'জামুল বুলদানে'র প্রকাশনায়ও তার অংশগ্রহণ ছিল।

উইলিয়াম ম্যুর (১৮১৯-১৯০৫) William Muir : তিনি মিশনারি পাদরি ছিলেন। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করেন। ভারতের ব্রিটিশ কর্মকর্তা হিসেবেও নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং এই দায়িত্ব পালনকালে তিনি আরবি ভাষা শেখেন। মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জ্ঞানগত সহায়তার জন্য বিপুল আগ্রহী ছিলেন। তার বই 'দ্যা লাইফ অব মুহাম্মদ' এবং 'দ্যা টিচিং অব দ্যা কুরআন' অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে। 'দ্যা লাইফ অব মুহাম্মদ' গ্রন্থে যত্রতত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আপত্তি উত্থাপন করে নবীজির রিসালাত ও নবুওয়াতকে সংশয়পূর্ণ করে তুলবার চেষ্টা করা হয়েছে।

তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে রয়েছে :

- The Life of Mahomet and History of Islam.
- Annals of Early Caliphate.
- The Beacon of Truth: Testimony of the Coran to the.
- Truth of the Christian Religion.

জুলিয়াস ওয়েলসেন (১৮৮৪-১৯১৮) Jullius Wellhausen : তিনি ইসলামের ইতিহাস এবং ইসলামি বিভিন্ন দল-উপদলের উপর কাজ করে খ্যাতি অর্জন করেন। আল-ইমবিরাতুরিয়্যাতুল আরাবিয়্যাহ ওয়া সুকুতিহা, আল-আহযাবুল মুআরাজাতু লিল ইসলাম, আশ-শিয়া ওয়াল খাওয়ারিজ, তানজিমু মুহাম্মদ লিল জামাআতি ফিল মাদিনা, মুহাম্মদ ওয়াস সিফারাত আল্লাতি ওয়াজজাহাত ইলাইহি এবং মুহাম্মদ ফিল মাদিনা (Muhammed in Medina, Berlin, 1882) তার জগদ্বিখ্যাত সব রচনা।

ইগনাজ গোল্ড জিহার (১৮৫০-১৯২১) Ignaz Goldziher : হাঙ্গেরির এই মৌলবাদী ইহুদি প্রাচ্যবিদকে বিগত শতাব্দীর প্রাচ্যতাত্ত্বিক ধারার প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। তিনি শিক্ষার্জনের লক্ষ্যে বুদাপেস্ট এবং বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে জামিয়া আল-আজহার পর্যন্ত গিয়েছেন। এক সময়কালব্যাপী বুদাপেস্ট ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস, আরবি এবং দীনিয়াত বিষয়ে পাঠদান করেছেন।

ইসলামি ধর্মতত্ত্ব, ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস, ইসলামি শরিয়ত, কুরআন মাজিদ এবং হাদিসে নববী ছিল তার গবেষণার বিষয়। তিনি উল্লিখিত বিষয়গুলোর উপর একাধিক পক্ষপাতদুষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা ইউরোপে সর্বজনমান্য। 'তারিখু মাজাহিবিত তাফসিরিল ইসলামি' এবং 'আল-আকিদাতুশ শারিয়াহ'কে তার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রচনা মনে করা হয়। গ্রন্থ-দুটি মূলত ইসলামের উপর অজস্র মনগড়া আপত্তির সমাহার।

থিওডর নলদেক (১৮৩৬-১৯৩০) Theodor Noldeke : লন্ডন এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা নেওয়া এই প্রাচ্যবিদ ভাষা, ইতিহাস এবং আরবি কাব্যের পাঠদানে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। 'তারিখুল কুরআন' এবং 'মুখতারাত মিনাশ শে'রিল আরাবি' তার সবচাইতে গ্রহণযোগ্য দুটি গবেষণা।

ভ্যাসিলি ভ্লাদিমিরোভিচ বার্টল্ড (১৮৬৯-১৯৩০) V.V. Barthold : এই রাশিয়ান প্রাচ্যবিদ ইসলামি দুনিয়া, বিশেষ করে এশিয়াটিক ইসলামি দেশগুলোর সামাজিকতা, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি নিয়ে ব্যাপক কাজ করেছেন। পিটার্সবার্গ ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষা অর্জন করেন এবং সেখানেই দীর্ঘ সময়কালব্যাপী অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামের ইতিহাস নিয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেই সাথে তিনি রাশিয়ান অ্যাকাডেমির সদস্য এবং প্রাচ্যতাত্ত্বিক কমিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন।

তার গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে রয়েছে :

- Mussulman Culture.
- Turkestan Down to the Mongol Invasion.

স্যার টমাস ওয়াকার আর্নল্ড (১৮৬৪-১৯৩০) Sir Thomas Walker Arnold : এই ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে আরবি ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৮ পর্যন্ত ভারতের আলিগড় ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন। এরপর দর্শনের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে ইসলামি ধর্মতত্ত্ব এবং আরবি ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকেন।

'আদ-দাওয়াহ ইলাল ইসলাম', 'আল-খিলাফাহ' এবং 'হাওলাল আকিদাতিল ইসলামিয়্যাহ' তার বিখ্যাত রচনা। নেদারল্যান্ড থেকে প্রকাশিত 'আল-মাউসুয়াতুল ইসলামিয়্যাহ'র প্রথম সংস্করণের সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে প্রফেসর আর্নল্ডের নামও যুক্ত রয়েছে। ভারতবর্ষের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি, যার মধ্যে প্রাচ্যের কবি ইকবালও, তার ছাত্র।

আর্নল্ডকে প্রান্তিকতামুক্ত প্রাচ্যবিদদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। কিন্তু তারপরও কিছু জায়গায় তার চিন্তাগত স্খলন চোখে পড়ে। স্বয়ং আল্লামা ইবালের বক্তব্য হলো, প্রফেসর সাহেবের সবচাইতে বিখ্যাত 'দ্যা প্রিচিং অব ইসলাম' গ্রন্থে পরোক্ষে জিহাদকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে।

তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে রয়েছে :

- The preaching of Islam (1913).
- The Old and New Testaments in Muslim Religious Art (1928).

স্টেনলি লেন পুল (১৮৫৪-১৯৩১) Stnly Lane-poole : ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ। জন্ম লন্ডন শহরে। অধ্যাপনা করতেন ডাবলিন ইউনিভার্সিটিতে। ইসলামি ইতিহাসে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিজের ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাধারার কারণে ইসলামি বিশ্বে বেশ খ্যাতি আছে তার।

তার গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে রয়েছে :

- The People of Turkey (1878)
- Lane's Selection From the Kuran (1879)
- Egypt (1881)

- Studies in a Mosque (Cairo, February 1883)
- Social Life in Egypt (1884)
- The Story of the Moors in Spain (1886)
- The Speeches and Table-Talk of the Prophet Mohammad (1893)
- The Mohammedan Dynasties (1894)
- Saladin: All-P0werful Sultan and Unite of Islam (1898)
- Babar (1899)
- Medieval India under Mohammedan Rule, AD 712-1764 (1903)
- Saladin and the fall of the Kingdom of Jerusalem (1903)

ডেভিড স্যানটিলানা (১৮৫৫-১৯৩১) David Santillana : তিউনিসে জন্ম। ইসলামি আইন (ফিকহ) ও ইসলামি দর্শনে ডিগ্রি নিয়েছেন রোম ইউনিভার্সিটি থেকে। মিশর ইউনিভার্সিটিতে দর্শনের ইতিহাস এবং রোম ইউনিভার্সিটিতে ইসলামি আইন বিষয়ে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কার্ল হেনরিক বেকার (১৮৭৬-১৯৩৩) Carl Heinrich Becker : জার্মান প্রাচ্যবিদ। তিনি বিখ্যাত এশিয়াটিক ধর্ম ও ইতিহাস নিয়ে গবেষণার জন্য। পড়াশোনা করেছেন বার্লিনে। স্পেনের বাইরেও মিশরে অধ্যাপনার দায়িত্ব আনজাম দিয়েছেন। তার অংশগ্রহণে প্রাচ্যবিদদের বিখ্যাত জার্নাল 'আল-ইসলাম' ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে যাত্রা শুরু করে। জার্মান প্রশাসনে কিছুকাল সংস্কৃতিমন্ত্রণালয়েরও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

ইগনাজিও গুইদি (১৮৪৪-১৯৩৫) Ignazio Guidi : এই ইটালিয়ান প্রাচ্যবিদ শিক্ষাগ্রহণ করেন রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এবং সেখানেই অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করবার সাথে সাথে আরবি ভাষার অভিধান এবং আরবি ভাষাতত্ত্বে বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেন।

লিওন কেতানি (১৮৬৯-১৯৩৫) Leone Caetani : আরবি ও ফারসি ভাষায় প্রাজ্ঞ একজন প্রাচ্যবিদ। তার বাবা সারমোনেতা (Sermoneta) রাজ্যের ডিউক (নবাব) ছিলেন। এ কারণে কেতানিও ডিউক এবং প্রিন্স অভিধায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি মাত্র ১৫ বছর বয়সেই আরবি ও সংস্কৃত ভাষার পাঠ শুরু করে দিয়েছিলেন। প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের কারণে তিনি ইটালি পার্লামেন্টের সদস্যপদ লাভ করেন এবং আরব-আমিরাতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নির্বাচিত হন।

তার অবারিত সুযোগ লাভ হয় আরব দেশগুলো ভ্রমণ করার। আলজেরিয়া, তিউনিস, মিশর, শাম, লেবানন, তুরস্ক, ইরাক, ইরান, হিন্দুস্থান, মধ্য-এশিয়া এবং রাশিয়ার ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি তিনি কাছ থেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তার প্রসিদ্ধ রচনা 'হাওলিয়াতুল ইসলাম'। দশ ভলিউমে সংকলিত ইসলামের ইতিহাসের এই সংকলনটি অধিকাংশ প্রাচ্যবিদের কাছেই আকরগ্রন্থ ও সূত্রগ্রন্থ হিসেবে বেশ সমাদৃত।

তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে রয়েছে :

- Annali dell'Islam (1908) 10 Volumes.
- Uthman and the Recession of the Koran, Muslim World-5 (1915)
- Study 0f the history of the Orient (1914)

হেনরি ল্যামেন্স (১৮৬২-১৯৩৭) Henri Lammens : খ্রিষ্টান কলেজ বৈরুতে (Society of Jesus, Beirut) প্রতিপালিত এই প্রাচ্যবিদ মিশনারিদের নেতৃস্থানীয় সদস্য এবং ইসলামের ব্যাপারে কঠোর হঠকারী মনোভাবের লোক ছিলেন। তার কাজের বিশেষ ক্ষেত্র ছিল ইসলামের ইতিহাস। খোলাফায়ে রাশেদিন এবং উমাইয়া খলিফাদের জীবনচরিত কলঙ্কিত করবার ক্ষেত্রে কোনো কসুর রাখেননি তিনি। তার কয়েকটি গ্রন্থ প্রসিদ্ধি পেয়েছে। মিশনারিদের জার্নাল 'আল-বাশির'-এর সম্পাদনার দায়িত্বও তিনি পালন করেন।

তার গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে রয়েছে :

- Islam: Beliefs and Institutions.
- The Age of Muhammad and the Chronrology of the Sira.
- Fatima and the Daughters of Muhammad.

আরেন্ট জন ফিনসিক (১৮৮২-১৯৩৯) Arent Jan Wensink : হল্যান্ডের এই প্রাচ্যবিদ বিশেষ শ্রম দিয়েছেন হাদিসের সূচক তৈরির পেছনে। এবং আল-মু'জামু মুফহারিস লিল হাদিসিন নাবাবিয়্যি' ও তার সারসংক্ষেপ 'মিফতাহু কুনুজিস সুন্নাহ' প্রস্তুত করে ইসলামি দুনিয়ার বিদ্বান ও আলেমদের ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তবে তার অন্যান্য রচনার বিভিন্ন স্থানে হঠকারিতা ও হিংসা-দ্বেষ নজরে পড়ে। 'মুহাম্মাদ ওয়াল ইয়াহুদ ফিল মাদিনা' (পিএইচডি থিসিস) এবং 'আল-আকিদাতুল ইসলামিয়্যাহ : নাশাতুহা ওয়া তাতাওয়্যারুহা ফিত তারিখিল ইসলামি' তার আরও দুটি বিখ্যাত রচনা।

ডেভিড স্যামুয়েল মার্গোলিথ (১৮৫৮-১৯৪০) David Samuel Margoliouth : ইহুদিঘরানার সাথে সম্পৃক্ত এই প্রাচ্যবিদ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ৪৮ বছর পর্যন্ত আরবি ভাষার প্রভাষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। আল-আলাকাত বাইনাল আরাব ওয়াল ইয়াহুদ, আল-ইসলাম, আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ তার প্রসিদ্ধ রচনা, যা পক্ষপাতিত্ব এবং একদেশদর্শী প্রোপাগান্ডায় পরিপূর্ণ।

তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে রয়েছে :

- Mohammed and the Rise of Islam. (1905)
- Umayyad's and Abbasids. (1907)
- The Early Development of Mohammedanism. (1914)
- The Relations Between Arabs and Israelites Prior to the Rise of Islam.

এ.ই. স্মিথ (১৮৭১-১৯৪১) A. E. Schmidt : ইসলামের ভাষা ও ইতিহাসে যারা বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, তাদেরই মতন একজন রাশিয়ান প্রাচ্যবিদ। পিটার্সবার্গে ২০ বছর পর্যন্ত অধ্যাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে তাসখন্দে একটি ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেন। আন-নাবী মুহাম্মদ, মুহাওয়ালাতুত তাকরিব বাইনাস সুন্নাতি ওয়াশ শি'য়াহ এবং ফিহরিসে মাখতুতাতিল আরাবিয়্যাহ ফি তাসখন্দ তার বিখ্যাত গবেষণাকর্ম।

স্যামুয়েল মারিনুস জুয়েমার (১৮৬৭-১৯৫২) Samuel Marinus Zwemer : এই আমেরিকান প্রাচ্যবিদের ইসলাম-বিদ্বেষ প্রবাদপ্রতীম। মিশনারি পাদরি, আন্তর্জাতিক ধর্মপ্রচারক এবং লেখক হিসেবে বহু কাজ করেছেন। তিনি ইসলামি বিশ্বে মিশনারিদের পদচারণা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে মিশনারিদের হাতে দলিল-প্রমাণ সরবরাহ করবার লক্ষ্যে নিজের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দেন এবং সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বাস্তবায়নে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

তার গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে রয়েছে :

- Arabia, the Cradle of Islam (1900)
- Moslem Doctrine of God (1906)
- The Mohammedan World of Today (1906)
- Islam: a Challenge to faith (1907)
- Our Moslem sisters: a cry of need from lands of darkness interpreted by those who heard it (1907)
- The Moslem Christ (1911)
- The Unoccupied Mission Fields of Africa and Asia (1911)
- Childhood in the Moslem World (1915)
- Mohammed or Christ (1916)
- The Disintegration of Islam (1916)
- The Influence of Animism on Islam (1920)
- The Law of Apostasy in Islam (1924)
- Moslem Women (1926)
- Across the world of Islam (1929)
- Studies in popular Islam (1939)
- The Art of Listening to Good (1940)
- Islam in Madagascar (1941)
- Heirs of the Prophets (1946)

কার্ল ব্রোকলমান (১৮৬৮-১৯৫৬) Carl Brockelmann : এই জার্মান প্রাচ্যবিদের কাজের ক্ষেত্র ছিল ইসলামের ইতিহাস। তারিখুশ শুউবিল ইসলামিয়্যাহ, তারিখুল আদাবিল আরাবিয়্যাহ তার দুটি প্রসিদ্ধ রচনা, যাকে আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্কলারগণ মৌলিক আকরগ্রন্থ হিসেবে অত্যন্ত মর্যাদা দিয়ে থাকে; অথচ বাস্তবতা হলো তার গ্রন্থ-দুটি যতসব ভুলভাল চিন্তা, উদ্ভট মতামত এবং মিথ্যা বয়ানে ভরা।

লুইস ম্যাসিনিওঁ (১৮৮৩-১৯৬২) Louis Massignon : ফ্রান্সের প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদদের মাঝে পরিগণিত হন। জন্ম প্যারিসে। আরবি ভাষা শেখেন। আলজেরিয়া, কায়রো, আল-কুদস, লেবানন, তুর্কি, হেজাজ ও মরক্কো সফর করেন। চরমপন্থি গোল্ড জিহার থেকেও অ্যাকাডেমিকভাবে উপকৃত হয়েছেন। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোর ফরাসি কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন প্রাচ্যের প্রভাব বিষয়ে। ১৯২৬-১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসি কলেজে ইসলামতত্ত্বের শিক্ষক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কাজ করেছেন ইসলামি বিভিন্ন দল-উপদল এবং নানা শ্রেণি নিয়ে। শিয়া মতবাদ এবং সুফিতত্ত্বের বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ছিলেন দায়িরাতুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়্যার ব্যবস্থাপকদের একজন। তিনি দামেশকের মাজমাউল ইলমিরও সদস্য ছিলেন। আল-হাল্লাজ : আস-সুফিউশ শাহীদ (The Passion of al-Hallaj: Mystic and Martyr of Islam) তার সবচাইতে বিখ্যাত রচনা।

হ্যারল্ড আলবার্ট ল্যাম্ব : নিউইয়র্ক শহরে জন্মগ্রহণ করেন হ্যারল্ড আলবার্ট ল্যাম্ব (১৮৯২-৯ এপ্রিল, ১৯৬২)। শিক্ষার্জন করেন কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে। তার বিশেষ আগ্রহ ছিল ইতিহাস এবং এশিয়াটিক সভ্যতা-সংস্কৃতিতে। সাহিত্য এবং ঐতিহাসিক বিষয়ে বহুগ্রন্থ রচনা করেছেন। সে-সব গ্রন্থ দুনিয়াব্যাপী কল্পনাতীত খ্যাতি লাভ করে। হ্যারল্ড ল্যাম্ব মূলত গবেষক ছিলেন না। বরং ছিলেন পুরোদস্তুর একজন সাহিত্যিক ও ফিকশন রাইটার। কিন্তু ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে চেঙ্গিস খানকে নিয়ে একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করে তিনি বিপুল গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন। আর তারপরই তার লেখালেখির অভিমুখ সম্পূর্ণরূপে ঘুরে যায় জীবনীরচনার দিকে। এবং গবেষক ও ঐতিহাসিক হিসেবে তাকে গণ্য করা শুরু হতে থাকে।

হ্যারল্ড ল্যাম্বের রচনায় সাহিত্যের রং পুরোপুরি বিদ্যমান। বাহ্যত তাকে মুসলমানদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ মনে হয় যদিও; কিন্তু কয়েক স্থানে তিনি স্পষ্ট পক্ষপাতদুষ্টতার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং বাস্তবতাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে মুসলমানদের ত্রুটি এবং পশ্চিমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা চালিয়েছেন।

তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে রয়েছে :

- Genghis Khan: The Emperor of All Men (1927)
- The Flame of Islam (1930)
- The Crusades (1931)
- The March of the Barbarians (1940)
- Suleiman the Magnificent (1951)
- Babur the Tiger: First of the Great Moguls (1962)

জোসেফ ফ্রানজ শ্যাখট (১৯০২-১৯৬৯) Joseph Schacht : ব্রিটিশ-জার্মান প্রাচ্যবিদ। বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন প্রাচ্যের ভাষা বিষয়ে। মিশর ইউনিভার্সিটিতে ফিকহুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ এবং সুরয়ানি ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি নিউইয়র্কেও। দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়্যার দ্বিতীয় সংস্করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইসলামের উপর আপত্তি উত্থাপনে তার বিশেষ খ্যাতি ছিল।

আর্থার জন আরবেরি (১৯০৫-১৯৬৯) Arthur John Arberry : দক্ষিণ ইংল্যান্ডে জন্ম। ফারসি এবং আরবি ভাষার শিক্ষা গ্রহণ করেছেন মিশরে। শাম এবং লেবাননেও কিছুকাল ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রণালয়ের হয়ে তথ্য ও যোগাযোগ অধিদপ্তরে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে কুরআন কারিমের ইংরেজি ভাষান্তর করেন। ইকবালিয়াত, মাওলানা রুমী রহিমাহুল্লাহ এবং সুফিতত্ত্ব নিয়েও তিনি কাজ করেন।

তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে রয়েছে :

- Translations of Muhammad Iqbal's Work.
- Aspects of Islamic Civilization.
- The Doctrine of the Sufis.
- The Essential Rumi.
- The Life and Work of Jalaluddin Rumi.
- Religion in the Middle East.

হেলমুট রিটার (১৮৯২-১৯৭১) Helmut Ritter : তিনি তুরস্কে ইলমি পাণ্ডুলিপি এবং দুর্লভ গ্রন্থাদি খুঁজে বের করবার পেছনে অনেক শ্রম ব্যয় করেছেন। মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন (আবুল হাসান আশআরী), আসাসুল বালাগাহ (আবদুল কাদের জুরজানি) এবং ফিরাকুশ শিয়াহ (হাসান বিন মুসা)-এর মতো বহু দুর্লভ গ্রন্থ নতুন করে সামনে এনেছেন। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানিতে 'মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ'র প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য ছিল, সেখান থেকে ইসলামি পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করা। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে Oriens ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠা করেন।

স্যার হ্যামিল্টন আলেকজান্ডার রসকিন গিব (১৮৯৫-১৯৭১) Sir Hamilton A. R. Gibb : স্কটিশ এই প্রাচ্যবিদ এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটিতে আরবি ভাষাতত্ত্ব এবং লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে প্রাচ্যতত্ত্ব ও আফ্রিকাবিষয়ক বিদ্যার তালিম নেন। আরবি ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন লন্ডন এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে।

তার বিশেষ আগ্রহের ক্ষেত্র ছিল ইতিহাস। আল-ফুতুহাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল আসিয়াতিল উসতা, আল-ইত্তিজাহাতুল হাদিসিয়্যাহ ফিল ইসলাম এবং আল-মুহাম্মদিয়্যাহ (আল-ইসলাম) তার বিখ্যাত রচনা।

তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে রয়েছে :

- Modern Trends in Islam (1947)
- Mohammedanism: An Historical Survey (1949)
- Shorter Encyclopedia of Islam (1953)
- Islamic Biographical Literature (1962)
- Studies on the Civilization of Islam (1982)

ফিলিপ খুরি হিট্টি (১৮৮৬-১৯৭৮) Philip Khuri Hitti : লেবানিজ এই প্রাচ্যবিদ ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের একদেশদর্শী ও হঠকারী। আমেরিকান প্রেসবাইটেরিয়ান মিশন স্কুল, আমেরিকান ইউনিভার্সিটি বৈরুত এবং কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি নিউইয়র্ক থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে ইসলামি ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপনা করেন। কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে। মুসলমানদের জ্ঞানবিজ্ঞানকে ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণ করা এবং ইসলামের ইতিহাস নিয়ে উপহাস করা ছিল তার বিশেষ অভ্যাস।

তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে রয়েছে :

- The Syrians in America (1924)
- History of Syria (1957)
- The Arabs (1960)
- Lebanon in History (1967)
- Makers of Arab History (1968)
- The Near East in History (1961)
- Islam and The West (1962)
- Islam: A Way of Life (1970)
- Capital cities of Arab Islam (1973)

ফ্রান্সেসকো গ্যাব্রিয়েলি (১৯০৪-১৯৯৬) Francesco Gabrieli : আরবি ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষ একজন ইটালিয়ান প্রাচ্যবিদ। রোম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মাজমাউল ইলমি দামেশকের সদস্য নির্বাচিত হন।

তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে আছে :

- A short history of the Arabs (1965)
- Arab historians of the Crusades (1969)
- Muhammad and the conquests of Islam (1973)

অ্যানেমারি শিমেল (১৯২২-২০০৩) Annemarie Schimmel : এই প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদের জন্ম জার্মানে। ১৫ বছর বয়সে আরবি ভাষা শেখেন। ফারসি, তুর্কি এবং উরদু ভাষাতেও দক্ষতা অর্জন করেন। পড়াশোনা করেন বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে। আনকারা ইউনিভার্সিটিতে ধর্মের ইতিহাস বিষয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন।

অবৈতনিক (Honorary) অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সভ্যতা, ভাষাতত্ত্ব এবং ধর্মের ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বিশেষ আগ্রহ ছিল মাওলানা রুমী এবং ইকবালে। পিএইচডিও করেন ইকবালকে নিয়েই। জার্মান ভাষায় জাবেদনামার অনুবাদ করেন। ফারসি, সিন্ধি, উরদু ও তুর্কি ভাষার নির্বাচিত কবিতার ইংরেজি এবং জার্মান ভাষান্তর করেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পাঁচিশটি। ইসলামি বিদ্বানেরা তাকে প্রান্তিকতা-বিবের্জিত প্রাচ্যবিদ মনে করে থাকেন।

তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে আছে :

- And Muhammad is His Messenger.
- Islamic Calligraphy.
- Islam: An Introduction.
- Rumi's World.

জাঁ জ্যাক ওয়ের্ডেনবুর্গ (১৯৩০) Jean Jacques Waardenburg : বর্তমান সময়ের হল্যান্ডের বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ। লেখাপড়া করেছেন আর্মস্টার্ডাম ইউনিভার্সিটিতে। বিশেষত্ব অর্জন করেন ইসলামি আইন এবং আরবি ভাষাতত্ত্বে। তিউনিস, লেবানন, ইরাক, জর্ডান, শাম, ক্যালিফোর্নিয়া এবং লস এঞ্জেলসের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। আল-ইসলাম ফি মিরআতিল আরাব (পিএইচডি থিসিস), ওয়াকিয়াতুল জামিয়াতিল আরাবিয়া (দুই খণ্ডে) এবং আল-মুসতাশরিকুন তার প্রসিদ্ধ রচনা। দায়িরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়ার দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি সম্পৃক্ত হন।

তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে আছে :

- Religion und Religion.
- Official and popular religion of Iran.
- Islam and Christianity.
- Muslim perceptions of other religions.
- Islam: Historical, social and political perspectives.
- Muslims and others.

ম্যাক্সিম রডিনসন (১৯১৫-২০০৪) Maxim Rodinson : জন্ম প্যারিসে। শাম এবং লেবাননে ফ্রান্স নিয়ন্ত্রণাধীন কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ফ্রান্স এবং ইউরোপের শাসকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ম্যাডেল এবং প্রাইজ ও সম্মাননা লাভ করেন। আল-ইসলাম ওয়ার রা'সুল মালিয়্যাহ, মুহাম্মদ, ইসরাইল ওয়ার রাফদুল আরাবি তার বিখ্যাত রচনা।

তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে আছে :

- Islam and Capitalism (1973)
- The Arabs (1981)
- Marxism and the Muslim world (1982)
- Israel and the Arabs (1982)
- Israel: A Colonial-Settier State? (1988)
- Muhammad (2002)

উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াট (১৯০৯-২০০৬) W. Montgomery Watt : আমাদের কাছাকাছি সময়ের বহু গ্রন্থপ্রণেতা এই প্রাচ্যবিদ ছিলেন স্কটিশ। এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি, টরেন্টো ইউনিভার্সিটি (কানাডা), ফরাসি কলেজ (প্যারিস), জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতে (ওয়াশিংটন) আরবি ভাষাতত্ত্ব এবং ইসলামিয়াতের অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। বিশেষ আগ্রহ ছিল খ্রিষ্টবাদের প্রচারে। অক্সফোর্ড, লন্ডন এবং এডেনবার্গের চার্চগুলোর তত্ত্বাবধান তার কাঁধেই অর্পিত ছিল। মুহাম্মদ ফি মাক্কা, মুহাম্মদ ফি মাদিনা, তা'সিরুল ইসলাম ফি উরাব্বা, মু'জায তারিখুল ইসলাম, হাকিকাতুদ দীন ফী আসরিনা, আল-ফিতরাতুত তাকউইনিয়্যাহ লিল-ফিকরিল ইসলামি তার বিখ্যাত গ্রন্থ।

তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে আছে :

- Muhammad at Mecca (1953)
- Muhammad at Medina (1956)
- Muhammad: Prophet and Statesman (1961)
- Islamic Philosophy and Theology (1962)
- Islamic Political Thought (1968)
- Islamic Surveys (1972)
- The Majesty That was Islam (1976)
- What Is Islam? (1980)
- Muhammad's Mecca (1988)
- Muslim-Christian Encounters (1991)
- Early Islam (1991)
- Islamic Creeds (1994)
- History of Islamic Spain (1996)
- Islamic Political Thought (1998)
- Islam and The Integration of Society (1998)
- Islam: A Short History (1999)
- A Christian Faith For Today (2002)

বার্নার্ড লুইস (১৯১৬) : ১৯৭৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত লন্ডন ইউনিভার্সিটির ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস অনুষদের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। এবং একজন লেকচারার থেকে অনুষদের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে ওঠা পর্যন্ত ইতিহাস অনুষদে কাজ করেন। অধ্যাপনার

দায়িত্ব পালন করেন আমেরিকার কলম্বিয়া, ওকলাহামা ও প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে। ফিলাডেলফিয়াতে ইহুদি জ্ঞানতত্ত্বের একটি প্রতিষ্ঠানেও অধ্যাপক হিসাবে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। ইসলামের ইতিহাস, ইসমাঈলি হাশাশিন, ইসলামি বিশ্বের সমস্যাদি এবং আন্দোলন-বিপ্লব নিয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে আছে :

- The Origins of Islamism (1940)
- The Arabs in History (1950)
- The Emergence of Modern Turkey (1961)
- Race and color in Islam (1979)
- The Muslim Discovery of Europe (1982)
- The Jews of Islam (1948)
- The Political Language of Islam (1988)
- Islam and the West (1993)
- Islam in History (1993)
- The Future of the Middle East (1997)
- What Went Wrong? (2002)
- The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror (2003)
- From Babel to Dragomans: Interpreting the Middle East (2004)
- Islam: The Religion and the People (2008, With Bunty Ellis Churchill)

উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ (১৯১৬) Wilfred Cantwell Smith : কানাডিয়ান এই প্রাচ্যবিদ টরেন্টো ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বর্তমান ইসলামি বিশ্ব এবং ইসলামি আকিদা তার বিশেষ আগ্রহের বিষয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও তিনি ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নারমান মিশনারি কলেজ লাহোরে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। নামাজিজুল ঈমান হাওলাল আলাম, আল-ঈমান নাজরাতুন তারিখিয়্যাহ, আল-ঈমান ওয়াল ই'তিকাদ ওয়াল ফিরাকু বাইনাহুমা তার বিখ্যাত রচনা।

বারবারা রেজিনা ফ্রেয়ার স্টুয়াসের Barbara Regina Fryer Stowasser : বর্তমান সময়ের একজন আমেরিকান নারী প্রাচ্যতাত্ত্বিক। জন্মগ্রহণ করেন জার্মানিতে। মনস্টার (Munster) ইউনিভার্সিটি (জার্মান) থেকে ইসলামিয়াত বিষয়ে পিএইচডি করেন। আনকারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুর্কি, ফারসি এবং আরবি ভাষা শিক্ষা করেন। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসবিষয়ে বিশেষ ডিগ্রি নেন। অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ওয়াশিংটনের জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতে। আমেরিকান ইসলামি জ্ঞানতত্ত্ব কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে যুক্ত আছেন।

আন-নিসা ফিল কুরআন ওয়া ফিল হাদিস ওয়া ফিত তাফসির, আত-তাতাউউরুদ দীনি ওয়াস সিয়াসি এবং হাওলা বা'দি আফকারি ইবনি খালদুন ওয়া মিকিয়া ফিলিলি তার বিখ্যাত রচনা।

রিচার্ড ডাব্লু বুলিয়েট (৩০ অক্টোবর ১৯৪০) Richard W. Bulliet : আমেরিকান প্রাচ্যবিদ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ইতিহাস এবং মধ্য-এশিয়াটিক জ্ঞানতত্ত্বে পিএইচডি করেন। অধ্যাপনা করেছেন ক্যালিফোর্নিয়া এবং কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে। জাপান, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান, মিশর, হিন্দুস্থান, ওমানসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন। দিরাসাত ফিত তারিখিল ইসলাম আল-ইজতিমায়ী ফিল কুরুনিল উসতা, আত-তাহাওউলু ইলাল ইসলামিল কুরুনিল উসতা, আল-ইসলাম নাজরাতুন মিনাল খারিজ তার বিখ্যাত রচনা। তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে আছে :

- The Patricians of Nishapur (1972)
- Islam: The View from the Edge (1993)
- Under Siege: Islam and Democracy (1994)
- The Encyclopedia of the Modern Middle East (1996)
- The Case for Islam-o-Christian Civilization (2004)

৪.১.১৯: কতক প্রাচ্যবিদ, যারা ইসলামগ্রহণে ধন্য হয়েছিলেন

আবদুল্লাহ : ইটালিতে শিক্ষা গ্রহণ-করা এই প্রাচ্যবিদ গির্জার প্রধান ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিউনিস সফর করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে নেন। তিনি ৮০ বছর বয়সে ১৪৩২ হিজরি সনে ইনতেকাল করেন। তার কবর তিউনিসের বাবুল মিনারাতে।

ইয়াহইয়া নুরুদ্দীন সুফী : তার জন্ম ১৫ নভেম্বর ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯০৮ সালে ফ্রিম্যাসনের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দর্শন এবং মেটাফিজিক্স বিষয়ে তার একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মিশরের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার মিশরেই তিনি তার ইসলামগ্রহণের ঘোষণা দেন। এবং নিজের নাম ইয়াহইয়া নুরুদ্দীন ব্যবহার আরম্ভ করেন। তার বিশেষ আগ্রহ ছিল তাসাউফ নিয়ে। তিনি শায়েখ আলিসুল কাবির নামে জনৈক বুজুর্গের হাতে বাইয়াত হন। মিশরে ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৪৫ এবং ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি কিছু বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। ৭ জানুয়ারি ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইনতেকাল করেন। তার গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে আছে :

* Crisis of the Modern World.
* East and West.
* Introduction to the Study of Hindu Doctrines.

নাসিরুদ্দীন দীনিয়াহ : এই ফরাসি প্রাচ্যবিদ এক সময় পর্যন্ত আলজেরিয়ার মুসলমানদের সাথে অবস্থান করেন এবং তাদের জীবনযাপনধারায় প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আলজেরিয়ার এক আলেমের তত্ত্বাবধানে সিরাতের একটি উৎকৃষ্ট সংকলন 'আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ' রচনা করেন। তিনি ফ্রান্সে ইনতেকাল করেন; তবে তাকে দাফন করা হয় আলজেরিয়ায়।

মুহাম্মদ আসাদ (১৯০০-১৯৯২) Leopold Weiss : পোলান্ডের এক ইহুদি রাব্বি পরিবারে তার জন্ম। দার্শনিক স্বভাবের ছিলেন। কিন্তু সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মের অধ্যয়নও অব্যাহত রাখেন। সেই সূত্রে রিপোর্টিংয়ের জন্য তিনি হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সফর করেন। এবং মুসলিম-সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হন। সর্বশেষ কুরআন কারিমের পাঠ তার হৃদয়ে ঈমানের আলো জ্বেলে দেয়। অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ আসাদ নাম ধারণ করেন। এরপর সশরীরে লিবিয়ার জিহাদে তিনি অংশ নেন। হিজাজে সুলতান ইবনে সৌদ এবং হিন্দুস্থানে আল্লামা ইকবালের সান্নিধ্যেও কিছুদিন ছিলেন। পাকিস্তানে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে কূটনীতিকের দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন।

তার রচনাবলিতে ইসলামের সত্যতা বৌদ্ধিকভাবে প্রমাণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে সময়ের এক বিরাট প্রয়োজন। তার গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে আছে :

- The Road to Mecca.
- The Message of The Qur'an.
- Translation and commentary on the Sahih bukhari.
- This Law of Ours.
- Islam at the Crossroads.

৪.১.২০: প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদদের কিছু রচনা, যা আরবিভাষাতেও অনূদিত হয়েছে

- প্রিচিং অব ইসলাম, স্যার থমাস আর্নল্ড
- হায়াতু মুহাম্মদ, আর্নল্ড জে টয়েনবি
- আল-ইসলাম, উইলিয়াম ম্যুর
- দীনুশ শিয়া, আলফ্রেড গিওম
- আল-ইসলাম, বিশপ টারপান
- আল-মুসতাশরিকুনা ওয়াল ইসলাম, এ. জে ফিনসিক
- তারিখুল আরাব, গোল্ড জিহার
- আল-ইয়াহুদিয়াহ ফিল ইসলাম, ফিলিপ কে হিট্টি
- আল-হারবু ওয়াল ইসলাম, লুইস ম্যাসিনিওঁ
- তরিকুল ইসলাম, এইচ. এ. আর গিব
- মাসাদিরে তারিখুল কুরআন, নিকলসন
- মুকাদ্দামাতুল কুরআন, আর বেল
- মুহাম্মাদ ও মাতলাউল ইসলাম, ডিএইচ মার্গোলিথ
- আল-আ'য়াদুল মুহাম্মাদিয়্যা, জি ভন গ্রোমবাম
- তারিখু মাজাহিবিত তাফসীরীল ইসলামী, গোল্ড জিহার
- তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান, ডক্টর এডওয়ার্ড ব্রাউন
- আল ইত্তেজাহাতুল হাদিসিয়্যা ফিল ইসলাম, বার্ডেইন কিরাডি ফ্রান্সি
- আল মাজহাবুল মুহাম্মাদী, বার্ডেইন কিরাডি ফ্রান্সি

- আল ইসলাম ওয়াল মুজতামাউল আরাবি, বার্ডেইন কিরাডি ফ্রান্সি
- আল ইসলাম, এইচ এম জোয়েমার
- তারিখুল আরব, ফিলিপ হিট্টি
- তারিখু সুরিয়া, ফিলিপ হিট্টি
- আল ইসলাম, আলফ্রেড গিওম
- ইসলামুল উ'সুর ওয়াল উসতা: মুহাওয়ালাত ফি শরহিল ইসলামিল মুয়াসির, জি ফোন গ্রোবাম
- আল জাবরু ওয়াল ইখতিয়ার ফিল ইসলাম, এইম ওয়াট
- তারিখুল ইয়াহুদ, জে ওয়ালসন
- আল ইসলাম ওয়াল কওমিয়্যা, হার্নেজ
- আল আরব ফীত তারিখ, বার্নার্ড লুইস
- তারিখুল হারবিস সালিবিয়্যা, এইম এসট্রেক
- আল কাওয়ানিনুল এজতেমায়িয়্যা ফিল কুরআন, আর রবার্ট
- আল কুরআন ওয়াত তাওরাতু ফিল কাওয়ানীনুল ইজতিমায়িয়্যা, আর রবার্ট
- উসুলুল ইসলাম ফিল বাইহাতিল মাসিহিয়্যা, আর বেল
- উম্মতে মুহাম্মাদিয়্যা, এরিক শ্রোডার
- তারিখুল মুসলিমিনা ওয়া ফুতুহাতুহুম, এডোরা ফ্রমান
- তারিখুশ শুউবিল ইসলামিয়্যা, কার্ল ব্রোকলমান
- আল-ইসলাম আল ইয়াউম, জে আরব্রে[৫৮]

---

[৫৮] লেখক যেসব বইয়ের উল্লেখ করেছেন আমরা চেষ্টা করেছি সেগুলোর অস্তিত্ব যাচাইপূর্বক অনুবাদে স্থান দেওয়ার। এক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু বই কিংবা লেখকের নাম মাওলানা ইসমাইল রেহান হাফিজাহুল্লাহ যেমনটা বলেছেন তার থেকে সামান্য ভিন্ন পেয়েছি। আমরা চেষ্টা করেছি সেই ভিন্নতাগুলো সংশোধন করেই অনুবাদে স্থান দেওয়ার। অধিকাংশ পার্থক্য তেমন বড় না হওয়ার কারণে টীকায় আলাদাভাবে সেগুলোর উল্লেখ করা হয়নি। তবে এই বইগুলোর ক্ষেত্রে লেখক যেমনটা বলেছেন আমাদের প্রাপ্ত তথ্যের সাথে তার ভিন্নতা কিছুটা চোখে পড়বার মতন। ফলে এখানে একটা টীকা যুক্ত করবার প্রয়োজন মনে হয়েছে আমাদের।

আমরা দাবি করছি না, লেখক যেমনটা নির্দেশ করেছেন সেটা ভুল। আমাদের অনুসন্ধানই সর্বত সঠিক সে দাবির দুঃসাহসও করছি না। তাই লেখকের তথ্য অপরিবর্তিত রেখেই আমরা টীকাতে আমাদের অনুসন্ধান-পরবর্তী তথ্যটুকু যুক্ত করে দিলাম।

যেমন : 'হায়াতু মুহাম্মাদে'র লেখক হিসাবে ইসমাইল রেহান বলেছেন আর্নল্ড জে টয়েনবির কথা। কিন্তু ড. মুসতফা সিবায়ী বলেছেন হায়াতু মুহাম্মাদের লেখক উইলিয়াম ম্যুর। এমনিভাবে 'দীনুশ শিয়া' গ্রন্থের লেখক বলা হয়েছে আলফ্রেড গিওমকে। কিন্তু মুসতফা সিবায়ী বলেছেন ডি এম ডোনাল্ডসনের কথা। বিশপ টারপানের লিখিত গ্রন্থের তালিকাতে আমরা 'আল-ইসলাম' নামে কোনো গ্রন্থের সন্ধান পাইনি। তবে 'আল-ইসলাম' নামে গ্রন্থরচনা করেছেন—আলফ্রেড গিওম, হেনরি ল্যামেন্স, এইচএম জোয়েমার, মার্গোলিথ, জি ভন গ্রোমবাম। 'তারিখুল আরব' গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে গোল্ড জিহারের কথা বলা হলেও এ নামে গোল্ড জিহারের কোনো গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাইনি। আমরা তার কাছাকাছি নামের একটি গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি : 'তারিখুল মাজাহিবিত

৪.১.২১: প্রাচ্যবিদদের কতক রচনা, যা ইংরেজিতে রচিত এবং বাজারে বর্তমান

1. The Life of Mohammad. (William Muir)
2. Islamic law in Palestine and Israel. (Robert H. Eisenman)
3. A history of Islamic law. (N. J. Coulson)
4. The origins and evolution of Islamic law. (Wael B. Hallaq)
5. Islamic law: Theory and Practice. (Robert Gleave)
6. Islamic family law. (Chibli Mallat, Jane Frances Connors, University of London. 1990- 395 Pages)
7. The justice of Islam. (Lawrence Rosen, 2000- 234 pages)
8. Contingency in a sacred law. (Baber Johansen, 1999- 521 Pages)
9. A History of Islamic legal theories. (Wael B. Hallaq, 1999- 294 pages)
10. Wahhabi Islam (Natana J. De Long-Bas, 2007- 370 pages)
11. Women in Muslim Family Law. (John L. Esposito, 1982- 172 pages)
12. Islam and Christian Theology (James Windrow Sweetman, 2002- 368 pages)
13. The Arabs in Histoy (Bernard Lewis, 2002- 240 pages)
14. The Arabs: a short history (Philip Khuri Hitti, 1996- 273 pages)
15. A history of the Arab peoples (Albert Habib Hourani, Malise Ruthven, 2002- 565 pages)
16. A history of the modern Middle East (William L. Cleveland, 2000- 585 pages)
17. A history of the Arabs in the Sudan (Harold Alfred Macmicheal, History, 1922- 347 pages)
18. Is religion killing us? Violence in the Bible and Quran (Jack Nelson-Pallmeyer)
19. Prophets in the Quran (Brannon M. Wheeler)
20. What everyone needs to know about Islam (John L. Esposito- page 119)
21. Islam: a short history (Karen Armostrong)
22. The truth about Muhammad (Robert B. Spencer- page 35)
23. Religions of the World (Lewis M. Hopfe, Mark R. Woodward)
24. Dictionary of Islam (Thomas Patrick Hughes- page 642)
25. Hades or the place of departed spirits (Robert Govett)
26. The spirit of Islamic law (Bernard G. Weiss)

তাফসিরিল ইসলামি'। গ্রন্থটি গোল্ড জিহার কর্তৃক রচিত। তবে তারিখুল আরব নামে ফিলিপ খুরি হিট্টির একটি গ্রন্থের সন্ধান আমরা পেয়েছি। তেমনিভাবে, ইসমাইল রেহান হাফিজাহুল্লাহ 'আল-ইত্তিজাহাতুল হাদিসিয়্যা ফিল ইসলাম', 'আল-মাজহাবুল মুহাম্মাদী' এবং 'আল-ইসলাম ওয়াল মুজতামাউল আরাবি' গ্রন্থ-তিনটির রচয়িতা হিসাবে বার্ডেইন কিরাডি ফ্রান্সির কথা বলেছেন; কিন্তু মুসতফা সিবায়ী এই গ্রন্থ-তিনটির রচয়িতা হিসাবে বলেছেন এইচএ আর গিবনের কথা। মাসাদিরে তারিখুল কুরআন গ্রন্থের লেখক হিসাবে নিকলসনের কথা বলা হলেও এ গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে আমরা অর্থার জেফরির নাম পেয়েছি। আল্লাহু আ'লাম।

গ্রন্থপঞ্জি

—মুসতাশরিকিন কা তরিকায়ে কার, মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশেমী

—মাগরেবি মুসতাশরিকিন কে ফিকির ওয়া ফালসাফা কা আছার, প্রবন্ধ, মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী

—আল-মুসতাশরিকুনা ওয়াল ইসলাম, শায়েখ মুসতফা সিবায়ী

—আল-ইসতিশরাক : মাওকায়ু শাবকাতি মিশকাতিল ইসলামিয়্যাহ, মাউসুয়াতুশ শামিলা

—আল-মুসতাশরিকুনা ওয়াত তানসির, আলী ইবনে ইবরাহিম আন নামলা

—আল-মাউসুয়াতুল মুয়াস্‌সারা ফিল আদইয়ান, মাওকায়ু শাবকাতি মিশকাতিল ইসলামিয়্যা, মাউসুয়াতুশ শামিলা

—আল-ইসতিশরাক, মাযিন ইবনু সলাহ

—আল-ইসতিশরাক: জুহুদহু ওয়া আফকারুহু, আবদুল মুনয়িম মুহাম্মদ হাসনাইন, জামিয়া ইসলামিয়া মদিনা মুনাওয়ারা

—মাউসুয়াতুর রাদ্দি আলাল মাজাহিব, আলী ইবনে নায়েফ আশ শুহুজ

—মাউসুয়াতুল গাজবিল ফিকরি, আলী ইবনে নায়েফ আশ শুহুজ

—কিতাবাতু আ'দায়িল ইসলাম ওয়া মুনাকাশাতুহা, ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইসমাইল আশ শারবিনী

—আল-মুসতাশরিকুনা ওয়াল ইসলাম, শায়েখ জাকারিয়া হাশেম জাকারিয়া

—মাসিক সাহেল, ভলিউম ২০০৫

—আল-ইসতিশরাক ওয়াত তাবশীর, ডক্টর মুহাম্মদ সাইয়েদ আল-জালান্দ

৪.২: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের দ্বিতীয় ক্ষেত্র
উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ

সাম্রাজ্যবাদ হলো, এক দেশের আরেক অঞ্চলের উপর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করা। ক্যামব্রিজ ডিকশনারি অনুযায়ী কলোনিয়ালিজম (colonialism) অর্থ—'এমন ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো, যার মাধ্যমে এক দেশ আরেক দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করে।'

যদিও উপনিবেশবাদের সাধারণ অর্থ—কোনো অনাবাদ জনপদকে নিজেদের কর্তৃত্বে এনে আবাদ করা এবং সেখানকার অব্যবহৃত কাঁচামাল ও উপকরণ কাজে লাগানো; কিন্তু ইউরোপিয়ান শক্তি এন্টার্টিকা ও উত্তর মেরু ছাড়া পৃথিবীর যত জনপদে নিজেদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছে, তা পূর্ব থেকেই আবাদ ছিল। এই শক্তি সেই অঞ্চলগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে তাকে আবাদ করেনি। বরং পূর্ব থেকেই আবাদ সম্প্রদায়কে আরও বরবাদ ও ধ্বংস করেছে। স্থানীয় সম্পদকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে লুণ্ঠন করেছে। সেজন্য সাম্রাজ্যবাদের সঠিক অর্থ দাঁড়িয়েছে—কোনো অঞ্চলে নিজেদের এজেন্টকে ক্ষমতায় বসিয়ে সেই অঞ্চলে এই পরিমাণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যেন সেখানকার সম্পদ-লুণ্ঠন অব্যাহত রাখা যায়।

৪.২.১: সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার ভিত্তি

সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার ভিত্তি দুটি :

১. সম্পদ এবং ক্ষমতার লোভ।

২. স্বজনপ্রীতি এবং জাত্যভিমান।

যখন দুনিয়ার কোনো সম্প্রদায়ের সম্পদ সংগ্রহ করবার এবং ক্ষমতাকে আরও বিস্তৃত করবার উন্মাদনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং সেইসাথে এমন চিন্তা জেগে ওঠে যে, বংশ, ভাষা এবং সভ্যতা ও সামাজিকতায় তাদের চাইতে উৎকৃষ্ট জাতি কেউ নয়, তখন তারা ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের মানুষ হিসেবে আর গণ্য করে না। আর ভিনজাতিকে মানুষ গণ্য না করেই তাদের ভূখণ্ড, তাদের সভ্যতা, ব্যক্তিত্ব এবং তাদের সকল অধিকার কেড়ে নিতে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা নতুন কিছু নয়; বহু পুরোনো। তার প্রাচীন নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় গ্রিক শাসক আলেকজান্ডার গ্রেটের বিজয়াভিযান এবং তার সমসাময়িক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের শিক্ষা-দর্শনে। আলেকজান্ডার গ্রেট খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৪ সালে ইউরোপ থেকে বেরিয়ে এশিয়ার বহু বিস্তৃত অঞ্চল জয় করে নেন। সেই

বিজয়যাত্রায় ইরান দখলের পর তিনি যখন অ্যারিস্টটলকে পত্র লিখে এলাকার সার্বিক অবস্থার বিবরণ জানান, জবাবে অ্যারিস্টটল তাকে বলেন :

"এই দেশকে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মাঝে ভাগ করে দিয়ে প্রতিজন নেতাকে বাদশাহ অভিধায় ভূষিত করুন। তার রাজ্য যত ছোটই হোক না কেন, তারপরও তাকে বাদশাহি তাজ পরিয়ে সেই অঞ্চলের স্বতন্ত্র শাসক বানিয়ে দিন। কেননা বাদশাহ অভিধায় একবার কেউ ভূষিত হলে তারপর সে অন্যকে আর মানতে পারে না। অন্যকে মানার মানসিকতা সে হারিয়ে বসে। সে কারণে এই ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যদখলে রাখবার জন্য সেই আঞ্চলিক বাদশাহদের মধ্যকার লড়াই চলতেই থাকবে। তারা আপনার বিপক্ষে লড়বার বিপরীতে নিজেদের মধ্যকার লড়াই নিয়ে মেতে থাকবে। যদি আপনি সেখানে থাকেন তবে তারা আপনার সামনে দুর্বল হয়ে থাকবে। আর আপনি যদি তাদের থেকে দূরে অবস্থান করেন, তারপরও তারা আপনার সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের সম্মানিত মনে করতে থাকবে। এভাবে তারা আপনার বিরুদ্ধে সম্মিলিত শক্তি সঞ্চয়ের বিপরীতে ব্যস্ত থাকবে অভ্যন্তরীণ বিবাদ নিয়েই। আপনার পরও তাদের থেকে কোনো ধরনের ঝুঁকির আশঙ্কা থাকবে না।"

এটা ছিল সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার প্রথম সবক, যাকে আলেকজান্ডার গ্রেট তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর নিজেদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সমস্ত বিজিত অঞ্চলে যতদূর সম্ভব গ্রিক সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার করেন। মিশরের তীরবর্তী অঞ্চলে নিজের নামে আলেকজান্দ্রিয়া শহরের পত্তন করে সেখানে গ্রিকদর্শনের মারকায ও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য—গ্রিকদর্শনই যেন দুনিয়ার চিন্তাগত ভিত্তি হতে পারে। আমুদরিয়ার তীর থেকে শুরু করে ট্যাক্সিলা পর্যন্ত স্থানে স্থানে গ্রিক সভ্যতা-সংস্কৃতির নমুনা ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যা আজও আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার প্রমাণ বহন করে চলেছে। আলেকজান্ডার তো এশিয়া থেকে ফিরবার পথে যুবাবয়সেই মারা যান; কিন্তু তার গৃহীত পলিসির কারণে এশিয়ার জাতি ও গোত্রসমূহ প্রায় চারশ বছর গ্রিকদের গোলামি করে এবং সেই সূত্রে একে অন্যের সাথে লড়াইয়ে মেতে থাকে।

৪.২.২: ইসলামি দুনিয়ার বিপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াস, প্রারম্ভিক কাল

আলেকজান্ডার গ্রেট এবং অ্যারিস্টটলের সময় ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদ কোনো এক একক সম্প্রদায়ের বদলে এশিয়ার সকল সম্প্রদায় ও জাতি-গোত্রের বিপক্ষে ছিল। কিন্তু ক্রুসেডযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইউরোপ থেকে যে সাম্রাজ্যবাদী ঢেউ উথলে ওঠে, বিশেষভাবে তা ছিল মুসলিম সম্প্রদায়েরই বিরুদ্ধে। যদিও ইউরোপের এই সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ ঘটে সঠিক অর্থে খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে এসে। কিন্তু তারও পূর্বে একটি প্রারম্ভিককাল ছিল, যার চিত্রায়ণ খেলাফতে রাশেদার সময়কাল থেকে নিয়ে ক্রুসেডযুদ্ধের ক্রান্তিলগ্ন পর্যন্ত দেখা যায়। এই সমস্ত সময়কালে কেবল

ইউরোপের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই নয়; বরং অন্যান্য খ্রিষ্টীয় দেশ এবং অন্যান্য ইসলাম-বিদ্বেষী শক্তিকে নিম্নযুক্ত চারটি লক্ষ্য সামনে রেখে অগ্রসর হতে দেখা গেছে :

১. ইসলামি খেলাফত-ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি।
২. পবিত্র ভূমিসমূহের দখল।
৩. ইসলামি বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা।
৪. ইসলামি দুনিয়ার ধ্বংস সাধন।

ইসলামি খেলাফত-ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি : খেলাফতে রাশেদার সময়কাল থেকে নিয়ে খেলাফতে আব্বাসিয়া পর্যন্ত সময়টাতে কাফির-শক্তির প্রথম লক্ষ্য এটাই ছিল যে, খেলাফতে ইসলামিয়াকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেওয়া হবে। কেননা খেলাফত থাকাবস্থায় মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত এবং দুর্বল করা বাহ্যত সম্ভব ছিল না।

এই প্রথম লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই ইরানি সাসানি সাম্রাজ্যের এক কর্মচারী ফাইরুজ হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহিদ করে ফেলে। তারপর সেই একই লক্ষ্যে হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিবেশ তৈরি করা হয়। তারপর তাকে বিদ্রোহীদের হাতে শহিদ করা হয়। এই ধরনের চক্রান্তই জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফফিন এবং কারবালার মতো বেদনাদায়ক ঘটনার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত বেদনাদায়ক ঘটনার পরও ইসলামি খেলাফত-ব্যবস্থা টিকে ছিল। আর টিকে ছিল কেবল নয়; বরং পূর্ণ ঔজ্জ্বল্যের সাথে সমস্ত দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল।

খেলাফতে আব্বাসিয়ার পতনের পর যখন মিশরে মিথ্যা খেলাফত উবাইদি সাম্রাজ্য মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তার কারণে ইসলামি দুনিয়া দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন ইসলামের বিপক্ষ-শক্তি বিপুল তৃপ্তি বোধ করে। তিনশ বছর পর্যন্ত পরিস্থিতি এমনই থাকে। কিন্তু এরপরে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী উবাইদি সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিয়ে সমস্ত মুসলিমজাতিকে ফের এক খেলাফতের অধীন করে দেন।

এর কয়েক বছর পর ৬১৬ হিজরিতে চেঙ্গিস খান যখন ইসলামি দুনিয়ায় আক্রমণ করে তখন ইউরোপ ইসলামি খেলাফত ধ্বংসের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে ওঠে। এই সময়ে খ্রিষ্টান মিশনারিরা চেঙ্গিস খানের দরবারে হাজির হয় এবং তাতারদের খ্রিষ্টবাদের দিকে আকৃষ্ট করতে প্রয়াসী হয়। চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খান মহররম ৬৫৬ হিজরি সালে বাগদাদ তছনছ করে খেলাফতব্যবস্থা নির্মূল করলে খ্রিষ্টানেরা তাকে নিজেদের বিজয় বলে অভিহিত করে। হালাকু খানের বাহিনী দামেশকে প্রবেশ করে যখন তখন স্থানীয় খ্রিষ্টানেরা তাদের অভ্যর্থনা জানায়। তারা মিছিল বের করে আনন্দ প্রকাশ করে এবং স্লোগান দিতে থাকে যে, ঈসা মাসিহের ধর্ম বিজয়ী হয়েছে।

পবিত্র ভূমির দখল : পবিত্র ভূমিসমূহ দখলে নেওয়ার জন্য ইসলামি দুনিয়ায় ক্রুসেডযুদ্ধের অভিশাপ চাপিয়ে দেওয়া হয়। যে যুদ্ধে হত্যা করা হয় অসংখ্য মুসলমানকে। এবং এর

মাঝে ৯০ বছর ধরে ক্রুসেডাররা বাইতুল মাকদিসকে নিজেদের দখলে রাখে। সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধার করবার পর ক্রুসেডযুদ্ধ আরও তীব্র মাত্রায় আরম্ভ হয় এবং সোয়াশ' বছরেরও অধিককাল তা অব্যাহত থাকে।

ইসলামি বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা : ক্রুসেডযুদ্ধের প্রারম্ভেই ইউরোপে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার বীজ রোপিত হয়ে গিয়েছিল। তখন তাদের উদ্দেশ্য কেবল বাইতুল মাকদিস দখল করবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তারা ইসলামি খেলাফত নির্মূলে প্রয়াসী হয়ে ওঠে। এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, যেকোনো উপায়ে ইসলামি বিশ্বের ভূখণ্ড ও সম্পদকে তারা কবজা করবে।

ইসলামি দুনিয়ার ধ্বংস সাধন : এই সকল উদ্যোগের পেছনে তাদের প্রধান অভিলাষ ছিল দুনিয়া থেকে ইসলাম মিটিয়ে দেওয়া এবং নিজেদের ধর্মকে বিশ্বব্যাপী বিজয়ী করা। শেষমেশ খ্রিষ্টানেরা নিজেদের উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের জন্য তাতারদের সাথে হাত মেলানোর চেষ্টাও করে। যার ফলে বাস্তবেই এমন হুমকি দেখা দিয়েছিল যে, তারা উল্লিখিত চার লক্ষ্য পূরণে সফল হয়ে যাবে।

৪.২.৩: অতীতে বাতিলপন্থিদের ব্যর্থতার কারণ

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে মুসলমানেরা এমন তিনটি মৌলিক উদ্যোগ গ্রহণ করে, যার ফলে খ্রিষ্টান ও তাতার-শক্তির সকল অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় :

১. মুসলমানেরা তাতারদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করে দেন। যার ফলে তাতাররা দলে দলে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হতে থাকে। এবং উম্মত মুক্তি লাভ করে এই মানবতাবিধ্বংসী আজাব থেকে।

২. মুসলমানেরা খেলাফতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয় এবং বাগদাদে খেলাফতে আব্বাসিয়ার ধ্বংসের মাত্র দুই বছর পরই সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবার্স মিশরে খেলাফতে বনু আব্বাস প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন। আর এর মধ্য দিয়ে উম্মতের ঐক্য ও সংহতি অব্যাহত থাকে।

৩. মুসলমানেরা জিহাদের পতাকা সমুন্নত রাখে এবং কাফির-শক্তির সামনে মাথানত করে না। লাগাতার কয়েক বছর সুলতান আইয়ুবীর উত্তরসূরিরা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এবং সুলতান জালালুদ্দীনের মতন জানবাজ মুজাহিদ তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান।[৫৯] তারপর সুলতান সাইফুদ্দীন কুতুজ আইনজালুতে তাতারদের পরাজয়ের স্বাদ চাখিয়ে তাদের অব্যাহত বিজয়ের অহংকার ধূলিসাৎ করে দেন এবং সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবার্স সপ্তম ক্রুসেডযুদ্ধে সেন্ট লুইকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে খ্রিষ্টান-শক্তির অহম একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন।

---

[৫৯] এই মহান মুজাহিদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন : 'খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস'। মাওলানা ইসমাইল রেহান প্রণীত দুই খণ্ডের এই বইটির অনুবাদ প্রকাশ করেছে নাশাত পাবলিকেশন। অনুবাদ করেছেন আলমগীর মুরতাজা।

৪.২.৪: চিন্তাধারা এবং মানসিকতা পরিবর্তনের কাল

যাই হোক, এটাই হলো সেই অভিজ্ঞতা, যার পর ইসলামের বিপক্ষ-শক্তির দৃঢ় ধারণা জন্মে যায় যে, ইসলামি খেলাফত ধ্বংস করা, পবিত্র ভূখণ্ড দখল করা এবং মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। তার পূর্বে পথ মসৃণ করে তুলতে হবে এবং প্রস্তুতির বিভিন্ন স্তর পার হয়ে তবে সাফল্যের দিকে এগোতে হবে। অন্যদিকে এই সময়টাতেই প্রাচ্যতাত্ত্বিক আন্দোলন অগ্রসর হতে থাকে এবং দুই শতকেই ইউরোপ জ্ঞান, চিন্তা ও অ্যাকাডেমিক বিচারে বেশ প্রাগ্রসর হয়ে উঠতে আরম্ভ করে। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, গণিত এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় ইউরোপ বেশ উন্নতি লাভ করে ওঠে। বহিঃরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কোন্নয়নের দিক থেকেও তারা অন্যদের ছাড়িয়ে যেতে থাকে। ইটালির পরিব্রাজক মার্কো পোলো (Marco Polo) খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষদশকে ইউরোপ থেকে চীন পর্যন্ত সফর করেন। ইউরোপের উন্নতি-অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় তার এই ভ্রমণ কূটনৈতিকভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ভ্রমণযাত্রায় তিনি ভূমধ্যসাগর, শাম, বাইতুল মাকদিস, ইরাক, খোরাসান এবং পামির পর্বতমালার দুর্গম ও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছিলেন। মার্কো পোলো চীন সফরকালে সেখানকার তৎকালীন বাদশাহ কুবলাই খানের দরবারে অবস্থান করে ইউরোপ এবং চীনকে কাছাকাছি আনার চেষ্টা করেন। তার গ্রন্থ (মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনি) ইউরোপকে বহিঃরাষ্ট্র সম্বন্ধে যে অবগতি এনে দিয়েছিল, তা তাদের মনস্তাত্ত্বিক বিস্তৃতির পেছনে বেশ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতকে ইউরোপ অস্ত্র আবিষ্কার ও সমরাস্ত্রের মজুদ বৃদ্ধির ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিতে শুরু করে। এক উসমানি সাম্রাজ্যের কথা বাদ দিলে বলা যায়, সমস্ত ইসলামি দুনিয়ার চাইতে উন্নততর অস্ত্র তারা তৈরি করতে থাকে। যার ফলে সমগ্র দুনিয়া নিজেদের কর্তৃত্বাধীন করবার বাসনা তাদের 'দিলে' আরও একবার জেগে ওঠে।

৪.২.৫: সাম্রাজ্যবাদী কল্পনা বাস্তবায়নকারী চারটি ঘটনা

এই ক্ষমতা, প্রতিভা এবং আরও কিছু বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৪৫০-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ এই অর্ধশতাব্দীকালে ইউরোপ এমন ঘুমন্ত দানবের মতো আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠতে আরম্ভ করে, যার ঘুম পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এমন ঘটনা, যার ফলে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারায় নতুন জোয়ার আসে, তার সংখ্যা চারটি :

১. ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে উসমানি খেলাফতের তুর্কি শাসক সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ কন্সটান্টিনোপল জয় করে প্রাচীন বাইজান্টাইন রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেন। এই অবস্থায় সমস্ত ইউরোপ যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর গিয়ে পড়ে এবং কন্সটান্টিনোপল হাতছাড়া হবার প্রতিশোধ গ্রহণ করা তাদের জন্য জাতিগত চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়।

২. কন্সটান্টিনোপল মুসলমানদের হাতে চলে গেলে সেখানকার অধিবাসী বহু রোমান দার্শনিক এবং ফিলোসফার ইউরোপ চলে যান। তারা সেখানে আরও একবার প্রাচীন গ্রিকদর্শন ও ফালসাফার প্রচার আরম্ভ করেন। ইউরোপজুড়ে প্রাচ্যতাত্ত্বিক আন্দোলন চলমান থাকার সুবাদে ইতোমধ্যে সেখানে জ্ঞানচর্চার গতি ঊর্ধ্বমুখী ছিল। এখন দ্বিতীয়বার লোকেরা গ্রিকদর্শন পড়ে অ্যারিস্টটল এবং প্লেটোর রাজনৈতিক দর্শন দ্বারা বিপুলমাত্রায় প্রভাবিত হতে শুরু করে। আর সেই সাথে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারারও বিকাশ ঘটতে থাকে।

৩. এই সময়ে খ্রিষ্টানদের স্পেন দখলের মর্মান্তিক ঘটনা পৃথিবীর মঞ্চে মঞ্চায়িত হয়। জানুয়ারি ১৪১৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাস্টোলার (Castilr) শাসক ফার্ডিন্যান্ড স্পেনে মুসলমানদের শেষ দুর্গ গ্রানাডাও দখল করে নেয়। আর এরই মধ্য দিয়ে সেখানে মুসলমানদের আটশ বছরের শাসনকাল পরিসমাপ্তিতে পৌঁছে। এই ঐতিহাসিক বিজয় ইউরোপের অহংকার বৃদ্ধিতে এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা গতিশীল করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৪. এই সময়েই তুর্কিরা ইউরোপের সমস্ত বিশৃঙ্খলা ও চক্রান্তের বিষয় আমলে নিয়ে প্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে ইউরোপের আমদানি-রপ্তানির পথ বন্ধ করে দেয়। যার কারণে ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত চিন্তায় পড়ে যায়। তারা ব্যবসার জন্য নতুন রুটের সন্ধানে নামে। এবং মুসলিম-দুনিয়ার যেসব দেশ বাহ্যত কিছুটা স্বাবলম্বী তবে সামরিকভাবে দুর্বল ছিল, তাদের পর্যন্ত পৌঁছতে সমর্থ হয়। আর এভাবেই মুসলিমবিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের দুয়ার খুলে যায়।

যাই হোক, এই ছিল চারটি কারণ। যার ফলে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী লালসা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং সূচনা ঘটে এক নতুন সময়ের।

৪.২.৬: সাম্রাজ্যবাদের মূল পর্ব

বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদের মূল পর্ব শুরু হয় খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষদিকে। গভীরভাবে লক্ষ করলে স্পষ্ট হবে যে, মুসলমানদের নাস্তানাবুদ করবার প্রাচীন যে পন্থা, শুরু থেকেই খেলাফত বিনষ্ট করবার যে লক্ষ্য, ইউরোপ তা ত্যাগ করে। এবারে তারা অগ্রসর হতে থাকে ভিন্ন পন্থায়। তাদের লক্ষ্য হয়—প্রথমত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ব্যবসা ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার দিক দিয়ে নিজেদের শক্তিশালী করে তোলা। দ্বিতীয়ত ব্যবসা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করবার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। তৃতীয়ত মুসলমানদের বাণিজ্যিক ও সামরিকভাবে অবরোধ করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া। এই পর্যায়ে এসে খেলাফত ধ্বংস করা, ইসলামি দুনিয়াকে বিভক্ত করা এবং মুসলমানদের সাথে সখ্য তৈরির মতন গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য পেছনে সরিয়ে রাখা হয়।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইউরোপের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর চিত্র আমাদের সমুখে যেভাবে ধরা দেয় :

১. অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতা অর্জন।
২. ইসলামি বিশ্বে অর্থনৈতিক এবং সামরিক অবরোধ।
৩. ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব অর্জন।
৪. ইসলামি বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা।
৫. ইসলামি খেলাফতের বিনাশ।
৬. ইসলামি বিশ্বের বিভক্তিকরণ।
৭. ইসলামি বিশ্বের বড় বড় মনীষীদের শেষ করে দেওয়া।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গৃহীত পদক্ষেপের এই দাস্তান কিছুটা বিস্তারের সাথে জানা আমাদের জন্য জরুরি, যাতে আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের হামলার পদ্ধতি সম্বন্ধে ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারি। এই দাস্তানের বিস্তারিত পাঠ উল্লিখিত ক্রমধারা অনুপাতেই শুরু করা যাক :

প্রথম ধাপ : অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতা অর্জন

প্রাচীনকাল থেকেই প্রাচ্যের সাথে ইউরোপের বাণিজ্যের রাস্তা ছিল দুইটি :

১. মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে নেমে উটে করে লোহিতসাগর পর্যন্ত। এরপর সেখান থেকে আবার সামুদ্রিক জাহাজে চড়ে হিন্দুস্থান এবং দূরবর্তী প্রাচ্য (Far East)।
২. সিরিয়ার উপকূলে অবতরণ করে স্থলপথ অবলম্বন করা হতো। ইরাক এবং খোরাসানের পথ ধরে কাফেলা হিন্দুস্থান এবং চীন পর্যন্ত পৌঁছে যেত।

খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতকে এই দুই পথের নিয়ন্ত্রণ ছিল উসমানি খেলাফতের হাতে। ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ীরা এই রুট ব্যবহার করে প্রাচ্যের দেশগুলোতে যাতায়াত করত, নিজেদের পণ্য আনা-নেওয়া করত এবং ন্যায়সঙ্গত মুনাফা অর্জন করত। যদিও তাদের উৎপাদিত পণ্য অত্যন্ত নিম্নমানের ছিল তারপরও তাদের কিছু পণ্য হাতে হাতেই বিক্রি হয়ে যেত। যেমন, উলের পোশাক, তালা, আয়না এবং চকোলেট। এই বাণিজ্যের সবচাইতে বড় মার্কেট ছিল হিন্দুস্থান। এখানকার উৎপাদিত পণ্য এবং গরম মশলা ইউরোপে খুবই জনপ্রিয় ছিল। ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ীরা নীল, গুড়, সুতি কাপড়, ঢাকাইয়া মসলিন, কাগজ এবং কারপেট ও গালিচা এখান থেকে ক্রয় করে নিজেদের দেশে নিয়ে যেত এবং সেখানে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে বিপুল মুনাফা অর্জন করত।

তুরস্ক যখন নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে ইউরোপের জন্য স্থল ও জলভাগের বাণিজ্যিক পথ বন্ধ করে দিলো, তখন গোল মরিচ, গরম মশলাসহ প্রাচ্যের সকল বাণিজ্য তাদের হাতে চলে এলো। ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ীরা তাদের সকল পণ্য মিশর বন্দরে সুলভ মূল্যে বিক্রি করে দিতে লাগলো আর অন্যদিকে তুরস্ক থেকে প্রাচ্যের উৎপাদিত পণ্য চড়া মূল্যে কিনতে বাধ্য হয়ে পড়ল। এভাবে ইউরোপের অর্থনৈতিক

স্বনির্ভরতা ও স্বাবলম্বিতা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেল। এই বাণিজ্যিক ক্ষতির মুখে পড়ে ইউরোপিয়ান নাবিকেরা আটলান্টিক মহাসাগর ধরে প্রাচ্যে যাবার নতুন পথের সন্ধানে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে।

যদিও নাবিকদের এই প্রচেষ্টার পেছনে প্রধান প্ররোচক হিসেবে কাজ করেছিল তুর্কির ক্ষমতাকে খর্ব করা এবং কনস্টান্টিনোপল হাতছাড়া হবার বদলা নেওয়ার জজবা; কিন্তু ইউরোপ তখনও অতটা শক্তিধর হয়ে ওঠেনি যে, উসমানিদের সাথে টক্কর দিয়ে পেরে উঠবে। সে কারণে বাণিজ্যিক স্বার্থ হাসিল করে নিজেদের অর্থনীতিকে মজবুত করবার প্রতিই তারা অধিক জোর দেয়। যার জন্য তারা প্রথম পদক্ষেপ নেয় বাণিজ্যিক পথ সন্ধান করে তুর্কির পক্ষ থেকে আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যর্থ করে দেবার। সে কারণে ইউরোপের বড় বড় ব্যবসায়ী এবং নেতৃবৃন্দ এই চেষ্টায় নেমে পড়ে। এই সময়কার একজন ইউরোপিয়ান প্রিন্সের গল্পও জানা যায়, যিনি তার সমুদয় সম্পদ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের সন্ধানে ব্যয় করে ফেলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হতে পারেননি।

ভাস্কো ডা গামার প্রয়াস

এই প্রয়াস অব্যাহত থাকে। খ্রিষ্টানদের একটি টেম্পলার-সংস্থা এই কাজে অক্লান্তভাবে নিরত থাকে। ক্রুশের জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে লড়াই করবার মানসে এই সামরিক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করা হয় প্রথম ক্রুসেডের অব্যবহিতকাল পরেই, বাইতুল মাকদিসে। ইতোমধ্যেই মুসলমান তাদের রক্তপাত ও নৈরাজ্য প্রত্যক্ষ করে উঠেছিল। টেম্পলেররা ছিল সুদি-কারবারি। ব্যাংকের মাধ্যমে বড় বড় বাদশাহদের ঋণ দিয়ে নিজেদের দাস বানিয়ে নিতো। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী যখন বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধার করে শামের সমুদ্র উপকূলকে টেম্পলারদের দুর্গ-মুক্ত করেন তখন তারা ইউরোপে ফিরে যায়। ইউরোপে ফিরে গিয়ে এক শতক ধরে তারা সেখানে যে ফেতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা ঘটায়, তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৩১২ খ্রিষ্টাব্দে পোপ এই টেম্পলার সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এরপর টেম্পলাররা আত্মগোপনে চলে যায়। এবং কিছুদিন আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকার পর 'আর্ড রাউফ ক্রাইস্ট' নামে পর্তুগালে দ্বিতীয়বার আত্মপ্রকাশ করে। পোপ এবারে ১৩১৯ খ্রিষ্টাব্দে এই নতুন সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দিয়ে দেন।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপ যখন নতুন সমুদ্রপথের সন্ধানে নামে, তখন 'আর্ড রাউফ ক্রাইস্ট' এই উদ্যোগে এগিয়ে আসে। পর্তুগাল এবং স্পেনের শাসকেরা এই ধরনের উদ্যোগে বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে। ফলে ইউরোপিয়ান শাসকেরা প্রথমবারের মতন জানতে পারে যে, পূর্ব-আফ্রিকান উপকূলে মুসলমানদের ছোট তবে অবস্থাপন্ন কিছু সাম্রাজ্য আছে, যাদের সামরিক শক্তি প্রায় না থাকার মতন। এই উপকূলীয় জনপদগুলো যেন-বা আন্তর্জাতিক বাজারের কেন্দ্র,

যেখানে আরব, হিন্দুস্থান এবং চীন থেকে বাণিজ্য তরী এসে ভেড়ে। এক পর্তুগিজ নৌ-অভিযাত্রী বার্তালোমিউ ডিয়াস (Bartolomeu Dias) ১৪৮৮ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার কোণ পর্যন্ত পৌঁছতে সমর্থ হন। এবং তিনি এটা বুঝে নিয়েছিলেন যে, সেখান থেকে মহাদেশের ভূমণ্ডল প্রাচ্যের দিকে মোড় নিচ্ছে। আর এর পরেই ইউরোপিয়ান নাবিকদের প্রাচ্যের দেশগুলোতে পৌঁছার নতুন পথ খুঁজে পাবার আশা বড় আকারে দেখা দিতে শুরু করে।

সেই সময়ে স্পেনে রাজা ফার্ডিন্যান্ড এবং পর্তুগালে সম্রাট ম্যানুয়েলের শাসন চলছিল। এই দুজনের ইসলাম-বিদ্বেষ আজও প্রবাদ হয়ে আছে। ইসলাম ও মুসলিম-বিদ্বেষিতার ক্ষেত্রে তারা দুজন যেন-বা একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার প্রয়াসে থাকত। তখন পর্যন্ত পর্তুগাল এবং স্পেনে এক বিরাট সংখ্যক মুসলমানের বসবাস ছিল। কিন্তু এই দুই উন্মাদ শাসক নিজেদের অধীনস্থ মুসলমানদের জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে কিংবা জবরদস্তিমূলক খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে নিতে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করে যে, অল্প সময়ের মধ্যেই স্পেন এবং পর্তুগালের বড় বড় শহর একেবারে মুসলমানশূন্য হয়ে পড়ে।

ফার্ডিন্যান্ড এবং তার রানি ইসাবেলা, দুজনের প্রবল বাসনা—মুসলিমশক্তির বিরুদ্ধে তারা সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর হয়ে উঠবে। আর সেই বাসনা থেকে নতুন সামুদ্রিক পথ খুঁজে বের করবার উদ্যোগেও তারা এগিয়ে আসে। গ্রানাডা দখলের অব্যবহিতকাল পরেই আগস্ট ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত নৌ-অভিযাত্রিক ক্রিস্টোফার কলাম্বাসকে প্রাচ্য-অভিমুখী পথ আবিষ্কারের জন্য যাত্রা করিয়ে দেয়। কারণ পৃথিবী যে গোল—ইতোমধ্যেই ইউরোপ সেটা জেনে গিয়েছিল। যে কারণে কলাম্বাসের দৃঢ় ধারণা জন্মে, সে পশ্চিম অভিমুখে চলতে থাকলে একদিন অবশ্যই পূর্বদেশীয় উপকূলে পৌঁছে যাবে। কিন্তু সে পথ হারিয়ে নতুন দুনিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছে যায়। বাহ্যত তার এই সফর ব্যর্থ হয়। সে প্রাচ্যদেশের পথ আবিষ্কার করে উঠতে পারে না। কিন্তু প্রাচ্যদেশের অনুসন্ধান ব্যর্থ হলেও ইউরোপ সম্ভাবনার এক নয়া দুনিয়ার সন্ধান পেয়ে যায়। এবং অনাগত দিনগুলোতে ইউরোপ সেই দুনিয়ার সমস্ত প্রকারের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের একচ্ছত্র মালিক বনে যায়।

এদিকে পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়েলও নতুন দেশের সন্ধান পেতে এবং তার সমুদয় সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকে। এমনকি এই আশঙ্কাও তৈরি হয়ে যায় যে, ইউরোপের এই দুই নয়া ক্রমবর্ধমান শক্তি আবার পারস্পরিক লড়াই-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে না তো! এই পর্যায়ে এসে ইউরোপের ভাবনা-চিন্তার প্রতি আমাদের একটু নজর দেওয়া উচিত। পর্তুগালের পক্ষ থেকে কোনো নতুন উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বেই খ্রিষ্টান দুনিয়ার তৎকালীন পোপের মধ্যস্থতায় এই সমস্যার নিরসন করে নেওয়া হয়। পোপ ফায়সালা প্রদান করেন যে, স্পেন আটলান্টিকের পশ্চিম দিকে অভিযান পরিচালনা করবে আর পর্তুগাল আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব দিকে আফ্রিকা এবং ভারত মহাসাগরে (Indian Ocean) তাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

এই আপস-চুক্তির পর পর্তুগাল ভাস্কো ডা গামা নামের এক নৌ-অভিযাত্রীর নেতৃত্বে একটি নৌ-অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়। ভাস্কো ডা গামা একরোখা এবং খুবই কঠিন মানসিকতার অধিকারী ছিল। তার প্রতিপালন হয় আর্ড রাউফ ক্রাইস্টের রক্তাক্ত পরিবেশে। কারণ তার বাবা ছিলেন এই সংগঠনের নেতৃস্থানীয় কর্তাব্যক্তি।

এই উদ্যোগের পেছনে ইউরোপের একাধিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। প্রধান লক্ষ্য তো এটাই ছিল যে, হিন্দুস্থান পৌঁছার পথ আবিষ্কার করবার চেষ্টা চালানো হবে। পাশাপাশি পর্তুগালের মনে বিশেষ একটি বাসনাও দানা বেঁধে ছিল। সেই বাসনার জন্ম একটি ভুল ধারণা থেকে। পর্তুগালের কেন যেন ধারণা হয় যে, ভারতবর্ষে খ্রিষ্টানদের বসবাস। এজন্য তারা পরিকল্পনা আঁটে, সেখানকার খ্রিষ্টানদের সাথে চুক্তি করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তুলবে। এবং তারা এই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে বসে যে, বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি যতদূর সম্ভব লুটতরাজ চালিয়ে মুসলমান এবং প্রাচ্যীয় দুর্বল শাসনব্যবস্থাকে ভীত করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে ভাস্কো ডা গামা পর্তুগালের কারাগার থেকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বহু আসামি, সন্ত্রাসী এবং মাস্তানকে নিজের সাথে এই শর্তে নিয়ে নেয় যে, তারা খ্রিষ্টধর্মের জন্য সর্বদা জীবন দিতে প্রস্তুত থাকবে।

৮ জুলাই, ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ভাস্কো ডা গামার নৌবহর লিসবন বন্দর থেকে যখন যাত্রা আরম্ভ করতে থাকে তখন সাম্রাজ্যবাদের এই প্রথম দলকে পোপের বার্তা পাঠ করে শোনানো হয়। সেই বার্তায় তাদের অনুমোদন দেওয়া হয় মুসলমান এবং আফ্রিকার অধিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করবার। চারটি জাহাজের এই নৌবহরে অভিযাত্রীর সংখ্যা ছিল সর্বমোট ১৭০ জন। তিন বছরের খাদ্যসামগ্রী এবং ব্যবহার্য সাথে নেওয়া হয়। চারটি নতুন তোপও তাদের সাথে থাকে। অনবরত তিন মাসের সফর শেষে ছয় হাজার মাইল সমুদ্র-পথ পাড়ি দিয়ে তারা ডিসেম্বর মাসে আফ্রিকার এক কোনার দিকের জনপদ কেপটাউন পৌঁছে। এরপর সেখান থেকে প্রাচ্যের দিকে মোড় নেয়। সমুদ্র-পথে তাদের কাছে এ ছিল একদমই অপরিচিত এক রুট। তারা নিরাপদে মোজাম্বিক (Mozambique) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মোজাম্বিক তৎকালে মুসলিমরাজ্য ছিল। ভাস্কো ডা গামা এখানে মুসলমান বেশ ধরে মোজাম্বিকের সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং সেখানকার প্রথা অনুযায়ী সুলতানের সামনে কিছু উপঢৌকন হাজির করে। যার মধ্যে ছিল তামার তৈজসপত্র, টিনের ঘণ্টা এবং সুতি কাপড়। সুলতান এই সকল জিনিস দেখে অসন্তুষ্ট হন। মোজাম্বিকের বাজারেও সে-সব পণ্য তেমন মূল্য পায় না। কারণ, পণ্যগুলোর মান ইসলামি দুনিয়ার বিচারে ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। ভাস্কো ডা গামা বাণিজ্যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে ফিরবার কালে মোজাম্বিকের উপকূলে গোলা নিক্ষেপ করতে করতে পলায়ন করে।

এখন তার নৌবহর ইসলামি দুনিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল। পথিমধ্যে তারা আরবদের বাণিজ্যিক জাহাজেরও দেখা পায়। জাহাজগুলোতে কোনো ধরনের

নিরাপত্তাকর্মী কিংবা অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। ভাস্কো ডা গামা সেইসব জাহাজে লুটতরাজ চালায়। এবং এরই সাথে পর্তুগিজ জলদস্যুদের এই ধারণাও পোক্তভাবে তৈরি হয়ে যায় যে, সমুদ্রে মুসলমানদের নিরাপত্তা-ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। তাদের উপর লুটতরাজ চালানো তেমন কঠিন কিছু নয়। ফেব্রুয়ারি ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদের এই প্রথম দল কেনিয়ার বন্দরনগরী মালিন্ডিতে (Malindi) পৌঁছয়। এখানে ভাস্কো ডা গামার সাথে কিছু হিন্দু নাবিকের সাক্ষাৎ হয়। ভাস্কো ডা গামা তাদেরকে খ্রিষ্টান মনে করে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে নেয়। ওই হিন্দু নাবিকেরাই পর্তুগিজ দস্যুদের পথ দেখিয়ে হিন্দুস্থান পর্যন্ত নিয়ে আসে (সুতরাং, মুসলিম অ্যাডমিরাল আহমাদ বিন মাজেদ পথ দেখিয়ে তাদের হিন্দুস্থান নিয়ে আসেন—প্রাচ্যবিদদের এমন দাবি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও মিথ্যা)।

১৮ মে ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদের এই প্রথম কাফেলা হিন্দুস্থানের বন্দরনগরী কালিকটের উপকূলে নোঙর ফেলে। ভারতবর্ষে তখনও মোগলসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এবং দিল্লির মুসলমান শাসকদের সমুদ্র উপকূলে কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তিও তৈরি হয়নি। কালিকট এবং উপকূলীয় অধিকাংশ রাজ্য স্বায়ত্তশাসিত ছিল। ভাস্কো ডা গামা কালিকটের রাজার মন জয় করবার জন্য কাঁচের মালা, মধু এবং সুতি কাপড় উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করে, যা দেখে একজন আরববণিক বলে ওঠেন, 'রাজা এই বর্জ্য কখনোই গ্রহণ করবেন না।'

এমনটাই ঘটে। শুরুতে রাজা পর্তুগিজ নাবিকদের বেশ সমীহ করেন। কিন্তু উপহার-উপঢৌকন দেখে তার মেজাজ পরিবর্তন হয়ে যায়। এবং ভাস্কো ডা গামা তার উদ্দেশ্যে পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারে না। তবে সে আফ্রিকা এবং হিন্দুস্থানের সমুদ্র-পথের নিরাপত্তার দুর্বলতার বিষয়টা ঠিকই ধরতে পারে। এখানে তিন মাস অবস্থান করে সে আবার পর্তুগাল ফিরে যায়।

তার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে বাদশাহ ম্যানুয়েল ক্যাপ্টেন ক্যাবরেলের (Pedro Alvares Cabral) নেতৃত্বে ভারত-অভিমুখে আরেকটি অভিযান পরিচালনা করেন। কালিকটের রাজা পর্তুগিজদের যথাযথ সম্ভাষণ করেনি। এই অজুহাতে প্রতিশোধস্বরূপ ক্যাপ্টেন ক্যাবরেল শহরে গোলাবাজি করে এবং আরেক উপকূলীয় রাজ্য থেকে গরম মশলা বোঝাই জাহাজ নিয়ে দেশে ফিরে যায়।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগমনের উদ্দেশ্য তো কেবল বাণিজ্য নয়; বরং দুর্বল সাম্রাজ্য জবরদস্তিমূলক দখলে নেওয়া, সেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং রক্তপাত—এসব তো তাদের ইশতেহারেই ছিল। সে লক্ষ্যেই ভাস্কো ডা গামা ১৫০২ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার পুরোদস্তুর রণসজ্জিত নৌবাহিনী নিয়ে হিন্দুস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করে। পথিমধ্যে মোজাম্বিক এবং তানজানিয়ায় থেমে সেখানে লুটতরাজ চালায় এবং নির্বিচারে মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করে। হিন্দুস্থানে পৌঁছে সে গোয়ার একটি শহরে হামলা করে এবং তাকে নিজের খাজনা আদায়ের কুঠি হিসেবে ঘোষণা করে। কন্নৌর

(Kannur) উপকূলে সে একটি আরব নৌযান ঘেরাও করে, যাতে উমরা শেষে মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী সাতশ পুরুষ নারী বৃদ্ধ এবং শিশু যাত্রী ছিল। ভাস্কো ডা গামা জাহাজের সমুদয় সম্পদ লুণ্ঠনের পর তীর্থযাত্রীদের একটি ঘরে আবদ্ধ করে জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয়। সমস্ত যাত্রী মুহূর্তেই জ্বলেপুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়।

ভাস্কো ডা গামা অতি দ্রুত কালিকট বন্দরে হামলা চালিয়ে প্রায় ২৫ জন মুসলমান ও হিন্দুকে গ্রেফতার করে। শহরের মধ্যিখানে লোকজনের ভিড়ে তাদের হাত-পা এবং নাক-কান কেটে তাদের তড়পানোর দৃশ্য তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করতে থাকে। কতক মুসলমানকে জাহাজের মাস্তুলের (Mast) সাথে বেঁধে তিরন্দাজির নিশানা বানায়।

ভাস্কো ডা গামার পর আরো এক পর্তুগিজ কমান্ডার আলবুকার্ক (Affonso de Albuqurque) গোয়াতে মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করে নিজের শাসকের কাছে এই মর্মে পত্র লেখে যে, 'আমার বাহিনী চার দিন অনবরত রক্তপাত চালিয়েছে, শহরের মুসলমানদের শেষ করেই আমাদের তরবারির রক্তপিপাসা মিটেছে। আমরা তাদের লাশ দিয়ে মসজিদগুলো ভরিয়ে তুলেছি এবং মসজিদে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি।'

এই ধরনের দৃশ্য চিত্রায়িত করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলমানদের হাতে তাদের পরাজয়ের ক্ষোভ মেটাচ্ছিল কেবল নয়; বরং এসবের মাধ্যমে তারা শুরু থেকেই দুনিয়াজুড়ে ত্রাস ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

হিন্দুস্থানের ব্যাপারে পর্তুগিজদের যে অনুমান ছিল, সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী খ্রিষ্টান, যাদের সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে নেওয়া যাবে—তা শুরুতেই সম্পূর্ণরূপে ভুল প্রমাণিত হয়। তদুপরি ভাস্কো ডা গামার অভিযানের ফলে ইউরোপের সামনে বাণিজ্যের নতুন পথ উন্মোচিত হয় এবং লুটতরাজ চালানোর জন্য তারা একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়ে যায়। আর এভাবেই ইউরোপের উপর তুর্কির বাণিজ্যিক অবরোধ বিফল হয়ে দেখা দেয়। ওদিকে কলাম্বাসের অভিযান ইউরোপকে ধনসম্পদে পরিপূর্ণ এক নতুন দুনিয়ার সন্ধান দেয়। ফলে ইউরোপে সচ্ছলতার জোয়ার দেখা দেয়। যদিও ইউরোপের সচ্ছলতা ও স্বাবলম্বিতার যেই ইমারত, তা গড়ে উঠছিল অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষের অস্থিমজ্জার উপর।

দ্বিতীয় ধাপ : ইসলামি বিশ্বে অর্থনৈতিক এবং সামরিক অবরোধ

ইউরোপ নতুন বাণিজ্যিক রুটের মাধ্যমে তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের সফর অতিক্রম করে চলছিল। তা সত্ত্বেও তাদের ধারণা ছিল না যে, এত স্বল্প সময়ের মধ্যে মুসলমানদের উপর অর্থনৈতিক ও সামরিক অবরোধ প্রদানে তারা সফলতার মুখ দেখতে পাবে। কিন্তু ইউরোপের নাবিকেরা তাদের এই বিশ্বভ্রমণ ও লুটতরাজের মাঝে ভালোভাবেই বুঝে নিয়েছিল যে, মুসলমান তাদের সমুদ্রপথের নিরাপত্তার দিকটাতে

মারাত্মকভাবে উদাসীন। উসমানি সাম্রাজ্য ছাড়া কারুর সমুদ্র-সীমানাতেই কোনো প্রকার প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা নেই। বিশেষ করে ওই সকল এলাকা, যা উসমানি সাম্রাজ্যের নাগালের বাইরে, বহু দূরে, সেগুলো একদমই অরক্ষিত পড়ে আছে। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সশস্ত্র বাহিনী ইসলামি দুনিয়ার জল-সীমানা নিজেদের দখলে নিয়ে নিতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তাদের ঘেরাও এমন মজবুত হয়ে ওঠে যে, ইসলামি দুনিয়া সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক এবং সামরিক অবরোধের শিকার হয়ে পড়ে।

পর্তুগিজ উপনিবেশ

হিন্দুস্থানের পর পর্তুগাল পারস্য উপসাগর এবং আরবসাগরকে সব ধরনের সুরক্ষা ও প্রতিরোধ থেকে মুক্ত দেখতে পেয়ে ১৫১৫ খ্রিষ্টাব্দে তারা মাস্কাট, হরমুজ এবং বাহরাইনের মতন গুরুত্বপূর্ণ বন্দর দখল করে নেয়। আরব-বণিকেরা, যারা শত বছরেরও অধিককাল ধরে এই রুটগুলো ব্যবহার করে আসছিল, কয়েকদিনের মধ্যেই তারা চিত্রপট থেকে বাইরে ছিটকে পড়ে। এশিয়া থেকে ইউরোপ অবধি বাণিজ্য পর্তুগিজদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় কেবল নয়; বরং আরব-অনারব বাণিজ্যিক জলপথেও ইউরোপের দখলদারি প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়।

এ অবস্থায় উসমানি খেলাফত কয়েকবার তাদের নৌবাহিনী পাঠিয়ে ইউরোপিয়ান নাবিকদের ওই সকল সমুদ্র থেকে বিতাড়নের খানিক চেষ্টা করেছে বটে; কিন্তু প্রতিবারই তাদের ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসতে হয়। আর তার কয়েক বছর পর এই সমস্যাকে অন্য মুসলিম দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ভেবে তারাও এড়িয়ে যেতে থাকে। এবং নিজেদের সুরক্ষার জন্য লোহিতসাগর ও ভূমধ্যসাগরের প্রতিরক্ষাকেই যথেষ্ট মনে করে। পরিণামে ভারত মহাসাগর ও আরবসাগরে ইজারাদারি প্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে পড়ে। তাদের বাঁধা দেওয়ার মতন আর কেউ থাকে না।

প্রশান্ত মহাসাগরে সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব

ইউরোপ এই পর্যন্ত নতুন আবিষ্কৃত আমেরিকার ব্যাপ্তি এবং তার অপর পাড়ের দুনিয়াসম্বন্ধে কোনো কিছুই জানত না। ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক ফার্ডিনান্ড ম্যাজিলান স্পেনের রাজা পঞ্চম ফিলিপের পৃষ্ঠপোষকতায় আমেরিকার অপর পাড় দেখবার বাসনায় কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। তিনি তার নৌবহর নিয়ে স্পেন থেকে আমেরিকা-অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। প্রায় সোয়া দুই মাস ধরে আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে ভেসে থেকে আমেরিকার পূর্ব উপকূল পর্যন্ত পৌঁছতে সমর্থ হন। এটা ছিল ব্রাজিলের একটি বন্দরনগরী।

কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দের শেষদিকে এই নৌবহর দক্ষিণের দিকে যাত্রা আরম্ভ করে। এবং দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ কোণ প্রদক্ষিণ শেষে পশ্চিমের দিকে মোড় নেন। দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত তিনি একটিমাত্র প্রণালির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন, যার বর্তমান নাম ম্যাজিলান প্রণালি (Strait of Magellan)।

প্রণালি পার হলে তিনি এক নতুন সমুদ্রের সন্ধান পান, যাকে প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean) বলা হয়। এবং স্প্যানিশরা তার সীমানা পরিমাপ করতে উদ্যোগী হয়। এটা ছিল প্রশান্ত মহাসাগরে কোনো ইউরোপিয়ান নাবিকের প্রথম সমুদ্রযাত্রা। এই সমুদ্র পেরিয়ে তিনি ১৫২১ খ্রিষ্টাব্দে কিছু সবুজ-শ্যামল ও নয়নাভিরাম দ্বীপে গিয়ে পৌঁছেন। নাবিক ম্যাজিলান স্পেনের রাজা ফিলিপের নামের সাথে সম্বন্ধ করে দ্বীপপুঞ্জের নাম রাখে ফিলিপাইন।

ফিলিপাইনে তখন মুসলমানদের শাসন চলছিল। সেখানকার অধিবাসীরা খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকে মুসলিম নাবিক এবং বণিকদের কাজকর্ম এবং দাওয়াত ও তাবলিগে প্রভাবিত হয়ে ইসলামগ্রহণে ধন্য হয়েছিল। স্প্যানিশরা এই সুখী সমৃদ্ধ মুসলিম সাম্রাজ্যটিকে তাদের রক্তপাতের লক্ষ্য বানিয়ে নেয়। ম্যাজিলানের সঙ্গী-সাথিরা ওই এলাকা থেকে অবৈধ পন্থায় স্বর্ণ সংগ্রহ করে। মে ১৫২২ খ্রিষ্টাব্দে তারা প্রাচ্যের দিকে যাত্রা করে ভারত মহাসাগর হয়ে স্পেন পৌঁছয়। আর এরই মধ্য দিয়ে সমগ্র ভূখণ্ডে প্রথমবারের মতন সমগ্র ভূখণ্ডের প্রদক্ষিণ সম্পন্ন হয়।

এরপর আরম্ভ হয় সুদূর প্রাচ্যে স্প্যানিশ সাম্রাজ্যবাদের হামলা। ফিলিপাইনি মুসলমানেরা স্প্যানিশদের নতুন কামানের গোলার মোকাবেলা করে উঠতে সমর্থ হয় না। আর তাই ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে স্প্যানিশরা ফিলিপাইনের উপকূল নিজেদের দখলে নিয়ে নিতে সক্ষম হয়। ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে তারা ম্যানিলাতেও তাদের দখলদারি প্রতিষ্ঠা করে ওঠে (এই দখলদারি ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যার পর ফিলিপাইনে আমেরিকার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে)।

ফিলিপাইন দখলে রাখবার কালে এই স্প্যানিশরা সেখানে খ্রিষ্টবাদের দাওয়াত এবং লোকদের জোরপূর্বক খ্রিষ্টান বানাবার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। যার ফলে বর্তমানকালে সেখানকার মোট জনসংখ্যার ৭০ ভাগ খ্রিষ্টান। ইসলাম ধর্মাবলম্বী, যাদের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ, তাদের আবাস দেশটির দক্ষিণ অংশে।

১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দে স্প্যানিশরা আরো একটি মুসলিম দেশ ব্রুনাইতে হামলা চালায়। ব্রুনাইয়ে তখন মহামারি চলছিল। যার ফলে তারা সেখানে নিজেদের দখলদারি ধরে রাখতে পারেনি। কিন্তু তবু যেতে যেতে তারা ব্রুনাইয়ের সমুদয় সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়।

এইকালেই আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চলে এবং মধ্য-আফ্রিকার রাজ্যগুলিতে স্পেন, পর্তুগাল এবং অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশের সশস্ত্র বণিকদের লুটতরাজ জারি হয়। ফলে আফ্রিকা মহাদেশের ১ কোটি ১৪ লাখ মানুষকে দাস বানিয়ে বিক্রি করা হয় আমেরিকার বাজারে। এবং আফ্রিকার সেই অঞ্চল, যেখানে মুসলমানদের বদৌলতে ইলম ও জ্ঞানচর্চার প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকত, অজ্ঞতা ও মূর্খতার এক দৃষ্টান্তে পরিণত হয়।

এখানে একটি ভুল ধারণা দূর করে নেওয়া জরুরি মনে করছি। অনেকেরই ধারণা—ঔপনিবেশিক সাফল্যের পেছনে প্রধান ভূমিকা ছিল ইউরোপিয়ান দেশগুলোর পারস্পরিক ঐক্যের। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সাম্রাজ্যবাদের সফলতার

পেছনে মুসলিম শাসকদের নিজেদের অবহেলা, আজনবি জাতির উপর সীমাহীন নির্ভরতা, নিজেদের উপকূলগুলোর প্রতিরক্ষায় নজিরবিহীন উদাসীনতা—সবচাইতে বড় কারণ ছিল। আর ইউরোপিয়ান দেশগুলোর কথা যদি বলতেই হয় তাহলে বলবো, তারা কখনোই ঐক্যবদ্ধ ছিল না। বরং সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের পাশাপাশি তারা পারস্পরিক কলহ-বিবাদ এবং লড়াই-যুদ্ধেও লিপ্ত ছিল। তাদের এই পারস্পরিক লড়াই-বিবাদ কোনো-না-কোনো আকৃতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আর একথা বলা একদমই অনর্থক হবে না যে, ইসলামি দুনিয়ার সম্পদ ও ধনভান্ডার লুণ্ঠনের অতিমাত্রিক লোভই ইউরোপিয়ান শাসকদেরকে তাদের পারস্পরিক লড়াইয়ে প্ররোচিত করেছিল। মুসলিম শাসকেরা তখন যদি সুযোগের সামান্যও সদ্ব্যবহার করতেন তাহলে তারা ইউরোপিয়ান শাসকদের মধ্যকার বিরোধ থেকে ফায়দা হাসিল করে তাদেরকে নিজেদের সামনে অবনত করাতে পারতেন। কিন্তু তার বিপরীতে তারা পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বেখবর হয়ে নিজেরাই ইউরোপিয়ান শাসকদের পারস্পরিক বিরোধের শিকার হতে থাকেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের খাঁচায় সোনার পাখি

শুরুতে প্রায় এক শতাব্দীকাল উপমহাদেশে পর্তুগিজদের একচ্ছত্র ইজারাদারি প্রতিষ্ঠা থাকে। আর তারা মনভরে এই বাণিজ্য রুটের ফসল ঘরে তুলতে থাকে। সাথে সাথে খ্রিষ্টবাদের প্রচারকার্যও জারি রাখে। হিন্দুস্থানের সম্পদের প্রাচুর্যের গল্প শুনে ষোড়শ শতকের শেষদিকে হল্যান্ডের অধিবাসী ওলন্দাজেরা (ডাচ) চারটি জাহাজের একটি নৌবহর নিয়ে এ অঞ্চলে আগমন করে। এবং প্রথমবারের মতন এই উৎপাদন ও বাণিজ্যিক স্বর্গ প্রত্যক্ষ করে নিজেদের নয়ন জুড়ায়। আর এভাবেই ভারত মহাসাগরে ডাচদের বাণিজ্যিক যাত্রার ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয়ে যায়।

ইতোমধ্যে হিন্দুস্থানের শাসনক্ষমতায় একটি বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে গেছে। লুধি সাম্রাজ্যের দুর্বল শাসন-ক্ষমতার স্থলে মোগলেরা একটি মজবুত ও পোক্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। যে কারণে গতবারের মতন প্রকাশ্যে হামলা-অভিযান ও বিশৃঙ্খলা ইউরোপিয়ান অভিযাত্রীদের এড়িয়ে যেতে হয়। বিপরীতে তাদের প্রথম চেষ্টা থাকে, তাদের ব্যাপারে মোগলদের নিশ্চিন্ততা বজায় রাখা এবং তাদের বাণিজ্যিক কর্মযজ্ঞে তারা যেন কোনো প্রকারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে—সেই চেষ্টা অব্যাহত রাখা। বাকি স্তরগুলো ক্রমে ধীরে ধীরে অতিক্রম করা হবে—এমন সিদ্ধান্তেই তারা স্থির হয়।

হল্যান্ডের এক ব্যবসায়ী জন হায়েন্নিন ছয় বছর গোয়াতে অবস্থানের পর এখানকার সার্বিক অবস্থা তুলে ধরে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির মাধ্যমে তিনি তার স্বদেশিদের এখানে পুঁজি বিনিয়োগের প্রতি উৎসাহিত করে তুলতে সমর্থ হন। তিনি তার গ্রন্থে এই বিষয়েরও খোলাসা করেন যে, এখানকার বাণিজ্যের উপর পর্তুগিজ বণিকদের কর্তৃত্ব এতটাও মজবুত নয় যে, তাদের ইজারাদারি শেষ করা

যাবে না। ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে সেই বইটি প্রকাশের অব্যবহিত পরেই হল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা 'ইউনাইটেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অব নেদারল্যান্ড' নামে একটি বাণিজ্যিক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে, যাকে 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'ও বলা হয়। ডাচ বণিকদের বাণিজ্যিক কায়দাকানুন পর্তুগিজদের চাইতেও উত্তম বলে প্রতীয়মান হতে থাকে। ফলে দ্রুতই তারা পর্তুগিজ বণিকদের প্রভাব কমিয়ে আনতে সমর্থ হয়। আর এভাবেই হিন্দুস্থানের বাণিজ্যের উপর ডাচ বণিকদের প্রভাব ছায়া বিস্তার করতে থাকে।

ইতোমধ্যে সেই জন হায়েন্লিনের ভ্রমণকাহিনির ইংরেজি, ফরাসি, ইটালি এবং জার্মান সংস্করণও প্রকাশ হয়ে গেছে। এবং আরও নানা দেশের নাবিকেরা হিন্দুস্থানে অভিযানের পরিকল্পনা আঁটতে আরম্ভ করেছে। ইউরোপে হিন্দুস্থানকে বলা হতে থাকে 'সোনার পাখি'। এবং সেই সোনার উপর কামড় বসানোর বাসনা নিয়ে ইউরোপিয়ান বণিকদের সশস্ত্র গ্রুপ একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার প্রয়াসে মেতে ওঠে।

ইতোমধ্যে ডাচ বণিকেরা হিন্দুস্থানের রপ্তানিযোগ্য পণ্য বিশেষ করে গোল মরিচ এবং গরম মশলার মূল্য বৃদ্ধি করে দিয়েছিল। যখন তারা এক পাউন্ড গরম মশলার মূল্য একধাপে পাঁচ শিলিং বৃদ্ধি করে তখন লন্ডনের ব্যবসায়ীরা প্রতিবাদ শুরু করে এবং ২৪ সেপ্টেম্বর ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, স্বতন্ত্র সংস্থা তৈরি করে হিন্দুস্থান থেকে নিজেরাই পণ্য আমদানি করবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ৩১ ডিসেম্বর ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুমতিসাপেক্ষে 'ইস্ট ইন্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানি'র সূচনা হয়, যেখানে ১২৫ জন শেয়ার হোল্ডারের পঁচিশ হাজার পাউন্ড জমা পড়ে। ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে কোম্পানিকে ১৫ বছর পর্যন্ত শুল্কমুক্ত আমদানি-রপ্তানির অধিকার দেওয়া হয়।

স্মরণ রাখা দরকার, এই সময়ে প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ নিজেদের বাণিজ্যিক কোম্পানিকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের মতোই সুবিধাদি দিয়ে রেখেছিল। লুটতরাজ, নির্বিচার হত্যা, যুদ্ধ, চুক্তি, ভূমিদখল এবং দুর্গনির্মাণের অধিকার পর্যন্ত দিয়ে রাখে। উদ্দেশ্য— কোম্পানি যেন সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পদ ও কাঁচামাল লুণ্ঠন করতে পারে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেখাদেখি হল্যান্ড প্রশাসনও ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে নিজেদের কোম্পানিকে উল্লিখিত সুবিধাদি প্রদান করে।

হিন্দুস্থানে বাণিজ্য শুরু করবার লক্ষ্যে ইংরেজরা তাদের প্রতিনিধি স্যার উইলিয়াম হকিন্সকে পাঠিয়ে দেয়। তার জাহাজ ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে সুরাট বন্দরে নোঙর গাড়ে। হকিন্স সেখান থেকে দিল্লি পৌঁছে মোগল বাদশাহ নুরুদ্দীন জাহাঙ্গিরের দরবারে হাজির হয়। আর সুরাটে বাণিজ্যিক কুঠি প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রার্থনার পাশাপাশি বাণিজ্যিক অন্যান্য সুবিধা চেয়ে আবেদন জানায়। কিন্তু হকিন্স সেখানে বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা পায় না। কেননা সেখানে পূর্ব থেকেই পর্তুগিজ বণিকদের বিশেষ অবস্থান তৈরি হয়ে ছিল। হকিন্স তিন বছর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে।

শেষমেশ বাদশাহ জাহাঙ্গির কোম্পানির নামে অনুমতিপত্র জারি করেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পর্তুগিজ বণিকেরা বাদশাহের কান ভারী করে সেই অনুমতি প্রত্যাখ্যান করিয়ে নেয়। অবশেষে ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে হকিন্সকে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যেতে হয়।

তবে ইংরেজরা উদ্যম-হারা হয় না। কিছুদিনের মাথায় তারা ক্যাপ্টেন থমাস বেস্টকে দূত বানিয়ে দুটি সশস্ত্র নৌবহর সহকারে হিন্দুস্থান অভিমুখে প্রেরণ করে। সুরাটের কাছাকাছি পৌঁছতেই পর্তুগিজরা তাদের বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ক্যাপ্টেন বেস্ট তাদের পরাজিত করেন। জাহাঙ্গির যখন এই ঘটনা জানতে পারেন তখন ইংরেজদের সাহসিকতায় প্রভাবিত হয়ে পড়েন। আর এরপরে ক্যাপ্টেন আবেদন নিয়ে তার দরবারে হাজির হলে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে গোয়া, সুরাট ও আহমদাবাদে বাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করে ফরমান জারি করেন।

এটা ছিল ইংরেজদের অনেক বড় সাফল্য। অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের ব্যবসা জমজমাট হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্রিটিশ রাজ প্রথম জেমসের (James VI and I) অভিপ্রায় ছিল পর্তুগিজ এবং ডাচদের এই খেলা থেকে একদম হটিয়ে ব্রিটেন একচ্ছত্রভাবে এই বাণিজ্যের অধিকারী হয়ে উঠবে। এই অভিপ্রায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি তার অত্যন্ত বিচক্ষণ ও চতুর দূত স্যার টমাস রোকে (Sir Thomas Roe) দিল্লি পাঠান। তিনি সেখানে তিন বছর অবস্থান করে বাদশাহর বিপুল আস্থা অর্জনে সমর্থ হন। পর্তুগিজ এবং ডাচ বণিকদের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করানোর মিশনে যদিও তিনি সফল হতে পারেননি; তবে ১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জাহাঙ্গির থেকে এই মর্মে অনুমতি লাভে সমর্থ হন যে, 'আগত দিনগুলোতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে মুক্তভাবে বাণিজ্য করতে পারবে। উপকূলীয় অঞ্চলে ভাড়া বাড়িতে থাকতে পারবে। নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য লেনদেনের ব্যবস্থাপনা নিজেরাই করতে পারবে। ঘর থেকে বের হবার কালে অস্ত্র সাথে রাখতে কোনো বাঁধা থাকবে না। তাদের থেকে সাধারণ রাজস্ব হারের চাইতে অধিক শুল্ক নেওয়া যাবে না।'

এক বছর পর যখন ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে টমাস রো ব্রিটেনে ফেরত যান, ততদিনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুরাট এবং আহমদাবাদে বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন সম্পন্ন করে ফেলেছে। অতি দ্রুত তারা কলকাতার কাছাকাছি হুগলিতেও একটি বাণিজ্যিক দপ্তর খুলে নেয়। এর কয়েক বছর পর তারা গোলকোন্ডার শাসক থেকেও বাণিজ্যের অনুমতি নিয়ে নেয়। এ ছাড়াও তারা পাটনা এবং ঢাকাতেও বাণিজ্যিক স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করে ওঠে। এটা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সূচনা বা প্রারম্ভিককাল, যেইকালে ক্লান্ত নিঃস্ব ও দুরবস্থাপন্ন ব্রিটেন সচ্ছলতা এবং উন্নতি-অগ্রগতির রাস্তায় চলতে শুরু করে। তা সত্ত্বেও ভারতের রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবার দুঃসাহস তাদের তখন পর্যন্ত হয়নি। এই সময়েও ব্রিটেনের শাসকেরা হিন্দুস্থানের ধনী ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের ঈর্ষার নজরে দেখতো। দুই দেশের সঞ্চিত মূলধনের মধ্যকার ব্যবধানের অনুমান এ থেকেই করা যেতে পারে যে, সুরাটের কেবল একজন ব্যবসায়ী আবদুল গফুরের সম্পদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমুদয় পুঁজি এবং মূলধনের চাইতে বেশি ছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে নিজের সুবিধাদির মধ্যে সংযুক্তি আনতে থাকে। ১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে এক ইংরেজ সার্জন গ্যাব্রিয়েল বাউটন শাহজাহানের দরবারে এলেন। তিনি শাহজাহানের রুগ্ণ কন্যা জাহানারার চিকিৎসা করেন এবং তার চিকিৎসায় জাহানারা সুস্থ হয়ে ওঠে। এতে খুশি হয়ে শাহজাহান ঘোষণা করেন যে, চিকিৎসক তার কাছে যা চাইবেন তাকে দেবেন। এই সুযোগে ডাক্তার বাউটন নিজের জাতিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলার বাণিজ্যের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শুল্কমুক্তির আবেদন মঞ্জুর করিয়ে নেন। আর এর মাধ্যমে ইংরেজের বাণিজ্যিক মুনাফার হার বেড়ে যায় কয়েকগুণ। ১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাজ বন্দরে তাদের ইজারাদারি প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে তারা রাজা চান্দগরির[৬০] থেকে মাদ্রাজে একটি প্রশস্ত জমিন ক্রয় করে নেয়। সেখানে বাণিজ্যিক কুঠির নাম করে 'সেইন্ট জর্জ' (Fort St. George) দুর্গ প্রতিষ্ঠা করে বসে।

এই সময়টাতে হল্যান্ড এবং ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যকার প্রতিযোগিতা দিন দিন বাড়তে থাকে। এমনকি আক্ষরিক অর্থে দুই কোম্পানির মধ্যে লড়াইও সংঘটিত হয়ে যায়। যার ফলে ডাচদের হিন্দুস্থানের উপকূল ছেড়ে দিয়ে দূরবর্তী প্রাচ্যের দিকে চলে যেতে হয়। কয়েক বছরের মধ্যে তারা ইন্দোনেশিয়াকে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদের জালে আটকে ফেলতে সমর্থ হয়। এদিকে ইংরেজরা পর্তুগিজদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নিঃশেষ করে দিয়ে তাদের কেবল গোয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই সাফল্য দেখে তাদের উপর ব্রিটিশ রাজের পৃষ্ঠপোষকতা বাড়তেই থাকে। এবং ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বের একটি সম্পূর্ণ দ্বীপ তাদের দিয়ে দেওয়া হয়।

ইংরেজের বাণিজ্যিক বিজয়, যা তখন লুটতরাজের সীমানা ডিঙাতে শুরু করেছিল, ফ্রান্সকে উসকে দিতে ভূমিকা রাখে এবং ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি বণিকেরা ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (French East India Company) নামে একটি বাণিজ্যিক ফার্ম গঠন করে হিন্দুস্থানের উপকূলীয় অঞ্চলে নিজেদের কার্যক্রম বিস্তারের কাজ শুরু করে।

বাদশাহ আলমগির এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

হিন্দুস্থানে তখন গ্রেট মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগিরের শাসন চলছিল। মোগল সাম্রাজ্যের সূর্য তখন মধ্যগগনে। মোগলরা চাইলে এক ঝটকায় ইংরেজকে ভারতছাড়া করতে পারতো। কিন্তু বাদশাহ ধারণাও করতে পারেননি যে, ইংরেজদের কতক বণিক আর তাদের সশস্ত্র গুটিকয়েক কর্মচারী গ্রেট মোগল সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দিতে পারে। তারপরও আলমগির তখন কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, যখন ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা নব আগন্তুক ফরাসি বণিকদের কেবল নিজেদের শক্তির

---

[৬০] এ সংক্রান্ত ইতিহাসের অন্যান্য বইপত্রে রাজা চান্দগরির স্থলে রাজা 'দার্মালা ভেনকাদ্রি' নাম উল্লেখ আছে। হতে পারে নাম ভিন্ন হলেও ব্যক্তি একজনই ছিলেন।

জোরেই প্রতিহত করতে চেষ্টা চালিয়েছিল। আলমগির বুঝতে পেরেছিলেন, ইংরেজ বাণিজ্যের সীমা ছাড়িয়ে রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠবার প্রয়াসে মেতেছে। সে কারণে দিল্লি থেকে এই ফরমান জারি করে দেওয়া হয় যে, ইংরেজদের হিন্দুস্থান থেকে বের করে দেওয়া হোক। এই ফরমানের পরিপ্রেক্ষিতে সুরাট এবং বোম্বেতে কোম্পানির দপ্তর, কারখানা এবং কুঠি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবং তাদের গভর্নরকে বোম্বেতে তার দুর্গে নজরবন্দি করে রাখা হয়। চতুর ইংরেজ তখন চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুশোচনা, ওজরখাহি এবং অক্ষমতা জাহির করে মোগল সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ততা অর্জনের চেষ্টা করে। বারংবারের প্রচেষ্টার পর একসময় তাদের ক্ষমা লাভ হয় এবং তাদের পূর্ববৎ সুবিধাদিও বহাল রাখা হয়। কোম্পানি ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় কাজে নেমে পড়ে।

ফিরতি বছরেই ইংরেজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে চট্টগ্রাম নিজেদের দখলে নিতে চেষ্টা চালায়। যদিও শেষমেশ তারা সফল হয়নি। এই ঘটনায় বাদশাহ আলমগিরের ক্রোধ উথলে উঠলে তারা বাংলার সুবেদার ইবরাহিম খানের মধ্যস্থতায় আরও একবার আলমগিরের দরবার থেকে ক্ষমা আদায় করিয়ে নিতে সমর্থ হয়। মহানুভব বাদশাহ আলমগির মহানুভবতার স্বাক্ষর রেখে তাদের এবারও ক্ষমা করে দেন। মোগল শাসকেরা তাদের শান-শওকত ও ক্ষমতার সামনে ভিনদেশি বণিকদের ব্যাপারে তেমন কোনো আশঙ্কাই তখন পর্যন্ত করে ওঠেনি। আর এটাই ছিল তাদের এমন নিঃশর্ত ক্ষমা করার কারণ।

আলমগিরের পর

কিন্তু অবস্থার বদল ঘটতে সময় লাগে না বেশি। বিপদ-আপদ ও দুর্যোগ-দুর্ঘটনা বলে-কয়েও আসে না। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে আলমগিরের ইনতেকাল হওয়ামাত্র তার উত্তরসূরিদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়ে যায় এবং দেখতে দেখতেই হিন্দুস্থানে মোগল সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা নিছক গল্পগাথায় পরিণত হয়। আলমগিরের উত্তরসূরি প্রথম বাহাদুর শাহ শিয়া মতাবলম্বী হয়ে তার পিতার সেই সমস্ত পরিশ্রমের উপর পানি ঢেলে দেন, যা তিনি সুন্নত প্রতিষ্ঠায় করে গিয়েছিলেন। ফররুখ সিয়ারের শাসনামলে আমিরদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় এবং বাদশাহ নিছক তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হন।

এই সময়ে ইংরেজরা আরেকটি সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে। অগ্নিকাণ্ডে শাহ ফররুখ সিয়ারের কন্যার শরীর ঝলসে যায়। রাজ্যের কোনো হাকিম তার চিকিৎসা করে উঠতে পারে না। ইংরেজরা এই সংবাদ জানতে পেরে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক হ্যামিল্টনকে দিল্লি পাঠিয়ে দেয়। তার চিকিৎসায় শাহজাদির ক্ষত সেরে ওঠে। এই চিকিৎসকও পুরস্কার হিসেবে হিরা-জহরত নেওয়ার বদলে জাতিগত স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনা করেন। এবং সকল ধরনের কর থেকে ইংরেজদের মুক্ত করবার আবেদন জানান। কন্যা সুস্থ হয়েছে। বিহ্বলিত বাদশাহর তরফ থেকে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের এই আবেদন মঞ্জুর হয়ে যায়।

এই দিনগুলোতে ফরাসি এবং ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা রীতিমতো লড়াইয়ের রূপ ধারণ করেছিল। দুই শক্তি হিন্দুস্থানের উপকূলসহ দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে। কিন্তু মোগলপ্রশাসন তাদের কিছুই করতে পারছিল না। কেননা সেই অবস্থাতে, যখন বিভিন্ন প্রদেশ কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল, সেই সময় উপকূলীয় অঞ্চলে নজর দেওয়ার কার আর ফুরসত ছিল!

১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে কার্নাটকের লড়াইয়ে ইংরেজরা ফরাসিদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে এবং তাদের জেনারেল গোন্ট লালিকে পন্ডিচেরি থেকে গ্রেফতার করে। এমতাবস্থায় ফরাসিরা এই চুক্তি করবার জন্য বাধ্য হয়ে পড়ে যে, (নতুন করে) তারা আর কোনো অঞ্চল দখলের চেষ্টা করবে না।

এ ঘটনার পর হিন্দুস্থানের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচ্ছত্র ক্ষমতাধর শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই সময়ের মধ্যে দুনিয়ার আরও আরও স্থানে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের ক্ষমতার থাবা এমনভাবে বিস্তার করেছিল যে, তাদেরকে আর সেখান থেকে হটানো সহজ ছিল না। আর এভাবেই খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম-দুনিয়ার অর্থনৈতিক এবং সামরিক অবরোধকে পরিপূর্ণ করে নেয় এবং মুসলিমজাতি বৃহৎ পরিসরে তাদের বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে যায়।

তৃতীয় ধাপ : ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব অর্জন

মুসলিম-দুনিয়ার অর্থনৈতিক ও সামরিক অবরোধ পূর্ণ করবার পর বৈশ্বিক বাণিজ্য একপ্রকার ইউরোপের হাতেই চলে যায়। কেননা মুসলিমবিশ্বের উৎপাদিত পণ্যের মুনাফা এখন অধিকাংশ ইউরোপ বণিকদের পকেটেই যেতে থাকে। যদি এই মুনাফা বাণিজ্যের কোনো বৈধ পন্থা ও নীতি মেনে হতো তাহলে তার কোনো হিসাব করা হয়তো-বা সম্ভব হতো বা তার পরিমাণ উল্লেখ করা যেত; কিন্তু বাস্তবতা হলো, সাম্রাজ্যবাদী বণিক-শক্তি ব্যবসা নয়; তারা মূলত লুটতরাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। এবং নিজেদের ভান্ডার প্রতিদিন দুই গুণ চারগুণ করে ভরিয়ে তুলছিল। খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাঙালের উপকূলীয় অঞ্চলে কী পরিমাণ লুটতরাজ চালায়, তার অনুমান এ থেকেই করতে পারেন যে, ইংরেজ বণিকেরা স্থানীয় বণিকদের রপ্তানীকৃত পণ্যের বাজারমূল্যের কেবল এক-চতুর্থাংশ পরিশোধ করেই জোরপূর্বক পণ্য ছিনিয়ে নিয়ে যেত। বিপরীতে নিজেদের আমদানিকৃত পণ্য বাজারমূল্যের চাইতে পাঁচগুণ অধিক মূল্যে বিক্রি করত। স্থানীয় শ্রমিক ও কারিগরদের মাধ্যমে কাজ আদায় করিয়ে নিতো নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। জনৈক ইংরেজ বণিক উইলিয়াম বোটসের মন্তব্য :

> "এটা ইংরেজ নির্ধারণ করে নিতো যে, একজন কারিগর কী পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করবে এবং তার কতটুকু পারিশ্রমিক মিলবে। যদি কেউ নির্ধারিত পারিশ্রমিক নিতে অস্বীকার করত তাহলে তাকে বন্দি করা হতো।"

রমেশ চাঁদ 'হিন্দুস্থান কে একতেসাদি তারিখ' গ্রন্থে লেখেন :

"হিন্দুস্থান থেকে যে পরিমাণ পণ্য বিলেতে পাঠানো হতো তার বিনিময়ে এক পাইও ফিরে আসতো না।... কোম্পানির পলিসি ছিল হিন্দুস্থানের শিল্প বরবাদ করে ফেলা। বাঙাল অঞ্চলে প্রকাশ্যে রেশম উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। রেশম-কারিগরদের জোরপূর্বক কারখানায় শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এবং ইংরেজ ছাড়া দ্বিতীয় কারুর জন্য কাপড় উৎপাদন করতে পারবে না—এই মর্মে আদেশ জারি করা হয়। এমনিভাবে দাক্ষিণাত্যের ছিট কাপড় (রঙিন পাড়যুক্ত একপ্রকার ছাপার কাপড়) ও সুতি কাপড়ের উৎপাদনও বরবাদ করে ফেলা হয়।"[৬১]

এই ধরনের লুটতরাজের মাধ্যমে ইউরোপ কয়েক বছরের মধ্যেই তার ধনভান্ডার ভরিয়ে তোলে। সেই সাথে ইউরোপ তার বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির প্রয়াসেও নিরত থাকে। ইতোমধ্যে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব ঘটে গেছে। এবং একের পর এক পণ্য উদ্ভাবিত ও উৎপাদিত হয়ে চলছে। ইউরোপের শাসকেরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক ফার্মকে বেশি থেকে আরো বেশি পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে। ফলে সেইসব দেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির গতি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মোটকথা, এই বৈধ-অবৈধ কর্মযজ্ঞের বদৌলতে খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইউরোপ শিল্প, বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক শক্তির বিচারে অধিকাংশ ইসলামি দেশ থেকে অগ্রসর হয়ে পড়ে, যার পর তাদের চতুর্থ লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাওয়া অত্যন্ত অনায়াসসাধ্য হয়ে যায়।

চতুর্থ ধাপ : ইসলামি বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এখন ইসলামি বিশ্বের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ইসলামি বিশ্বের শাসকদের কাছে এখন যদিও ইউরোপের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তবু তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনের বিপরীতে ভোগ-বিলাস, আনন্দ-উদযাপন এবং পারস্পরিক মতবিরোধে মেতে থাকে। ইংরেজ সর্বপ্রথম বাঙাল অঞ্চল দখল করবার জন্য উদ্যোগী হয়। এবং কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গকে মজবুত করতে থাকে। বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজকে ঠেকানোর চেষ্টা করেন। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের কাছে এই মর্মে তিনি বার্তা পাঠান :

"আমরা বণিক ভেবে তোমাদের সম্ভাষণ জানিয়েছিলাম। তোমরা দুর্গ এবং মোর্চা গড়ে তুলবে—এইজন্য তোমাদের জায়গা দেওয়া হয়নি। এই দুর্গ এখনই ভেঙে ফেলা হোক।"

ইংরেজরা তার এই আদেশ পালনে অস্বীকার করে বসে। এবং প্রকাশ্যেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। আর এভাবে বাণিজ্যের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদের ভয়ানক রূপ হিন্দুস্থানিদের সবার সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। এখান থেকেই

---

[৬১] আংরেজ কে বাগি মুসলমান, পৃষ্ঠা : ৬০

ইংরেজদের দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপের প্রকাশের সূচনা। তারা গাদ্দার আমিরদের সহায়তায় ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পলাশির ময়দানে পরাজিত করে ফেলে এবং বাংলা অঞ্চল দখলে নিয়ে হিন্দুস্থানের এক স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এরপরে মহীশূরের শাসক হায়দার আলী ও টিপু সুলতান ইংরেজদের প্রতিরোধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। টিপু সুলতান দীর্ঘ সময়ব্যাপী ইংরেজদের সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের মধ্যে তখন পুরোদস্তুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। টিপু সুলতান সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফায়দা নিয়ে ফরাসিদের সাথে সন্ধি করে নেন। এবং তাদেরকে নিজের বাহিনীতে সৈন্য হিসেবে নিয়োগ দেন। যদিও ফরাসিরাও ছিল একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং সেইকালে তুর্কি খেলাফতের সাথে তাদের জবরদস্ত বিরোধ চলছিল; কিন্তু হিন্দুস্থানের সার্বিক পরিস্থিতি সামনে রেখে টিপু সুলতানের কাছে ফরাসিদের তুলনায় ইংরেজদের অধিক বিপজ্জনক মনে হয়। এবং বাস্তবে প্রকৃত বিরোধীপক্ষ তখন ইংরেজরাই ছিল।

টিপু সুলতান চিন্তা করেন, ফ্রান্সের রাজা নেপোলিয়ানের মাধ্যমে ইংরেজদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব! সে কারণে সুলতান ফ্রান্সের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করবার উদ্যোগ অব্যাহত রাখেন। দিল্লির মোগল বাদশাহ, আফগানিস্তানের হাকিম শাহ জামান, দাক্ষিণাত্যের নিজাম এবং উসমানি খলিফাসহ বিভিন্ন মুসলিম শাসককে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। কিন্তু কোনো দিক থেকেই সাহায্যের কোনো প্রতিশ্রুতি আসতে দেখা যায় না। উলটো দাক্ষিণাত্যের নিজাম সুলতান টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাথে হাত মেলান। শাহ জামান সুলতানের সহায়তার উদ্দেশ্যে রওনা করেছিলেন বটে; কিন্তু পথিমধ্যে তিনি বিদ্রোহের সংবাদ প্রাপ্ত হন। যার কারণে তাকে ফেরত যেতে হয়। শেষমেশ ইংরেজ যখন টিপু সুলতানকে শ্রীরঙ্গপত্তন বা শ্রীরঙ্গপত্তনমে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে তখন তিনি বাধ্য হয়ে নেপোলিয়ানের কাছে আবেদন করেন হিন্দুস্থানে সেনা-অভিযান পরিচালনা করে ইংরেজদের এখান থেকে বিতাড়ন করবার জন্য। নেপোলিয়ান তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় ঠিকই; কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের অভিযানে ব্যর্থ হবার কারণে হিন্দুস্থান পর্যন্ত তার আর আসা হয় না।

এইকালে উসমানি খেলাফত ফরাসিদের হামলা থেকে বাঁচবার জন্য ব্রিটিশদের সাথে সম্পর্ক জোরদার করে নেয়। তারা যখন ফরাসিদের সাথে টিপু সুলতানের মৈত্রীর সংবাদ জানতে পারলো তখন হিন্দুস্থানের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল না হয়েই টিপুকে অনুরোধ জানায় ইংরেজদের সাথে সন্ধি করে নিতে এবং ফরাসিদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতে। খলিফা এই মর্মে পত্র পাঠান :

"ফরাসিরা উসমানি খেলাফতের নির্মম শত্রু এবং তাদের বিরুদ্ধে বর্তমানে আমাদের যুদ্ধ চলছে। তাদের বিপরীতে ইংরেজ তুলনামূলক ভালো। আমাদের অভিজ্ঞতা

বলে, ইংরেজ ভালো এবং ভদ্র শ্রেণির। সে কারণে এটাই কল্যাণকর যে, আপনি ইংরেজদের সাথে সন্ধি করে নিন। এবং ফরাসিদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলুন। নতুবা আমরা আপনার বিরুদ্ধে তদন্ত করতে বাধ্য হবো।"

মোটকথা, এই দ্বিধান্বিত পরিস্থিতিতে মুসলমানরা সিদ্ধান্তে স্থির হতে পারছিল না, তারা কার পক্ষ নেবে আর কারই-বা বিপক্ষে যাবে। কেউ টিপুর সাথি হলো না। শেষমেশ হিন্দুস্থানের এই স্বাধীন পুরুষ ৪ মে ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে নিজের শাসনাধীন শ্রীরঙ্গপত্তন বা শ্রীরঙ্গপত্তনমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইরত অবস্থায় শহিদ হয়ে গেলেন।

এই লড়াইয়ে ইংরেজরা ধোঁকা এবং প্রতারণার প্রতিটি কৌশল প্রয়োগ করেছিল। বিভেদ বাঁধাও আর শাসন করো—এই ছিল তাদের প্রধান পলিসি। নিজেদের বিরুদ্ধে যেন কোনো ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত শক্তির উত্থান ঘটতে না পারে সেজন্য তারা একেক সময় একেক চক্রান্তের আশ্রয় নিতে থাকে। কখনো কোনো শাসকের হাতে কোনো প্রদেশ তুলে দিয়ে তাকে নিজেদের হাতে রাখতো। আবার কোনো কোনো শাসককে ধমকানির মাধ্যমে নিজেদের বশে রাখতো। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন শাসকদের বিরুদ্ধে যখন তারা দুর্বলতা উপলব্ধি করত তখন তাদের সাথে চুক্তি করে নিজেদের বাঁচিয়ে নিতো এবং যখনই একটু সামলে উঠতো চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে প্রতিপক্ষের উপর হামলে পড়তো। তারা সকল আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শাসকের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ গাদ্দারের দল তৈরি করে নিয়েছিল। এবং তারপর প্রকাশ্য লড়াই বাঁধিয়ে গাদ্দারের ভরসায় তাদের বিরুদ্ধে জয় অর্জন করেছিল। বাংলায় নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে তারই সেনাপতি মির জাফর এবং মহীশূরে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে তার একাধিক সাথি মির সাদেক, মির মঈনুদ্দীন, পণ্ডিত পূর্ণাইয়া এবং গোলাম আলী ল্যাংড়েকে ইংরেজরা সফলভাবে ব্যবহার করে।

টিপু সুলতানের পর ইংরেজরা দেখতে দেখতেই মধ্যভারত এবং গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল দোয়াবেও (Doaba) নিজেদের দখলদারি প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। সিন্ধুর মির ইংরেজের মিত্র ছিল। কিন্তু ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ সিন্ধু অঞ্চল দখল করে নেয়। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাবও তারা নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের দখলদারত্বের বিরুদ্ধে আজাদি আন্দোলনের মশাল জ্বলে ওঠে। তবে দ্রুতই তাকে নিভিয়ে ফেলা হয়। প্রবাহিত করা হয় অজস্র নিরপরাধ মানুষের রক্ত। দিল্লির শেষ মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরকে গ্রেফতার করে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ রাজ এই পর্যায়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তুলে দিয়ে হিন্দুস্থানের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি সরাসরি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। আর এভাবেই সমগ্র ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদের থাবায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ রাজের এই সাম্রাজ্যবাদী কর্মযজ্ঞের আলোচনা কিছুটা বিস্তারের সাথে করা হলো, কেননা তার সম্পর্ক সরাসরি সেই অঞ্চলের সাথে, যেখানে আমাদের বাস। অন্যান্য দেশে সাম্রাজ্যবাদের যে নখর আঘাত করেছিল, পাঠক তা ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদের সাথে মিলিয়ে অনুমান করে নিতে পারেন। এক ব্রিটিশ রাজের জুলুম-নির্যাতনের দিকে তাকালেই বুঝে নিতে পারবেন, সাম্রাজ্যবাদী আঘাত কতটা নির্মম ছিল। প্রায় সব অঞ্চলেই সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং নৈতিক অবস্থান ছিল অভিন্ন। প্রতিটি অঞ্চলেই স্থানীয় শাসকদের অবহেলা, উদাসীনতা এবং ভদ্রতার অবৈধ সুযোগ নেওয়া হয়েছে। নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার পর নির্বিচারে লুটপাট চালানো হয়েছে, শাসকের চেয়ার উলটে দেওয়া হয়েছে, নিজের পছন্দমাফিক এজেন্ডার বাস্তবায়ন ঘটানো হয়েছে এবং তার মাধ্যমে স্থানীয় জনপদবাসীর উপর এই পরিমাণ শোষণ চালানো হয়েছে যে, তারা নিজ দেশেই নিজেদের পরদেশি ভাবতে বাধ্য হয়েছে।

এই গেল হিন্দুস্থানের কথা। এখন অন্যান্য দেশের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এক ঝলক দেখে আসা যাক। ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ নাইজেরিয়ায় নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মিশর তাদের দখলে নিতে সক্ষম হয়। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে সুদানও তাদের দখলে চলে যায়। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে তারা ইরাক দখল করে নেয় এবং ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে জর্ডান এবং ফিলিস্তিনেও তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংরেজ এবং আফগানিস্তান

এইকালে ইংরেজ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ১৮৪০, ১৮৮০ এবং ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনটি যুদ্ধ পরিচালনা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আত্মমর্যাদায় ভাস্বর এই মুসলমানদের দেশে তারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়নি। যাই হোক, তারপর খ্রিষ্টীয় উনিশ শতকের শুরু থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ইংরেজ-রাজনীতি এবং চক্রান্ত ও অপকৌশলের প্রভাব আফগানিস্তানকে লাগাতার অস্থিতিশীল করে রাখে। এই সোয়া শতকে আফগানিস্তানে শাসন পরিচালনাকারী চারজন বড় বড় শাসক : শাহ সুজা, আমির দোস্ত মুহাম্মদ খান, আমির আবদুর রহমান খান এবং আমির হাবিবুল্লাহ খান ইংরেজদের প্রতি বিমুগ্ধ থেকে তাদের পলিসিমাফিক সবকিছু পরিচালনা করে যেতে থাকে। সেই সময় ইংরেজ তাদের প্রথম গান্দমাক চুক্তি (Treaty of Gandamak) এবং তারপর ডুরান্ড লাইন চুক্তির মাধ্যমে আফগানিস্তানকে ওই বিশেষ অঞ্চল থেকে বঞ্চিত করবার প্রয়াসেও সফলতা লাভ করে। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের কারণেই আফগানিস্তান কখনো শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল রাজনীতির দেশ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেনি। এবং এখন পর্যন্ত বাকি দুনিয়া থেকে এক শতক পেছনেই রয়ে গেছে।

অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিবরণ

রাশিয়ার ঔপনিবেশিক কার্যক্রম : রাশিয়া 'স্লাভ' (Slavs) জাতির প্রাচীন আবাসভূমি। শত-সহস্র বছর ধরে তার রাজধানী মস্কোভি (Muscovy) (মস্কো)। সেখানকার বাদশাহ খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। প্রথম রাশিয়ান শাসক 'ভ্লাদিমির' (Vladimir the Great) ৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এবং তিনিই সর্বপ্রথম রাশিয়ার সীমান্ত প্রসারিত করেছিলেন।

১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে চতুর্থ ইভান (Ivan the Terrible) রাশিয়ার সম্রাট হন এবং 'জার' উপাধি ধারণ করেন। এই উপাধি তিন শতক ধরে রাশিয়ার শাসকদের মাঝে প্রচলিত থাকে। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দেখাদেখি রাশিয়াও ইসলামি বিশ্বের দিকে তাদের পদক্ষেপ শুরু করে। ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তারা নওমুসলিম তাতারদের রাজধানী অস্ত্রাখান (Astrakhan) দখল করে নিয়ে মধ্য-এশিয়ার মুসলিম সাম্রাজ্য এবং ইরান পর্যন্ত পৌঁছার পথ পেয়ে যায়। ১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে বৈকাল হ্রদ এবং রাশে তারা নিজেদের দখলদারি প্রতিষ্ঠা করে নেয়।

১৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়ান জার পিটার দ্য গ্রেট ইউরোপের সাথে তার সম্পর্ক জোরদার করে নিয়ে ইসলামি বিশ্বের উপর পুরোপুরি উপনিবেশ বিস্তারের সূচনা করে। সেই সময়ের রাশিয়া খ্রিষ্টবাদের সাম্প্রদায়িক শিক্ষাদীক্ষায় প্রভাবিত ছিল। জার বংশের লোকেরাও ছিল খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। জার পিটার প্রথমও নিজের বাহিনীকে ইউরোপিয়ান সেনা-অফিসার দ্বারা প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলামি বিশ্বকে বশীভূত করবার জন্য প্রস্তুত করছিলেন। ইসলামি খেলাফত-ব্যবস্থার তুর্কি ছিল এই প্রস্তুতির সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় টার্গেট। ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়া তুরস্কের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নগরী এজোভ (Azov) দখল করে নেয়। তারপর ১৭১১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ান বাহিনী উসমানি তুরস্কের অধিকৃত অঞ্চলে হামলা করতে থাকে। তুরস্ক কয়েকবার রাশিয়াকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে সমর্থ হয়। কিন্তু নানামুখী ষড়যন্ত্রের শিকার উসমানি সাম্রাজ্য যত দুর্বল হয়ে পড়ে, ততই রাশিয়ার আঘাত তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। ১৭৬৮ থেকে ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চলমান যেই লড়াই বলকান অঞ্চলে সংঘটিত হয়, তাতে রাশিয়ার পাল্লা ভারী ছিল। এই সাফল্যের পর রাশিয়া বিজিত অঞ্চলগুলোতে বসবাসরত মুসলিম মঙ্গোলদের মধ্যে গণহত্যা শুরু করে, যার ধারাবাহিকতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়া কৃষ্ণসাগরে তুরস্কের প্রতিরক্ষা-কেন্দ্র ক্রিমিয়া দখল করে নেয়। এর পরের ১৫ বছরে তুরস্কের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী অঞ্চল রাশিয়ার দখলে চলে যায়। ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দের যুদ্ধবিরতিতে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তির অধীন তুরস্ক কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী রাশিয়ার দখলীকৃত সব অঞ্চলে তাদের দখল মেনে নেয়। আর এরপর থেকে তুরস্কের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে। ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা অঞ্চল ক্রিমীয় খানাত (Crimean Khanate) দখলে নিয়ে নেয়।

খ্রিষ্টীয় উনিশ শতকে রাশিয়া মধ্য-এশিয়ার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। এবং একের পর এক বহু ইসলামি রাজ্যে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নেয়। গাজি মুহাম্মদ, হামজা বে এবং ইমাম শামিলের মতন মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ বছরের পর বছর ধরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ করে গেছেন। কিন্তু সে-সব আন্দোলন শেষমেশ বহিঃরাষ্ট্রের মুসলিম দেশগুলোর উদাসীনতার কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যার

ফলে রাশিয়া অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ট্রান্স-অক্সিয়ানায় নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তারা ককেশাস দখল করে নেয়। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তাশখন্দ, ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বোখারা, ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে খিভা (Khiva) এবং ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মার্ভ রাশিয়ার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

ফ্রান্স : ফ্রান্স ইউরোপের একটি শক্তিধর রাষ্ট্র। তাদের বাণিজ্যিক সংস্থা 'ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' হিন্দুস্থানে ইংরেজদের কারণে অগ্রসর হতে পারেনি। সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু অন্যান্য দেশে ফ্রান্সের কলোনি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। ফ্রান্স ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে আলজেরিয়া দখল করে নেয়, যা এতকাল উসমানি খেলাফতের একটি প্রদেশ ছিল। সেখানকার গভর্নর হুসাইন পাশাকে গ্রেফতার করে প্যারিসে নিয়ে যাওয়া হয়। আর তারপর থেকে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলো একটির পর একটি ফ্রান্সের বশীভূত হতে থাকে। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে তিউনিস এবং ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে সেনেগাল এবং মাদাগাস্কার পদানত হয়। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে মরক্কো এবং ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়াও ফ্রান্সের দেশ-দখলের অভিলাষের মুখে পড়ে।

ইটালি : ইটালিও আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোকে নিজেদের লক্ষ্যে পরিণত করে। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তারা সোমালিয়া এবং ইরিত্রিয়ায় হামলা চালায়। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে লিবিয়া দখল করে নেয়। মোটকথা, খ্রিষ্টীয় বিশ শতকের শুরুতেই প্রায় সমস্ত ইসলামি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবলে চলে যায়। অর্থাৎ ইসলামি বিশ্বের উপর ইউরোপের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন, তা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

তার পরের গল্প সংক্ষেপই। সেই সময়ে ব্রিটিশদের সাথে সাথে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের ক্ষমতার বিস্তার চালিয়ে যেতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদ ও ক্ষমতা বিস্তারের উদ্যোগে অন্যদের পদক্ষেপ ব্রিটিশদের চেয়ে ভিন্ন ছিল না। ব্রিটিশের মতোই তাদেরও সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের প্রতিটি ধাপ ছিল রক্তপাত, ওয়াদাখেলাফি এবং স্থানীয় লোকেদের সাথে নিকৃষ্ট আচরণ ও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডে ভরপুর।

পঞ্চম ধাপ : ইসলামি খেলাফতের বিনাশ

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এখন ইসলামি খেলাফত ধ্বংস করবার মতন সামর্থ্য হয়ে উঠেছে। খেলাফতের রক্ষক উসমানি সাম্রাজ্য তার উত্থানকালে তিনটি বড় মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত ছিল। এশিয়াতে এশিয়ামাইনর (Anatolia), ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং আরব উপদ্বীপ ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। ইউরোপে হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া এবং বলকানের রাজ্যসমূহ, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, ম্যাকডোনিয়া, গ্রিস, মন্টিনিগ্রো, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, ইউক্রেন এবং রোমানিয়া উসমানি খেলাফতের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। আফ্রিকায় সুদান, নাইজেরিয়া, চাদ, মিশর, লিবিয়া, তিউনিস, আলজেরিয়া

এবং মরক্কো পর্যন্ত ছিল খেলাফতের অধীন। ইউরোপের দেশগুলো বহু বছর ধরে উসমানি খেলাফতের এই শান-শওকত ও আজমত দেখে দাঁতে দাঁত পিষে হা-হুতাশ করে চলছিল। তারা সকলে মিলে তুর্কি খেলাফতের শক্তিমত্তাকে 'প্রাচ্যীয় সমস্যা' হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

খ্রিষ্টীয় উনিশ শতকে ইউরোপের সাহিত্যিক, কবি এবং চিন্তকেরা বলকানের স্থানীয় খ্রিষ্টানদের ভাষা ও স্বদেশপ্রেমের স্লোগান শুনিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকে দেবার উদ্যোগ শুরু করে। এবং তুর্কিকে সাহসহারা করবার লক্ষ্যে ইউরোপ উসমানি খেলাফতের জন্য 'ইউরোপের অসুস্থ মানব'-এর মতো পরিভাষার প্রচলন ঘটায়।

এই ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের অংশ. হিসেবে প্রথমে গ্রিসকে তার পূর্বেকার শান-শওকত ও আভিজাত্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তুর্কির বিরুদ্ধে আজাদি আন্দোলন উসকে দেয়। আর তারপর ইউরোপিয়ান দেশগুলোর সহায়তায় মার্চ ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে গ্রিস স্বাধীন হয়ে খেলাফতের তদারকি থেকে বের হয়ে যায়। এই অভিজ্ঞতা খেলাফতের অধীন ইউরোপ এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশে দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করা হয়। যার ফলে উসমানি খেলাফতের সীমানা সংকুচিত হয়ে আসতে থাকে। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্স আলজেরিয়া এবং ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেন মিশর দখল করে নেয়। এভাবে খ্রিষ্টীয় উনিশ শতকের শেষ অবধি উসমানি সাম্রাজ্য পশ্চিমা শক্তির চক্রান্তের জালে নির্মমভাবে ফেঁসে গিয়ে সীমাহীন দুর্বল হয়ে পড়ে। তার অধিকাংশ অঞ্চল ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ইউরোপিয়ান দেশগুলোর তত্ত্বাবধানে 'আনজুমানে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি'র মতন সংস্থা স্বদেশপ্রেমের নাম করে তুর্কি তরুণদের হৃদয় থেকে খেলাফতের মর্যাদা এবং ইসলামি নিদর্শনাবলির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দূর করে দিতে থাকে। আর মুসতফা কামাল পাশার মতন এজেন্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে তার লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য তো প্রস্তুতই ছিল।

১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে তরুণ তুর্কিরা বিদ্রোহের মাধ্যমে খলিফার ক্ষমতা খর্ব করে সেখানে পশ্চিমা অনুকরণে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। সুলতান আবদুল হামিদ, যিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এগিয়ে যাবার পথে প্রতিবন্ধক ছিলেন, তাকে অপসারণ করে ফেলা হয়। এবং নামমাত্র খলিফা বানানো হয় মুহাম্মদ পঞ্চমকে। এই বিপ্লব থেকে ফায়দা হাসিল করে বুলগেরিয়া তুরস্ক থেকে স্বাধীন হয়ে যায়। আর অস্ট্রিয়া, বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনা নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়।

১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কিতে খেলাফত-ব্যবস্থা কেবল একটি প্রথা হিসেবে বাকি থাকে। বাস্তবে সমস্ত ক্ষমতা থাকে তরুণ জাতীয়তাবাদী তুর্কিদের, যাদের নেতা ছিল মুসতফা কামাল। এই নতুন নেতা তুরস্ক থেকে সমস্ত আরবীয় প্রভাব মিটিয়ে দেয়। তুর্কি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। এবং উসমানি খেলাফতকে সকল বিবেচনায় পরিত্যক্ত বানিয়ে ফেলে।

এরই মধ্যে অক্টোবর ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে বলকানের শাসকেরা রাশিয়ার উসকানিতে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে বসে। এই লড়াই তুরস্ককে একেবারে

নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। ৩০ মে ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনে বলকান এবং তুরস্কের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে দেওয়া হয়। এই চুক্তির ফলে তুরস্ক বাধ্য হয় তার বেশ কিছু দ্বীপ ও অঞ্চল বলকানের কাছে ছেড়ে দিতে।

বলকান যুদ্ধের পর ২৮ জুলাই ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধে এক পক্ষে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান এবং রাশিয়া। অপরপক্ষে ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি এবং বুলগেরিয়া। সে-সময় এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়, যার ফলে তুরস্ককে জার্মানির পক্ষ নিতে হয়। বিনিময়ে তার সাথে ওয়াদা করা হয়, বিজয়ের পর মিশর, লিবিয়া, তিউনিস, আলজেরিয়া এবং রাশিয়ার তুর্কিস্তানি অঞ্চলগুলো তুরস্কের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হবে। তুরস্কের মনে এমন আশারও সঞ্চার হয়েছিল যে, সেই-সকল এলাকার মুসলমানেরাও তুরস্কের সঙ্গ দেবে। এবং দখলদার পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে বুকটান করে প্রতিরোধে দাঁড়াবে। কিন্তু এটা এক নির্মল স্বপ্নই ছিল, যে স্বপ্নে বিভোর রেখে তুরস্ককে যুদ্ধে টেনে আনা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল—পরবর্তীতে তাকে অপরাধী প্রমাণ করে নির্মম শাস্তি দেওয়া।

ঘটনা যা ঘটে তা ছিল তুরস্কের আশা-প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত। পশ্চিমা শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের সাধারণ মানুষ তুর্কির সঙ্গ দেওয়া তো দূরের কথা, উলটো তুরস্কের অবশিষ্ট এলাকায় বিদ্রোহ জেগে ওঠে। যার পেছনে ব্রিটিশ গোয়েন্দা কর্নেল লরেন্সের বিরাট ভূমিকা ছিল। এই ব্রিটিশ গোয়েন্দা আরবের ভাষা এবং উচ্চারণভঙ্গির উপর অভাবনীয় যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন এবং রাসায়নিক পদ্ধতির প্রয়োগে নিজের গায়ের সাদা বর্ণ পালটে গোধুম বর্ণের করে নিতে পারতেন। এই লোক আরবের জনপদ; বরং মাদরাসা এবং খানকাতে দীর্ঘকাল অবস্থান করে তাদের দুর্বলতা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হয়ে তাদেরকে তুর্কি খেলাফতের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তোলে। কর্নেল লরেন্স আরবকে তুরস্কের বিরুদ্ধে এই পরিমাণ উত্তেজিত করে তুলতে সমর্থ হয় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আরবের লোকেরা তার কথামতো তুর্কি কর্মকর্তাদের হত্যা পর্যন্ত করতে থাকে। প্রতিজন তুর্কিকে হত্যার বিনিময়ে আরবকে সে পুরস্কারও দিত। লরেন্স হিজাজের গভর্নর এবং মক্কার তত্ত্বাবধায়ক হুসাইন এবং তার পুত্র আমির ফয়সাল এবং আমির আবদুল্লাহকে তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহের প্রতি প্ররোচিত করতে থাকে। এবং তাদের সাথে অঙ্গীকার করে যে, তুরস্কের খেলাফত ধ্বংস হওয়ামাত্র হুসাইনকে আরব উপদ্বীপের, ফয়সালকে সিরিয়ার এবং আবদুল্লাহকে ফিলিস্তিনের শাসক বানিয়ে দেওয়া হবে। লোভে পড়ে জুন ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার তত্ত্বাবধায়ক এবং তার পুত্রেরা তুর্কি খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দেয় এবং আরব উপদ্বীপে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করে বসে। আর এরই মধ্য দিয়ে ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং জর্ডানও তুর্কির হাত থেকে বের হয়ে মিত্রশক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

তুরস্ক শেষমেশ অবনত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ৩০ অক্টোবর ১৯১৮ সালে মুদ্রোসে যুদ্ধবিরতির আলোচনা হয়। যুদ্ধ শেষ হবার পর ১০ আগস্ট ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে সেভ্রেস (Treaty of Sevres) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির অধীন বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তুরস্ককে সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং ইরাক থেকেও ক্ষমতা গুটিয়ে নিতে বাধ্য করে। দার্দানেলস (Dardanelles) প্রণালিসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অঞ্চল আন্তর্জাতিক তদারকিতে দিয়ে দেওয়া হয়। আরব উপদ্বীপে মেনে নেওয়া হয় মক্কার আমির হুসাইনের স্বায়ত্তশাসন। তুরস্ককে কেবল ১৫ হাজার স্থলসৈন্য রাখবার অনুমতি দেওয়া হয়। এবং বলা হয় সমস্ত বিমান ও নৌঘাঁটি তুলে নিতে। ইরাকে হুসাইনের পুত্র আমির ফয়সাল এবং জর্ডানে আবদুল্লাহর নেতৃত্বে গড়ে তোলা হয় স্বতন্ত্র রাষ্ট্র।

এর অব্যবহিতকাল পরেই গ্রিস তুরস্কের উপর আক্রমণ চালিয়ে তার ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলো দখলে নেওয়ার একটা ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। এই সকল যুদ্ধে মুসতফা কামাল পাশা বিখ্যাত জেনারেল হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এবং ইসলামি দুনিয়ায় তাকে একজন মহান নেতা হিসেবে বিবেচনা করা হতে থাকে। কিন্তু ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে যখন ব্রিটিশ রাজ এবং মুসতফা কামাল পাশার মধ্যে লুজান চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং এর মাধ্যমে তুরস্ক থেকে খেলাফত-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ও তার ইসলামি মূল্যবোধ মিটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয় তখন বাস্তবতা সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসতফা কামাল ইসলামবিদ্বেষী শক্তির শত বছরের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করবার মধ্য দিয়ে নিজেই খেলাফত বিলুপ্তির ঘোষণা প্রদান করেন। কবি বলেন :

নির্বোধ তুর্কি ছিন্ন করে ফেলেছে খেলাফতের কুর্তা;
নিজেদের সারল্য দেখে নাও অন্যের 'বুদ্ধিমত্তা'ও দেখ।

খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নের অপমৃত্যু

অতীতে খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস দেখে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মনে ভয় ছিল, মুসলমান না আবার খেলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ওঠে! এবং খেলাফতধ্বংসের নিমিত্তে কৃত তাদের বারশ বছরের পর্যায়ক্রমিক পরিশ্রম ব্যর্থ না হয়ে পড়ে। সে-কারণে মুসলমান যেন দ্বিতীয়বার খেলাফতপ্রতিষ্ঠার কোনো ধরনের উদ্যোগ করতে না পারে—এই ব্যাপারে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনি তারা। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে খেলাফত ধ্বংস হবার বহুপূর্বেই নিম্নযুক্ত পদক্ষেপগুলো তারা গ্রহণ করেছিল :

১. মুসলমানদের থেকে, বিশেষভাবে তুর্কিদের থেকে ইসলামপ্রীতি নিঃশেষ করবার জন্য এবং তদস্থলে আধুনিকতার প্রতি আগ্রহ তৈরি করবার জন্য বিপুল প্রয়াস চালানো হয়। তুরস্কে ব্যাপক করে তোলা হয় দাড়ি মুণ্ডানো, কোর্ট-প্যান্ট পরিধান করা এবং নারীদের বেপর্দা চলাফেরাকে। ইউরোপিয়ান সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচলন ঘটিয়ে ইসলামি রীতিনীতির গুরুত্ব অন্তর থেকে বের করে দেওয়া হয়। কমিয়ে আনা হয় ইসলামের সাথে মানুষের হৃদ্যতা ও আন্তরিক সম্পর্ক।

২. মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ এবং স্বাদেশিকতা উসকে দেওয়া হয়। একদিকে যেমন লরেন্স অব অ্যারাবিয়ার মতো গোয়েন্দাদের সহায়তায় আরবে আরবজাতীয়তাবাদের ধোঁয়া তোলা হয়, অন্যদিকে মুসতফা কামাল পাশার মতন নেতাদের মাধ্যমে তুরস্কে ইসলামপ্রীতির বিপরীতে দেওয়া হয় স্বদেশপ্রীতির তালিম। ইসলামের অন্যান্য অঞ্চলের চিত্রও এমনই ছিল।

স্পষ্টতই এর ফল হয়, ইসলামি বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের মুসলমান নিজেদের ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে নেতৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের উপযোগী মনে করে না। এবং খেলাফতের সাথে তাদের হার্দিক আকর্ষণ নিঃশেষ হয়ে যায়। মুসলমানদের কোনো জাতিই আরেক জাতির কোনো সদস্যকে নিজের আত্মিক কিংবা রাজনৈতিক নেতা মানতে রাজি হয় না। ইসলামি দুনিয়ার এতধা বিভক্ত অঞ্চল, এত প্রকারের ভাষা এবং এত ধরনের জাতির লোকদের কোনো এক খলিফার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আর উম্মত প্রতিনিয়ত কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্নতার শিকার হতে থাকে।

৩. মুসলিম-দুনিয়ায়, বিশেষ করে তুরস্কে এই প্রচারণা চালানো হয় যে, খেলাফত একটি নিথর অঙ্গ এবং একটি অকার্যকর প্রতিষ্ঠান, যা বর্তমান সময়ের প্রয়োজনের সঙ্গ দিতে পারে না। সে-কারণে তাকে নির্মূল করে দেওয়া দরকার।

৪. এই বলে মুসলমানদের মগজধোলাই করা হয় যে, খেলাফতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইউরোপের নয়া রাজনৈতিক দর্শনের অনুকরণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিলে তারাও ইউরোপের মতো উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারবে।

৫. ইসলামি খেলাফত তার পতনকালেও একটি মর্যাদাকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হতো। প্রত্যেক মুসলিম শাসক খলিফার থেকে নিজের শাসন-ব্যবস্থার মঞ্জুরি করিয়ে নিতো। ইসলামি বিশ্ব কোনো-না-কোনোভাবে একটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যুক্ত ছিল। খেলাফতের মধ্যস্থতায় তাদের সীমান্তগত বিরোধ এবং অন্যান্য সংঘাতের নিষ্পত্তি ঘটে যেত। এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি খেলাফত-ব্যবস্থা ধ্বংসের পূর্বে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে বিকল্প আন্তর্জাতিক সংগঠন 'লিগ অব নেশন্স' প্রতিষ্ঠা করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন (Woodrow Wilson) এর রাজনৈতিক উপদেষ্টা কর্নেল মান্ডেল হাউস (Edward M. House) তার সাথি-সঙ্গীদের নিয়ে এর পরিকল্পনা ও কাঠামো প্রস্তুত করেছিলেন। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠার পেছনে মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল—দুনিয়ার সকল দেশ, যার মধ্যে মুসলিম দেশও অন্তর্ভুক্ত ছিল, নিজেদের মধ্যকার সকল সমস্যা ও বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য এই প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হবে। কোনো দেশ যেন কখনো এমন মনে করতে না পারে যে, তারা কোনো আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। আর এভাবেই খেলাফত-ব্যবস্থার প্রয়োজন চোখের আড়াল হয়ে পড়ে (পরবর্তীতে লিগ অব নেশন্সের জায়গা দখল করে নেয় জাতিসংঘ)।

৬. যদি খেলাফতধ্বংসের কাজটা ইহুদি-নাসারাদের কারুর হাতে সম্পন্ন হতো তাহলে মুসলমান কোথাও-না-কোথাও কোনো-না-কোনোভাবে খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা আরম্ভ করে দিত। যে কারণে সিদ্ধান্তই এমন নেওয়া হয়, এই কাজটি তুরস্কের মুসলমানেরই এমন কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে করানো হবে, যাকে সমস্ত দুনিয়া গাজি ও মুজাহিদ হিসেবে বিবেচনা করে, যাতে মুসলমানদের মধ্যে কোনো অপ্রতিরোধ্য পরিস্থিতির উদ্ভব না ঘটে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামনে একটি অজুহাত থাকে যে, যখন খোদ তুরস্কই খেলাফত থেকে ছুটে পালাতে চায় তখন অন্যরা আর কীই-বা করতে পারে!

অবশেষে এই পদক্ষেপগুলোর কারণে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায়, মুসলমান খেলাফত-ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কল্পনাও এখন আর করে না এবং তাদের কাছে 'অন্তত' প্রথাগত খেলাফত-ব্যবস্থা বাকি থাকবারও কোনো গুরুত্ব অবশিষ্ট নেই। উদ্ভূত পরিস্থিতি খেলাফত-ব্যবস্থার পতনের চেয়েও অধিক আফসোসের। অধিক দুঃখজাগানিয়া।

ষষ্ঠ ধাপ : ইসলামি বিশ্বের বিভক্তীকরণ

খেলাফতের পতনের পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ষষ্ঠ পর্বের কাজ শুরু করে দেয় এবং ইসলামি দুনিয়ার অঞ্চলগুলোকে টুকরো টুকরো করে নিজেরা প্রস্তুতি নিতে থাকে ফিরে যাবার। তাদের এই প্রত্যাবর্তনের পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল :

১. ইসলামি দুনিয়া এবং প্রাচ্য থেকে যে পরিমাণ সম্পদ লুণ্ঠন সম্ভব ছিল, তা লুটে নেওয়া হয়েছিল। ইসলামি বিশ্বের দৃষ্টান্ত তখন সেই শস্যক্ষেত্রের অনুরূপ, যাতে বন্যপ্রাণীরা ইচ্ছে মতন চরে বেড়িয়েছে। এমনকি সেখানে শস্যের একটি দানা ও খরকুটোর এক টুকরো পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। সে-কারণে জরুরি ছিল, পরবর্তী ফসল উৎপন্ন হওয়া পর্যন্ত খেতটি তার মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

২. ইসলামি দুনিয়ায় একের পর এক আজাদি আন্দোলন চলতে থাকে, যা দমন করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একটি অনুৎপাদনশীল দুনিয়ায় কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্য এতবেশি অর্থের ব্যয় করাকে অপচয় মনে করে। তার বদলে ফিরে যাওয়াই তাদের কাছে সেই সময় শ্রেয়তর মনে হয়।

৩. কালের বিবর্তন সাম্রাজ্যের পোক্ততা এবং ক্ষমতার বিশালতার সংজ্ঞা বদলে দিয়েছিল। কোনো দেশ ও জাতি এখন আর কোনো ভূখণ্ড কিংবা জনপদের বিস্তৃতির মাধ্যমে দুনিয়ার উপর অধিক প্রভাবক হতে পারে না। বরং এখন অধিক ক্ষমতাধর তারাই, যাদের অর্থনীতি স্থিতিশীল এবং যারা শিক্ষা, প্রযুক্তি, সমরাস্ত্র এবং শিল্পকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে কর্তৃত্ববান। যে কারণে কেবল ভূখণ্ডের বিস্তৃতিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আর কোনো আগ্রহ থাকে না।

৪. ইসলামি বিশ্ব এবং প্রাচ্যের দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পশ্চিমপ্রেমী একটি শ্রেণি তৈরি করে দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যাবার কালে প্রাচ্যের রাজনীতির বাগডোর সঁপে দিয়ে যাচ্ছিল তাদের হাতেই। এই নয়া নেতৃত্ব যে পশ্চিমা শক্তির অনুপস্থিতিতেও তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাদির প্রতি পূর্ণ সজাগ থাকবে—পশ্চিম এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল।

৫. আমদানি-রপ্তানির বাহন এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থার অগ্রগতি পুরো পৃথিবীকে পালটে দিয়েছিল। এখন হাজার মাইল দূরে থেকেও কোনো দেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা কোনো কঠিন কাজ ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজের সীমানা বদলেও মুসলিম-দুনিয়া এবং প্রাচ্যের উপর তার কর্তৃত্ব ঠিকই বহাল রাখতে পারবে।

৬. খেলাফতের পতন সম্পন্ন হয়ে গেছে আর মুসলমানদের সংহতি ধরে রাখবার মতন কোনো প্রথাগত প্ল্যাটফরমও তখন ছিল না। মুসলিমবিশ্বে জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতা এবং ভাষাপ্রীতি খেলাফত-ব্যবস্থার পতনের পূর্ব থেকেই ইসলামি বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যে কারণে মুসলিমবিশ্বের ঐক্যবদ্ধ হবার কোনো শঙ্কা তাদের মধ্যে আর অবশিষ্ট ছিল না।

৭. মুসলিম-দুনিয়াকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আইনিভাবে বেঁধে ফেলা যায় এমন সব আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল। এই পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, যতদিন পর্যন্ত জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হয়নি ততদিন কোনো ইসলামি দেশ স্বাধীন হয়নি। মুসলিমবিশ্ব থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রত্যাবর্তনের ধারাবাহিকতা শুরু হয় ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর। তার আগে নয়। অর্থাৎ মুসলিম দেশগুলোকে বিভিন্ন রীতিনীতি এবং চুক্তিতে বেঁধে ফেলার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করবার পরই সেখান থেকে সামরিক হস্তক্ষেপ তুলে নেওয়া আরম্ভ হয়।

উল্লিখিত পদক্ষেপগুলোর অধিকাংশই পরিকল্পনার অংশ; তবে সেগুলো বাস্তবায়নের কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নির্ধারিত ছিল না। ইতোমধ্যে এমন এক পরিস্থির উদ্ভব ঘটে, যার কারণে আন্তর্জাতিক শক্তি সকল কাজ ফেলে তাৎক্ষণিকভাবে ইসলামি বিশ্ব এবং প্রাচ্যের দেশগুলোর নতুন সীমানা বেঁধে দিতে এবং অতি দ্রুত প্রত্যাবর্তনের আয়োজন শুরু করতে একপ্রকার বাধ্য হয়ে পড়ে।

ঘটনা এই, প্রাচ্যের সম্পদের 'বানর-বণ্টনে'র পরিসমাপ্তিতে শেষমেশ চোরদের দলেই হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। এবং ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটে যায়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পুঁজির একটি বড় অংশ শেষ হয়ে যায় এই যুদ্ধে। এবং তারপরে এই দেশগুলো নিজেদের ব্যয় সংকুচিত করে আনতে যেন একপ্রকার বাধ্য হয়ে পড়ে। এদিকে ইসলামি দেশগুলোতে আজাদি আন্দোলনও উদ্যমের সাথে শুরু হয়েছে। তখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপলব্ধ হয় যে, ইসলামি বিশ্বকে ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডে ভাগ করে দিয়ে নিজেদের প্রত্যাবর্তনে আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না।

এই কারণে যুদ্ধের পরপরই একের পর এক মুসলিম দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করতে থাকে। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিপাইন স্বাধীনতা লাভ করে আমেরিকা থেকে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ ছেড়ে যায় ভারত-উপমহাদেশ। মরক্কো এবং তিউনিস ছেড়ে ফ্রান্স বের হয়ে যায় ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্স থেকে আলজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে।

স্বাধীনতা দেওয়া সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলিম-দুনিয়ার রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সাধারণ্যের মানসিকতা, ভবিষ্যতে সেখানে প্রাপ্ত সম্পদ এবং সবধরনের উৎপাদিত পণ্যে নিজের অধিকার ধরে রাখবার চিন্তা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেনি।

ইসলামি বিশ্বে স্বাধীনতা আসে এভাবে, আগে যেখানে একটি রাষ্ট্র ছিল, এখন তা একাধিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কিছু জনপদ, যেখানে ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, বছরের পর বছর সেখানে খ্রিষ্টবাদের প্রচার-প্রসার এবং নতুন সীমানা নির্ধারণের ফলে তা অমুসলিমপ্রধান অঞ্চল হয়ে উঠেছে, ফিলিপাইন যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সীমান্তের বণ্টনে অভাবনীয় প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হয়। ভারত উপমহাদেশে পাকিস্তানের সাথে যা করা হয়, তা স্পষ্টই অনাচার। কাশ্মিরকে ভারতের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ এবং জুনাগড় ভারতের অধীনে চলে যায়। ডুরান্ড লাইন অপরিবর্তনীয় রেখে পাখতুনবাসীকে দুই ভাগ করে দেওয়া হয়েছে কেবল নয়; বরং আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতার বীজ বপন করে রাখা হয়। বেলুচিস্তানকে ভাগ করে দেওয়া হয় আফগানিস্তান, ইরান এবং পাকিস্তানের মধ্যে।

মধ্যপ্রাচ্যে সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান এবং ফিলিস্তিনকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় এবং ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ভিত্তিস্থাপন করা হয় অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের। আফ্রিকায় অকল্পনীয় আকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ করা হয়। এই সীমানা নির্ধারণ যে কতটা অবাস্তব ভিত্তিতে করা হয়েছে, মানচিত্রে দৃশ্যমান লম্বমান রেখা থেকেই তা প্রতীয়মান করা সম্ভব।

এ ছাড়াও স্বাধীন হওয়া মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক দলের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের দীক্ষাপ্রাপ্ত এজেন্টদের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়ে যায়। যেমন জাফরুল্লাহ কাদিয়ানী, যিনি মুসলিম লিগের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে সেই দলে শামিল ছিলেন। এবং পাকিস্তানপ্রতিষ্ঠার পর দেশের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

কলোনিয়ালিজম মুসলিমবিশ্বকে কী দিয়েছে?

এই পর্যায়ে এসে আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন হাজির হয়, যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগমন ঘটেছিল তখন মুসলিমবিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কীরূপ ছিল আর তাদের প্রত্যাবর্তনের সময়েই-বা কেমন ছিল?

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন বণিক-বেশে মুসলিম-দুনিয়ায় আগমন করে, মুসলিমবিশ্ব তখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়ে সম্পূর্ণ স্থিতিশীল ছিল।

রাজনৈতিক শক্তিমত্তার প্রমাণ হিসেবে বলা যেতে পারে, পূর্ব থেকে নিয়ে পশ্চিম পর্যন্ত মুসলমানদের বড় বড় সাম্রাজ্য তখন বিদ্যমান। মরক্কো থেকে দজলার তীর পর্যন্ত এবং ইয়ামান থেকে বলকান পর্যন্ত উসমানি খেলাফতের পতাকাই সমুন্নত ছিল। আলজেরিয়া, লিবিয়া, তিউনিস, মিশর, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ফিলিস্তিন, আরব উপদ্বীপ, ইরাক এবং এশিয়ামাইনর ছিল তারই অংশ। ইউরোপের বহু দেশ গ্রিস, মাকদুনিয়া, রোমানিয়া, আলবেনিয়া, বলকান, বসনিয়া, কসোভো এবং বুলগেরিয়ার আকাশেও তুরস্কের পতাকা তখন পতপত করে উড্ডীন ছিল।

পাকিস্তান, ভারত, কাশ্মির, নেপাল, বাংলা এবং বার্মা একসাথে তখন মোগল সাম্রাজ্যের অধীন। আফগানিস্তানের ভূখণ্ড আমুদরিয়া থেকে শুরু করে সিন্ধু এবং হাবনদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যেখানে প্রতিষ্ঠা ছিল আবদালিদের নিয়ন্ত্রণ। মধ্য-এশিয়ায় বোখারা, সমরকন্দ, উজবেকিস্তান, দাগিস্তান এবং কাজাকিস্তানে স্বাধীন স্বার্বভৌম সুখী সমৃদ্ধ উজবেক আমিরদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

অর্থনীতির কথা বলতে গেলে বলতে হয়, মুসলিমবিশ্বের সমৃদ্ধি দেখে ইউরোপ ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়তো। ইসলামি বিশ্বের সম্পদ ও প্রাচুর্য দেখেই তো ইউরোপ তার উপর হামলে পড়ে। উপমহাদেশ, যা আজকাল দুনিয়ায় কেবল একটি ফসলি ভূখণ্ড হিসেবে পরিচিত, তৎকালে ছিল পৃথিবীর সবচাইতে বৃহৎ শিল্পাঞ্চল। তার তুলনামূলক কম সমৃদ্ধ অঞ্চল 'সিন্ধু'র শিল্পোন্নয়নের চিত্র ছিল এই, ইউরোপের রাজরাজড়াগণ এখানকার উৎপাদিত কাপড় গর্বের সাথে পরিধান করত। থাট্টার (Thatta) তৈরীকৃত পালঙ্কের চাদর ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইটালির রাজারা তাদের আভিজাত্য প্রকাশের জন্য ব্যবহার করতেন। হিন্দুস্থানের 'চিকেন' এবং মখমলকে গণ্য করা হতো অত্যন্ত দামি ও মূল্যবান উপহার হিসেবে। লন্ডনের রানি ও শাহজাদি ঢাকাই মসলিনের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিতেও রাজি ছিল। মসলিনের সম্পূর্ণ এক থান একটি আংটির মধ্যে এঁটে যেত। সমস্ত হিন্দুস্থানের স্থানে স্থানে মকতব এবং মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিক্ষিতের হার ছিল ৭০ শতাংশেরও অধিক। কিন্তু ইংরেজ যখন উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যায় তখন এই ভূখণ্ডের অবস্থা কেমন ছিল? স্বয়ং ইংরেজদের ভাষ্যতেই শুনুন। ইংরেজ ঐতিহাসিক ম্যাগডোনাল্ড (James Ramsay MacDonald) এর ভাষ্য 'হিন্দুস্থান নিঃস্ব দরিদ্রের জনপদ হয়ে পড়ে থাকে।'[৬২]

আমেরিকান ট্যুরিস্ট জেমস মেডস হিন্দুস্থান সফরকালে দেখেন, ইংরেজ শাসকেরা কলকাতার রেসের জন্য ঘোড়ার এন্তেজামে মশগুল। আর শহরের বুকে অসংখ্য মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণায় প্রাণ হারাচ্ছে।[৬৩]

---

[৬২] The Awakening of India, 14
[৬৩] নিউইয়র্ক টাইমস, ১৪ মে ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ

কেবল বাংলা অঞ্চলেই দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা ১৮ লাখে দাঁড়ায়। সারা দুনিয়ায় কাপড় সরবরাহকারী বাংলার জীবিত মানুষের পরিধানের জন্য এবং মৃতের কাফনের জন্য কাপড় পাওয়া যাচ্ছিল না।[৬৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন হিন্দুস্থানের সমস্ত উৎপাদিত পণ্য লুট করে নেয়। শস্য, কাপড় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী মিত্র জোটের প্রয়োজন মেটাতে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হতে থাকে। যার ফলে হিন্দুস্থানে নেমে আসে করুণ দুর্ভিক্ষ।

জোট বাহিনীর প্রয়োজন পূরণ করবার লক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে রেললাইন তুলে ফেলা হয়। লোহার চাহিদা পূরণ করবার জন্য বিদ্যুৎ এবং টেলিফোনের খুঁটি তুলে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হতে থাকে। জমিদারদের ঘরের ভেতর টানা-হেঁচড়া করে তাদের শস্য ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ইংরেজ উপমহাদেশকে এমন অবস্থায় রেখে যায়, যা বর্ণনাতীত। অন্যান্য যেসব উপনিবেশিত অঞ্চল থেকে ফ্রান্স, ইটালি এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সে-সবের চিত্রও কিছু ভিন্ন ছিল না।

নৈরাজ্য জারি রাখবার কৌশল : সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলিমবিশ্বকে টুকরো টুকরো করে ফিরে চলে গেলেও মুসলিমবিশ্ব নিয়ে তাদের চক্রান্তের সমাপ্তি টানেনি। বরং ফিরে যাবার পূর্বে এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে যায়, যার ফলে মুসলমানদের মধ্যকার অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে। এবং বিভেদ-বিসংবাদের পথ থেকে তারা বেরোতে পারেনি। ইসলামি বিশ্বে নৈরাজ্য জারি রাখবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

জাতিসংঘের খবরদারি : জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল দুটি :

১. মুসলমানদের স্বতন্ত্র কোনো কার্যকর প্ল্যাটফরম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানো।

২. আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর মধ্যকার বিরোধ যথাসম্ভব কমিয়ে আনা।

মোটকথা, সাম্রাজ্যবাদী যেই দস্যু দীর্ঘ তিন শতক ধরে ইসলামি বিশ্বে বিভিন্নভাবে লুটতরাজ চালিয়ে যাচ্ছিল, এবারে লুণ্ঠনের সেই কাজটি তারা করে যেতে চাচ্ছিল একটি সংস্থার আদলে, একটি সংগঠনের ছায়ায় থেকে, যাতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতন ট্রাজেডির আর সৃষ্টি না হয়।

জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী লুটেরারা প্রথমবার একসাথে বসল। এবং সিদ্ধান্ত নিল, আপসে, কোনো প্রকারের লড়াই-সংঘাত ব্যতিরেকেই সবাই মিলেমিশে লুটতরাজ চালিয়ে যাব। এই সংস্থার যেই সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা প্রচার করা হয়, সংস্থার কার্যক্রম তাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। সংস্থাটির সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রকৃত ক্ষমতা পাঁচটি বড় দেশ : আমেরিকা, ব্রিটেন,

---

[৬৪] রোজনামায়ে আজমল, ৬ মার্চ ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ

ফ্রান্স, রাশিয়া এবং চীনের হাতে, যাদের বলা হয়ে থাকে পিস কাউন্সিলের স্বতন্ত্র সদস্য। এবং যাদের হাতে রয়েছে ভেটো পাওয়ারের মতন ক্ষমতা। আর তার জোরেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইসলামি বিশ্বের সমস্যাগুলোকে 'নিষ্পত্তির অযোগ্য' করে রেখেছে। ইসলামি বিশ্বের পারস্পরিক বিরোধ ও ভুল বোঝাবুঝি, গৃহযুদ্ধ এবং অন্যান্য যন্ত্রণার উৎসও এই সংস্থার অযৌক্তিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত।

আন্তর্জাতিক আইন : জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় মুসলিমবিশ্বের উপর এমনসব আইন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা শিরোনামে আন্তর্জাতিক হলেও কার্যত তার প্রয়োগ কেবল মুসলিমবিশ্বের উপর করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পাকিস্তানে নবীজির অবমাননায় যদি কাউকে হত্যা করা হয় তাহলে তাকে মানবাধিকারের লঙ্ঘন দাবি করে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ফিলিস্তিনের অজস্র মুসলমানকে যে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, সে-ব্যাপারে জাতিসংঘ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। এবং তার আইনও তখন অকেজো থাকে। মোটকথা, বাস্তবতা হলো এইসব কানুন প্রকৃতপক্ষে মুসলিম দেশগুলোর উপর প্রতিবন্ধকতা তৈরির একটা হাতিয়ার। এই চার্ট মূলত তৈরি করা হয়েছে মুসলিমবিশ্বকে ইসলামের দেওয়া স্বাধীনতা, স্বকীয়তা ও স্বনির্ভরতা থেকে বঞ্চিত রাখবার জন্য।

চুক্তি : সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো কখনো জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় আবার কখনো সরাসরি মুসলিমবিশ্বের সাথে নানান চুক্তি সম্পাদন করে থাকে। যার কারণে তাদের অস্থিতিশীলতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং মুসলমানেরা রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে আরও দুর্বল হতে থাকে। যেমন কাশ্মির-সমস্যায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সমস্যার নিষ্পত্তির বদলে তাকে আরও জটিল করে তুলেছে। একইভাবে ডুরান্ড লাইনের সমস্যা আজ পর্যন্ত পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে স্থিতির পথে প্রধান বাঁধা হয়ে আছে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তরফ থেকে মুসলমানের উপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ : মুসলিম-দুনিয়া তছনছ ও বরবাদ করে দেবার জন্য সময়ে সময়ে তার উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়। ইসরাইলের মিশর হামলা হোক বা ভারতের পাকিস্তান হামলা, তাদের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কৌশল স্পষ্টই নজরে আসে। এই ধরনের বহু যুদ্ধে মুসলিম-দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বহু সামরিক ঘাঁটি প্রতিবেশী কাফির রাষ্ট্রের দখলে চলে গেছে।

ব্লক : আন্তর্জাতিক শক্তি বিভিন্ন ব্লক বানিয়ে মুসলিম দেশগুলোকে পরস্পর থেকে বিভক্ত করে রেখেছে। যার কারণে এক ব্লকের মুসলিম দেশ আরেক ব্লকের মুসলিম দেশকে নিজের প্রতিপক্ষ মনে করে। তার বিপরীতে নিজের ব্লকের কাফির রাষ্ট্রের উপর অধিক ভরসা রাখে। যেমন আমেরিকান ব্লক ও রাশিয়ান ব্লক প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর মুসলিম দেশ তাদের কোনো একটির মধ্যে শামিল থেকে অন্যটির সাথে লড়াইয়ে নিরত থাকত।

ইসলামি দুনিয়ায় উসকে দেওয়া যুদ্ধ : সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলিম দেশগুলোকেও পারস্পরিক লড়াইয়ে জড়িয়ে দেবার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করেনি। আর এতে করে একদিকে যেমন মুসলিম-দুনিয়ার দুর্বলতা ও অরাজকতা বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিভিন্ন সাময়িক লক্ষ্য পূরণ হয়ে যায়। এই ধরনের চক্রান্তের বলি হয়ে আলজেরিয়া এবং মরক্কো তিনদুফ (Tindouf) মরুভূমিতে লড়াই করে। মিশর এবং সুদানের মধ্যবর্তী হালাইব (Halaib Triangle) এবং শালাতিন (Shalateen) অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আম্মান এবং আরব-আমিরাত আল-বুরেইমি (Al-Buraymi) মরুভূমি নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। সৌদি আরব আর ইয়ামান নাজরান এবং আসির অঞ্চল নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শাম এবং জর্ডানে হাম্মাহ উপত্যকার কারণে বিরোধ শুরু হয়ে যায়। ঘটনাগুলোর যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, এই ধরনের অধিকাংশ লড়াইয়ের পেছনে থাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্ররোচনা।

ইরান-ইরাক যখন শাতিল আরবের জন্য যুদ্ধংদেহী হয়ে পড়ে তখন আমেরিকা ইরাককে আর রাশিয়া ইরানকে লাগাতার অস্ত্র সরবরাহ করে আট বছর পর্যন্ত সেই যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গে হাওয়া দিয়ে যায়। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা আরব-দুনিয়াকে তার অতিরিক্ত অস্ত্র বিক্রির জন্য এবং আরব উপসাগরে ঘাঁটি বানাবার জন্য একদিকে ইরাককে কুয়েতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্ররোচিত করে, অন্যদিকে আরবদের ইরাকের প্রতি ভীত করে তোলে। এবং এর মাধ্যমে তারা তাদের অস্ত্রের দামও বৃদ্ধি করিয়ে নেয়।

তারপর এই যুদ্ধ কেবল দুই দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং দেশের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধের আগুনও জ্বেলে দেওয়া হয়। লেবাননে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়া হয় শিয়া-সুন্নি বিরোধ উসকে দিয়ে। ইরাকে একদিকে শিয়া-সুন্নি আরেক দিকে আরব-কুর্দি লড়াই চলে আসছে। মরক্কোতে আরব এবং বারবারদের মাঝে গৃহযুদ্ধ উসকে দেওয়া হয়েছে। ইয়ামান উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে নিজেদের ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবার উপক্রম। মিশরে মুসলমান এবং কিবতিদের মধ্যকার লড়াই চলমান। সুদানে মুসলমান এবং খ্রিষ্টানদের লড়াই থামার নাম নেই। চাদ এবং মালিতে আরব ও আফ্রিকার টানা-হেঁচড়া চলতেই থাকে। বাহরাইন, ইরাক এবং শামে শিয়া-সুন্নি বিরোধ ক্রমে আরও বাড়ছে। ইতোমধ্যে হাজারও মানুষ তাতে হতাহতের শিকার।

উপমহাদেশে একই অঞ্চলের মুসলমান পাকিস্তান এবং ভারতে বিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এরপর পাকিস্তানকে আবার ভাষাগত বিরোধে দুই টুকরো করে ফেলা হয়েছে। বাংলাদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তান আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। পাকিস্তানের যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাতেও পাঠান, সিন্ধি এবং পাঞ্জাবিদের বিরোধ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। হাজারা এবং সারায়িকি স্বতন্ত্র পরিচয়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেছে। বেলুচ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে আফগানিস্তান এবং ইরাককে জাতিভিত্তিক বিভক্ত করবার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। জুন ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে কতক আমেরিকান রাজনীতিজ্ঞ সৌদি আরবকেও ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত করবার সুপারিশ হাজির করে।

মোটকথা, ষড়যন্ত্রতত্ত্বের কারণে সমস্ত ইসলামি দুনিয়া বিভেদ এবং বিচ্ছিন্নতার এক কঠিন সময় পার করছে। আর বিভক্তি ও বিভাজনের কাজ তো অব্যাহত আছেই।

সিকিউরিটি ও নিরাপত্তা : সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কিছু কিছু মুসলিম দেশে নিরাপত্তা-ব্যবস্থার নামে সৈন্য মোতায়েন করে রাখে। বন্ধুত্বের নামে এটা মূলত শত্রুতা, যা সেই দেশের সাথে ঘোষিত যুদ্ধের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। যেমন : সৌদি আরবের সাথে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে এই চুক্তি করা হয়, সৌদপরিবারে নেতৃত্ব এবং শাসনক্ষমতার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমেরিকার। বিনিময়ে সৌদি আরব আমেরিকার সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, সে কখনো আমেরিকাকে তেল সরবরাহ বন্ধ করবে না। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা তার এই বন্ধুর নিরাপত্তার কথা বলে সেখানে ঘাঁটি প্রস্তুত করে বসে, যা ইসলামি বিশ্বের জন্য অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে।

পুতুল শাসকদের ইজারাদারি : সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জন্য মুসলিম দেশে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা এবং পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসানো অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে। যেকোনো ভিনদেশি এজেন্ট জালিয়াতির মাধ্যমে রাতারাতি ইলেকশন জিতে অ্যাসেম্বলির মেম্বার এবং মন্ত্রী হয়ে যায়। এরপর নিজের আনুগত্য ও ওয়াফাদারি সেই বহিঃরাষ্ট্রের নামে উৎসর্গ করে দেয়, যার কৌশল ও চতুরতায় সে ক্ষমতা লাভ করেছে। এই পুতুল সরকার কখনো মুসলিম দেশের সাথে ঐক্য, সংহতি এবং সহায়তার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে না। যে কারণে মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল কখনো নিষ্পত্তিতে পৌঁছে না।

রাজনৈতিক এবং ভাষাকেন্দ্রিক বিভিন্ন দলের উদ্ভব : নিত্যনতুন রাজনৈতিক ও ভাষাগত দল-উপদলের সৃষ্টিও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রত্যাশামাফিক ইসলামি দুনিয়ায় অরাজকতা ছড়িয়ে দেবার একটি বড় মাধ্যম। আজ প্রতিটি মুসলিম দেশে দু-চারটি উন্মাদ ছোট-বড় রাজনৈতিক ও ভাষাভিত্তিক দল বিদ্যমান। আর সাধারণ মানুষ ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অন্ধের মতন তাদের পেছনে ছুটছে। এমতাবস্থায় জাতিগত সংহতি তৈরির কোনো সুযোগই সৃষ্টি হয় না।

ভাষাপ্রীতি এবং আঞ্চলিকতা : প্রতিটি মুসলিম দেশকে ভাষা এবং অঞ্চলের ভিত্তিতে আরও বেশি টুকরো করে তুলবার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিশেষ করে যেসব দেশের প্রত্যেক প্রদেশের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন, সেখানে এই প্রচেষ্টা ঊর্ধ্বমুখী। প্রতিটি দেশে এমন একটি দল তৈরি করে রাখা হয়েছে, যারা ভাষাপ্রীতি এবং আঞ্চলিকতার প্রচার চলমান রাখে।

ধর্মীয় দল-উপদলের উদ্ভব : মুসলিম-দুনিয়ায় নিজেদের এজেন্টদের মারফত নতুন এবং অভিনব চিন্তার উদ্ভব ঘটিয়ে তৈরি করা হয় নিত্যনতুন ধর্মীয় দল-উপদল। নতুন চিন্তার লালন ও প্রচারকারী প্রতিটি দলের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। কাদিয়ানী, মুনকিরে হাদিস, নেচারি, গামেদী, ঘোরশাহি ইত্যাদি তার কিছু দৃষ্টান্ত।

ভুয়া নেতৃত্ব তৈরি করা : সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলিম-দুনিয়ার নেতৃত্ব নিজেদের হাতে রাখবার উদ্দেশ্যে নিজেদের পছন্দের লোকদের প্রস্তুত রাখে। এবং যথাসময়ে তাকে সকলের সামনে হাজির করে জাতির উদ্ধারকারীরূপে। বিশেষ করে সেই মুহূর্তে, যখন কোনো দেশে বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং জাতি তার পূর্বেকার নেতৃত্বে নিরাশ হয়ে কোনো নতুন নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ও অনুসন্ধান করতে থাকে। এমন পরিস্থিতির 'সদ্ব্যবহারের' জন্য ইসলামবিদ্বেষী শক্তির কাছে পূর্ব থেকেই কিছু লোক প্রস্তুত করা থাকে, যাকে প্রয়োজনের সময় বিকল্প নেতৃত্ব হিসেবে সামনে হাজির করা হয়। ইসলামি দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে এই ধরনের বহু দৃষ্টান্ত নিকট-অতীতের আন্দোলনে লক্ষ করা গেছে। সেই বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের কারণে ইসলামি বিশ্ব এখন পর্যন্ত নিজের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কোনো স্বতন্ত্র ব্লক গঠনে কিংবা কোনো সমস্যায় ঐক্য বা সংহতি গড়তে ব্যর্থ রয়ে গেছে।

সপ্তম ধাপ : মুসলিমবিশ্বকে মনীষীশূন্য করা

ইসলামি বিশ্বকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বর্তমানে তার মনীষীদের, আরেক ভাষায় বললে, মুসলমানদের একক জাতিসত্তা হিসেবে আবির্ভাবের সম্ভাবনা নষ্ট করে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে তারা যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে :

বিপথগামী চিন্তক নির্মাণ : এমনসব চিন্তক ও বুদ্ধিজীবী তৈরি করা হচ্ছে, যাদের মাধ্যমে ইসলামের রুহানিয়্যাত নিঃশেষ করে দেওয়া যায়, যারা দীনের নামে মানুষকে দীন থেকে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা বেশ ভালো করেই জানে যে, অশ্লীলতা, উলঙ্গপনা, সম্পদের প্রলোভন এবং বস্তুবাদ দ্বারা মুসলিম-সমাজের একটি অংশকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করা গেলেও সকলের চরিত্র বিগড়ানো সম্ভব হবে না। অনেক বিভ্রান্ত ও বিপথগামী মানুষ সময়ে সময়ে নিজের ভেতরের রুহানিয়্যাতের তৃষ্ণা ঠিকই অনুভব করে ওঠে। এবং দীনধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়তে আরম্ভ করে। তাদের হৃদয় রুহানি প্রশান্তি লাভ করতে চায়। এমন সময়ে যদি তার বিশুদ্ধ ইসলামের প্রতি পথনির্দেশ লাভ হয়ে যায় তাহলে সে পশ্চিমের শয়তানি মতাদর্শের বিরুদ্ধে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই অবস্থায় দীনের শিরোনামে তার অভিমুখ যদি অন্য কোনো কিছুর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে জীবনভর প্রকৃত ইসলামের দিকে ফিরে

আসবার অবকাশ পাবে না। সেই কারণেই তারা একটি মানুষের জীবনের গতিপথ পরিবর্তনের মতন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণের মুহূর্তে তাকে বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে প্রথম থেকেই তথাকথিত ইসলামি চিন্তাবিদদের মঞ্চ তৈরি করে রাখে। ইসলামের অভিমুখী ব্যক্তি তাদের প্রসিদ্ধিতে প্রভাবিত হয়ে তাদের দিকেই ধাবিত হয়। এবং এসব বিপথগামী চিন্তকের অনুসরণের অন্তরালে মূলত সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টের ফাঁদে পা দিয়ে বসে।

সাম্রাজ্যবাদের আনুগত্যের দীক্ষা : এইসকল তথাকথিত ইসলামি চিন্তাবিদ এবং মুজতাহিদ নিজেদের গবেষণা ও ফতোয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আনুগত্যের দীক্ষা প্রদান করেন। যেই-সময়ে শাইখুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহিমাহুল্লাহ তুরস্কের বিরুদ্ধে লড়াইরত ইংরেজ বাহিনীতে ভর্তি হওয়া হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন, বেরেলির মুফতিরা তখন ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, ইংরেজ বাহিনীতে ভর্তি হওয়া বৈধ। শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী রহিমাহুল্লাহ খ্রিষ্টীয় উনিশ শতকের শেষদিকে হিন্দুস্থানকে দারুল হরব বলে ফতোয়া প্রদান করেন। কিন্তু খ্রিষ্টীয় বিশ শতকে যখন ইংরেজদের ক্ষমতার সূর্য মধ্যগগনে তখনও বেরেলির মুফতি সাহেবরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন হিন্দুস্থান দারুল ইসলাম—এই বলে ফতোয়া প্রদান করতে থাকে। আল্লামা ইকবাল এই শ্রেণির লোকেদেরই সম্বোধন করে বলেছেন :

হিন্দুস্থানের জমিনে সিজদার ইজাজত পেয়ে মোল্লা ভাবে,
ইসলাম আজাদ দুনিয়াতে।

একইভাবে মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আনুগত্যকে ওয়াজিব বলতেন। বর্তমান সময়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমর্থিত ইসলামি চিন্তাবিদদের কাছে অন্যান্য দেশের উচ্চতর বিদ্যাপীঠের শিক্ষাগত সার্টিফিকেট থাকে। তারা সাধারণত মিডিয়ায় দৃশ্যমান হন। আলাপচারিতা এবং বক্তৃতার ভাষায় তারা খুব দক্ষ হয়ে থাকেন। যে কারণে সম্বোধিত ব্যক্তির মন ও মননে নিজেদের চিন্তা বেশ পোক্তভাবে গেঁথে দিতে সমর্থ হন। দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ডিগ্রিধারী কিছু ব্যক্তিও সময়ে সময়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে যান। বর্তমান সময়ে সাম্রাজ্যবাদের আনুগত্যকে সাধারণত বৈশ্বিক স্রোতের সঙ্গ দেওয়া, সামগ্রিক কল্যাণ এবং যুগ-চাহিদার বিবেচনা করা কিংবা আন্তর্জাতিক সমাজের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার মতন চটকদার শিরোনাম দেওয়া হয়ে থাকে।

বিভ্রান্তিমূলক এবং ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে জিহাদের স্বপ্ন নিঃশেষ করে দেওয়া : জিহাদ উপনিবেশবাদের বিষের জন্য প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। এ কারণে সাম্রাজ্যবাদের অ্যাকাডেমিক ও মনস্তাত্ত্বিক এজেন্টরা জিহাদের কল্পনা ও পরিকল্পনা মিটিয়ে দেবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কখনো জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ এবং

মুজাহিদদের সন্ত্রাসবাদী বলছে আবার কখনো জিহাদের জন্য এমনসব শর্ত আবশ্যিক করে দিচ্ছে, যা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। প্রথম দিকে ইকদামি জিহাদের বিরোধিতা করা হতো। কিন্তু এখন আত্মরক্ষামূলক জিহাদকেও বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিরোধপূর্ণ করে ফেলা হচ্ছে।

ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসকে সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যমাফিক বদলে ফেলা : এই চিন্তাবিদদের সহায়তাতেই সাম্রাজ্যবাদ ইসলামের প্রকৃত চেহারা বিকৃত করে ফেলতে চায়, যাতে ইসলাম আর ইসলাম না থাকে; বরং একটি পরিবর্তিত মতবাদে পরিণত হয়ে যায়। এই ধরনের বিবর্তন-কর্ম হয়ে থাকে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব এবং উম্মতের সংশোধনের শিরোনামে। ফলে, সাধারণ মানুষ তাতে খুবই প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে। যেমন : স্যার সৈয়দ আহমদ খান বাহ্যত মুসলমানদের সংশোধন-কর্ম শুরু করেছিলেন; কিন্তু সেই সংস্কার ও সংশোধন-কর্মের অধীন তিনি যে প্রকৃতিবাদ হাজির করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ এক নয়া ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছিল।

একইভাবে গোলাম আহমদ পারভেজ এবং অন্যান্য চিন্তাবিদ হাদিস অস্বীকারের মধ্য দিয়ে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস পালটে ফেলে এক নতুন ধর্ম প্রণয়ন করবার সকল চেষ্টা সম্পন্ন করেছিল। বর্তমানে জাবেদ গামেদী এবং তার কিছু সমচিন্তক ব্যক্তিও সেই ধারা অব্যাহত রাখার প্রয়াসে লেগে রয়েছে। যদি এইসব কর্মযজ্ঞের নাম 'ইসলামের নামেই ইসলামের কাঠামো ধসিয়ে দেওয়া' রাখা হয় তবে অন্যায় কিছু হবে না।

মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি বিক্ষত করা : সাম্রাজ্যবাদ মুসলমানদের স্বকীয়তা ক্ষতবিক্ষত করবার জন্য তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং তাদের মতাদর্শিক অবস্থানসহ সকল বিষয় বদলে দিয়েছে। আফ্রিকার মুসলমানেরা বাধ্য হয়েছে ফরাসি সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করে নিতে। মরক্কোতে স্প্যানিশ এবং পর্তুগিজ ভাষার ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে। ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়ায় স্প্যানিশ এবং ডাচ ভাষা শিক্ষিত হবার মানদণ্ডে পরিণত হয়েছে। হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ইরান এবং আরব-দুনিয়ায় ইংরেজিকে মাথায় তুলে রাখা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক দর্শন ও চিন্তাধারার প্রসার ঘটানো : ইসলামি রীতিনীতি ধ্বংস করবার লক্ষ্যে এবং সাধারণ মানুষকে কেবল বস্তুবাদী জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তুলবার উদ্দেশ্যে মুসলিম দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার ঘটানো হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলিম-দুনিয়ার বল্গাহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন শাসকদের ইজারাদারি মুসলিম-দুনিয়াকে বহু ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু এখন শিক্ষিতশ্রেণির মাঝে যেই গণতান্ত্রিক দর্শনের প্রসার ও বিস্তৃতি ঘটানোর উদ্যোগ করা হচ্ছে, তা একটি মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক ভ্রষ্টতা, যা একজন মানুষকে ইসলাম থেকেই দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। কেননা এই দর্শন ও চিন্তাধারার মূলকথা

হলো, মানুষ জন্ম নিয়েছে একদমই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নিয়ে। একজন সাধারণ মানুষ যেকোনো প্রকারের আইনপ্রণয়নের এবং তা বাস্তবায়নের পরিপূর্ণ অধিকার রাখে। স্পষ্টতই এই দর্শন ইসলামের সাথে কোনো প্রকার সাদৃশ্য রাখে না। মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মহীন এবং নাস্তিক্যবাদী অধিকাংশ লক্ষ্য এই দর্শনের অনুসারীদের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

—আসালিবুল গাজবিল ফিকরি, ডক্টর আলী মুহাম্মদ জারিশা, উসতায মুহাম্মদ শরিফ জিবাক।
—মা যা খাসিরাল আলাম বিন হিতাতিল মুসলিমিন, মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী।
—আদ দাওলাতুল উসমানিয়্যা, মুহাম্মদ বিন আলী আস সাল্লাবী।
—বাহছুল ইসতি'মারিল হাদিস, মুনকিজ আস সাক্কার।
—আল-ইসতি'মার: আহকাদ ও ইতমা', মুহাম্মদ আল-গাজালী।
—আজনিহাতুল মাকরিছ ছালাছাহ, আবদুর রহমান বিন হাসান দামেশকী।
—আততারিখুল উরাববিল হাদিস: মিন আছরিন নাহদাহ ইলাল হারবিল আলামিয়্যাতিল উলা, আবদুল আজিজ নাওয়ার, মাহমুদ মুহাম্মদ জামালুদ্দীন।
—আসিরানে মাল্টা, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মিঞা।
—বারতানুবি সামরাজ নে হামে ক্যায়সে লুটা, হজরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানী।
—আংরেজ কে বাগী মুসলমান, জানবাজ মির্জা।
—হুয়ে তুম দোস্ত জিনকে, হাক্কি হক

৪.৩: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের তৃতীয় ক্ষেত্র
গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন

৪.৩.১: আমেরিকান ও ইহুদি সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রাচ্যতত্ত্ব

এই যুগে উপনিবেশবাদ এবং প্রাচ্যতত্ত্বের নেতৃত্ব আমেরিকা এবং ইহুদি লবির হাতে এসে গেছে। আর ইসলামের শত্রুপক্ষ এই দুটি শক্তি সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রাচ্যতাত্ত্বিক উদ্দেশ্যগুলো একটি সংক্ষিপ্ত ও সর্বব্যাপী মাধ্যমের মধ্যস্থতায় চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার সংগ্রামে নিরত আছে, যাকে বলা হয় বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন।

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসে সংঘটিত হয় প্রাচ্যবিদদের উনিশতম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স। এই কনফারেন্সে আমেরিকার প্রখ্যাত ইহুদি প্রাচ্যবিদ বার্নার্ড লুইস-এর সুপারিশে 'প্রাচ্যতত্ত্ব' পরিভাষা ত্যাগ করে একটি নতুন পরিভাষার ব্যবহার আরম্ভ করার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নতুন পরিভাষাটিই আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনারে বিশ্বায়ন বা Globalization নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

তবে 'বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন' কেবল প্রাচ্যতত্ত্বেরই নয়; বরং সাম্রাজ্যবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষাতার (ধর্মহীনতার)-ও নতুন সংস্করণ, যার নেতৃত্ব রয়েছে পূর্বেকার বড় শক্তিগুলো : ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার বদলে আমেরিকা ও ইহুদি লবির হাতে।

৪.৩.২: গ্লোবালাইজেশন, পশ্চিমের ভাষায়

ক্যামব্রিজ ডিকশনারিতে গ্লোবালাইজেশন (Globalization) বা বিশ্বায়নের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :

> Globalization: the increase of trade around the world, especially by large companies producing and trading goods in many different countries:
>
> "গ্লোবালাইজেশন অর্থ হলো—বাণিজ্যকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। বিশেষ করে বিভিন্ন দেশে বড় বড় কোম্পানি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যস্থতায়।"

বিশ্বায়নের সবচাইতে বড় প্রতিনিধি ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন তার সংজ্ঞা দিয়েছে :

> "গ্লোবালাইজেশন অর্থ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক সহায়তা, যা উৎপাদিত পণ্য এবং সেবার (প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসেস) বিনিময়ের আধিক্যের কারণে প্রসার লাভ করে। তার কারণে দেশের পুঁজির মধ্যেও প্রবৃদ্ধি আসে, সারা দুনিয়ায় প্রযুক্তির প্রসার ঘটে। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কাস্টম এবং ভৌগোলিক

সীমার প্রতিবন্ধকতা উঠিয়ে দেওয়া। এবং সারা বিশ্বকে এক আন্তর্জাতিক বাজারে রূপান্তর করা।"

এইসব সংজ্ঞা অনুযায়ী বিশ্বায়ন সাধারণ মানুষের উপলব্ধিতে একটি ইতিবাচক ধারণা হিসেবে হাজির হয়। মনে করা হয়, নতুন আবিষ্কারের মারফত সারা দুনিয়া একটি জনপদের রূপ নিয়েছে—এটাই গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন।

কিছু মানুষ বিশ্বায়নকে সংক্ষেপে 'সীমানার প্রতিবন্ধকতার পরিসমাপ্তি'র অর্থে গ্রহণ করেন। এবং মনে মনে আনন্দিত হন এই ভেবে যে, হয়তো-বা শীঘ্রই সারা দুনিয়া একটি দেশের মতো হয়ে যাবে। আর সকলে ভাই ভাই হয়ে বসবাস করবে। কিন্তু এই পরিভাষার আড়ালের বাস্তবতা এত সরল এবং এত ইতিবাচক নয়। যদিও তাকে সাদাসিধা এবং ইতিবাচক প্রমাণ করবার জন্য আমেরিকা ও ইহুদিশক্তি তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৪.৩.৩: মুদ্রার অপর পিঠ, নেতিবাচক দিক

কিন্তু কথা হলো—গ্লোবালাইজেশন কি এতটাই সরল ব্যাপার? নথিপত্র ঘাটলে দেখা যায়, এই পরিভাষা আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি তখনই লাভ করেছে যখন আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সিনিয়র তার এক লেকচারে তা ব্যবহার করেছেন। এই লেকচারটি উপসাগরীয় যুদ্ধ সমাপ্তির পর উপসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েনকৃত সেনাসদস্যদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল। বুশ তার এই লেকচারে সন্ত্রাসবাদ-মুক্ত এমন একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনার চিন্তা হাজির করেন, যা পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করবে। এবং জনসাধারণকে সুখ ও সমৃদ্ধির সাথে জীবনযাপনের অবকাশ এনে দেবে। এই ব্যবস্থাকে 'নয়া বিশ্বব্যবস্থা' (New World Order) শিরোনামেও ব্যক্ত করা হয় এবং পর্যবেক্ষকদের মতেও বিশ্বায়নের আসল লক্ষ্য হলো বুশের ঘোষিত এই 'নয়া বিশ্বব্যবস্থার'ই পথ মসৃণ করা।

বিশ্বায়ন পশ্চিমের অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে কেবল নয়; বরং সারা পৃথিবীকে একটি বিশেষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির রঙে রাঙিয়ে তোলাও তার অন্যতম উদ্দেশ্য বটে। আর একথা তো এখন কারুর থেকেই গোপন নেই যে, সেই একক কালচার আমেরিকান কালচার ছাড়া কিছু নয়, যে কালচার ও সংস্কৃতির দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গোটা পৃথিবীকে।

স্বয়ং আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বিশ্বকোষে (The International Encyclopedia of Business & Management) বিশ্বায়নের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, 'বিশ্বায়ন হলো, বৈশ্বিক সভ্যতার প্রচার ও প্রসার ঘটানোর এক রোডম্যাপ।'

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনও এক জায়গায় স্বীকার করেছেন, বিশ্বায়ন কেবল অর্থনৈতিক বিষয় নয়; বরং এটা পরিবেশ-পরিস্থিতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং স্বাস্থ্যের মতন বিষয়ের সাথেও সম্পর্ক রাখে। বস্তুত বিশ্বায়ন এমন একটি ব্যবস্থা এবং এমন একটি রূপকল্প, যার একদিকে একজন শক্তিধর, মেধাবী এবং সমৃদ্ধশালী

ব্যক্তি, অপর প্রান্তে একজন নিঃস্ব, মেধাহীন ও দুর্বল ব্যক্তি। একজনের কাছে সবকিছু আছে, অন্যজনের কাছে কিছুই নেই। এই ধরনের বাণিজ্যের পরিণাম এই ছাড়া আর কী হবে যে, দুর্বল ব্যক্তি তার ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকেও বঞ্চিত হয়ে শক্তিধরের দাসে পরিণত হয়ে পড়বে।

এইসব দৃষ্টান্ত সামনে রেখে বিশ্বায়নের যথার্থ সংজ্ঞা হওয়া উচিত :

"বিশ্বায়ন এক এমন আন্দোলন, যার উদ্দেশ্য—অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য নির্মূল করে দিয়ে ইউরোপিয়ান দুনিয়ার জায়নাবাদী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ঘটানো।"[৬৫]

বিশ্বায়নের এই যথার্থ সংজ্ঞার প্রতিবিম্ব দেখতে পাওয়া যায় স্বয়ং মার্কিন চিন্তাবিদদেরই লেখাজোখায়। প্রসিদ্ধ মার্কিন বুদ্ধিজীবী উইলিয়াম গ্রেডার লেখেন :

"বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক শিল্পবাণিজ্যের শিরোনামে উচ্চকিত বিপ্লবের পরিণতি হয়ে সামনে হাজির হওয়া এমন এক পথ ও পন্থা, যা উন্নতি এবং ধ্বংস—দুয়েরই সক্ষমতা রাখে, সমানভাবে। এবং আন্তর্জাতিক সীমানার তোয়াক্কা না করে নিজের মতো এগিয়ে চলে। এটা অগ্রগতির বড় কারণ হওয়ার পাশাপাশি সেই পরিমাণ ভয়াবহও বটে।"[৬৬]

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মাহাথির মুহাম্মদ বিশ্বায়নের ঝুঁকিগুলো শনাক্ত করে ইসলামিক কনফারেন্সের ডায়াসে বলেছিলেন :

"আন্তর্জাতিক বাণিজ্যব্যবস্থা বিশ্বায়নের একটি টুল। সে উন্নত দেশগুলোকে অনুমতি দেয় যেন তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সম্পূর্ণরূপে শুষে নেয়।"[৬৭]

ডক্টর মুসতাফা নাশশার বিশ্বায়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য তুলে ধরে লেখেন :

"বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য কোনোভাবেই বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির মানুষকে কাছাকাছি আনা নয়; বরং তার উদ্দেশ্য সকল স্থানীয় ও জাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি নির্মূল করে দিয়ে সমস্ত দুনিয়াকে পশ্চিমা রঙে রাঙিয়ে তোলা।"[৬৮]

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিভাগের পরিচালক ডক্টর মুহাম্মদ হাসান রসমির বক্তব্য হলো :

"বিশ্বায়ন একটি অন্ধ তুফান, যে নিজের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে কোনো কিছুই সহ্য করতে পারে না। এই ব্যবস্থা শক্তিধর লোকেদের জন্য সহায়ক আর দুর্বলদের জন্য ধ্বংসাত্মক।"[৬৯]

---

[৬৫] আল-আওলামা, সালেহ রাকব, পৃষ্ঠা : ৬
[৬৬] সালেহ রাকবের আল-আওলামার সূত্রে One World Reedy Or No?
[৬৭] আল-আওলামা, সালেহ রাকব, পৃষ্ঠা : ১৪
[৬৮] আল-মুনতাদা, সংখ্যা ১৯৩; আগস্ট ১৯৯৯
[৬৯] মাআল-আওলামা, আখবারুল হারাম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০১

৪.৩.৪: মুসলিমবিশ্বই কেন বিশ্বায়নের মূল লক্ষ্য

যদিও বিশ্বায়ন সারা বিশ্বেই কর্তৃত্বশীল হয়ে উঠছে; কিন্তু তার প্রকৃত লক্ষ্য মুসলিমবিশ্ব ও মুসলমান। এর চারটি কারণের কথা উল্লেখ করা যায় :

১. বিশ্বের মানচিত্রে ইসলামি দেশগুলোর অবস্থান সর্বোত্তম রেখায়।
২. ইসলামি দুনিয়া প্রচুর পরিমাণ খনিজ সম্পদের অধিকারী, যার অধিকাংশ এখনো ভূগর্ভেই রয়ে গেছে।
৩. তিন প্রধান ধর্ম : ইসলাম, খ্রিষ্টান এবং ইহুদি—এর পবিত্র ভূমি ইসলামি বিশ্বেই অবস্থিত। বিশ্বায়নের প্রতিষ্ঠাতা জায়নিস্ট রাষ্ট্রের অবস্থানও ইসলামি বিশ্বে, যার বিস্তৃতি ও প্রসার বিশ্বায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যও বটে।
৪. পশ্চিম এই কথা ভালো করেই জানে যে, বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক হামলার জবাব দেওয়ার সামর্থ্য কেবল ইসলামি ব্যবস্থারই রয়েছে। এ কারণে ইসলামকে একেবারে নির্মূল করে ফেলা এবং ইসলামি ব্যবস্থার পুনর্জাগরণের সকল সম্ভাবনা নিঃশেষ করে দেওয়া অবধি বিশ্বায়নের স্বপ্ন পূরণ হবার নয়।

৪.৩.৫: বিশ্বায়নের চার ক্ষেত্র

বিশ্বায়ন মূলত ইহুদিদের স্বপ্ন। শত বছর ধরে তারা এমন এক বৈশ্বিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে নিরত রয়েছে, যার রাজধানী হবে জেরুসালেম। আর তার সিংহাসনে বিরাজমান হবে বনি ইসরাইলের সর্বজনীন বাদশাহ (মাসিহে দাজ্জাল)। সেই অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে চারটি ক্ষেত্রে তারা বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশনের প্রসারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সেগুলো হলো :

১. রাজনৈতিক বিশ্বায়ন।
২. অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন।
৩. সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন।
৪. সামাজিক বিশ্বায়ন।

বিশ্বায়নের প্রথম ক্ষেত্র : রাজনৈতিক বিশ্বায়ন

রাজনৈতিক বিশ্বায়নের ইতিহাসের সূচনা সম্ভবত সেই সময়ে, বৈশ্বিক সাম্রাজ্য তৈরির জন্য ইহুদিরা যখন আমেরিকার শক্তির ব্যবহার শুরু করল। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাভিলাষ, তাদের পুঁজির বিপুল সংস্থান এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বে তাদের উদীয়মান অবস্থান দেখে খ্রিষ্টীয় উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ইহুদিরা আমেরিকায় নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে আরম্ভ করে।

আমেরিকা ইউরোপিয়ান জাতির নতুন জনপদ। সেখানকার মূল আদিবাসী ছিল রেড ইন্ডিয়ান, যারা হাজারো বছর ধরে সেখানে বসবাস করে আসছিল। কলাম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে সেখানে স্প্যানিশ, পর্তুগিজ এবং ব্রিটিশ অভিবাসীদের স্বতন্ত্র আবাস গড়ে উঠতে থাকে। তবে তাদের সমাজব্যবস্থা চলতে থাকে প্রত্যেকের নিজ দেশেরই আইন অনুযায়ী। পরবর্তী সময়ে এই নতুন

অভিবাসীরা নতুন সমাজব্যবস্থার প্রচলন ঘটালে আমেরিকার ভার্জিনিয়ায় একটি নতুন দেশের গোড়াপত্তন করা হয়। আর তারও পরে এই নতুন অভিবাসীরা জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ইউরোপিয়ান দেশগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকাকে স্বাধীন করে নেয়।

আমেরিকান অধিবাসীদের অধিক সংখ্যকই সেই সমস্ত অপরাধীর সন্তান, যাদের প্রতি ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে তাদের শাসকেরা তাদেরকে দ্বীপান্তর করে দিয়েছিলেন। এই কারণে মার্কিনিদের মধ্যে ধোঁকা, প্রতারণা, গোয়ার্তুমি এবং স্বার্থপরতা কানায় কানায় পূর্ণ। তাদের সেই ধোঁকা-প্রতারণা এবং অহংকারের অনুমান করা যেতে পারে ক'জন মার্কিন বুদ্ধিজীবীর নিম্নযুক্ত উদ্ধৃতি থেকে :

মার্কিন জাতি খোদার প্রিয়তর। একদিন আমরাই আন্তর্জাতিক বিশ্বের প্রধান কেবলা হয়ে উঠব। (উইলিয়াম বেয়ার্ড)

আমাদের দ্বারা কোনো ভুল হওয়া সম্ভব নয়। কেননা খোদা আমাদের সমর্থন করেন। (ফ্রান্সিস হে নিক্সন)

সারা বিশ্বের উপর আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব (সুপারিয়র) দেখে খোদা সন্তুষ্ট। (জন বেরিঞ্জা)

আমেরিকার জন্য আবশ্যক হলো, সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর উপর ক্ষমতার ছড়ি ঘোরানো। (মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেফারসন)

এই হঠকারিতা এবং অহংকারের কারণেই আমেরিকা সেই মহাদেশের প্রকৃত বাসিন্দাদের (রেড ইন্ডিয়ান) থেকে তাদের ভূমি ছিনিয়ে নেবার উদ্যোগ শুরু করে। নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায় নিরীহ মানুষদের উপর। তাদেরকে বাধ্য করে দুর্ভিক্ষপিড়িত মরু-অঞ্চলে বসবাসের জন্য। আর এর মধ্য দিয়েই আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের সূচনা ঘটে যায়।

এই অভিবাসীরা স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদের থেকে ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে লুজিয়ানা এবং ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম ফ্লোরিডা দখল করে নেয়। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মেক্সিকো, ক্যালিফোর্নিয়া, নিউমেক্সিকো, নেভেডা, অ্যারিজোনা জয় করে নেয়।

আমেরিকা যখন প্রতিষ্ঠা হয় তখন রেড ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা ছিল ছয় লাখ। কিন্তু বিংশ শতকের শুরুতেই তাদের সংখ্যা মাত্র দুই লাখ বিশ হাজারে নেমে আসে। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে তাদেরকে এই শর্তে আমেরিকার নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় যে, তারা নিজেদের অতীত ভুলে প্রতিটি এমন প্রথা-পার্বণ ও অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, যা তাদের রেড ইন্ডিয়ান হবার (আইডেন্টিটি) বিশেষ পরিচায়ক হবে, যা দেখেই পার্থক্য করা যাবে যে, তারা রেড ইন্ডিয়ান।

এই জাতিগত বিদ্বেষ এবং অহংকার মার্কিনিদের রক্তে মিশে আছে। মূলত এটা ইহুদিদের মস্তিষ্কজাত পরিকল্পনা, যে কল্পনা তাদের রাজাধিরাজ হয়ে উঠবার পাগলামিতে মত্ত রেখেছে। ইহুদি পুঁজিপতিদের বিশ্বাস—আমেরিকার এই অহংকার, হঠকারিতা এবং সাম্রাজ্যবাদী উন্মাদনা তাদের বৈশ্বিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অত্যন্ত

উপকারী ও কল্যাণকর। আর তাই তারা আমেরিকার কাঁধে চরে রাজনৈতিক বিশ্বায়নের সফর শুরু করেছে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তারা আমেরিকার জ্ঞানবিজ্ঞান এবং মিডিয়ার উৎসমুখের কর্তৃত্ব অর্জন করে নিয়েছে। আর এভাবেই তারা সমর্থ হয়েছে মার্কিন জনগণের মনন ও মগজের দখল নিজেদের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিতে।

ইহুদি লবি আমেরিকার রাজনৈতিক বিষয়ে কতটা প্রভাবক শক্তি, তার স্পষ্ট অনুমান সম্ভব পাদরি পল ফিন্ডল প্রণীত মুগ্ধকর They dare to speak out গ্রন্থ থেকে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে, আমেরিকান ইহুদিসংস্থা American Israel Public Affairs Committee মার্কিন কংগ্রেস এবং সিনেটের রগরেশায় বেশ ভালো রকমে মিশে গিয়েছিল।

পাদরি[৭০] জানাচ্ছেন, ওয়াশিংটনের ইহুদি লবিই এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কখন কীভাবে কী করতে হবে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রণালয় পেন্টাগনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ইহুদি লবির মর্জিমাফিক পরিচালিত হয়ে থাকে। নিউইয়র্ক টাইমসের মতে, মার্কিন ইহুদি লবি ওয়াশিংটনের সবচেয়ে প্রভাবক, সবচেয়ে মজবুত এবং সুবিন্যস্ত লবি, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যাদের প্রভাব অকল্পনীয়।

আমেরিকায় নিজেদের এই প্রভাব-প্রতিপত্তির মারফত ইহুদিরা তাদের তিনটি উদ্দেশ্য পূরণে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তা হলো :

১. দুনিয়ার বৃহত্তর সব রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৃত্তকে ভেঙে-চুড়ে দুর্বল করে দেওয়া হবে।
২. আমেরিকাকে এতটা ক্ষমতাধর করে দেওয়া হবে যে, তার সামনে দ্বিতীয় কোনো শক্তি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।
৩. একটি বৈশ্বিক রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা হবে সারা দুনিয়ার শাসক ও নিয়ন্ত্রক।

আর এরই পরিণামে আমরা দেখি যে, খ্রিষ্টীয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকা তার সীমান্তের বাইরে আগ্রাসনের এক অসমাপ্ত ধারা শুরু করে দেয়। যেহেতু মুসলিম-দুনিয়া এই সময়ে কতক বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি : ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স এবং ইটালির নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, সে কারণে আমেরিকা ইসলামি দুনিয়ার বাইরে তার নতুন শিকারের অনুসন্ধানে নামে। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা জাপানে হামলা করে জাপানিদের তাদের এলাকা এদো (Edo) থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করে। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিপাইন দখল করে নেয় এবং সেই বছরই কিউবাতে হামলা চালায়। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পানামাতে অনুপ্রবেশ করে। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে কিউবার উপর

---

[৭০] লেখক মাওলানা ইসমাইল রেহান পল ফিন্ডলের পরিচয় দিয়েছেন 'পাদরি' বলে। মূলত তিনি পাদরি না, ছিলেন একজন জনপ্রিয় লেখক।

দ্বিতীয়বারের মতন হামলা চালায়। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে টার্গেট বানায় হাইতিকে। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, সতর্কভাবে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে, অংশ নেয়। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে হাইতিতে দ্বিতীয়বার অভিযান চালায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে হিরোশিমা এবং নাগাসাকি ধ্বংস করে দেয় অ্যাটম বোমার আঘাতে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে সিআইএ প্রতিষ্ঠা করে সারা দুনিয়ায় ভয়ঙ্কর সব কর্মকাণ্ড আরম্ভ করে। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে কোরিয়াকে নিশানা বানায়। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন সৈন্যরা সিআইএর সহায়তায় গুয়াতেমালায় হামলা চালায়। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে লেবাননে অনুপ্রবেশ করে। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে কিউবার উপর তৃতীয়বার হামলে পড়ে। সেই বছরেই ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু করে। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে কম্বোডিয়ায় হামলা চালায়। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে ইসরাইলের সহায়তার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার লেবাননে অনুপ্রবেশ করে এবং আবারও মুসলিমবিশ্বের উপর অনবরত আঘাত হানতে শুরু করে। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে লিবিয়ায় হামলা চালায়। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের ঘোষণার পর আরবসাগরে যুদ্ধ বিস্তৃত করে ইরাক তছনছ করে ফেলে। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস করবার অজুহাতে হামলা চালায় আফগানিস্তানে। ১৯ মার্চ ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে আরও একবার ইরাকে হামলা চালিয়ে দেশটির উপর নিজেদের দখলদারি প্রতিষ্ঠা করে।

এর মধ্য থেকে কয়েকটি বড় অভিযান, বিশেষ করে মধ্য-এশিয়া এবং ইসলামি বিশ্বে অনুপ্রবেশের অন্তরালে যে ইহুদি লবির কলকাঠি কার্যকর ছিল—তা স্পষ্ট।

এখানে আরও একটি বিষয় জেনে রাখা উপকারী হবে যে, ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকার শাসনকার্য পরিচালনাকারী পঞ্চম প্রেসিডেন্ট মনরো (James Monroe) ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতির ঘোষণা দেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮ খ্রিষ্টাব্দ) আমেরিকা তার নিরপেক্ষ রাজনৈতিক নীতি খতম করে দিয়ে ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে বিপুল অস্ত্রের যোগান দেয়। অবশ্য যুদ্ধে সরাসরি নিজেদের সৈন্য তারা সরবরাহ করেনি।

৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে পার্ল হারবারে জাপান হামলা করে বসে। জাপানের এই হামলাকে আমেরিকা তার নিয়ন্ত্রণহীন আক্রমণের জন্য বাহানা বানিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই পরিমাণ প্রত্যক্ষ অংশ নেয় যে, ইউরোপের রণাঙ্গনে মিত্রশক্তির সকল কামান আমেরিকান জেনারেল আয়জান হাওয়ারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। যুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে একদিন আচমকা মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মারা যান। তার পর প্রেসিডেন্ট হন ট্রুম্যান[৭১] (Harry S. Truman)। আর এরই মধ্য দিয়ে মার্কিন ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক জায়নিস্ট গ্রুপ অত্যন্ত প্রবলভাবে কর্তৃত্বে আসে। ট্রুম্যান তাদের এজেন্ট হয়ে মানব-ইতিহাসের দুটি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করে বসেন।

---

[৭১] উনি রুজভেল্টের সময়ে তার উপরাষ্ট্রপতি বা ভাইসপ্রেসিডেন্ট ছিলেন।

প্রথমটি 'যুদ্ধের দীর্ঘতা' থেকে বাঁচবার বাহানায় ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে জাপানের দুটি শহর হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক হামলা চালানো হয়, যার আঘাতে যথাক্রমে পাঁচ এবং চার লক্ষ অধিবাসীর এই শহর-দুটি মাত্র কয়েক মুহূর্তে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে পড়ে। মৃত্যুমুখে পতিত হয় ছয় থেকে ৭ লাখ মানুষ। এবং তিন লাখ মানুষ চিরদিনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করে নেয়।

দ্বিতীয়টি, এই একই ব্যক্তি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার আমেরিকার প্রসিডেন্টের পদে আসীন হন। আর প্রেসিডেন্ট হওয়া মাত্র ইসরাইলের আবাসভূমির সমর্থন জানিয়ে ইসলামি বিশ্বের বুকের ঠিক মধ্যখানে একটি খঞ্জর বিদ্ধ করে দেন। এবং ধারাবহিকভাবে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতি তার সহায়তা অব্যাহত রাখেন।

এ তো গেল আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী উদ্যোগের কথা। এসবের পাশাপাশি রাজনৈতিক বিশ্বায়নের অভিমুখে তাদের যে যাত্রা, সেটাও অব্যাহত ছিল। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ইহুদি পুঁজিপতিরা আমেরিকার সবচাইতে প্রভাবশালী শ্রেণিতে পরিণত হয়ে ওঠে, যাদের হাতে পুঁজি ছাড়াও ছিল মিডিয়ার ক্ষমতা। এরই মাঝে ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে জায়োনিস্টদের প্রথম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে উপস্থাপিত প্রোটোকলে একটি আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থার নকশা উপস্থাপন করা হয়। সামনের দিনগুলোতে ইহুদিদের ব্রিটেন, আমেরিকা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহায়তায় এই বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার দিকেই অগ্রসর হতে দেখা যায়। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব ছিল যখন দুনিয়ার অধিকাংশ দেশ বিশেষ করে পরাশক্তির অধিকারী দেশগুলো তার প্রয়োজন অনুভব করবে। এই প্রয়োজন সৃষ্টি করবার লক্ষ্যেই ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম এবং ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অঙ্গার উসকে দেওয়া হয়। এই যুদ্ধে সমস্ত দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যায়। লাভ হয় কেবল ইহুদি লবি আর আমেরিকার।

আমরিকা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তার শক্তি-সামর্থ্য পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষণ করে রাখে। আর যখন সারা দুনিয়া লড়তে লড়তে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছে তখন সে পরাশক্তির রূপ ধরে দৃশ্যমান হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে জাপানের বিরুদ্ধে পারমাণবিক হামলা চালিয়ে সম্মিলিত জোটকে বিজয় এনে দেয়। এবং রাশিয়ার পর পৃথিবীর সবচাইতে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র হিসেবে সকলের সামনে আবির্ভূত হয়। এই দুই যুদ্ধের বাহানায় ইহুদি লবি সমর্থ হয় পৃথিবীকে আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রয়োজন অনুধাবন করাতে। আর এভাবেই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংস্থা লিগ অব নেশন্স এবং জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা-ভাবনা বাস্তবে রূপ পায়, যার নিয়ন্ত্রণ মূলত রয়ে যায় আমেরিকা এবং আমেরিকার ইহুদি পুঁজিপতিদের হাতে। সংস্থাদুটির প্রতিষ্ঠা এবং কর্মকাণ্ডের কিছু খণ্ডচিত্র নিচে উল্লেখ করা হলো :

লিগ অব নেশন্স : জায়োনিস্ট লবি এবং মার্কিন রাজনীতিবিদরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে প্রসারিত বৈশ্বিক অনিরাপত্তার ছুতো ধরে বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেই একটি আন্তর্জাতিক

রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দৌড়ঝাপ আরম্ভ করে দেয়। এবং এর ফলে লিগ অব নেশন্স নামে একটি সংস্থার সূচনা ঘটে। এই প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়—নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, সমরাস্ত্র কমিয়ে আনা, বাণিজ্যের স্বাধীনতা, উপনিবেশিত দেশগুলোর সমস্যাবলি সেখানকার স্থানীয় সাধারণ মানুষের চাহিদামাফিক সমাধান করা এবং গণতান্ত্রিক রীতির ভিত্তিতে একটি অনুকরণীয় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। এর অবকাঠামো তৈরি করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনের সামরিক উপদেষ্টা কর্নেল মান্ডেল হাউস। জানুয়ারি ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রস্তাবনাটি মার্কিন কংগ্রেসে উত্থাপন করা হয়। প্রস্তাবটি মার্কিন কংগ্রেসে '১৪ দফা' (Fourteen Points) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

লিগ অব নেশন্সের ঘোষণাপত্রে যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদের অপরাধগুলো তালিকাভুক্ত করে বেশ ক'টি উপনিবেশিত অঞ্চলের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি আশা জাগিয়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু যেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যের সম্পর্ক, সেখানে কোনো প্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতার ঘটনা ঘটেনি। একইভাবে নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োগও আমেরিকা ব্যতীত অন্যান্য দেশের উপর চালানো হয়। কেননা আমেরিকা এবং ইহুদি লবির উদ্দেশ্যই ছিল লিগ অব নেশন্সের মাধ্যমে আমেরিকার বিরুদ্ধাচরণের মতন সকল শক্তি নিঃশেষ করে দেওয়া।

বাণিজ্যিক স্বাধীনতা বা মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রসার ঘটানোর দ্বারাও উদ্দেশ্য আমেরিকা এবং ইহুদিদের অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের অর্থনৈতিক লড়াইয়ে পরাজিত করা। আমেরিকার সেই সামর্থ্য ছিল। কেননা আমেরিকার বাণিজ্যিক নৌবহর ছিল সবচাইতে বড়। মুক্তবাজার অর্থনীতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে দখলপ্রতিষ্ঠা করবার দৌড়ে আমেরিকা ছিল সবচাইতে এগিয়ে।

লিগ অব নেশন্সের এই আইনিধারার ফলে আমেরিকা এবং ইহুদি পুঁজিপতিরা দিনেরাতে চারগুণ মুনাফা করতে থাকে। এমনকি ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার কাছে সংরক্ষিত স্বর্ণের পরিমাণ দাঁড়ায় সারা দুনিয়ার মোট স্বর্ণের ষাট-শতাংশ।

জাতিসংঘ : আমেরিকা এবং জায়োনিস্ট লবি যেই গতিতে তাদের উদ্দেশ্য সফল দেখতে বদ্ধপরিকর ছিল, লিগ অব নেশন্সের ঘোষণাপত্র তাদের জন্য ততবেশি কার্যকর প্রমাণিত হলো না। সে কারণে আমেরিকান এবং জায়োনিস্ট লবির উদ্দেশ্যগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লিগ অব নেশন্সকে রহিত করে দেওয়া হয়। এবং পয়লা জানুয়ারি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ২৬টি দেশের ঐক্যের ভিত্তিতে তাকে 'জাতিসংঘে' রূপান্তরিত করা হয়। ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার শহর সানফ্রান্সিসকোতে জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রের প্রকাশ করা হয়। যেই ঘোষণাপত্রটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেই প্রস্তুত করে নেওয়া হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানটিই এখন বৈশ্বিক রাজনীতির কেন্দ্রীয় অক্ষ। এই

ব্যাপারে স্বয়ং জাতিসংঘের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল বুত্রোস ঘালির (Boutros-Gahali) সাক্ষ্য বিদ্যমান। তিনি বলেন :

"জাতিসংঘ বৈশ্বিক সরকার-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় প্রথম ইটের ভূমিকা পালন করে।"[৭২]

জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলের মাত্র পাঁচটি ক্ষমতাধর দেশকে ভেটো পাওয়ার দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এই দেশগুলোর অধিকার আছে যেকোনো ধারা-উপধারা রদ করার। কোনো একটি আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানও সম্ভব নয় এই পাঁচ দেশের ঐকমত্য ছাড়া।

এই ভেটো পাওয়ার কাজে লাগিয়ে সবচাইতে অধিক লাভবান হয়েছে আমেরিকা। শ্রেফ ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে তারা ৬০ বার ভেটো ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়ে দুনিয়ার উপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছে। ব্রিটেন ২৬ বার, ফ্রান্স ১১ বার এবং রাশিয়া ৮ বার এই ক্ষমতার ব্যবহার করে সারা দুনিয়া নিয়ে উপহাস করেছে। এটা রাজনৈতিক বিশ্বায়নের একটি যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য যে, মুসলিম-দুনিয়া জাতিসংঘের সদস্যপদ গ্রহণের পর এ ধরনের অন্যায় ধারাগুলোও মেনে নিয়েছে।

জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রের সপ্তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ (United Nations Security Council) প্রয়োজন দেখা দিলে নিজের তত্ত্বাবধানে সেনাবাহিনী গঠন করতে পারবে। নিরাপত্তা পরিষদ কোনো দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে এই বাহিনী নিজের দায়িত্ব পালন করবে।

৩৯নং অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করা হয়েছে, পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের। এই পরিষদেরই কেবল অধিকার রয়েছে, নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটানো হচ্ছে—এমন প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরে সে প্রবেশ করতে পারবে। প্রবেশের ক্ষেত্রে শক্তির প্রয়োগ করা কিংবা না করার এখতিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের হাতেই থাকবে।

জাতিসংঘের এই ঘোষণাপত্র বড় শক্তিধরদের, বিশেষ করে আমেরিকাকে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের ন্যায়সঙ্গত পথ করে দিয়েছে, যার কিছু দৃষ্টান্ত পাঠকের সামনে হাজির করা হচ্ছে :

- ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে আফ্রিকান দেশ কঙ্গোতে রাজনৈতিক গোলযোগের সময় এই নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ থেকে প্রথম কোনো দেশের অভ্যন্তরে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয়, যে বাহিনী অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে।
- ৭ ডিসেম্বর ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফোর্ড (Gerald Ford) এবং তার উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপ পূর্বতিমুর পরিদর্শন করেন। আর তার মাত্র তিন ঘণ্টা পর ইন্দোনেশিয়ার আমেরিকান পুতুল সরকার তিমুরে হামলা চালিয়ে বসে। যার ফলে প্রায় ২ লক্ষ মানুষ নিহত হয়। এরপর যখন

---

[৭২] পশ্চিমা মিডিয়া গ্রন্থের সূত্রে বুত্রোস ঘালি, আলমি হুকুমাত, গ্লোবাল লিডারশিপ পৃষ্ঠা : ৮৫

জাতিসংঘে ইন্দোনেশিয়ান সরকারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য ভোট অনুষ্ঠিত হয় তখন আমেরিকা ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ নিয়ে ভোট দেয়। যার ফলে ইন্দোনেশিয়ার দুঃসাহস বৃদ্ধি পায়। এবং তারা তিমুরের বাসিন্দাদের উপর বোমা বর্ষণ শুরু করে।

এই ঘটনার ২৫ বছর পর ইন্দোনেশিয়ার সাথে আমেরিকার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আমেরিকা পূর্বতিমুর দ্বীপের উপর ইন্দোনেশিয়ান সরকারের দখলদারিকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মারফত অবৈধ প্রমাণ করে। এবং তিমুরের খ্রিষ্টান অধিবাসীদের পূর্ণ সহায়তা করে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় তিমুরে গণভোটের আয়োজন করানো হয়। সবশেষ আমেরিকা তাকে একটি খ্রিষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বাধীন করিয়ে নেয়।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় সেপ্টেম্বর ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে রাজনৈতিক বিশ্বায়নের একটি খসড়া প্রস্তুত করে ঘোষণা দেয়, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে প্রথম শ্রেণির একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠন করা হবে। আর তারপর একপর্যায়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সকল দেশকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করে ফেলা হবে, যাতে কোনো দেশের পক্ষে জাতিসংঘের ক্ষমতাধর বাহিনীর মোকাবেলা আর সম্ভব না হয়।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার : এই সকল প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার পর রাজনীতির বিশ্বায়নের পথে সবচাইতে বড় পদক্ষেপটি নেওয়া হয় তখন, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে পরাজিত হয়ে ভেঙে-চুড়ে খানখান হয়ে পড়ে। এবং কমিউনিজম চিন্তাধারার ব্যর্থতা চাক্ষুষ হওয়ার কারণে ইউরোপে কম্যুনিস্ট শাসনব্যবস্থার চেয়ার উলটে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কমিউনিজমের পতনের পেছনে ভূমিকা রেখেছিল মুসলমানদের ঈমানি শক্তি এবং তাদের জিহাদি জজবা। যার কারণে পশ্চিমের মনে শঙ্কা দেখা দেয়, পৃথিবী এখন কমিউনিজমকে পরাস্তকারী ইসলামের ন্যায়পরায়ণ জীবনব্যবস্থার মধ্যেই নিজেদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সকল সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করবে। এই 'শঙ্কা' উপলব্ধি করে আমেরিকা ইসলামবিদ্বেষী সকল শক্তিকে বিশ্বায়নের বাস্তবায়নের জন্য জড়ো করতে থাকে। সে তার প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়াকে বোঝাতে সমর্থ হয় যে, পারস্পরিক শত্রুতা ভুলে গিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ শুরু করে দেওয়া দরকার। এই সিদ্ধান্তে ঐকমত্যে পৌঁছানোর পর কমিউনিজমের পরাজয়কে ইসলামের সাফল্যের বদলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিজয় হিসেবে উপস্থাপন করা হতে থাকে। এবং দুনিয়াকে সম্পূর্ণভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উন্নত 'মডেল' বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশনের দাস বানাবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার পক্ষ থেকে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার ছিল তার ভূমিকা। আমেরিকার সাবেক

প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সিনিয়রের এই বক্তব্যও রাজনৈতিক বিশ্বায়নের সংকল্পকে আরও বেশি করে স্পষ্ট করে :

"আমাদের সামনে এখন নতুন বিশ্বব্যবস্থা বাস্তবায়নের মহামূল্যবান সুযোগ উপস্থিত; আমাদের জন্যও এবং আমাদের অনাগত প্রজন্মের জন্যও। বাস্তবেই আমাদের সামনে এই সুযোগ এসে গেছে যে, আমরা বিশ্বব্যবস্থার ব্যবহারিক রূপরেখা প্রস্তুত করে নেব।"

বিশ্বায়নের অফিসিয়াল ঘোষণা

১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার শহর সানফ্রান্সিসকোতে সংঘটিত এক কনফারেন্সে বিশ্বায়নের সূচনার অফিসিয়াল ঘোষণা দেওয়া হয়। এই সেমিনারে আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সিনিয়র, রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ, সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার এবং সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুল্টজ (George Shultz)-সহ পৃথিবীর ৫৮৬ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, সমাজবিদ, বিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদ অংশগ্রহণ করেন। বাহ্যত এই সেমিনারের এজেন্ডা ছিল একবিংশ শতকে প্রবেশের জন্য একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এটা ছিল বিশ্বায়নের দিকে উত্থিত প্রথম পদক্ষেপ।[৭৩]

আর এরই মধ্য দিয়ে জায়োনিস্ট লবি এবং ইহুদি পুঁজিপতিদের কল্পনার বৈশ্বিক সাম্রাজ্যের পথ সুগম করবার উদ্দেশ্যে বিশ্বায়নের পুরোদস্তুর সূচনা ঘটে যায়।

রাজনীতির বিশ্বায়ন আমেরিকাকে কীভাবে পৃথিবীর এক অত্যাচারী জমিদারে পরিণত করল, তার অনুমানের জন্য এতটুকু জেনে নেওয়াই যথেষ্ট, বর্তমান সময়ে পৃথিবীর ১৪০টি দেশে আমেরিকার সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। এর মধ্যকার বহু দেশ থেকে আমেরিকা এই দাবি আদায় করে নিয়েছে যে, তাদের সাধারণ জনগণ কিংবা শাসকগোষ্ঠী মার্কিন নাগরিকদের কোনো প্রকার যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের প্রতিবাদ করবে না।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য গরিব দেশগুলো কোনো মার্কিন সৈন্য, নাগরিক কিংবা সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে মামলা দায়ের করবে না—২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা হুমকিধমকির মাধ্যমে তাদের থেকে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। আমেরিকা আরও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে যে, ৩০ জুন ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যদি কোনো দেশ এই চুক্তিনামায় স্বাক্ষর না করে তাহলে সেই দেশের সামরিক এবং অর্থনৈতিক সহায়তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৪৩টি গরিব দেশ সেই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে একপ্রকার বাধ্য হয়ে পড়ে।[৭৪]

---

[৭৩] আল-আওলামা, সালেহ আর-রাকব, পৃষ্ঠা : ৮

[৭৪] রোজনামায়ে রাষ্ট্রীয় সাহারা, উর্দু, নয়া দিল্লি, ৩০ জুলাই ২০০৩ অব্দ

এই সময়ে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র সৌদি আরবও বিশ্বায়নের বড় টার্গেটে পরিণত হয়। এই রাষ্ট্র, যা ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে বাদশাহ আবদুল আজিজ আস সৌদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তেল আবিষ্কারের ফলে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে উন্নতি লাভ করতে থাকে এবং সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির এক দৃষ্টান্তে পরিণত হয়। কিন্তু শাহ ফয়সালের মৃত্যুর পর আমেরিকা সেখানে নিজের সভ্যতা-সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়ে বড় বড় আমিরদের নিজের প্রভাবাধীন করে নেয়। সৌদি শাসকদের থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়া হয় যে, তারা কখনোই আমেরিকায় তেল রপ্তানি বন্ধ করবে না। বদলে আমেরিকা সব সময় তাদের শক্তির সুরক্ষা দিয়ে যাবে। তখন থেকে আমেরিকা প্রায় বিনামূল্যে সৌদি আরবের তেল ব্যবহার করে চলছে। যার ফলে সৌদি আরব নিজেদের ইমারাত ও বিপুল অর্থ-বিত্ত সত্ত্বেও আর্থিক ধসের মুখে পড়ছে। এবং দুর্মূল্যের শিকার হচ্ছে। সৌদির সাধারণ মানুষ জানে, তাদের সকল সমস্যার মূলে রয়েছে আমেরিকার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার। কিন্তু তারপরও মুক্তির কোনো দিশা তারা খুঁজে পাচ্ছে না।

পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, তুরস্ক, ইরাক, মিশর এবং অন্যান্য ইসলামি দেশের অবস্থা আরও ভয়াবহ। এসব দেশে শাসনব্যবস্থার বিবর্তন-পরিবর্তন থেকে আরম্ভ করে অন্য দেশের সাথে লড়াই এবং চুক্তি পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় আমেরিকার স্বার্থ সামনে রেখেই সম্পাদিত হয়ে থাকে।

বিশ্বায়নের দ্বিতীয় ক্ষেত্র : অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন

বিশ্বায়নের দ্বিতীয় ক্ষেত্র অর্থনীতি। আর এই ক্ষেত্রের মৌলিক লক্ষ্য হলো বিশ্বের অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তাকে অল্প কজন পুঁজিপতির হাতে কেন্দ্রীভূত করে ফেলা।

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন প্রত্যাশা করে, অর্থনৈতিক বিষয়ে পৃথিবীর সকল স্থানীয় সরকারের এখতিয়ার এমনভাবে নির্মূল করে দেওয়া হবে, যাতে কোনো দেশের সরকার নিজেদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে না পারে। সারা দুনিয়ার অর্থনীতিতে কেবল আমেরিকার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া হবে। আর সারা দুনিয়ার অর্থনীতি চলে আসবে আমেরিকান ইহুদি পুঁজিপতিদের হাতের মুঠোয়। এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে :

১. স্বর্ণভান্ডারের উপর দখলদারি প্রতিষ্ঠা করা।
২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো।
৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করা।
৪. মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির প্রচলন করা।
৫. পাবলিক রিলেশন্স ইন্ডাস্ট্রি বা জনসংযোগ শিল্পের প্রসার ঘটানো।

প্রথম পদক্ষেপ : স্বর্ণভান্ডারের উপর দখলদারি প্রতিষ্ঠা করা

স্বর্ণের উপর দখলদারি প্রতিষ্ঠা—এটা ইহুদিদের একটি প্রাচীন অভিলাষ। এই স্বপ্ন পূরণ হয় তখন, যখন সোনারুপার স্থান দখল করে নেয় কাগজের নোট। প্রাচীনকালে লোকেরা পণ্যের বদলে পণ্য কেনাবেচা করত, যাকে বার্টার (Barter) বা বাইয়ে মুকায়াজা বলা হয়। পরবর্তীকালে এই পদ্ধতিতে নানা জটিলতা দেখা দিলে লেনদেন ও কেনাবেচা শুরু হয় সোনারুপার মুদ্রার মাধ্যমে।

কয়েক শতাব্দী অন্তর এই প্রচলনও শুরু হয়ে যায় যে, লোকেরা মুদ্রা-ব্যবসায়ী বা মহাজনদের কাছে সোনা-রুপার মুদ্রা আমানত রেখে দিত। বদলে মহাজন তাকে একটি রশিদ লিখে দিত, যা দেখিয়ে সেই ব্যক্তি পুনরায় তার থেকে নিজের সোনা-রুপা ফেরত নিতে পারত। কিছুকাল অতিক্রান্ত হবার পর ইউরোপ কেবল এই রশিদ দিয়েই লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আর ক্রমেই রশিদগুলো কাগুজে মুদ্রার আকার লাভ করে। আর একসময় এমন হয় যে, প্রতিটি দেশের বাজারে প্রচলিত কাগুজে মুদ্রার সমপরিমাণ স্বর্ণ ব্যাংকে জমা রাখা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। আমেরিকার ইহুদি পুঁজিপতি এবং ব্যাংকাররা এই অবস্থার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। আর অনবরত কাগুজে মুদ্রার প্রচলন ঘটিয়ে আমেরিকার ব্যাংকগুলোতে সোনার বিপুল থেকে বিপুল সঞ্চয় করিয়ে নেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের আর্থিক ব্যবস্থা একেবারেই ধ্বংস হয়ে পড়ে। এবং বহু দেশের হাত থেকে স্বর্ণের সংগ্রহ বেরিয়ে যায়। বাধ্য হয়ে কাগুজে মুদ্রার বদলে সোনা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপিয়ান দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা আরও বেশি ঝুঁকির মুখে পড়ে। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে এই সময়ে আমেরিকা এতটাই মজবুত যে, তৎকালে সারা দুনিয়াতে যত স্বর্ণ ছিল, তারও অধিক ছিল কেবল এক আমেরিকার সংগ্রহে।

এই সময় মার্কিন পুঁজিপতিরা আমেরিকার ব্রেটন উডসে (Bretton Woods) এক কনফারেন্সের আয়োজন করে। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে আয়োজিত এই কনফারেন্সে বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থার একটি নয়া রূপরেখা হাজির করা হয়, যে রূপরেখা অনুসারে যেকোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমেরিকাকে ডলার দিয়ে তার থেকে স্বর্ণ নিতে পারবে। আর এভাবেই আমেরিকান ইহুদি পুঁজিপতিদের স্বর্ণ সারা দুনিয়ার কারেন্সির মানদণ্ডে পরিণত হয়ে যায়। আর সকল দেশের কারেন্সি মিশে যায় ডলারের সাথে। কারণ, ডলার স্বর্ণের সাথে যুক্ত ও সম্পৃক্ত ছিল। যদিও কার্যত কোনো দেশ ডলার দিয়ে আমেরিকার থেকে স্বর্ণ ফিরিয়ে নেয়নি এবং সমস্ত দেশ ডলারের বিনিময়েই লেনদেন করতে থাকে; তবে সবার বিশ্বাস ছিল, চাওয়ামাত্র আমেরিকা ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণ ফিরিয়ে দেবে।

পরবর্তীতে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে যখন চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা স্বর্ণ দিতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানিয়ে দেয় তখন ব্রেটন উডস কনফারেন্সে তৈরীকৃত রূপরেখা (Bretton Woods System) অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং সেই সাথে এই বাস্তবতাও সবার সামনে চাক্ষুষ হয়ে ওঠে যে, এখন স্বর্ণভান্ডারের অধিকাংশের প্রকৃত মালিক ইহুদি পুঁজিপতি গোষ্ঠী।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা

আমেরিকা এবং জায়োনিস্ট লবি বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য দ্বিতীয় বৃহৎ পদক্ষেপ নেবার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংক এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন বা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) : ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মুদ্রাতহবিল (International Monetary Fund) সংস্থাটি সারা দুনিয়ার একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যা অল্প কিছু প্রয়োজনগ্রস্ত দেশকে তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সহায়তার উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান করে থাকে। এই সংস্থার সদস্যদেশ প্রায় ১৪০টি। কোনো দেশকে তখনই ঋণ দেওয়া হয় যখন তাতে আমেরিকার কোনো স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয়। ঋণের জন্য প্রতিটি দেশের একটি নির্দিষ্ট কোটা থাকে, যা বিশ্ববাণিজ্যে সেই দেশের বাণিজ্যের অনুপাতে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যেমন ধরা যাক, বৈশ্বিক বাণিজ্য হচ্ছে ১০ বিলিয়ন ডলার, যাতে কোনো দেশের অংশ এক বিলিয়ন ডলার। তাহলে সেই দেশটির কোটা হবে দশ-শতাংশ। এবং প্রয়োজনের সময় সে নিজের কোটা অনুপাতেই বিশ্বব্যাংক থেকে সহায়তা নিতে পারবে। আর যেহেতু বিশ্ববাণিজ্যে সবচাইতে বেশি অংশ আমেরিকা এবং ইহুদি পুঁজিপতিদের, সে কারণে সবচাইতে অধিক ঋণ তারাই পেয়ে থাকে।

এই প্রতিষ্ঠানের রীতিনীতি ভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভোটিংও হয়ে থাকে কোটার ভিত্তিতেই। অর্থাৎ বিশ্ববাণিজ্যে যে দেশের যত শতাংশ পুঁজি বিনিয়োগ হবে, তার সেই অনুপাতেই ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে। যেমন ধরা যাক, বিশ্ববাণিজ্যে কোনো দেশের বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণ বিশ-শতাংশ। তাহলে সে মতামত নির্বাচনের সময় ২০টি ভোট দিতে পারবে। এই নিয়মের সুফলও আমেরিকা আর কতিপয় বড় দেশ পেয়ে থাকে। কারণ, বিশ্ববাণিজ্যে তাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণই অধিক। তাদের ভোটের সংখ্যাই বেশি। আর তাই এই সংস্থার পলিসিও নির্ধারণ করে থাকে এই দেশগুলো।

আইএমএফ উন্নয়নশীল দেশকে ঋণ দেবার সময় এমন শর্ত অবশ্যই যুক্ত করে দেয়, যার দ্বারা আমেরিকান মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির প্রভাব এবং ক্ষমতা আরও বেড়ে যায় এবং দেশের অর্থনীতি আমেরিকার দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

বিশ্বব্যাংক : World Bank অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুযোগ সৃষ্টির নামে সদস্য দেশগুলোকে দীর্ঘ সময়ের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণের মেয়াদ হয় ১৫-৩০ বছর। এই সংস্থার পলিসিও ভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। কিন্তু এখানেও ভোটার তাদের সংখ্যার বিবেচনায় নির্ধারিত হন না; বরং বাণিজ্যে তাদের অংশীদারত্বের ভিত্তিতে হয়ে থাকেন। আইএমএফ-এর মতন বিশ্বব্যাংকেও সবচাইতে বেশি কোটার অধিকারী দেশ আমেরিকা। সে কারণে সংস্থাটির যাবতীয় পলিসিও আমেরিকা এবং জায়নবাদী পুঁজিপতিদের ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ডাব্লিউটিও) : বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বা World Trade Organization প্রতিষ্ঠা লাভ করে এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে মরক্কোর রাজধানী রাবাতে। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য, আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বিশ্বায়নের প্রসার ঘটানো। বাহ্যত তার মৌলিক লক্ষ্য দুটি :

১. বিশ্ববাণিজ্যের স্বার্থে স্বাধীন এবং নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা।
২. মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রচলন ঘটানো।[৭৫]

এই সংস্থাটি বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থার জন্য মৌলিক এবং আইনগত নীতিনির্ধারণ করে থাকে। যেমন ধরা যাক, সংস্থাটির অধিকার রয়েছে যে, সে নির্ধারণ করবে—কোন সরকার তার শিল্পবাণিজ্য কীভাবে পরিচালনা করবে, স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত ও উৎপাদিত পণ্যের শুল্ক কত শতাংশ নির্ধারিত হবে, ভিনদেশি পণ্যের বিপরীতে স্থানীয় পণ্যের মূল্য কেমন হবে? এই সংস্থা বিশ্ববাণিজ্যের সেই চুক্তির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে, যাতে সরকারগুলোর জন্য স্থানীয় শিল্পবাণিজ্য পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এমনও কিছু আইন প্রণয়ন করেছে, যার ফলে দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদিত পণ্যের পশ্চিমের দেশগুলোতে, বিশেষ করে আমেরিকাতে প্রবেশ করা কঠিন হয়ে উঠেছে।

পর্দার অন্তরালের কিছু সংগঠন

অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের প্রসার ঘটাবার লক্ষ্যে কিছু সংগঠন পর্দার অন্তরালে থেকেও কাজ করে যাচ্ছে। তার মধ্যে দুটি সংগঠনের পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

বিল্ডারবার্গ (Bilderberg) : এটা প্রতিষ্ঠা করেন সুইডেনের এক পুঁজিপতি জোসেফ রেটিনগার (Joseph H Retinger), ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে। এটা পৃথিবীর অত্যন্ত মজবুত এবং গুপ্ত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংগঠন।

---

[৭৫] বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আরো একটি উদ্দেশ্যের কথা জানা যায়। তা হলো, বাণিজ্য-শুল্কের বাধাসমূহ দূর করা। -অনুবাদক

রকফেইলার ফাউন্ডেশন : এই ফাউন্ডেশনটি মূলত আমেরিকার সবচাইতে বড় বাণিজ্যিক কোম্পানি। সংস্থাটি কাজ করে যায় আমেরিকায় ইহুদি লক্ষ্য, বিশেষ করে বিশ্বায়নের প্রসার ঘটাবার উদ্দেশ্যে। সংগঠনটির একাধিক অঙ্গসংগঠনও রয়েছে, যা বাহ্যত একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু বাস্তবে তারা প্রত্যেকে একটি বিশেষ পরিকল্পনায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে।

তৃতীয় পদক্ষেপ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করা

জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাগুলোর সহায়তায় আমেরিকা এবং ইহুদি পুঁজিপতিরা বহুজাতিক চুক্তির প্রচলন ঘটিয়েছে, যার মাধ্যমে মূলত আন্তর্জাতিক মুক্তবাণিজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

মুক্তবাণিজ্যের চিন্তাটা জন্ম নিয়েছে মূলত পুঁজিবাদ থেকেই। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি তিনটি :

১. ব্যক্তিমালিকানা (Private Property) : অর্থাৎ যেকোনো ব্যক্তি উৎপাদন মাধ্যম এবং মিলকারখানা নিজের মালিকানায় রাখতে পারবে।
২. ব্যক্তিস্বার্থের প্ররোচনা (Profit Motive) : অর্থাৎ যেকোনো উৎপাদনের পেছনে আসল প্ররোচক হয়ে থাকে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন।
৩. সরকারি হস্তক্ষেপহীনতা বা অবাধ নীতি (Laissez Faire) : অর্থাৎ সরকার ব্যবসায়ীদের কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

এই চিন্তাধারাগুলোই কিছুটা বিস্তৃত হয়ে বৈশ্বিক পরিসরে মুক্তবাণিজ্যের চিন্তার উদ্ভব ঘটিয়েছে। মুক্তবিশ্ববাণিজ্যের অর্থ হলো, উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশগুলো বহিঃরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্যপরিচালনা করতে পারবে। সকল দেশের বাজারের দুয়ার দুনিয়ার সমস্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। পণ্যের আমদানি-রপ্তানিতে কাস্টমের কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। কোনো সরকার কোনো বিদেশি কোম্পানির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে না। একটি বিদেশি কোম্পানি যেকোনো দেশে সেই সমস্ত স্বাধীনতা ও সুবিধার সাথে বাণিজ্য করতে পারবে, যা সেই দেশের স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের দেওয়া হয়। এইভাবে পৃথিবীর প্রতিটি মার্কেটে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং বিদেশি ব্যবসায়ীদের মধ্যে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হবে।

বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) : মুক্তবাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ। কোনো দেশে বিদেশি কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য করা, সেখানে পুঁজি বিনিয়োগ করা এবং নিজেদের কারখানা খুলে নেওয়াকে 'প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ' বলা হয়, যা অর্থনীতির ভাষায় Foreign Direct Investment (এফডিআই) নামে পরিচিত। অনেক বছর পর্যন্ত এফডিআই কেবল পুঁজিবাদী দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং মুক্তবাণিজ্যের কল্পনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে চুক্তি

সম্পাদিত করে ভিনদেশে বিনিয়োগকে আইনি বৈধতার রূপ দান করেছে, যার ফলে যেকোনো কোম্পানির জন্য যেকোনো দেশে বাণিজ্য করবার দ্বার উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। কোনো দেশে বাণিজ্য করবার জন্য কোনো কোম্পানির সামনে কোনো প্রকারের প্রতিবন্ধকতা আর অবশিষ্ট নেই।

গ্যাট চুক্তি : মুক্তবিশ্ববাণিজ্যের স্বার্থে সম্পাদিত চুক্তিসমূহের মধ্য হতে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্পাদিত গ্যাট (GATT) উল্লেখযোগ্য, যার বাহ্য উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চাপিয়ে দেওয়া বাণিজ্যিক শর্তাদি থেকে বিশ্ববাণিজ্যকে মুক্ত করা। এই চুক্তির চারটি মৌলিক নীতি হলো :

১. চুক্তির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশ একে অন্যের পণ্যের সেইভাবে মূল্যায়ন করবে যেভাবে তারা নিজেদের স্থানীয় পণ্যের করে থাকে। ফলে বিদেশি পণ্যের শুল্কহার নির্ধারিত হবে স্থানীয় পণ্যের শুল্কের সমানুপাতেই।
২. চুক্তিভুক্ত কোনো দেশের অধিকার থাকবে না চুক্তির আওতাধীন অন্য দেশের আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ নির্ধারণের।
৩. সদস্য দেশগুলো বিদেশি পণ্যের উপর শুল্কহার কমিয়ে আনবে।
৪. সদস্য দেশগুলো রপ্তানি পণ্যে অর্থায়ন করবে না।

গ্যাটচুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পণ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় যে প্রতিযোগিতা তা কেবল অল্পকিছু সরকারের মধ্যে হবে না কিংবা সরকার ও অল্প কয়েকটি কোম্পানির মধ্যেও নয়; বরং প্রতিযোগিতা হবে কেবল বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে।

এই চুক্তির আওতায় শুল্কহার একদমই কমিয়ে আনা হয়। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে যেকোনো বহিঃরাষ্ট্রে রপ্তানি করবার জন্য তার মূল্যের ৪৮% শতাংশ শুল্ক দিতে হতো। এরপর ট্যাক্সের হার কম হতে হতে মাত্র ৪-৬% এ এসে দাঁড়ায়। আর এভাবেই বিদেশি কোম্পানিগুলো কম শুল্ক দিয়ে বাইরের দেশে নিজেদের পণ্য কমমূল্যে রপ্তানি করবার সুযোগ পেয়ে যায়। গ্যাটচুক্তিতে প্রথমে ২৩টি দেশ অংশ নিয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাতে যুক্ত হয় ১১৭টি দেশ।

বাহ্যত মুক্তবাণিজ্যের কর্মকাণ্ড চিত্তাকর্ষক মনে হয়; কিন্তু তার আবশ্যিক ফল বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কী? যখন বড় ব্যবসায়ী এবং উন্নত দেশের কোম্পানির পণ্য দুর্বল এবং দরিদ্র দেশে আসে তখন স্থানীয় কোম্পানিগুলো তার সামনে টিকে থাকতে পারে না এবং বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার দৌড়ে পেছনে রয়ে যায়। কারণ, উন্নত দেশের পণ্যের মান এতই উচ্চ পর্যায়ের হয় যে, স্থানীয় কোম্পানি তার মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়। এবং বিদেশি কোম্পানির সাথে পাল্লা দিয়ে স্থানীয় কোম্পানিগুলো নিজেদের পণ্যের মার্কেটিংও করে উঠতে পারে না। অনেক সময় এমনও হয়, একটি বিদেশি বড় কোম্পানির কেবল মার্কেটিং ও অ্যাডভার্টাইজিংয়ের বাজেট হয়ে থাকে কোনো দরিদ্র দেশের সারা বছরের বাণিজ্যের চেয়েও বহুগুণ। সেইসাথে তাদের উন্নত প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি, শ্রমিক, পাওয়ার এবং ডিস্ট্রিবিউশন বিভাগে নিজেদের উন্নত দেশগুলোর সরকারের তরফ থেকে এই পরিমাণ সুবিধাদি লাভ হয় যে, তারা একটি

ভালো পণ্য কম খরচে প্রস্তুত করে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করতে পারে। বিপরীতে দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশে পাওয়ার ও বিদ্যুতের স্ফীতি, শিল্পবাণিজ্যে পৃষ্ঠপোষকতার স্বল্পতা এবং শুল্কবৃদ্ধি—এসব কারণে একটি পণ্য উপযুক্ত খরচে তৈরি হতেও পারে না। আর স্বল্পমূল্যে তাকে বাজারজাত করাও সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে লোকেরা স্থানীয় পণ্যের বদলে বিদেশি পণ্য প্রাধান্য দিতে থাকে। আর এভাবেই এক সময় স্থানীয় কলকারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে।

বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক পাবন্দি ও সীমাবদ্ধতা

বিশ্ব অর্থনৈতিক সংস্থার মধ্যস্থতায় উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর এমন সব অর্থনৈতিক ও কৃষি পলিসি চাপিয়ে দেয়, যার উদ্দেশ্য কেবল সেই দেশের কৃষি ও অর্থনৈতিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত করা। যেমন কৃষিকাজের জন্য পশ্চিমা দেশ থেকে বিশেষ প্রকৃতির বীজ ও সার রপ্তানির পাবন্দি দেওয়া হয়েছে। এই বীজ এবং সার তাৎক্ষণিকভাবে বেশি ফসল উৎপন্ন করে ঠিকই; কিন্তু শেষমেশ জমিন বন্ধ্যা করে ফেলে। এই ফসলে সংক্রমিত পোকা-মাকড় ধ্বংস করবার জন্য বিশেষ ধরনের কীটনাশকের দরকার পড়ে, যা কেবল পশ্চিমই সরবরাহ করতে পারে।

পশ্চিমাদুনিয়া এখন উন্নয়নশীল দেশ থেকে কৃষিপণ্যের আমদানিও বন্ধ করে দিচ্ছে। ফলত উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্ববাণিজ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য সুবিধা করতে পারছে না।

ভিসা-নীতির মাধ্যমে দরিদ্র দেশগুলো শোষণ

এই সকল সীমাবদ্ধতার একটি রূপ এটাও—উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশের জন্য ভিসা-নীতি অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছে। তারা ভিসার জন্য এমন কঠিন সব নীতি প্রস্তুত করেছে যে, কেবল নির্বাচিত অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন এবং সমৃদ্ধ অল্প কিছু মানুষই সে-সব দেশে প্রবেশের সুযোগ পাবে। চাকরির উদ্দেশ্যে গমনেচ্ছু লোকেদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যাবার কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বড় দেশগুলো নিজেদের ইমিগ্রেশন-নীতিও এমনভাবে প্রস্তুত করছে, যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলো ধীরগতির রয়ে যায়। তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মেধাবী এবং যোগ্যতর ব্যক্তিদের প্ররোচনা দিয়ে নিজেদের দেশে ডেকে নেয়। ফলে প্রাচ্য এবং মুসলিম দেশগুলোয় যোগ্য তরুণসমাজ এবং কর্মদক্ষ মানুষের তীব্র অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বব স্টিকেলফ লেখেন :

> "দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজেদের স্ট্যান্ডার্ড বাড়াবার লক্ষ্যে উন্নত দেশগুলোর ইমিগ্রেশন পলিসির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। এসব দেশের সক্রিয় ও গতিশীল শ্রেণি ধনী দেশগুলোর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং জীবনযাপনের অনায়াস মাধ্যম অনুসন্ধান করতে থাকে।"[৭৬]

---

[৭৬] Freedom to Man in the Age of Globalization

ভারতের সাবেক অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথ সাহা ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের সেমিনারে আফসোস প্রকাশ করে বলেন :

"বিশ্বায়ন আমাদের জন্য একটি অন্যায্য উদ্যোগ, যার উদ্দেশ্য উন্নত দেশের মার্কেট রক্ষা করা। তারা বিশ্বায়নকে একটি হাতিয়ারের মতন ব্যবহার করছে। তারা তাদের ইমিগ্রেশন পলিসিও সেভাবেই প্রস্তুত করেছে, যার কারণে উন্নয়নশীল দেশের প্রতিবন্ধকতাগুলো আরও দ্বিগুণ হয়ে উঠছে। আগত বছরগুলোতে এখানে তরুণ কর্মীদের অভাব আরও প্রকট হয়ে দেখা দেবে।"[৭৭]

চতুর্থ পদক্ষেপ : মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির প্রচলন

বিশ্বায়নের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবার জন্য এবং উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো সফল করবার লক্ষ্যে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার ব্যাপ্তি দিন দিন সারা দুনিয়াকে বেষ্টন করে নিচ্ছে এবং বিপরীতে স্থানীয় বাণিজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি একটি সংক্ষিপ্ত সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে।

বর্তমান সময়ে মুসলিম-দুনিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে সবচাইতে বড় অন্তরায় হলো মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি। ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনেই আছে। এই দেশদুটো নিজেদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য আন্তরিক প্রয়াস-প্রচেষ্টায় নামে এবং বেশকিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির শেকড় ততদিনে সেখানে পোক্ত হয়ে উঠেছিল। তারা রাতারাতি স্টক এক্সেঞ্জে এমন কৌশল চালায়, সরকারকে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির সামনে কপাল ঠেকাতে বাধ্য হতে হয়।

মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারের জন্য নিম্নযুক্ত পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে :

১. সাধারণত কয়েকটি ছোট কোম্পানি মিলে একজোট হয়ে একটি মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। সেই কোম্পানিগুলোর মালিক পরস্পরে ব্যবসায়িক পার্টনার হয়ে যায়। অনেক সময় কয়েকটি বড় কোম্পানি মিলেও একটি আরও বড় মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি হয়ে ওঠে। এরপর তারা অনায়াসেই দুনিয়ার যেকোনো স্থানে নিজেদের উৎপাদিত পণ্য পৌঁছে দিতে পারে।

২. অনেক সময় কোনো একটি বিশেষ পণ্য উৎপাদনের স্বার্থে অথবা কোনো বিশেষ প্রোগ্রাম অর্গানাইজের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কোম্পানি অস্থায়ীভাবে একজোট হয়। যেমন মাইক্রোসফটের একটি প্রোগ্রামের জন্য ১৫টি কোম্পানি জোটবদ্ধ হয়েছিল।

৩. কোনো কোনো মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি অন্য আরেক কোম্পানির নাম (গুড ওয়েল) বা লোগো ক্রয় করে নেয়। এরপর নিজের পণ্যে সেই নাম ও লোগো ব্যবহার করে বাণিজ্য বিস্তৃত করতে থাকে।

---

[৭৭] টাইমস অব ইন্ডিয়া, ১৬ জানুয়ারি ২০০১ অব্দ

৪. কখনো আবার একটি কোম্পানি বাজারে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং মার্কেটে একচেটিয়াভাবে অধিক মুনাফা লাভের আশায় অন্য অনেক কোম্পানি কিনে নেয়। বা তার সাথে একীভূত হয়ে যায়।
৫. কোনো কোনো সময় কিছু ছোট কোম্পানি আন্তর্জাতিক মার্কেটের মোকাবেলায় দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন কোম্পানির মালিক নিজের প্রতিষ্ঠান বন্ধ হবার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কোনো বড় কোম্পানির সাথে শরিক হয়ে পড়ে। সেই শরিকানার কারণে ছোট কোম্পানি ডুবে যাওয়া থেকে বেঁচে যায় আর বড় কোম্পানি আরও বিস্তৃতরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

মোটকথা, মুক্তবাজার অর্থনীতি, প্রতিযোগিতার পরিবেশ এবং অধিক থেকে অধিকতর প্রসারিত হবার বাসনাই মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির প্রতিষ্ঠা, তাদের পারস্পরিক সম্মিলন, জোটবদ্ধতা এবং ব্যাপকাকারে প্রসারিত হবার কারণ।

মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি এবং মিডিয়া

মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রভাব সৃষ্টি করবার পেছনে মিডিয়া বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণ আমেরিকার ইহুদি পুঁজিপতিদের হাতে, যারা পৃথিবীর সর্বজনগ্রাহ্য সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, রেডিও ও টিভি চ্যানেল পরিচালনা করে। এই লোকেরা পুরোদস্তুর জাতিগত স্বার্থ ও উদ্দীপনা নিয়েই মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির প্রচার করে চলে। কেননা এই পুঁজিপতিরাই হলো মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির সবচাইতে বড় অংশীদার। তারা মিডিয়ার মাধ্যমে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পদ্ধতিতে এমন প্ররোচনা দিয়ে চলে, সাধারণ মানুষ স্থানীয় পণ্যের চাইতে বিদেশি পণ্যকে অধিক ভালো বলে মনে করতে থাকে। টেলিভিশনের চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই প্ররোচনাও দেওয়া হয় যে, বিদেশি পণ্য ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রাকৃতির দোকান থেকে কেনার চাইতে কোম্পানির মূল শাখা ও শো-রুম থেকে কেনাই হলো সভ্যতা এবং উন্নত যাপিত জীবনের পরিচায়ক।

পরিণামে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও প্রস্তুতকারক কোম্পানি নিজের দেশের কাস্টমারের চেহারা এক ঝলক দেখবার জন্য চাতক পাখির মতন আগ্রহ নিয়ে বসে থাকে। কিছু কিছু স্থানীয় পণ্যের গ্রাহক বাইরের দেশে অল্পকিছু হলেও থাকে বটে; তবে নিজ দেশে তা একদমই অপরিচিতের ন্যায় হয়ে পড়ে। ফলে দেশি পণ্য ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। আর বিদেশি পণ্যে সয়লাব হয়ে পড়ে দুনিয়ার বাজার।

একটি আপত্তির জবাব : এখানে একটি আপত্তি দেখা দেয়—মুক্তবাজার অর্থনীতির নীতিমালায় কোথাও এমন কোনো সীমাবদ্ধতা রাখা হয়নি, যার কারণে প্রাচ্য কিংবা এশিয়ার কোনো দেশের জন্য পশ্চিম বা অন্য কোনো দেশে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে। এখন এই মুক্তপ্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে যদি প্রাচ্য টিকতে না পারে তাহলে এটা কি প্রাচ্যের নিজেরই দুর্বলতা নয়? এর দায় পশ্চিমের উপর কেন বর্তাবে?

এই আপত্তিকে নিজের জায়গায় সঠিক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে; কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা অনুধাবনের জন্য পাঠককে কিছু বিষয় বুঝে নিতে হবে। পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে আমেরিকা এবং তাদের ইহুদি পুঁজিপতিরা এই 'স্বাধীন বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা'র স্লোগান এমন সময় উচ্চকিত করেছে, ততদিনে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ প্রাচ্যকে পুরোপুরি লুটে নিয়েছে। প্রাচ্যের স্বর্ণভাণ্ডার পশ্চিমের ব্যাংকে জমা হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিম চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে এবং প্রাচ্য অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার উপর ইচ্ছা করে প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক সঙ্কট চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে প্রাচ্য কখনো অর্থনৈতিকভাবে মজবুত হয়ে উঠতে না পারে। প্রাচ্যে, বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোকে এমনসব শর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে, যে শর্ত তাকে আর্থিকভাবে সব সময় পশ্চিমের মুখাপেক্ষী করে রাখছে। পশ্চিমে ব্যবসা করবার জন্য উন্নয়নশীল দেশের উপর যে অবাস্তব ও দুরূহ শর্তাদি আরোপ করা হচ্ছে, তা মূলত একধরনের সীমাবদ্ধকরণও বটে।

এমনতর পরিস্থিতিতে বাণিজ্যে স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্লোগান নিছক ভনিতা বৈ কিছু নয়। কোনো মুসলিম, প্রাচ্যীয় বা এশিয়ার কোনো কোম্পানি কখনোই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাণিজ্য করতে এবং পশ্চিমা কোম্পানির জন্য হুমকি হয়ে ওঠার অবস্থায় পৌঁছতে পারবে না—পশ্চিম এই বিষয়ে যখন নিশ্চিত হয়েছে তখনই বাণিজ্যে স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই স্লোগান উচ্চকিত করবার চিন্তা করেছে; তার আগে কখনোই নয়। পাঠককে বিষয়টি স্মরণে রাখতে হবে।

মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির বিস্তৃতি

মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির বিশ্বায়নের বিষয়টি বোঝার জন্য এই দৃশ্যটি কল্পনা করে নিতে পারেন যে, কেবল একটি পণ্য বাজারজাত করবার জন্যই একাধিক দেশের শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ করানো হয়। পণ্য এমন কোনো দরিদ্র দেশে তৈরি হয়, যেখানে সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়েই শ্রমিক পাওয়া যায়। এরপর তার প্যাকেজিং হয় আরেক দেশে। তারপর তৃতীয় অন্য কোনো দেশে তাকে বাজারজাত করা হয়। আর এভাবে একেকটি পণ্যের জন্য একাধিক দেশে কারখানা-কোম্পানি খুলে রাখা হয়। উৎপাদনপ্রক্রিয়া এভাবে একাধিক দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কোম্পানিগুলো দুটো বড় ফায়দা হাসিল করে :

১. যদি কোনো দেশে সেই কোম্পানির কোনো দুর্নীতি বা কোনো অকর্মের কথা উঠে আসে তাহলে তাদের উৎপাদনকাজ স্থগিত করা যায় না। কেননা তাদের কারখানা ও মার্কেট দুনিয়াব্যাপী বিস্তৃত। আবার এই ধরনের কোনো কাজের জন্য কোনো দেশের সরকারের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যায় না। কেননা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিকে কোনো দেশ বা কোনো রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব নয়।

২. এই কোম্পানিগুলো যেখানে কারখানা প্রতিষ্ঠা করে, তারা সেখানকার সরকারকে ট্যাক্স পে করে, যা যদিও মুক্তবাজার অর্থনীতির চুক্তির অনুসারে সামান্য বিষয়;

কিন্তু দরিদ্র ও অসচ্ছল দেশের সরকার সেই ট্যাক্সকেই নিজের দেশ গতিশীল রাখবার অবলম্বন মনে করে। এ কারণে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলো সেই সরকারকে ব্ল্যাকমেইল করে অত্যন্ত সহজেই নিজের ইশারার পুতুলে পরিণত করতে পারে। মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির সহায়তায় পশ্চিমা বিশ্ব আরব দেশগুলোর সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা করে নিজের বাণিজ্যে বিনিয়োগ করছে। আরব দেশগুলো পশ্চিমা বিশ্ব থেকে গড়ে প্রতিদিন ৪ বিলিয়ন ডলারেরও অধিক ঋণ গ্রহণ করে এবং পশ্চিমা বিশ্ব প্রতিদিন এই পরিমাণ অর্থই বাণিজ্যে বিনিয়োগ করে থাকে।

আরও একটি কৌশল

মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির আরও একটি কৌশল হলো, সে এক দেশের কাঁচামাল খুব সস্তায় কেনে। তারপর তাকে নিজের কারখানায় প্রস্তুত করে সে দেশেই আবার কয়েকগুণ বেশি দামে বাজারজাত করে। যেমন : আরব-দুনিয়ার খনি থেকে পেট্রোল উত্তোলন, রিফাইন্ড এবং ব্যবহার উপযোগী করবার যাবতীয় কোম্পানি বিদেশি। এসব কোম্পানি তাদের সেবার বিনিময় গ্রহণের পর আরববিশ্বের মুনাফা থাকে সামান্যই। এরপর মুসলমানদের সেই তেল রপ্তানি করবার বেলায় পশ্চিমাদুনিয়া আরব দেশের উপর মোটা অংকের ট্যাক্স চাপিয়ে দেয়।

মোটকথা, এভাবেই মুসলিম এবং প্রাচ্যের দেশগুলো নিজেদের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষিজাত পণ্য এবং কাঁচামাল থেকে কোনো বিশেষ উপকার লাভ করতে পারে না। তাদের অবস্থা ক্ষেতের ওই চাষীর মতোই, যাকে সবকিছুই বাইরে থেকে কিনে নিতে হয় এবং যার দুই বেলার আহার ও শরীর ঢাকবার মতন কাপড় জোগাড় করাও মুশকিল হয়ে দেখা দেয়।

বহুজাতিক কোম্পানির আধিপত্য

এই সময়ে ৫০০টি বড় মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি পৃথিবীর ৭৬% অর্থনীতির উপর রাজত্ব করছে। আমেরিকার বাণিজ্যের ৮০% এই মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিরই দখলে। মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির জোরেই পরোক্ষভাবে (এফডিআই) বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর আমেরিকা, ইউরোপ এবং জাপানের পরিপূর্ণ ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আমেরিকা, ইউরোপ এবং জাপান দুনিয়ার ৭৪.৯% উৎপাদন নিজেদের দখলে রেখেছে। পরিণামে দুনিয়ার মাত্র ৩০% জনপদ সমস্ত দুনিয়ার ৮৪% শতাংশ সম্পদ ভোগ করবার মজা নিচ্ছে। এশিয়া এবং আফ্রিকায় বসবাসরত দুনিয়ার ৭০% মানুষ বিশ্বসম্পদের কেবল ১৬% এর ভাগ পাচ্ছে।

৪০% বিশ্ববাণিজ্যের উপর আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি এবং ব্রিটেনের ৩৫০টি বড় কোম্পানি দখলদারি প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। পাবলিক টেলিকম এবং মোবাইল সেক্টরে বিশ্বপরিমণ্ডলের ৮৬% কর্তৃত্বই ওইসব দেশের ১০টি বড়

নারীর ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখে। এবং সর্বত্র এও ছড়িয়ে দেওয়া হলো যে, ধূমপান বিস্ময়করভাবে স্থূল নারীর শরীরের ভারত্ব কমিয়ে আনে এবং হালকা-পাতলা শরীরে ওজন ফিরিয়ে দেয়।

আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। যখন ইসরাইল লেবাননে হামলা চালিয়ে ধ্বংসযজ্ঞের এক নতুন ইতিহাসের জন্ম দিলো তখন এই ব্যাপারে আমেরিকান টিভিতে বিস্ময়কর নীরবতা অবলম্বন করা হয়; অথচ আমেরিকান টিভির হোস্ট তখন বৈরুতে হাজির ছিলেন। আসলে এটাও ছিল পিআর ইন্ডাস্ট্রিরই একটি কারিশমা।

অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের প্রভাব এবং ঝুঁকি

পেছনের পৃষ্ঠাগুলোর পাঠের দ্বারা আমাদের সামনে এই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, মুক্তবাজার অর্থনীতি, মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি এবং পিআর ইন্ডাস্ট্রির প্রভাবে দুনিয়াব্যাপী বিশ্বায়নের হামলা সম্পূর্ণরূপে সফলতা লাভ করে উঠেছে। এই হামলার কারণে যেই ধ্বংসযজ্ঞ পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হলো :

১. সারা দুনিয়ার ছোট কোম্পানি, স্থানীয় শিল্পকারখানা এবং ...

১. আমেরিকান ইংরেজি বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেওয়া।
২. বিশেষত আরবি এবং সাধারণভাবে অন্যান্য আঞ্চলিক ও জাতীয় ভাষার বিলুপ্তি ঘটানো।

আমেরিকান ইংরেজি বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেওয়া : আমেরিকান ইংরেজিই একমাত্র এমন ভাষা, বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে যার প্রসিদ্ধি এবং প্রসার ঘটছে। তাকে কিছু দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা থেকে বের করে সীমানাহীন করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি দেশের শিক্ষিতশ্রেণি তাকে আপন করে নিয়েছে। আরব দেশসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ইংরেজি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানসহ অধিকাংশ মুসলিম দেশের দাপ্তরিক ভাষা ইংরেজিই। এটা এক প্রারম্ভিক পদক্ষেপ। মূল লক্ষ্য সেদিনই পূরণ হবে, যেদিন সকল দেশের জাতীয় ভাষা হয়ে উঠবে আমেরিকান ইংলিশ।

স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে পাঠ্য বিষয়, ব্যাখ্যাগ্রন্থ, বিশ্বকোষ এবং রেফারেন্সগ্রন্থে আজকাল এই ভাষাই ব্যবহৃত হচ্ছে। দুই-তৃতীয়াংশের অধিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয় ইংরেজি শেখা ছাড়া পাঠ করা সম্ভব নয়। আমেরিকান কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পৃথিবীব্যাপী নিজেদের প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দিয়েছে, যেখানে ইংরেজি ভাষা শেখানো হয়ে থাকে। এইসব প্রতিষ্ঠান ও ইন্সটিটিউশনের শিক্ষাগত স্ট্যান্ডার্ড অনেক উঁচুমানের হয়ে থাকে। যে কারণে স্থানীয় সচ্ছল মানুষেরা তাদের সন্তানদের সেখানে ভর্তি করিয়ে দেয়। এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে বের হওয়া ছাত্রদের বড় বড় কোম্পানিতে খুব দ্রুতই ভালো মানের চাকুরি জুটে যায়। যার ফলে এইসব প্রতিষ্ঠানের কদর ও গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ছাড়া ব্যক্তি-উদ্যোগেও আমেরিকান ইংরেজি শেখানোর প্রতিষ্ঠান শহর-গ্রামের কোনায় কোনায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কারণ, এই ধরনের প্রতিষ্ঠান পয়সা উপার্জনের বেশ ভালো একটা মাধ্যমও বটে।

সর্বসাধারণে্য ইংরেজি ভাষাকে ব্যাপক করবার ক্ষেত্রে ইংরেজি ফিল্ম, টিভি প্রোগ্রাম এবং টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনগুলোর বড় ভূমিকা রয়েছে। তা ছাড়া সবাই ইংরেজি ভাষা সম্পূর্ণরূপে রপ্ত করতে না পারলেও বহু ইংরেজি শব্দ তাদের আলাপচারিতায় স্থান করে নেয়। আজকাল দোকানপাট, প্রতিষ্ঠান এবং রাস্তার সাইনবোর্ডগুলোতেও আমেরিকান ইংলিশ অনুযায়ী বানান চোখে পড়ছে।

সারা দুনিয়ার সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ইংরেজিতেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। পর্যটন পর্যায়ে সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমও এই ভাষা। ইন্টারনেটের ৮২% পত্রিকা ইংরেজি ভাষার, যেখানে দুনিয়ার অবশিষ্ট সকল ভাষায় মাত্র ১৮% পত্রিকা প্রকাশ হয়। বিশ্বের জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ কোনো-না-কোনো স্তরে ইংরেজি ভাষায় কথা বলে। আবার একটি বড় সংখ্যক এই ভাষা শেখার অত্যধিক তাগিদ অনুভব করছে। ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ইংরেজি শেখা মানুষের সংখ্যা দাঁড়াবে দেড়

বিলিয়নের চেয়েও অধিক। এবং সম্ভবত ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজিই জীবনের প্রতিটি আনুষঙ্গিক বিষয়ের ভাষা হয়ে উঠবে।[৮২]

বিশেষত আরবি এবং সাধারণভাবে অন্যান্য আঞ্চলিক ও জাতীয় ভাষার বিলুপ্তি সাধন : ভাষিক বিশ্বায়ন এখন সবার প্রথম আরবি ভাষা আর তারপর অন্যান্য প্রধান ভাষার বিলুপ্তির প্রয়াসে নিরত রয়েছে। কেননা সর্বত্র ইংরেজি ভাষার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যদি বর্তমানে কোনো প্রতিবন্ধকতা থেকে থাকে তা হলো আরবি ভাষা। সে-কারণেই পশ্চিমা থিংক ট্যাঙ্ক আরবি ভাষার উপর হামলার পরিকল্পনা আঁটছে এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কখনো তারা বিশুদ্ধ (ফাসিহ) আরবির বদলে সাধারণ আরবিকে মূল আরবি বলে আওয়াজ উচ্চকিত করছে। আবার কখনো আরবি ভাষার লিখনপদ্ধতি পরিবর্তন করবার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যদিও তাদের এতসব প্রয়াস-প্রচেষ্টার পরও আরবি ভাষার শব্দ ও বাক্যাবলি ইংরেজি শব্দ দ্বারা তেমন প্রভাবিত হয়নি; কিন্তু শৈলী ও বাগধারায় 'আধুনিক' আরবি ভাষায় ইংরেজির প্রভাব বেশ ভালোই নজরে আসে। আফসোসের বিষয় হলো, আরব শাসকেরা স্রেফ পশ্চিমকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্য এমন কোনো আইন করা থেকে বিরত আছে, যে আইন আরবি ভাষার সংরক্ষণে সমর্থ হবে।

ইংরেজির এই বিশ্বায়ন অন্যান্য ভাষাকেও গিলে ফেলছে। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি বিষয়ক একটি দলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সারা দুনিয়ার অর্ধেক স্থানীয় ভাষা বিলুপ্তির পথে। ২৩৪টি সমসাময়িক ভাষা ইতোমধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে। এই প্রতিবেদন আরও জানাচ্ছে যে, একবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সারা দুনিয়ার ৯০% স্থানীয় ভাষার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে যাবে।[৮৩]

আমেরিকান সংস্কৃতিতে এতটা আকর্ষণ কেন?

এখানে একটি কথা ভালো করে মনের মধ্যে গেঁথে নেওয়া দরকার, আমেরিকান কালচারের প্রসারের কারণ এই নয় যে, তার মধ্যে মানবতার কোনো কল্যাণ, কোনো অর্থনৈতিক লাভ বা কোনো স্বভাবগত আকর্ষণ রয়েছে। বরং বাস্তবতা হলো, তার রূপ খুবই ঘৃণিত। যেই প্রলেপ লাগিয়ে তাকে আকর্ষণীয় করবার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং যেই অল্পকিছু বাহ্য কারণে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হচ্ছে, তা সর্বসাকুল্যে চারটি :

১. সারা দুনিয়া তার অর্থনীতিতে আমেরিকার অর্থনীতির উপর নির্ভর করে।

২. নয়া যোগাযোগ-ব্যবস্থা এবং তথ্য-প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত পণ্যসামগ্রী যেমন, কম্পিউটার ইত্যাদির উৎপাদন আমেরিকাতেই অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে। তত্ত্ব, তথ্য এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত অধিকাংশ সামগ্রী এবং কাগজ ও ছাপা সংক্রান্ত মেশিনারির অধিকাংশের উৎপাদনও আমেরিকার দখলে।

---

[৮২] দ্রষ্টব্য : http:/www.krysstal.com/english/html

[৮৩] আল-আওলামাতুল লুগাতিয়্যাহ, মাজাল্লাতুল বায়ান, সংখ্যা-১৭০

৩. মিডিয়ার লাগাম আমেরিকার হাতে।
৪. আমেরিকান সভ্যতা স্বাধীনতা, ভোগ-বিলাস, বস্তুপূজা, স্বার্থপরতা এবং শারীরিক আনন্দের সমারোহ কেবল। আর এগুলো সেইসব প্রবৃত্তি, মিডিয়ার মাধ্যমে যাকে প্রথমেই উসকে দেওয়া হয়েছে। আর দুনিয়া এখন এই ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে আনতে অক্ষম হয়ে উঠছে।

আর এমন পরিস্থিতিতে, যখন আমেরিকা তার বেহুদা এবং নির্লজ্জ সভ্যতাকে সমস্ত জোর দিয়ে উপস্থাপন করে, তখন সারা দুনিয়ার তা আগ্রহের সাথে কবুল করে নেওয়া কোনো বিস্ময়ের কথা নয়।

মোটকথা, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের মাধ্যমে পৃথিবীর উপর একই সভ্যতা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই সভ্যতাকে আপন করে নেওয়া মানুষগুলো টেলিভিশন, মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অন্যের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এবং বিশ্বায়নের কর্তাব্যক্তিরা নিজেদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসকে তাদের মগজে স্থানান্তরিত করে তাদের মধ্যকার মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব দূর করবার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বায়নের পঞ্চম ক্ষেত্র : সামাজিক বিশ্বায়ন

সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাশাপাশি সমাজের উপরও বিশ্বায়ন প্রভাবক হয়ে উঠছে। সমাজ-কাঠামো পরিবর্তনের জন্য তার মূল উপাদান বংশ ও গোত্রের পরিবর্তন জরুরি আর বংশের পরিবর্তন তার একক অর্থাৎ সদস্যের পরিবর্তনের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব। বিশ্বায়ন বংশের পরিবর্তন করবার লক্ষ্যে তার এমন এক একককে ব্যবহার করছে, যা কার্যকর এবং প্রভাবক হিসেবে সর্বাধিক উপযুক্ত। বংশের এই একক হলো নারী, যাকে বদলে দেবার মাধ্যমে প্রথমে বংশ ও পরিবার এরপর সমগ্র সমাজের চারিত্রিক মান বদলে ফেলা সম্ভব; এবং পশ্চিম সেই প্রয়াসই চালিয়ে যাচ্ছে।

একজন ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী রোজিয়া মুইনিয়া ফ্রান্সের আলজেরিয়া দখলকালে তার দেশের সরকারের পক্ষ থেকে আলজেরিয়ার এই বিষয়টার তদন্ত করবার দায়িত্ব পেলেন যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও আলজেরিয়াতে ইসলামের স্ফুলিঙ্গ ঠান্ডা কেন হচ্ছে না! দীর্ঘ গবেষণার পর তিনি ফরাসি সরকারকে রিপোর্ট করে বলেন :

> "আলজেরিয়া ধ্বংস করবার একমাত্র পথ সেখানকার নারীসমাজ। নারীরাই হলো ইসলামি মর্যাদার রক্ষাকবচ। যদি আমরা তাদের ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারি তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়া খুব দূরের কিছু নয়।"

সামাজিক বিশ্বায়ন এবং জাতিসংঘ

সামাজিক বিশ্বায়নের প্রসারে এবং নারীকে তার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নারীস্বাধীনতা আন্দোলন বিশেষভাবে কাজ করেছে। তাকে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে আইনি রূপ দেওয়ার জন্য বড় ভূমিকা পালন করেছে জাতিসংঘ, তার অঙ্গসংগঠন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনফারেন্স। জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র, যা ২৬ জুন ১৯৪৫

খ্রিষ্টাব্দে প্রস্তুত করা হয়, লিঙ্গের ভিত্তিতে মানুষের পার্থক্য তৈরিতে অনুৎসাহিত করে এবং নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ জানায়।[৮৪]

জাতিসংঘের সংবিধানের ৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

"জাতিসংঘ এমন কোনো আইন প্রয়োগ করবে না, যার কারণে নারীপুরুষের সমতার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়ে।"

১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে একটি বৈশ্বিক চুক্তি সামনে আনা হয়। যেই চুক্তিতে সকল সদস্যদেশ নারী-পুরুষের মধ্যকার সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে তেহরানে 'মানবাধিকার' শিরোনামে 'তেহরান প্রস্তাব ১৯৬৮' নামে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, যার ঘোষণাপত্রের দফা পনেরোতে বলা হয়, মানবতার উন্নতি ও উৎকর্ষের জন্য নারীর সাথে ঘটমান বৈষম্যগুলো শেকড়সহ উপড়ে ফেলা আজ অত্যন্ত জরুরি।

নারীসংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে বিশেষ গুরুত্ব দেবার লক্ষ্যে জাতিসংঘ একাধিক অঙ্গসংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে, যে প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক বিশ্বায়নের পথে সৃষ্ট সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর। এই প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন দেশে নারীবিষয়ক নানা সেমিনারেরও আয়োজন করে থাকে। জাতিসংঘের নারীবিষয়ক কয়েকটি অঙ্গসংগঠন হলো :

জাতিসংঘের নারীবিষয়ক কাউন্সিল (UN Women)
জাতিসংঘের নারীবিষয়ক উন্নয়ন ফান্ড।
আন্তর্জাতিক রিসার্চ এইড ট্রেনিং সেন্টার (নারীদের জন্য)।
জাতিসংঘের সামাজিক উন্নয়নবিষয়ক রিসার্চ সেন্টার।
নারী-বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক কমিটি।
জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক অধিদপ্তর (ইউনিসেফ)।

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে নারী, সমতা এবং নিরাপত্তা বিষয়ে প্রথম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় মেক্সিকোতে, যাতে ফ্যামিলি প্লানিংয়ের উপরও জোর দেওয়া হয়।

১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 'নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য নির্মূল' বিষয়ে একটি কনফারেন্সের আয়োজন করে সারা দুনিয়ার সমর্থন কুড়িয়ে নেয়। এই ধরনের আরেকটি কনফারেন্স সংঘটিত হয় ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে।

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নারীবিষয়ক তৃতীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়, যা 'নাইরোবি নারী উন্নয়ন প্রস্তাবনা' নামে পরিচিত।

---

[৮৪] দ্রষ্টব্য: www.un.org/arabic/aboutum/charter

১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মেক্সিকোতে জনসংখ্যাবিষয়ক যে কনফারেন্স হয়, তাতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতাবিধান, নারীর বিবাহ এবং সন্তানগ্রহণে বিলম্ব করা, পুরুষকে ঘরে কাজ করবার এবং নারীকে বাইরের দায়িত্ব পালনে অংশগ্রহণ করানো, অল্প বয়সি ছেলেমেয়েদের যৌনশিক্ষা দেওয়া, পরিবারের বাইরে যৌন সম্পর্ক স্থাপন এবং যৌনকর্মী নারী-পুরুষদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে তাদের উপযুক্ত আবাসনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কায়রো কনফারেন্স

সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের রাজধানী কায়রোতে জনসংখ্যা ও উন্নয়নবিষয়ক একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়, যার ঘোষণাপত্রের সারসংক্ষেপ হলো :

- ব্যক্তির সুযোগ-সুবিধা এবং প্রত্যাশা—এটাই হলো আসল মানদণ্ড। ধর্ম, জাতি, গোত্র, প্রথা, রীতিনীতি এবং সামাজিক আচার এসব কোনো মানদণ্ড নয়। সে কারণে ব্যক্তির এই অধিকার আছে যে, সে ওই সকল প্রথাগত সীমাবদ্ধতা থেকে বের হয়ে আসবে।
- বিবাহচুক্তি ব্যতিরেকেই যৌন সম্পর্ক হওয়া উচিত। সমকামিতাকে ঘৃণ্য চোখে দেখার বদলে তার প্রসারে এগিয়ে আসতে হবে। তবে এতটুকু লক্ষণীয়—যেন এই অভ্যাস কোনো রোগে আক্রান্ত না করে ফেলে। যুবক ও তরুণদের যৌন সম্পর্ক এবং গর্ভনিরোধক উপকরণ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অবগত করানো। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গোপনীয়তার আশ্বাস দেওয়া এবং এইজাতীয় বিষয়ে তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানো।
- দ্রুত বিবাহ করে নেওয়া অত্যন্ত ভুল। কেননা এটা জন্মহার বৃদ্ধির কারণ।
- গর্ভপাত কোনো নিন্দনীয় বিষয় নয়; যদিও তার কারণে মায়ের স্বাস্থ্যের কোনো শঙ্কা দেখা দেয়। তবে গর্ভপাতে মায়ের কোনো ক্ষতি যেন না হয়—সেদিকে লক্ষ রাখা উচিত।
- শীঘ্রই মা হওয়া, বৈধ পন্থায় হোক কিংবা অবৈধ পন্থায়, একটি ভুল সিদ্ধান্ত। দ্রুত মা হওয়ার কারণে জন্মহার বৃদ্ধি পায়। এবং নারী পুরুষের সাথে কাঁধ মিলিয়ে বাইরের কাজে অংশ নিতে পারে না।

কায়রো কনফারেন্সের এই ঘোষণাপত্রে পরস্পরে শারীরিক সম্পর্ক রাখে এমন দুজন নারী-পুরুষকে স্বামী-স্ত্রী বলার বদলে 'সাথি বা বন্ধু' হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা এই সম্বোধনে নিয়মতান্ত্রিক ফিজিকাল রিলেশনে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা যেভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় সেভাবে অবৈধভাবে রিলেশন যারা রাখে, তারাও শামিল হয়ে যায়। বিবাহপূর্ব সম্পর্ক স্থাপনকারীরাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় আবার যারা ব্যভিচারী বা সমকামী তারাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। ঘোষণাপত্র প্রস্তুতকারীদের চিন্তায় 'সাথি বা বন্ধু' একটি নিরপেক্ষ শব্দ, যা দ্বারা ফিজিকাল রিলেশন স্থাপনকারী কোনো বিশেষ শ্রেণির প্রতি ঈঙ্গিত করা হয় না। বরং শব্দটি বিবাহবহির্ভূত শারীরিক ও যৌন সম্পর্কের গ্রহণযোগ্যতার প্রতিই ইঙ্গিত করে যেন।

আশ্চর্যের কথা হলো, কায়রো কনফারেন্সের ঘোষণাপত্র নিয়ে স্বয়ং আমেরিকাতেই প্রতিবাদ হয়েছে। আমেরিকায় অল্প বয়সি মায়েদের সংগঠনের প্রধান কায়রো কনফারেন্সের ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে মুসলমান মায়েদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, যেই লোকেরা আমেরিকার সমাজব্যবস্থা বরবাদ করে ছেড়েছে, এখন তারা তাদের বিকৃত চিন্তা ও মানসিকতা নিয়ে ইসলামি সমাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যাতে তাকেও ধ্বংস করে দেওয়া যায়। এবং নিজেদের মতো করে মুসলিম-সমাজ ও মুসলিম নারীদেরও পদদলিত করে ফেলা সম্ভব হয়।

কায়রোতে জনসংখ্যা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবার পর মিশর, জর্ডান এবং তিউনিসে নারীস্বাধীনতার আওয়াজ উচ্চকিত করবার একাধিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা হয়। নিজেদের প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য জাতিসংঘের তরফ থেকে তারা ২০ কোটি ডলারও অনুদান লাভ করেছে। মনে রাখা দরকার—এই অনুদান কৃষি এবং শিল্পখাতের অনুদানের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি।

বেইজিং কনফারেন্স

নারীবিষয়ক জাতিসংঘের চতুর্থ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বেইজিংয়ে। যেখানে যৌন স্বাধীনতার অনুমোদন, বাল্যবিবাহ এড়ানো, গর্ভনিরোধের মাধ্যম ও পন্থাগুলো ব্যাপক করা, অল্প সন্তানে খুশি থাকা, নিরাপদ পদ্ধতিতে গর্ভপাতের অনুমোদন, নারী-পুরুষের সহশিক্ষার চেতনাবোধ জাগিয়ে তোলা, অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের যৌনশিক্ষা প্রদান করা, পিতামাতাকে সন্তানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা, পুরুষকে নারীর ভরণপোষণের দায় থেকে রক্ষা করা এবং এতসব লক্ষ্যের বাস্তবায়নে মিডিয়ার লাগামহীন ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের সুপারিশ করা হয়।

এটাও বলা হয় যে, একটা মেয়ে যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাবে তখন তার যৌন সম্পর্কের পূর্ণ অনুমতি থাকবে। বাবা-মা কিংবা অন্য কোনো অভিভাবকের এই অধিকার থাকবে না যে, তারা মেয়েকে তা থেকে বাঁধা দেবে।

এই কনফারেন্সে আরও ঘোষণা করা হয়, আধুনিক-মনস্ক প্রতিটি সমাজ এখন সমস্ত প্রথাগত প্রতিবন্ধকতা ভেঙে দিয়ে ব্যভিচারের পথে হাঁটা আরম্ভ করবে। এবং ইসলামসহ কোনো ধর্মেরই কোনো ধরনের অধিকার থাকবে না তার দিক পরিবর্তন করবার। এই ঘোষণা কেবল ইসলামি শরিয়তই নয়; বরং তা ছিল মানবস্বভাবেরও বিরোধী। কনফারেন্সে অনুমোদনপ্রাপ্ত ঘোষণাপত্রের কিছু ধারা ছিল এমন :

* অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের যৌন স্বাধীনতার সুপারিশ করা এবং অল্পবয়সেই তাদের যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়বার এবং বিবাহ বিলম্বিত করবার জন্য উৎসাহ দেওয়া।
* পারিবারিক বন্ধন রক্ষায় বিবাহের ভূমিকা বন্ধ করা। পরিবারের বৃত্তের বাইরে নারী ও পুরুষের মধ্যে সর্বপ্রকারের যৌন সম্পর্কের জন্য উৎসাহিত করা।
* পরিবারের এই পরিচয় জনপ্রিয় করে তোলা যে, একটি পরিবার দুইজন মানুষের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। সেই দুজন মানুষ দুজন পুরুষ হোক কিংবা দুজন নারী।

* গৃহস্থালির কাজকর্ম পরিত্যাগের জন্য নারীকে প্ররোচিত করা। কেননা গৃহস্থালির কাজে কোনো পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না।
* স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করবার দায়ে স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের জন্য এবং তাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য আলাদা বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠা করা।
* সমকামিতাকে বৈধতা দেওয়া। সমকামিতা অপরাধ সাব্যস্ত হতে পারে—মানুষকে এমন আইন ভাঙার সুযোগ করে দেওয়া।
* নারী এবং পুরুষের মধ্যে পরিপূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য দুজনকেই কাজকর্ম, সন্তানপ্রতিপালন এবং উত্তরাধিকার সম্পদে সমান অংশীদার হিসেবে মেনে নেওয়া।
* কিছু কিছু মুসলিম দেশের পক্ষ থেকে যেসব প্রতিবাদ উত্থাপিত হচ্ছে, তাকে একেবারেই উপেক্ষা করা।

বিশ্বায়নের মোকাবেলার উপায়

এতক্ষণের আলাপের দ্বারা বিশ্বায়নের ভয়াবহতা বেশ স্পষ্টই ফুটে উঠেছে এবং তার আশু প্রতিরোধ ও মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তাও আশা করছি কারুর কাছে অস্বীকারযোগ্য নয়। সে উদ্দেশ্যে বিচার-বিবেচনা করা, পরিকল্পনা করা, কার্যকর প্রয়াস-প্রচেষ্টা চালানো এখন আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। নিচে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিশ্বায়নের গতি থামিয়ে দেবার জন্য কিছু প্রস্তাবনা পেশ করা হচ্ছে। কিন্তু কাজটি কার্যক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বিন্যাসের বিপরীতে সম্পাদিত করতে হবে। অর্থাৎ, সমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে আমাদের সফল প্রতিরোধের পরই আমরা অর্থনীতি এবং রাজনীতির ময়দানে এই ভয়াবহ তুফানের প্রতিরোধে সামর্থ্যবান হয়ে উঠব, তার আগে নয়।

সামাজিক বিশ্বায়নের মোকাবেলা : সামাজিক বিশ্বায়নের প্রতিরোধে নিম্নযুক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি :

* সর্বপ্রথম মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ এবং তার রাসুলের সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের আপ্রাণ প্রয়াস আরম্ভ করতে হবে।
* নারী ও শিশুদের পশ্চিমা এবং ধর্মহীন প্রভাব থেকে বাঁচানোর জন্য স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা চালানো হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকা এবং মিডিয়ায় বৈধ পন্থায় ঈমান, ইসলামি সমাজ এবং ইসলামি আচার-ব্যবহার রীতিনীতির উপকার ও গুরুত্বের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে।
* ইসলামকে একটি মডেল ও অনুসরণযোগ্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে হাজির করতে হবে।
* মুসলিম-পরিবারের সাথে সম্পর্কিত এমন বিষয়ের ব্যাপক প্রসার ঘটানো, যার মাধ্যমে ইসলামে নারীর অবস্থান এবং অধিকার বিষয়ে কারুর মনে কোনো প্রকার ধোঁয়াশা না থাকে।

* আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় পরিমণ্ডলে সংঘটিত কনফারেন্সগুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের ইসলামবিদ্বেষী পরিকল্পনা সম্বন্ধে সাধারণ মুসলমানকে সতর্ক করতে হবে। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত ইসলামবিরোধী সম্মেলনগুলোর ক্ষতিকর দিকগুলোও সাধারণ্যে তুলে ধরতে হবে এবং প্রভাবক ও কার্যকর প্রতিবাদেরও আয়োজন করতে হবে।
* স্কুল, কলেজ এবং ভার্সিটিগুলোতে ইসলামি আচার-আচরণ এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রসার ঘটাবার জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। গ্রহণ করতে হবে কুরআন ও হাদিস শিক্ষার কর্মসূচি।
* গণমাধ্যমের উপর জনসাধারণের চাপ বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে অনৈতিক বিষয়ের প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রে অধিক স্বাধীনতা তারা না পায়। এবং সাংবাদিক সমাজ যেন অনুভব করে উঠতে পারে যে, এই বিষয়টি সমাজে অত সহজে গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব হবে না।
* পরিবারের গুরুত্ব, ইসলামে নারীর অবস্থান, নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের শরয়ি তাৎপর্য, বৈবাহিক অধিকার, সন্তানের প্রতিপালনে প্রভাবক পন্থা ও মাধ্যম—এ ধরনের বিষয়াদি স্কুলের শিক্ষাসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
* পশ্চিমাপ্রবণতার কারণ অনুসন্ধান এবং তা দূরীকরণে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যেই প্রতিষ্ঠানে পোক্ত চিন্তার বুদ্ধিজীবীরা কাজ করবেন।
* আলেম, মসজিদের ইমাম এবং খতিবগণ এই বিষয়ে জাতিকে পথপ্রদর্শন করবেন।

সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের মোকাবেলা : সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের প্রতিরোধে নিম্নযুক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি :

* পশ্চিমা ভাষার বিপরীতে আরবির ব্যাপকতা নিশ্চিত করা। যেইসব দেশে আরবি ভাষা পৌঁছেনি, সেখানে আরবি ভাষার প্রচার করা। পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং তুরস্কের মতন মুসলিম দেশ, যেখানে আরবি ভাষা নিত্যকার আলাপচারিতার ভাষা নয়, সেখানে আরবি ভাষার প্রচলন ঘটানো। পশ্চিমা দুনিয়াতেও আরবি ভাষা ছড়িয়ে দেবার প্রয়াস চালানো এবং তার সূচনা স্থানীয় মুসলিম কমিউনিটির মাধ্যমে করা যেতে পারে।
* আরব দেশগুলোতে সাধারণ আরবির বদলে বিশুদ্ধ আরবির বিস্তৃতি ঘটানো।
* আরবি ভাষার এই প্রসারের মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর প্রচার ও প্রসারের পথ সুগম করে তোলা।
* বিদেশি ভাষা, বিশেষ করে ইংরেজির পরিধি সংকুচিত করে আনা। প্রয়োজন ব্যতিরেকে তার ব্যবহার না করা। বিশেষ করে নিজের মাতৃভাষার মধ্যে ইংরেজি শব্দের অনুপ্রবেশ থেকে বেঁচে থাকা। আরব মুসলমান এবং বাংলাভাষীরা এই বিষয়ে নিজের দায়িত্বের বিষয়টি উপলব্ধি করুন। এই ভাষাগুলোকে বিদেশি ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখুন।

* নতুন পরিভাষাগুলোর ইংরেজি থেকে স্থানীয় ভাষায় রূপান্তর করা।
* পশ্চিমা ভাষায় প্রকাশিত প্রতিটি উপকারী ইলমি ও অ্যাকাডেমিক গ্রন্থ এবং সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থের দ্রুততর সময়ে ইসলামি বিশ্বের ভাষায় অনুবাদ করানো।

অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের মোকাবেলা : অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে দুটি মূলনীতির আলোকে :

প্রথম মূলনীতি : বিপদ উপলব্ধি করানো। সাধারণ মানুষকে বিশ্বায়নের ভয়াবহতা উপলব্ধি করিয়ে তাদের মধ্যে এই বোধ ও উপলব্ধি তৈরি করতে হবে যে, তারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধাবস্থা পার করছে এবং জীবন-মরণ ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে।

দ্বিতীয় মূলনীতি : যতদূর সম্ভব বিদেশি পণ্য বয়কট করা। সাধারণ মানুষের চেতনা জাগ্রত করে এই আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত করতে হবে যে, যেসব পণ্য দেশেও উৎপাদন হয় সে-সব পণ্যের ক্ষেত্রে তারা কেবল দেশি পণ্যই ক্রয় করবে। বিদেশি পণ্য কেবল সেগুলোই কিনতে পারে, যেগুলো দুর্লভ এবং যেগুলোর কোনো বিকল্প দেশে তৈরি হয় না। যেমন জীবন বাঁচাবার ওষুধপথ্য। কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ ইত্যাদি।

সাজসজ্জার সামগ্রী, ফাস্টফুড, কোমল পানীয়, খেলনা, পোশাক, গহনা ইত্যাদি পণ্য বিদেশি ব্র্যান্ড কখনো না কেনা, তার গুণগত মান যতই উন্নত হোক না কেন। তার বিকল্প যদি না থাকে, তবু।

এই কাজটি সহজ হবে না। খুবই কঠিন। কাজটি করতে গিয়ে আত্মার উপর অত্যধিক চাপ অনুভূত হবে। বিদেশি কোম্পানিগুলো এমনসব আকর্ষণীয় কৌশল অবলম্বন করবে যে, শক্তপোক্ত মানুষের পা পর্যন্ত পিছলে যাবে। তারা বিজ্ঞাপনকে আরও বেশি চিত্তাকর্ষক ও চটকদার করে তুলবে। সিনেমার নায়ক-নায়িকা আর খেলোয়াড়ই কেবল নয়; বরং রাজনীতিবিদ এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানকে পর্যন্ত নিজেদের পণ্যের আগ্রহী হিসেবে দেখাবে। পুরস্কারের লাইন লাগিয়ে দেবে। দাম খুবই হ্রাস করে দেবে। সাময়িকভাবে 'না লাভ না লোকসান' পদ্ধতিতে ব্যবসা করতে উদ্যোগী হয়ে উঠবে। দেশের মধ্যে নানা কল্যাণকর কাজ শুরু করে দেবে। ফ্রি খাদ্য এবং ফ্রি শিক্ষার মতন কর্মসূচি গ্রহণ করবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রকাশ্যে অনুদান দিয়ে হলেও সাধারণ মানুষের সহমর্মিতা অর্জনের চেষ্টা করে যাবে। জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, আলেম ও বিজ্ঞজনেরা বিভিন্ন ইভেন্টে তাদের পণ্য গর্বের সাথে ব্যবহার করছে, এসব দেখিয়ে সাধারণ মানুষের মনে পোক্ত ধারণা তৈরি করবে যে, দেখো, আমরা তোমাদের শত্রু নই; বরং বন্ধু।

কিন্তু বিশ্বায়নের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডগুলো সামনে রেখে সাধারণ মানুষকে তাদের সকল ফাঁদ থেকে বাঁচাতে হবে। নিজের মুঠির পয়সা স্থানীয় পণ্যের জন্যই কেবল সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর পন্থা হলো বিদেশি পণ্যের বিজ্ঞাপন একেবারেই উপেক্ষা করে চলা। সংবাদপত্রের অ্যাডভার্টাইজ এবং

সাইনবোর্ডের দিকে একদমই চোখ তুলে না তাকানো। রেডিও-টিভিতে তাদের প্রচার-প্রচারণা দেখা এবং শোনা বন্ধ করে দেওয়া। ফলে মনে না কোনো আগ্রহ তৈরি হবে আর না সেগুলো কেনার কোনো চিন্তা আসবে।

উল্লিখিত মূলনীতির যদি অনুসরণ করা হয় তাহলে অর্থনৈতিক অবরোধ খুলে যেতে শুরু করবে এবং স্বাবলম্বিতার দুয়ার উন্মোচিত হতে থাকবে। স্থানীয় শিল্প ও বাণিজ্য অগ্রগতি লাভ করবে। তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে গিয়ে উৎপাদকের করণীয় হবে, যেসব পণ্য বিদেশি ব্র্যান্ড ছাড়া পাওয়া যায় না, ধীরে ধীরে দেশেই সে-সবের বিকল্প প্রস্তুত করা।

তবে প্রথম মূলনীতিটি কোনো অবস্থাতেই ত্যাগ করা উচিত নয়। যার ফলে ধীরে ধীরে বিদেশি পণ্যের বাজার নষ্ট হতে থাকবে। এবং একসময় অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের আক্রমণ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে।

রাজনৈতিক বিশ্বায়নের মোকাবেলা : সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের সামনে দৃঢ়পদ হবার পর রাজনৈতিক বিশ্বায়নের প্রতিরোধ আমাদের জন্য খুব বেশি কঠিন হবে না। আর তার জন্য আমাদের যা করতে হবে :

* মুসলমানদের জাতীয়, আঞ্চলিক এবং ভাষাগত স্বার্থ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।
* ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। খেলাফত এবং শুরা-ব্যবস্থা নিজেরা বোঝা এবং সাধারণ মানুষকেও বোঝানো।
* এমনসব দল অস্তিত্বে আনতে হবে, যারা প্রচলিত রাজনীতির দূষণ থেকে মুক্ত থেকে সাধারণ মানুষকে নিজেদের প্রতি আস্থাশীল করে তুলবে। তারা কেবল সাধারণ মানুষের ধর্মীয় রাহনুমায়ী করবে না; বরং তাদের পার্থিব ও আর্থিক সমস্যাবলির সমাধানও হাজির করবে।
* খেলাফত প্রতিষ্ঠাকে মূল লক্ষ্য বানিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।
* যতদিন খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হচ্ছে ততদিন এমন কোনো স্বাধীন ও প্রভাবশালী প্ল্যাটফরম বানানো দরকার, যা মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। এবং পশ্চিমের উপর নিশ্চিত চাপ প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে।
* আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পোক্ত চিন্তার অধিকারী তরুণদের ইসলামি দেশের পেশাদার বাহিনী, রাজনৈতিক দল, আইন রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান, পুলিশ, বিচারবিভাগ এবং সচিবালয়ে উঁচু পদ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে। এই কাজটি একনাগাড়ে কয়েক দশক পর্যন্ত হওয়া জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে প্রতিটি সরকারেই পশ্চিমা এজেন্টদের স্থানে ইসলামের সত্যিকারের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা ক্ষমতায় থাকতে পারে।

শেষকথা

বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশনের চিন্তাধারা, দর্শন এবং তার প্রতিটি আক্রমণের প্রতিরোধপন্থা ইসলামের চিন্তা, আকিদা, আইন, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং তার নীতিগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার মধ্যেই রয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার প্রসারের প্রচেষ্টা যত দ্রুত হবে, বিশ্বায়নের মোহ তত দ্রুতই কেটে যেতে থাকবে।

গ্রন্থপঞ্জি

—আল-আওলামা, সালেহ আর রকব
—আল-আলমানিয়্যা ওয়াল আওলামা ওয়াল আজহার, ড. কামালুদ্দীন আবদুল গনী আল-মুরসী
—মাউসুয়াতুর রাদ্দি আলাল মাযাহিব, আলী ইবনে নাহিফ আশ শুহুজ
—আল-মুসলিমুনা ওয়াল আওলামা, উস্তাদ মুহাম্মদ কুতুব
—মাউসুয়াতুল গাজবিল ফিকরি, আলী ইবনে নাহিফ আশ শুহুজ
—আল-ই'লাম ওয়াত তায়ারাত আল-ফিকরিয়্যাহ আল-মুয়াসারাহ, সাঈদ আবদুল্লাহ হারিব
—গ্লোবালাইজেশন অওর ইসলাম, মাওলানা ইয়াসির নাদীম
—মাগরিবি মিডিয়া অওর উস কে আসারাত, মাওলানা নজরুল হাফিজ নদবী
—হিলাল ওয়া সলীব কা মা'রেকাহ, শফিকুল ইসলাম ফারুকী
—ইসলাম অওর জাদীদ তিজারাত ওয়া মাইশাত, মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী

৪.৪: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের চতুর্থ ক্ষেত্র
খ্রিষ্টান মিশনারি কার্যক্রম

বাতিলপন্থিদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ধর্মান্তর। অর্থাৎ তারা মুসলমানদেরকে মুরতাদ বানাতে এবং ইসলাম থেকে বের করে দিতে বদ্ধপরিকর। সাধারণত বাতিল চিন্তা-বিশ্বাস লালনকারী একাধিক দল নিজস্ব চিন্তা অনুযায়ী মুসলমানদের তার বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত করে ফেলতে চায়। এবং নিজেদের সমচিন্তক করে তুলবার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যায়। যেমন : কমিউনিজমের প্রচারকরা দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের নিজেদের চিন্তার প্রতি আহ্বান করে আসছে। একইভাবে হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের ধর্মহীন করবার জন্য শুদ্ধি আন্দোলনের মতন বহু আন্দোলন পরিচালনা করে চলছে। কিন্তু এই ধারাবাহিকতায় সবচাইতে বৃহৎ পরিসরে এবং সবচাইতে পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে খ্রিষ্টবাদের প্রতি আহ্বানকারী মিশনারি কার্যক্রম। এবং ইসলামি বিশ্বের সবচাইতে বড় শঙ্কা এখন এটাই, যে কারণে এ পর্যায়ে আমরা খ্রিষ্টবাদের দাওয়াত ও প্রচারকাজের কিছু বিশ্লেষণ দেখবো, যাকে আত-তানসির বা আত-তাবশির (Christianity Mission) বলা হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইবিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থে এই পর্যায়ে এসে 'আত-তানসির' (তথা খ্রিষ্টবাদে দীক্ষিতকরণ) সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে।

৪.৪.১: খ্রিষ্টান মিশনারির সংজ্ঞা

আত-তানসির দ্বারা উদ্দেশ্য সেই আন্দোলন, যার লক্ষ্য অ-খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে নিয়মতান্ত্রিকভাবে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করানো।

এই আন্দোলনের অধীন দুনিয়াজুড়ে বিস্তৃত পরিসরে খ্রিষ্টবাদের প্রচারকার্য পরিচালিত হচ্ছে; যদিও এই উদ্যোগের লক্ষ্য সারা দুনিয়ার এবং সকল ধর্মের প্রতিজন ব্যক্তি; কিন্তু সন্দেহ নেই—মুসলমান এবং ইসলামি বিশ্বই তার প্রধান টার্গেট। এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বলা হয়ে থাকে মিশনারি।

ইসলামি দুনিয়ায় কাজ করবার সময় খ্রিষ্টবাদের প্রচারকগণ রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধকতা কিংবা সাধারণ মানুষের ঘৃণা থেকে বাঁচবার লক্ষ্যে তাদের এই কর্মযজ্ঞকে আত-তানসির (খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা) বলবার বদলে আত-তাবশির (মিশনারি কার্যক্রম) বলে থাকে। আত-তাবশির অর্থ সুসংবাদ দেওয়া। খ্রিষ্টবাদের প্রচারকগণ নিজেদের দাওয়াত কবুলকারীদের গুনাহমুক্তির সুসংবাদ প্রদান করে থাকেন। তারা এমন মনোভাব প্রকাশ করেন যে, আমরা মানুষকে নৈরাশ্য ও অন্ধকার থেকে উদ্ধার করি। এবং তাদেরকে মুক্তির সুসংবাদ শোনাই।

৪.৪.২: খ্রিষ্টান মিশনারির ইতিকথা

এই আন্দোলনের সূচনা প্রায় পঞ্চম শতাব্দীকাল পূর্বে। আন্দোলনটির সমস্ত কর্মধারা আমরা দুটি অংশে বিভক্ত করে দেখতে পারি :

১. জোরপূর্বক খ্রিষ্টবাদে দীক্ষিত করবার কাল।
২. দাওয়াত ও প্ররোচনা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে খ্রিষ্টবাদের প্রসারকাল।

জোরপূর্বক খ্রিষ্টবাদে দীক্ষিত করবার কাল : জোরপূর্বক খ্রিষ্টান বানানোর উদ্যোগ সর্বপ্রথম শুরু হয় স্পেনে। ২ রবিউল আউয়াল ৮৯৭ হিজরি (২ জানুয়ারি ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ) গ্রানাডার পতনের সাথে সাথে যখন মুসলিম আন্দালুসের সমাপ্তি ঘটে তার অব্যবহিতকাল পরেই সেখানকার রাজা ফার্ডিন্যান্ড সরকারি ফরমান জারি করে মুসলিম অধিবাসীদের জোরপূর্বক খ্রিষ্টান বানানো আরম্ভ করে দেয়। পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়েলও একই পথে যাত্রা করে। এটা খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে নিজেদের ধর্মের প্রসারে একটি চক্রান্তমূলক ও ঘৃণিত প্রয়াস ছিল, যার পেছনে প্ররোচক হিসেবে ভূমিকা পালন করছিল শত বছরের লালিত প্রতিশোধপরায়ণতা।

সেইকালেই ইউরোপ অর্থনৈতিক এবং সাম্রাজ্যবাদী বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে প্রাচ্যমুখী নতুন পথ অনুসন্ধান আরম্ভ করে। এই উদ্যোগে সম্পদ এবং ভূমির প্রতি লোভের সাথে সাথে নিজের ধর্মকে অন্যের উপর 'চাপিয়ে' দেওয়ার পাগলামিও তাদের পেয়ে বসে। পোপের তরফ থেকেও উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার কোনো কমতি ছিল না। তিনি নিয়ম করে সবাইকে উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য—সবাই যেন দ্বিধা-সংশয়হীনভাবে নিজেদের ধর্মের প্রসারে নিয়োজিত হতে পারে। চার্চ এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য বৈধ-অবৈধ সবধরনের কৌশল অবলম্বনের, এমনকি রক্তপ্রবাহিত করবারও অনুমোদন দিয়ে দেয়।

এই অভিযাত্রীদলের অনেকেই ছিল ধর্মান্ধ ও গোঁড়া টেম্পলারদের সংগঠনের সদস্য। যেমন হিন্দুস্থানের পথ আবিষ্কারক পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা ছিল 'অর্ডার অব ক্রাইস্ট'-এর অনুগত। হিন্দুস্থানের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে সে নিজ ধর্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। আফ্রিকার বহু উপকূলীয় অঞ্চলকেও এই ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সেইকালের স্প্যানিশ নাবিকেরা প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে ফিলিপাইন পৌঁছে। এবং সেখানকার অধিবাসীদের তরবারির জোরে জবরদস্তিমূলক খ্রিষ্টবাদে দীক্ষিত করে। দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রয়াস এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যার ফলে পর্তুগাল এবং স্পেন থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা সম্পূর্ণরূপে মিটে যায়। এবং বর্তমানে আফ্রিকা থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত বহু অধিকৃত অঞ্চলে খ্রিষ্টবাদ গ্রহণকারীদেরই আধিক্য নজরে আসে।

দাওয়াত ও প্ররোচনা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে খ্রিষ্টবাদের প্রসারকাল : সামরিক শক্তির প্রয়োগে ধর্মকে সেখানেই প্রসারিত করা যায়, যেখানে ভূখণ্ডের দখল পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। যে-কারণে খ্রিষ্টবাদের প্রসারের গতি স্পেন এবং

ফিলিপাইনের মতন দুই-চারটি অধিকৃত ইসলামি দেশ ছাড়া বাকি দুনিয়ায় প্রায় না হবার মতোই। শেষমেশ তারা নিজেদের উদ্যোগে সফলতা লাভের জন্য সামরিক পদ্ধতি থেকে সরে গিয়ে ধর্মের দাওয়াত ও প্রচার সম্বন্ধে ভাবতে থাকে। খ্রিষ্টবাদ প্রচারের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কজন খ্রিষ্টান ছাত্র প্যারিসের সেন্ট মেরি গির্জার সাথে মিলে এই ভাবনার পূর্ণতাপ্রদানের কাজ আরম্ভ করে।

এই কাজের সূচনা খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকের চতুর্থ দশকের সেই সময়ে, যখন হিউম্যানিজম (মানববাদ) এবং যুক্তিবাদী আন্দোলনের ঢেউ ইউরোপের গির্জাগুলোতে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। মার্টিন লুথার কিংয়ের ধর্মসংস্কার আন্দোলন এবং প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব-প্রতিপত্তি কমিয়ে প্রায় শূন্যে নিয়ে আসে। এমতাবস্থায় ঐতিহ্যবাদী খ্রিষ্টানেরা নিজেদের প্রাচীন আকিদা-বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে ভাবনা-চিন্তা আরম্ভ করে দেয়। এবং সেই ঐতিহ্যবাদী বিশ্বাসের প্রসারের জন্য নতুন ভূমি অনুসন্ধান করতে থাকে।

প্যারিসের সেন্ট ম্যারি চার্চের এক স্প্যানিশ শিক্ষার্থী ইগনাতিউস লয়োলা (Ignatius of Loyola) খ্রিষ্টবাদের এই দুরবস্থা নিয়ে অত্যন্ত বিচলিত এবং উদ্বিগ্ন ছিল। সে তার সমচিন্তার সাতজন শিক্ষার্থীর সাথে ১৫ আগস্ট ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টবাদের প্রচারের শপথ নেয় এবং জেসুইট (Jesuit) সোসাইটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। এই উদ্দীপিত শিক্ষার্থীরা প্রথমে রোমে যায়। এবং সেখানে পোপের সাথে সাক্ষাৎ করে রোমান ক্যাথলিক চার্চের জন্য জীবন উৎসর্গ করবার শপথ গ্রহণ করে। ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে পোপ পল তৃতীয় (Pope paul III) নিয়মতান্ত্রিকভাবে এই দলের অনুমোদন প্রদান করেন। এই দলটির উদ্দেশ্য হলো :

—রোমান ক্যাথলিক চার্চের আকিদা-বিশ্বাস অনুযায়ী খ্রিষ্টবাদের প্রচার।
—গির্জার পবিত্রতা ফিরিয়ে আনতে দরিদ্রতাবরণ ও বৈরাগ্য অবলম্বনের প্রচার।
—শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে তাকে ক্যাথলিক ধর্মীয় বিশ্বাসের শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্রে পরিণত করা।

আর এভাবেই খ্রিষ্টধর্মের নিয়মতান্ত্রিক প্রচার ও তাবলিগের কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। দাওয়াতের সূচনা করা হয় পর্তুগাল এবং স্পেন থেকে, যেখানে পূর্ব থেকেই মুসলমানদের জোরপূর্বক খ্রিষ্টান বানাবার উদ্যোগ জারি ছিল। জেসুইট সোসাইটির 'দাঈ'রা সেই এলাকাগুলোতে শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। তাদের দেখাদেখি খ্রিষ্টধর্মের আরো কিছু উপদল খ্রিষ্টবাদের প্রচারে মাঠে নেমে পড়ে। তাদের সামনে তখন এই ময়দান একেবারেই প্রশস্ত ও উন্মুক্ত ছিল। যে কারণে এক দল অন্য দলের কাজের মধ্যে অনুপ্রবেশ না করেই প্রত্যেকে যার যার বিশ্বাসের প্রচারকাজে নিমগ্ন থাকতে পেরেছিল।

উত্তম ব্যবস্থাপনা এবং ধারাবাহিক অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ৫০-৬০ বছরের মধ্যেই এই সোসাইটি এতটা ক্ষমতাধর হয়ে ওঠে যে, ইউরোপের অধিকাংশ দেশের শিক্ষাকেন্দ্রে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেও তারা

কর্তৃত্বশীল হয়ে উঠতে থাকে। নতুন দুনিয়া আমেরিকাতেও তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে সাথে তাদের ধর্মপ্রচারক-দলও মুসলিম দেশগুলোতে পা ফেলতে শুরু করে। এই ধর্মপ্রচারকদেরই বলা হয় মিশনারি। তাদের কাজের পদ্ধতি হলো, শুরুতে স্থানীয় শাসকদের প্রভাবিত করে তাদের উপর নিজেদের জ্ঞানগরিমার চাকচিক্য জাহির করা। তারপর তাদের সহায়তায় বিভিন্ন স্থানে গির্জা প্রতিষ্ঠা করে খ্রিষ্টবাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং প্রচারকাজ আরম্ভ করা।

৪.৪.৩: ভারতবর্ষে মিশনারি কার্যক্রমের ঐতিহাসিক নিরীক্ষা

ভারতবর্ষের মিশনারিদের আগমনের ধারা আরম্ভ হয় মোগল শাসনামলে। ৩ ডিসেম্বর ১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে (৯৭৪ হিজরি) পর্তুগাল থেকে প্রথম মিশনারি প্রতিনিধিদের জাহাজ হিন্দুস্থানের বন্দরনগরী সুরাটে নোঙর করে। যদিও এটা ছিল মোগলদের উত্থানের সময় এবং ইউরোপিয়ান শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রভাবে বিপুলভাবে আচ্ছন্ন ছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও পর্তুগিজ মিশনারিরা সব ঝুঁকি কাটিয়ে উঠে মোগল-দরবারে ধর্মপ্রচারের সিদ্ধান্ত পোক্ত করে নেয়। সেই মিশনারিদের ভাগ্য ভালো বলতে হবে, তখন মোগল সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বাদশাহ আকবর, যিনি অল্পবয়সি, অশিক্ষিত এবং অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও মুক্তমনা মানুষ ছিলেন। যখন তিনি পর্তুগাল থেকে আগত প্রতিনিধিদলের সম্বন্ধে অবগত হলেন, তাদের হুকুম দিলেন, তারা যেন তাদের ধর্মপ্রচারকদের ধর্মীয় গ্রন্থ-সমেত দিল্লি পাঠিয়ে দেয়।

৪.৪.৪: আকবরের দরবারে

পর্তুগিজ ধর্মপ্রচারকেরা সম্রাট আকবরের দরবারে এলো। এবং ত্রিত্ববাদের পক্ষে দলিল-প্রমাণ হাজির করে খ্রিষ্টবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রয়াস চালাল। তারা হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের ছবি দেখালে আকবর সেই ছবির সামনে কনুই ঠেকিয়ে সেজদা করলেন। আকবর প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে এতই প্রভাবিত হয়ে পড়লেন যে, তাদের একজনকে নিয়োগ দিলেন শাহজাদার শিক্ষক হিসেবে।

সেইকালের আলেমগণ দরবার থেকে খ্রিষ্টবাদের প্রভাব মিটিয়ে দেবার জন্য সাধ্যমতো প্রয়াস চালিয়েছিলেন। একবার সম্রাট আকবরের দরবারে মুসলিম ওলামা ও খ্রিষ্টান পাদরিদের মধ্যে মুবাহালা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে শায়েখ কুতুবুদ্দীন জানসারি মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেন। আগুন প্রজ্বলিত করে দুই দলকে আহ্বান করা হয় তাতে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য।

শায়েখ পাদরির কোমরে হাত দিয়ে বলেন, "জি, হ্যাঁ, বিসমিল্লাহ।"

কিন্তু পাদরির সাহস হয় না। সে এই বলে প্রাণ রক্ষা করে যে, আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া বিবেকবিরুদ্ধ কাজ।

আকবর এই ঘটনাকে খ্রিষ্টানদের পরাজয় মনে না করলেও এতটুকু অবশ্যই হয় যে, এই ঘটনা পুরোপুরি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে নেওয়া থেকে আকবরকে ফিরিয়ে রাখে। তার জীবনীকারদের বক্তব্য হলো, তিনি কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারী ছিলেন না। পরবর্তীকালে আকবর যখন 'দীনে এলাহি' প্রবর্তন করেন তখন হিন্দুধর্ম এবং ইসলামধর্মের পাশাপাশি খ্রিষ্টধর্ম থেকেও কিছু কিছু বিষয় নিয়ে তাতে যুক্ত করেছিলেন।[৮৫]

বাহ্যত আকবর চাইত যেকোনোভাবে হিন্দু-খ্রিষ্টান সবাইকেই খুশি রাখতে। মানোচি তার ভ্রমণকাহিনিতে লিখেছেন, আকবরের একবার ইচ্ছা হলো নিজের জন্য একটি সমাধি তৈরি করবেন, যার নাম রাখা হলো সিকান্দার। বাগিচার প্রধান ফটকে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে শূলিতে চড়ানোর ছবি টাঙিয়ে দেওয়া হলো। তার বাম দিকে ঝুলানো হলো হজরত মারয়াম আলাইহাস সালামের ছবি। সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছিল যে, মারয়াম আলাইহাস সালাম শিশু ঈসাকে (আলাইহিস সালাম) দুধ পান করানোর জন্য কোলে নিয়ে বসে আছেন। আকবর যে খ্রিষ্টানদের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন, এটা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ইংরেজরা তাদের উদ্দেশ্যে প্রায় সফলতার চূড়া স্পর্শই করে ফেলেছিল। কিন্তু মুজাদ্দিদে আলফেসানীর আন্দোলন পরিস্থিতির গতিধারাই বদলে দেয়। যদি ওই নাজুক পরিস্থিতিতে তিনি ময়দানে নেমে না আসতেন তাহলে সারা ভারতবর্ষ একটি খ্রিষ্টান রাজ্যে রূপান্তরিত হবার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেই গিয়েছিল। খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় প্রচারের যেই প্রভাব 'দীনে এলাহী'র আকৃতিতে হিন্দুস্থানের মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল অত্যন্ত প্রজ্ঞা এবং দৃঢ়তার সাথে মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহিমাহুল্লাহ তার প্রতিরোধ করে ওঠেন।[৮৬]

৪.৪.৫: জাহাঙ্গিরের শাসনামলে

জাহাঙ্গিরের শাসনামলে ব্রিটিশ বণিকদের ভারতে পা রাখবার সুযোগ ঘটে। হকিন্স নামক এক ইংরেজ অফিসার মোগল-দরবারে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অর্জন করেন। একসময় বিদেশিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জাহাঙ্গির আগ্রা ও লাহোরে গির্জার জন্য জায়গার অনুমোদন দিয়ে দেন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তার তত্ত্বাবধানের নির্দেশ প্রদান করেন।[৮৭]

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য স্যার টমাস রো বাদশাহর দূত হিসেবে ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দুস্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি লেখেন :

---

[৮৫] দরবারে আকবরি, পৃষ্ঠা : ৮৩; তারিখে হিন্দ, জাকাউল্লাহ, ৫:৮২৫

[৮৬] বিস্তারিত জানতে পড়ুন : 'তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত' চতুর্থ খণ্ড (সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস নামে বাংলা অনুবাদ বাজারে বর্তমান)। -অনুবাদক

[৮৭] তারিখে জাহজাহার, পৃষ্ঠা : ৪৬৫

“জাহাঙ্গির বেশ প্রকাশ্যেই সম্রাট আকবরের চাইতেও খ্রিষ্টধর্মের প্রতি অধিক অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। তিনিও তার বাবার মতোই পর্তুগিজ খ্রিষ্টানদের আদেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন তাদের চার্চ ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নেয়। খ্রিষ্টানদের তিনি অনুমতি প্রদান করেছিলেন, যেখানে ইচ্ছা তারা বক্তব্য দিতে পারবে। এবং যারা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে চায় তাদের খ্রিষ্টান বানিয়ে নিতে পারবে।”

স্যার টমাস রো'র সাথে এক পাদরিও ছিলেন। তিনি হিন্দুস্থানের মুসলমানদের মধ্যে খ্রিষ্টবাদের প্রচারের সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে লেখেন :

“মুসলমানদের মধ্যে নিম্নশ্রেণির যারা, তারা ব্যতীত এমন আর কেউ ছিল না, যারা আমাদের পয়গাম্বর ঈসা মাসিহের নাম শ্রদ্ধা ও আদবের সাথে উচ্চারণ করে না। তাদের প্রত্যেকেই তাকে পুণ্যবান জ্ঞান করে। তাকে বলে রুহুল্লাহ। তবে জানি না কেন তারা ঈসা মাসিহকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে স্বীকার করে না। অধিকাংশ মুসলমানই খ্রিষ্টানদের অপবিত্র মনে করে। তারা আমাদের সাথে খাওয়াদাওয়া করে না। এমনকি যেই পাত্রে আমরা আহার গ্রহণ করি, সেই পাত্রেও তারা আহার গ্রহণ করে না।”

টমাস রো জাহাঙ্গিরের দুই পুত্র শাহজাদা খসরু এবং শাহজাদা খুররমের প্রতি গভীর দৃষ্টি রেখেছিলেন। তিনি তার শাসকের কাছে লিখেছেন :

“যদি (ভবিষ্যতের ক্ষমতার লড়াইয়ে) খসরু সফল হয় তাহলে ইংরেজদের কল্যাণ হবে। এবং হিন্দুস্থান খ্রিষ্টীয় সাম্রাজ্যের জন্য একটি অভয়ারণ্য হয়ে উঠবে। কেননা খসরু খ্রিষ্টবাদকে নেহায়েত পছন্দ করে। আর যদি খুররম জয়ী হয় তাহলে ইংরেজদের সীমাহীন ক্ষতি হয়ে যাবে। সে খ্রিষ্টানদের অত্যন্ত অপছন্দ করে।”

এই মিশনারিদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিল, যেন মোগল শাহজাদারা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে নেয়। এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে তারা ইংরেজ সুন্দরীদেরও ব্যবহার করত। এবং এই প্রয়াসে তারা সফলও হয়েছিল। জাহাঙ্গিরের ভাই দানিয়ালের দুই সন্তান খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিল। এবং আগ্রায় তাদের ব্যাপটিজম সম্পন্ন হয়।[৮৮]

৪.৪.৬: শাহজাহানের দরবারের বিতর্ক

এটাকে মুসলমানদের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, জাহাঙ্গিরের পর দিল্লির মসনদে উপবিষ্ট হয় তার পুত্র খুররম (শাহজাহান), যিনি মুজাদ্দিদে আলফেসানীর সংস্কার আন্দোলন দ্বারা দারুণ প্রভাবিত ছিলেন। ফলে আকবর যেই বদদীনির বীজ রোপণ করেছিল, জাহাঙ্গিরের পর তার নিকৃষ্ট চারাগাছ সমূলে উপড়ে ফেলা সম্ভব হয়। শাহজাহান ইসলামের মর্যাদার পুনঃস্থাপন করেন এবং মিশনারিদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

এই সময়ে পাদরি ডিউম ম্যাথিউস মোগল সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টবাদের প্রচারের কাজ শুরু করতে চায়। তিনি সেই নিষেধাজ্ঞা রহিত করবার লক্ষ্যে শাহজাহানের দরবারে মুসলমানদের সাথে বিতর্ক করবার আবেদন রাখেন। সিদ্ধান্ত হয়—বিতর্কে

---

[৮৮] তারিখে হিন্দ, জাকাউল্লাহ, ৫: ২৫০

মিশনারিদের জয় হলে তাদের প্রকাশ্যে খ্রিষ্টধর্মের প্রচারের জন্য অনুমতি দেওয়া হবে। পাদরি উপস্থিত ব্যক্তিদের সম্বোধন করে বলেন :

"জনৈক ব্যক্তি কোনো ঘন জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলে। একটু পর সে তার সমুখে দুজন মানুষকে দেখতে পায়। একজন জাগ্রত আরেকজন ঘুমন্ত। সে এখন কার কাছে পথের হদিস জানতে চাইবে!"

পাদরির উদ্দেশ্য ছিল, পথনির্দেশ ঘুমন্ত ব্যক্তির থেকে নয়; বরং জাগ্রতের থেকেই নেওয়া হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকাল হয়ে গেছে। তিনি ঘুমন্ত ব্যক্তির মতন। বিপরীতে ঈসা আলাইহিস সালাম মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস অনুযায়ীও জীবন্ত আছেন। যেহেতু জেগে আছেন; সুতরাং তার শরিয়ত অনুযায়ীই তো চলা উচিত!

পাদরির এই জিজ্ঞাসার জবাবে একজন বিজ্ঞ আলেম আমির সা'দুল্লাহ খান শান্তভাবে বলেন :

"পথহারা মুসাফির এবং জাগ্রত ব্যক্তি দুজনই ঘুমন্ত ব্যক্তির জেগে ওঠার অপেক্ষা করবে। এবং তার ঘুম ভাঙার পর তার থেকেই পথের দিশা জেনে নেবে। কেননা জাগ্রত ব্যক্তিকে তখনও ওই নির্জন গহীন জঙ্গলের মধ্যে এই কারণেই দেখা যাচ্ছিল; কেননা সেও পথের দিশা জানে না। তারও কোনো পথপ্রদর্শকের পথনির্দেশের দরকার।"

এই জবাব শুনে পাদরি নির্বাক হয়ে পড়ে। এবং বিতর্কে তার পরাজয় ঘটে। আর এরই মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে মিশনারিদের কর্মকাণ্ড তখনকার মতন থেমে যায়।

৪.৪.৭: মিশনারি এবং শাহজাদা দারা শিকোহ

শাহজাহানের পুত্র শাহজাদা দারা শিকোহকে নিয়ে মিশনারিদের কিছু ভবিষ্যৎ-প্রত্যাশা ছিল। দারা শিকোহকে বলা হয় সুফি মনীষা। কিন্তু তিনি ইসলামি সুফি নন; শরিয়তমুক্ত ধর্মত্যাগী মানুষ ছিলেন। খ্রিষ্টানদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল গভীরতর। তার উপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গোয়ার পাদরিরা তাকে দাওয়াত করেন। সেখানে ১৬-১৭ বছর বয়সি একজন ইউরোপিয়ান মেয়েকে 'মাসীহুন নিসা' নাম দিয়ে তার সামনে হাজির করা হয়। মেয়েটি নিজের হাতে পেয়ালা পূর্ণ করে দারা শিকোহকে পান করাতে থাকে। শেষমেশ তিনি ওই মেয়ের প্রেমে পড়ে যান। এবং খ্রিষ্টীয় পদ্ধতিতে তাকে বিয়ে করে নেন। এই মেয়ে তার মেজাজ; বরং আকিদা-বিশ্বাসের উপর এই পরিমাণ প্রভাবক হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত তিনি ইসলামি চিন্তাধারা এবং আকিদা-বিশ্বাস থেকে দূরেই থেকে যান।

শাহজাহানের পর ক্ষমতা লাভ করেন তার দীনদার ও সুযোগ্য পুত্র আওরঙ্গজেব আলমগির। হিন্দু এবং খ্রিষ্টানদের প্রত্যাশা ছিল, দারা শিকোহ বিদ্রোহ করে আলমগিরের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিক। দারা শিকোহ তাদের প্ররোচনায় পড়ে বিদ্রোহের পতাকাও উত্তোলন করে বসে। কিন্তু শেষমেশ ব্যর্থতা নিয়েই তাকে

মৃত্যুবরণ করতে হয়। ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকদের মতে, মৃত্যুর সময় দারা শিকোহর মুখে ছিল এই বক্তব্য :

محمد مـــرا کشد و ابن اللہ و مـــریم مـــرا می بخشد

মুহাম্মদ আমাকে মেরে ফেলল। আল্লাহর পুত্র এবং মারিয়াম আমাকে জীবন দিয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ)

এই বর্ণনা যদি সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে এর সুস্পষ্ট অর্থ দাঁড়ায় মোগল শাহজাদা খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন।

আজকালকার লিবারেল বুদ্ধিজীবীরা দারা শিকোহকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় শহিদ এবং মানব-বন্ধুত্বের নকিব বলে থাকেন। অথচ বিপরীতে হররোজ আলমগিরের চরিত্র হরণ করা হচ্ছে। এর কারণ কেবল এটাই যে, দারা শিকোহ ইসলামি শরিয়তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ছিলেন। আর আওরঙ্গজেব ছিলেন তার সংরক্ষক। আলমগিরের এই মুমিনসুলভ কর্মকাণ্ডের কারণে তার সময়েও মিশনারিদের কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকে। কিন্তু আলমগিরের পর তারা আবারও ঘুরে দাঁড়ায়।

৪.৪.৮: এক নজরে মিশনারিদের ভাবনা এবং চিন্তাধারা

মিশনারির সদস্যরা ইসলাম এবং ইসলামের নবী (আলাইহিস সালাম) সম্বন্ধে অত্যন্ত জঘন্য, বিষাক্ত ও অবাস্তব মানসিকতা লালন করে। যদিও বোকাসোকা রূপ ধারণ করে এরা সাদাসিধা মুসলমানদের সাথে অমায়িক একটা আচরণ বজায় রাখতো; কিন্তু তাদের অভ্যন্তর মুসলমানদের প্রতি কেবল ঘৃণাতেই পূর্ণ ছিল। তাদের জানা ছিল যে, মুসলমানেরা হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সম্মান লালন করে। এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করাকে তারা নিজেদের ঈমানের অপরিহার্য অংশ মনে করে। তা সত্ত্বেও তারা ইসলাম সম্বন্ধে চূড়ান্ত ঘৃণা পোষণ করত। তাদের ঘৃণার পরিমাণ অনুমানের জন্য সেই সময়কার প্রখ্যাত ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবী ডক্টর বার্নেইরের ভ্রমণকাহিনির আরও একটি অংশে নজর বোলানো যাক। তিনি হিন্দুস্থানে মিশনারিদের জয়যাত্রা এবং ইসলাম সম্বন্ধে নিজের ভাবনা প্রকাশ করে লেখেন :

> "১০ বছরেও কোনো একজন মুসলমান খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হবে কি না—বিষয়টি নিশ্চিত নয়; যথেষ্ট সন্দেপূর্ণ। কিন্তু তারপরও ইংল্যান্ডের খ্রিষ্টানদের এটা কর্তব্য যে, তারা মিশনারিদের সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করে যাবে। এই কাজ প্রতিটি খ্রিষ্টান দেশের উপর আবশ্যক। কিন্তু কোনো ধরনের অনর্থক ও ভিত্তিহীন কথা কানে নিয়ে এমন চিন্তা করে ওঠা ঠিক হবে না যে, ধর্মান্তরের কাজ কোনো অনায়াস কাজ। কেননা (আল্লাহ পানাহ) মুহাম্মদের বাতিল ধর্ম এমন যে, আমাদের ধর্ম তার অনুসারীদের যেসব কাজে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে থাকে মুহাম্মদের ধর্মে তা পুরোপুরি বৈধ। এ ধর্ম তার অনুসারীদের মনমানসিকতা এমনভাবে দখল করে নিয়েছে যে, আমরা তার অনুমানও করতে পারবো না। এই ধর্ম রক্তপাত এবং ধ্বংসযজ্ঞের সমষ্টি। এ ধর্ম

তরবারির জোরে প্রতিষ্ঠিত। এবং এখন পর্যন্ত প্রাচীন সেই বর্বরতা, অবিচার ও অনাচারের সাথেই টিকে আছে। তার এই বিষমাখা ও ধ্বংসাত্মক জয়যাত্রা থামিয়ে দেবার লক্ষ্যে খ্রিষ্টানদের সেই জোশ ও চেতনার সাথে অগ্রসর হতে হবে, যা আমি বিবৃত করেছি।"

৪.৪.৯: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলদারির পর মিশনারির প্রসার

মোগল সাম্রাজ্যের পতন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থানের সাথে সাথে মিশনারিদের কাজের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। তাদের বিভিন্ন মিশন এবং ধর্মপ্রচারকদল বিচরণ করতে থাকে দুনিয়াজুড়ে। সেই সময়ের মিশনারি ধর্মপ্রচারকদের ইউরোপে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হতো। ডক্টর বার্নেইর সেই মিশনারিদের প্রশংসা করে তার ভ্রমণকাহিনিতে লেখেন :

"এই কাজের জন্য যারা এই বিরাট দেশে এসেছেন, অবশ্যই তারা প্রশংসার দাবিদার।"

১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে 'ওয়েস্টার্ন ফরেন মিশনে'র প্রতিনিধি জন লরে পাঞ্জাবের শিখ-রাজা রঞ্জিত সিংয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে পাঞ্জাবে ধর্মপ্রচারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। রণজিৎ সিং এই চিন্তা করে অনুমতি দিয়ে দেন যে, মুসলমানদের খ্রিষ্টান হবার মাধ্যমে পাঞ্জাবে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমে আসবে। ফলে সংখ্যালঘু শিখ সম্প্রদায় হয়ে উঠবে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে চার্চ অব স্কটল্যান্ড পাঞ্জাবে কাজ শুরু করে। এবং শিয়ালকোটকে নিজের কেন্দ্র বানায়। ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকান পাদরিও সেই 'কল্যাণকর' কাজে অংশ নেয়। চার্চ অব আমেরিকা পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী শহর লুধিয়ানায় নিজেদের গির্জা স্থাপন করে। ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে 'চার্চ মিশনারি সোসাইটি' নামে একটি সংগঠনও পোক্ত কার্যক্রম শুরু করে।

অধিকাংশ মিশনারি সংস্থা পাঞ্জাবেই তাদের কেন্দ্র বানায়। কেননা এখান থেকে একইসাথে দিল্লি, ইউপিসহ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো, বিশেষ করে সিন্ধু ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রভাব বিস্তার করা ছিল সহজ।

সেইকালে পাদরিদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, তারা প্রকাশ্যে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে ত্রিত্ববাদের দাওয়াত দিত এবং মুনাজারা ও বিতর্কের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিত। ব্রিটেনের হাউজ অব কমন্সের এক সদস্য 'ম্যাগলেস' বলেন, প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য হিন্দুস্থানকে খ্রিষ্টরাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার মহান (!) কাজে নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করা।[৮৯]

পাদরিদের যন্ত্রণাদায়ক ও উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড এবং ইংরেজ অফিসারদের সীমালঙ্ঘনের প্রতিবাদে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে আজাদি আন্দোলনের ঢেউ উথলে ওঠে। অবশ্য সেই আন্দোলনের ব্যর্থতার পর নামসর্বস্ব মোগল সাম্রাজ্যেরও বিনাশ ঘটে যায়। এবং দিল্লিসহ সমগ্র উপমহাদেশ ইংরেজের সামনে পদানত হয়ে পড়ে।

[৮৯] পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ মিশন, পৃষ্ঠা : ২৯৪

খ্রিষ্টান পাদরিরা এখন লাগামহীন, স্বাধীন। এ পর্যায়ে তারা প্রকাশ্যেই মুসলমানদের খ্রিষ্টান বানাবার কাজে লেগে পড়ে। এই মিশনের পূর্ণতাপ্রদানের লক্ষ্যে হিন্দুস্থানজুড়ে খ্রিষ্টবাদের প্রচারকার্য শুরু হয়ে যায়। এর আগে প্রচারের কাজ এত বিন্যস্তরূপে ছিল না। কিন্তু এখন তাদের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন-দিন কেবল বাড়তেই থাকে। এবং ব্রিটিশ সরকারও যথারীতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যেতে থাকে।

মোগল সাম্রাজ্যের বিনাশের পর লর্ড লরেন্স (হিন্দুস্থানের ভাইসরয়, ১৮৬৬-১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছিলেন, 'খ্রিষ্টবাদকে আমরা হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে দেব। আমাদের ক্ষমতার স্থায়িত্বের জন্য এর চাইতে বড় কোনো মাধ্যম হতে পারে না।'

সেইকালে মুসলিম নবাবদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বড় বড় জায়গির খ্রিষ্টান মিশনারিদের দিয়ে দেওয়া হয়। এবং খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণকারীদের সরকারি নানা সুবিধা দেওয়া হতে থাকে। এমনকি তাদের সুরক্ষারও পরিপূর্ণ বন্দোবস্ত করা হয়।

৪.৪.১০: আলেমদের প্রতিরোধমূলক প্রচেষ্টা

খ্রিষ্টীয় উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের শুরুর দিকে মিশনারিদের কার্যক্রম সারা হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং পাদরিরা একের পর এক বড় বড় মুনাজারা-বিতর্কের আয়োজন করে চলছিল। তা সত্ত্বেও মুসলিম আলেমগণ সাধ্যমতো তাদের প্রতিরোধ করে যাচ্ছিলেন। মিশনারি আক্রমণের এই ভয়াবহতার কালে শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবী, মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানবী, মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী এবং মাওলানা আলী মুঙ্গেরী রহিমাহুমুল্লাহ কঠিন কুরবানি ও আত্মত্যাগ প্রদর্শন করেন। এবং খ্রিষ্টবাদের বিপক্ষে সর্বাত্মক প্রয়াস-প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রেখে পাদরিদের কুযুক্তি ও ভ্রান্ত দলিল-প্রমাণের যথার্থ জবাব দেন।

নানুতুবী রহিমাহুল্লাহর শাগরিদ মাওলানা আবুল মানসুর এবং হজরত গাঙ্গুহি রহিমাহুল্লাহর শাগরিদ মাওলানা শারফুল হক ও বিভিন্ন স্থানে পাদরিদের মুনাজারায় পরাজিত করেন।

৪.৪.১১: খ্রিষ্টান গির্জা এবং তাদের জমিদারি

খ্রিষ্টানরা সেই আমলে বিভিন্ন স্থানে আলিশান চার্চ নির্মাণ করে। তার মধ্যে পাকিস্তানে অবস্থিত কিছু চার্চ হলো :

-সেন্ট জেমস চার্চ, গর্ডন মেমোরিয়াল চার্চ, সেন্ট মেরি চার্চ (লাহোর)
-সেন্ট জন চার্চ (ঝিলাম)
-হলি ত্রিনিটি চার্চ (শিয়ালকোট)
-ক্রাইস্ট চার্চ, সেন্ট পল চার্চ, সেইন্ট ইন্ড্রিউজ চার্চ (রাওয়ালপিন্ডি)
-হলি ট্রিনিটি চার্চ, (মুরি)
-সেইন্ট লুকা চার্চ (অ্যাবোটাবাদ)
-সেইন্ট পিটার্স চার্চ, অল সেইন্টস (অটক)

-ক্রাইস্ট চার্চ, (নওশেরা)
-সেইন্ট আলবানিজ চার্চ, (মার্দান)
-সেইন্ট জন চার্চ, ক্রাইস্ট চার্চ (পেশোয়ার)
-সেইন্ট জন চার্চ (বানু)

ব্রিটিশ সরকার এই সময়টাতে বিভিন্ন চার্চ ও মিশনারি সংস্থার জন্য মন খুলে জায়গির প্রদান করে। প্রতিটি জায়গির মিশনারির নামে আবাদ করা হয়। আর এভাবেই খ্রিষ্টানদের স্বতন্ত্র কলোনি গড়ে উঠতে থাকে।

কসুরি জেলায় আড়াই হাজার একর জমি নিয়ে ক্লার্ক-আবাদ (সোসাইটি) গড়ে তোলা হয়েছে। মুলতানে এক হাজার একর জমির উপর সেইন্টস-আবাদ (বসতি) গড়ে উঠেছে, যেগুলোর তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মেথোডিস্ট চার্চকে।

খানওয়ালের কাছাকাছি দুই হাজার একর জমি স্যালভেশন আর্মিকে দেওয়া হয়েছে। তারা সেখানে শান্তিনগর সোসাইটি গড়ে তুলেছে। শিয়ালকোটে গড়ে তোলা হয়েছে মিশনারিদের বসতি ইয়াংসন।

সাহিওয়ালে প্রেসবাইটেরিয়ান গ্রুপকে রোন্সনাবাদ এবং অ্যাসোসিয়েটেট প্রেসবাইটেরিয়ানকে হ্যামিলটনাবাদ-এর জায়গির দেওয়া হয়েছে। শেখোপুরাতে মার্টিনাবাদের জায়গিরকে ইউনাইড প্রেসবাইটেরিয়ানের তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুখুকেতে মারয়ামাবাদ নামে একটি খ্রিষ্টানপল্লি গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন জেলায় একাধিক মহল্লা খাস করে দেওয়া হয়েছে কেবল মিশনারিদের জন্য।

কেবল উপমহাদেশেই নয়; বরং যেই দেশেই ব্রিটিশ, ফরাসি এবং ইটালিয়ান সাম্রাজ্যবাদ থাবা বিস্তার করেছে, সেখানেই খ্রিষ্টান মিশনারি এভাবে ধর্মপ্রচারের কাজ চালু রেখেছিল। এবং তাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টার প্রাথমিক ফল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হতে আরম্ভ করে, যার প্রথম ঢেউয়ের আঘাতে মুসলমান তার নিজের দীনধর্ম থেকে পেছনে সরে যেতে থাকে। পাদরি ফিলিপ, যিনি মিশরে মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সুবিন্যস্ত একটি শিক্ষাকারিকুলাম তৈরি করেছিলেন, এক প্রবন্ধে লিখেছেন :

> "এই শ্রেণির তরুণদের একটি বড় অংশ সংশয়বাদী এবং নাস্তিক ও প্রকৃতিবাদী হয়ে উঠেছে, যারা নবী মুহাম্মদের স্থানে স্পেনসারের (Herbert Spencer) অনুসরণ করছে। সমগ্র মুসলিমজাতির মধ্যে (বর্তমানে) তাদের সংখ্যা প্রায় দুই থেকে তিন হাজার। আর সংখ্যাটি একেবারেই কম নয়।"

৪.৪.১২: কিছু উদ্যমী খ্রিষ্টান মিশন

উপমহাদেশে কর্মব্যস্ত মিশনারির সংখ্যা ছিল অনেক। তার মধ্য থেকে অল্পকিছুর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

প্রেসবাইটেরিয়ান গ্রুপ : এটি বহু পুরোনো মিশনারি গ্রুপ। এর প্রতিষ্ঠাতা জন নক্স (Jhon Knox) ছিলেন রোমান ক্যাথলিক পাদরি। তার জন্ম ১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দে।

পাঞ্জাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর এই মিশন লাহোরে তাদের কেন্দ্র স্থাপন করে। তার প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় সাবেক রাজপ্রাসাদ রংমহলে। এই চার্চের ব্যবস্থাপনায় শাসকপক্ষ এবং চার্চ—উভয়েই অংশ নেয়। যার ফলে সাধারণ মানুষের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। শাসককে সেবক এবং শাসিতকে সেবিত মনে করা হয়। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে রাওয়ালপিন্ডি এবং মুরির অঞ্চল এই মিশনের অধীন করে দেওয়া হয়। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই মিশনের প্রচারকেরা ১৯ হাজার মানুষকে ব্যাপ্টাইজ করে ফেলতে সমর্থ হয়। যার মধ্য থেকে ১২ হাজার অর্থাৎ তেষট্টি-শতাংশ মানুষই ছিল কসুর জেলার অধিবাসী।

দি অ্যাসোসিয়েট রিফর্মড প্রেসবাইটেরিয়ান চার্চ (এআরপি) : এই মিশনারি সংস্থার বিশেষ মনোযোগ থাকে ধোঁকা ও প্রতারণার দিকে। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এরা ৪১ হাজারেরও অধিক মানুষকে ধর্মান্তরিত করে ফেলে। বর্তমান সময়ে তারা পাকিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেশ জোরেশোরে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

স্যালভেশন আর্মি বা মুক্তিবাহিনী : স্যালভেশন আর্মি ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাবে তাদের কার্যক্রম আরম্ভ করে। জংয়ে এর হেডকোয়ার্টার অবস্থিত। এই মিশনের প্রধান টার্গেট গরিব ও নিঃস্ব-দুঃস্থ শ্রেণির মানুষজন। চুড়ে (Chuhr) ধর্মপ্রচারের কাজ করে বহুলোককে তারা ব্যাপ্টাইজ করতে সমর্থ হয়েছে। এই চুড়-ই বর্তমানে পাকিস্তানে খ্রিষ্টানদের প্রধান ও প্রভাবশালী অংশ। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাদের শান্তিনগরের (খানওয়ালের সন্নিকটে) জায়গির দিয়ে মিশনারি কার্যক্রমের সুযোগ আরও অবারিত করে দেয়। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে এই গ্রুপের জনসংখ্যা ৩১ হাজারেরও অধিক ছিল।

স্যাভিলেশন আর্মির প্রচারকেরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বর্তমান খ্রিষ্টধর্মের সাথে মতানৈক্য করে থাকে। এবং প্রাচীন খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস লালন করে। তাদের আকিদা হলো, একসময় খোদা সম্পূর্ণ একা ছিলেন আর ঈসা মাসিহ হলেন খোদার প্রথম সৃষ্টি। দুনিয়ার অবশিষ্ট জিনিস তৈরি করবার ক্ষেত্রে তিনি খোদার সহকারীর ভূমিকা পালন করেন। তাদের মতে, মারয়ামকে খোদার মা বলা অত্যন্ত বেয়াদবি ও ধৃষ্টতামূলক কথা। এটুকু বাদ দিলে তাদের অধিকাংশ আকিদা-বিশ্বাস সাধারণ খ্রিষ্টানদের মতোই কুফুরিধর্মী।

দি আফগান বর্ডার ক্রুসেড (এবিসি) : পাঠানদের মধ্যে খ্রিষ্টবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সবচাইতে বেশি। পাঠানদের ধর্মীয় মূল্যবোধের বিবেচনা করলে এই কাজ ছিল খুবই কঠিন। কিন্তু এই দলের মিশনারিরা হাল ছাড়েনি। তাদের প্রচেষ্টায় অল্পকয়েক বছরের মধ্যেই ইতিহাসে প্রথম পাঠান খ্রিষ্টানদের আবির্ভাব ঘটে, যারা ৬৬ গোত্রভুক্ত বংশধরকে খ্রিষ্টবাদের দিকে আহ্বান করে। যার মধ্যে অধিক সংখ্যকের বসবাস ছিল মুর্দানে। এই খ্রিষ্টান গোত্রটি ছোট; কিন্তু যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল।

এয়ারফোর্সের অধিকাংশ খ্রিষ্টান অফিসারই এই গোত্রের। মনে রাখা দরকার, সর্বপ্রথম ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের এক পাঠান খ্রিষ্টানদের ফাঁদে পড়ে। তাকে প্রভাবিত করেছিল একজন নারী মিশনারি (নার্স)।

দি ইভেঞ্জেলিক্যাল অ্যালায়েন্স মিশন : দি ইভেঞ্জেলিক্যাল অ্যালায়েন্স মিশনের পূর্ব নাম স্ক্যান্ডেভিয়ান অ্যালায়েন্স মিশন। এই মিশনটি ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে আসে। তারা পাঞ্জাব এবং সীমান্তবর্তী এলাকাকে (বেলুচিস্তান) তাদের প্রধান লক্ষ্য বানায়। হারারা জেলায় তারা বিপুল কার্যক্রম পরিচালনা করে। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তারা ক্যাম্বেলপুর (অটক) এবং অ্যাবোটাবাদের বিভিন্ন এলাকায়ও কাজ শুরু করে। এই দল পাকিস্তানে ভবিষ্যৎ খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দ তৈরির পেছনে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছিল। তাদের সদস্যরা হিন্দকু ভাষায় (হাজারা জেলা এবং অ্যাবোটাবাদের স্থানীয় ভাষা) বেশ পারদর্শিতা লাভ করে।

এই মিশনের কর্মীরা অ্যাবোটাবাদ এবং কালান্দারাবাদের হাসপাতালগুলোতে পাঠকক্ষ এবং লাইব্রেরি গড়ে তোলে, যেখানে খ্রিষ্টীয় সাহিত্য ও লেখাজোখা সরবরাহ করা হতো। তক্ষশীলা এবং কালান্দারের মিশন হসপিটাল তাদের বিশেষ কেন্দ্র। এইসব হাসপাতালে পরিচালিত তাদের মিশনারি কার্যক্রমগুলো বেশ আকর্ষণীয়।

দি ইন্ডিজ ক্রিশ্চিয়ান ফেলোশিপ : এই মিশন ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে কার্যক্রমের সূচনা করে। তাদের কার্যক্রম আপার সিন্ধু এবং তার পশ্চিমাঞ্চলে ছেয়ে গেছে। তারা বিভিন্ন মেলা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং বুজুর্গ ব্যক্তিদের বাৎসরিক সভা-মাহফিল ইত্যাদিতে অংশ নিয়ে লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের নিজেদের দিকে আগ্রহী করে তোলে। এই মিশন হাতে-কলমে বাইবেল কোর্স চালু করেছে, যার মাধ্যমে ঘরে বসেই লোকেদের খ্রিষ্টবাদের দীক্ষা দেওয়া যেতে পারে। তাদের অধিকাংশ মিশনারি সিন্ধুকে প্রথম ভাষার মর্যাদা দিয়েছে আর অন্যরা প্রথম ভাষা হিসেবে রপ্ত করেছে উরদুকে। পাক-ভারত উপমহাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তাদের প্রধান টার্গেট।

১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত অজস্র মারোয়াড়ি তাদের জালে ফেঁসে যায়। ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে তাদের প্রচেষ্টার ফলে বিরাট সংখ্যক ভারতীয় নাগরিক খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে নেয়। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে তারা শিকারপুরে ক্রিশ্চিয়ান হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করে, যা সিন্ধে খ্রিষ্টবাদ প্রচারের বড় কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

দি পাকিস্তান মিশন অব ইন্টারন্যাশনাল ফরেন মিশনস অ্যাসোসিয়েশন : এই মিশন ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে পাকিস্তানে আসে। তারা মুজাফফরগড় এবং ডেরা গাজিখানের বিভিন্ন জেলায় ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব আনজাম দেয়। এবং এই পর্যন্ত অজস্র মানুষকে তারা মুরতাদ বানিয়ে ফেলেছে।

দি পাকিস্তান ক্রিশ্চিয়ান ফেলোশিপ অব দি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিশ্চিয়ান ফেলোশিপ : এই মিশনটি ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে রহীম ইয়ারখান এবং ভাওয়ালপুরকে টার্গেট বানিয়ে

নিজেদের কার্যক্রমের সূচনা করে। মিশনের পূর্বনাম দি সেইলন অ্যান্ড ইন্ডিয়া জেনারেল মিশন। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তাদের প্রচারকেরা ভেলুতে ধর্মপ্রচারের কাজ করছে। এবং এখন পর্যন্ত অসংখ্য মানুষকে তারা ব্যাপ্টাইজ করতে সমর্থ হয়েছে।

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এউইনজে লাইজেশন ক্রুসেড : এই মিশনের কার্যক্রম চলে বর্ডার, কাশ্মির এবং আপার পাঞ্জাবে। এদের প্রধান কাজ শিক্ষা নিয়ে। এরা অ্যাবোটাবাদ এবং মুজফফরাবাদে বহু মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। অ্যাবোটাবাদে তাদের প্রতিষ্ঠিত বাচ্চাদের একটি হোস্টেলও আছে। পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উঁচুমানের শিক্ষার লোভে নিজেদের বাচ্চাদের এইসব স্কুলে ভর্তি করিয়ে মূলত তাদের ঈমানই ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে।

দি চার্চ অব ক্রাইস্ট : এই মিশনের প্রধান কার্যক্রম সম্প্রচার নিয়ে। এরা পাকিস্তানের সীমান্তের কাছাকাছি আরবসাগরের দ্বীপ সেশেলজে নিজেদের মিশনারি রেডিওস্টেশন স্থাপন করে রেখেছে। যার শক্তিশালী রেডিও ট্রান্সমিটারের সম্প্রচার সমস্ত পাকিস্তানসহ একাধিক দেশ থেকে শোনা যায়। উরদু এবং ইংরেজি ছাড়াও পৃথিবীর ২৪টি ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার হয়। প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা উরদু, ইংরেজি, পাঞ্জাবি, পশতু এবং ফারসি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। খ্রিষ্টবাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় পাকিস্তানের পাঁচটি ভাষায়। সমস্ত স্থানীয় ভাষায় খ্রিষ্টবাদের প্রচার এবং দীক্ষাসংবলিত আকর্ষণীয় রেডিও অনুষ্ঠান উপস্থাপন করা হয়। রেডিওস্টেশনের একটি ব্যবস্থাপনা কার্যালয় ইসলামাবাদে অবস্থিত। সেখান থেকে নিজেদের রেডিওপ্রোগ্রামের জন্য লিখিত অজস্র কপি বিলি-বণ্টন করা হয়ে থাকে।

দি পেন্টিকোস্টাল চার্চ : ইউনাইটেড পেন্টিকোস্টাল চার্চ ইন পাকিস্তান—এটাও একটা মিশনারি গ্রুপ। এদের চার্চে কেবল ঈসা মাসিহের নামেই ব্যাপ্টাইজ করা হয়।

উল্লিখিত চার্চগুলো ছাড়া আরও কয়েকটি মিশনারি সংস্থা বাইরে থেকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এমন সংস্থার সংখ্যা প্রায় তিন ডজন। তাদের সম্পর্ক ব্রিটেন, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ইটালি এবং স্কটল্যান্ডের সাথে। তাদের কেন্দ্রীয় দফতর পাকিস্তানের বাইরে। মিশনারিরা নিজেদের ধর্মীয় প্রচারণা-সুবিধার জন্য পাকিস্তানকে নিম্নযুক্ত পাঁচটি অংশে ভাগ করে নিয়েছে :

১. করাচি ডায়োসিস।[৯০]
২. হায়াদারাবাদ ডায়োসিস।
৩. মুলতান ডায়োসিস।
৪. লাহোর ডায়োসিস।
৫. রাওয়ালপিন্ডি ডায়োসিস।

---

[৯০] Diocese: বিশপের এলাকা। -অনুবাদক

চারটি প্রদেশেরই বিভিন্ন শহরে মিশনারিরা তাদের হাতে-কলমে বাইবেল কোর্সের কার্যক্রম চালু রেখেছে। বৃহৎ পরিসরে খ্রিষ্টীয় লিটারেচার বিলি-বণ্টন করা হয়ে থাকে। করাচি থেকে মুরি পর্যন্ত এসটিডি সেন্টার এবং লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গরমের ছুটিতে মুরির বাইবেল স্কুলের তত্ত্বাবধানে একটি সামার ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। মুসলমান যুবকদের দাওয়াত দেওয়া হয়, যেন তারা একটিবারের জন্য হলেও কাছে থেকে বাইবেল অনুযায়ী যাপিত জীবন দেখে। এই সামার ক্যাম্পে আনন্দ উদযাপন ও বন্ধুত্বের নামে তরুণসমাজকে খ্রিষ্টবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলার প্রয়াস চালানো হয়।

বছরকয়েক পূর্বের আদমশুমারি অনুযায়ী পাকিস্তানে মিশনারিদের ২৪টি সাধারণ বিদ্যালয়, ১৩টি কারিগরি বিদ্যালয়, ৩২টি ছেলেদের এবং ৩০টি মেয়েদের হোস্টেল, ৩৫টি লাইব্রেরি, ১৮টি সম্প্রচার ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, ১৮টি পত্রিকা, ৩৬টি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ৫৪টি আঞ্জুমান এবং ৩৭টি ক্লাব বিদ্যমান। সারা দেশে ১৭টি মিশনারি হাসপাতাল কাজ করছে। অধিকাংশ মিশনারি প্রতিষ্ঠানকেই পাকিস্তান সরকার শুল্ক ও ট্যাক্সের আওতার বাইরে রেখেছে।

৪.৪.১৩: মিশনারিদের সক্রিয়তার ফল

একসময় মিশনারি কার্যক্রমের ফল সামনে আসতে শুরু করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় এখানে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ হাজার। খ্রিষ্টীয় জনবসতি আমাদের জনবসতির তুলনায় মাত্র দেড়-শতাংশ (১.৫৬%) বেশি ছিল। কিন্তু এর মাত্র বছরকয়েক পর ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের প্রথম আদমশুমারির সময় খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা হয় ৪ লাখ ৩৪ হাজার।

১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারিতে তাদের জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩ লাখ ১০ হাজার ৪২৬। সেই হিসেবে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা প্রতিবছর ২০২% হারে বৃদ্ধি লাভ করে। যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ১৫৯ ভাগ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথমদিকে পাক-ভারতের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর খ্রিষ্টান জনবসতিগুলোতে অভাবনীয় বৃদ্ধি ঘটে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের পর বেলুচিস্তান এবং সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে মিশনারি তৎপরতায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল। ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কেবল ১০ বছরেই সীমান্তপ্রদেশে খ্রিষ্টান জনসংখ্যা ১২ হাজার থেকে সাড়ে ৪৮ হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়।

একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার, যেসব এলাকায় খ্রিষ্টবাদের প্রচার জোরেশোরে করা হয়েছে, সেখানে একটা সময় পর রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হতে দেখা গেছে, যার প্রভাব মুসলমানদের জন্য যন্ত্রণাদায়কই হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার পূর্বতিমুরের অবস্থা আমরা দেখেছি। কীভাবে ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে সেখানে খ্রিষ্টানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তারপর মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করে

জাতিসংঘের তদারকিতে পূর্বতিমুরকে স্বতন্ত্র দেশের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ঢাকা ভাগের অভিজ্ঞতা তো আমাদের সামনেই রয়েছে।

পাকিস্তানের সবচাইতে বড় শহর করাচিতে প্রকাশ্যে খ্রিষ্টবাদের প্রচার করা হয়ে থাকে। প্রতিবছর অক্টোবর মাসে ওয়াইএমসিএ গ্রাউন্ডে মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করে। সারা দেশ থেকে নিঃস্ব, ব্যাধিগ্রস্ত এবং বিপদগ্রস্ত লোকদের এখানে সমবেত করা হয়। এবং একটি ফরম পূরণ করিয়ে সারা বছর অনবরত তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। মিশনারিরা সময়ে-অসময়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকে। এবং তাদের অবহিত করতে থাকে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের মুজেজা সম্বন্ধে। প্রভাবিত লোকদের পরবর্তী বছরের সম্মেলনে আসার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়। এবং বলা হয়, মেডিকেল ক্যাম্পে খোঁড়া, অন্ধ এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকেরা সুস্থতা লাভ করে। আপনারা আমাদের ধর্ম গ্রহণ না করুন। সমস্যা নেই। কিন্তু ঈসার মুজেজা স্বচক্ষে দেখে নিতে ক্ষতি কী?

এই সমাবেশে অভিনেতা ভাড়া করে তাদেরকে অন্ধ, খোড়া ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে সাজিয়ে আনা হয়। বড় পাদরির দোয়ার পর এই অভিনেতারা সুস্থতা লাভের অভিনয় করে সমাবেশের সবাইকে অবাক করে দেয়। এভাবে বহু মানুষ খ্রিষ্টবাদের জালে ফেঁসে গিয়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে নিতে একপ্রকার বাধ্য হয়।

৪.৪.১৪: মুসলিম স্কলার জনাব আহমাদ দিদাতের বিবৃতি

পাকিস্তানে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের এই গতি দেখে বিখ্যাত মুসলিম দাঈ মরহুম আহমাদ দিদাত বলেন :

> "পাকিস্তানের একাধিক শহরে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা লাখ পেরিয়ে গেছে। এবং পাঞ্জাবে বহু গ্রাম খ্রিষ্টান জনবসতিতে পরিণত হয়েছে। অথচ চিন্তাভাবনায় পাকিস্তান একটি মুসলিম দেশ। ধর্ম সম্বন্ধে বেপরোয়া হওয়ার কারণে পাকিস্তানের মুসলমানেরা ধর্মের সংরক্ষণ এবং তার প্রচার ও প্রসারের কাজে সঠিক অর্থে গুরুত্ব দিচ্ছে না। যার পরিণামে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের খ্রিষ্টানেরা মুসলমানদের মতন নাম রাখে। মুসলমানদের মতোই পোশাক পরিধান করে। আর এই সবই করা হচ্ছে পরিকল্পনা অনুযায়ী, যাতে অনায়াসেই ইসলামের ক্ষতি করে ওঠা যায়। খ্রিষ্টান আলেমদের চিন্তাধারাই ভিন্ন ধাঁচের। একজন সাধারণ খ্রিষ্টানও নিজের ধর্মের ব্যাপারে একনিষ্ঠ। এবং তার বিস্তৃতির লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে থাকে। কিন্তু মুসলমান তার সম্পূর্ণ বিপরীত।"[৯১]

৪.৪.১৫: অন্যান্য দেশে মিশনারি কার্যক্রমের উপর সামান্য আলোকপাত

কেবল পাকিস্তানই নয়; বরং সুদান, সোমালিয়া, মিয়ানমার, বাংলাদেশ, ফিলিপাইন, আফগানিস্তান, ইরাক, মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন দেশ এবং দারিদ্র্য-সমস্যা ও বিপদ-বিপর্যয়ে জর্জরিত দেশগুলোই মিশনারি কার্যক্রম পরিচালনার উর্বর ক্ষেত্র হয়ে দেখা দিচ্ছে।

---

[৯১] দৈনিক জঙ, করাচি, পৃষ্ঠা : ৫, ২৮ অক্টোবর ১৯৮৬ অব্দ

বাংলাদেশে মিশনারি কার্যক্রমের অবস্থা

বাংলাদেশ ইসলামি দুনিয়ার একটি পিছিয়ে থাকা দেশ; কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে দেশটি অনেক বড়। এই দেশের দারিদ্র্যকে কাজে লাগিয়ে এখানে প্রায় আশিটিরও অধিক মিশনারি সংস্থা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। হিন্দুস্থানে ফিরিঙ্গিদের প্রথম পদচারণা পড়েছিল বাঙাল অঞ্চলে। সেখানে মিশনারিদের কার্যক্রম তখন থেকেই চলে আসছে। কিন্তু বিগত ৪০ বছরে তাদের সেই কার্যক্রম শৃঙ্গের চূড়ায় পৌঁছে গেছে। এখানে চিকিৎসা সহায়তা, জনকল্যাণমূলক কাজ, মিশন হাসপাতাল এবং মিশন স্কুল ছাড়াও কিছু নতুন কৌশলও প্রয়োগ করা হচ্ছে। নিচে তার কিছু বিবরণ হাজির করা হলো :

কৃষিপ্রকল্প : এই প্রকল্পের অধীন মিশনারি প্রতিষ্ঠান কৃষি অঞ্চলে বড় বড় জমিন ক্রয় করে। এবং দুরবস্থাসম্পন্ন লোকদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের শর্তে চাষের জমি এবং গরু প্রদান করে।

আবাসনপ্রকল্প : এই প্রকল্পের অধীনে বাস্তুহারাদের, যাদের অধিকাংশই বন্যার কবলে পড়ে গৃহহীন, বসবাসের বাড়ি দিয়ে থাকে। পাশাপাশি তাদের কারিগরি ও হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ দিয়ে উপার্জনের ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে।

যিশুর ইসলাম এবং ঈসায়ী মুসলিম : কিছু কিছু অঞ্চলে লোকজনকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করবার লক্ষ্যে 'যিশুর ইসলাম' নামের এক নতুন ধারণার উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই হামলার লক্ষ্য সেই শ্রেণির লোকসকল, যারা ইসলামের উপর অবিচল থাকতে চান আবার মিশানরিদের কর্মকাণ্ডেও প্রভাবিত হয়ে পড়েন। এবং সেই সাথে তারা আর্থিক সহায়তারও মুখাপেক্ষী। মিশনারিরা তাদের ইসলাম এবং খ্রিষ্টধর্মের কমন বা বাহ্য সামঞ্জস্যশীল বিষয়গুলো মিলিয়ে প্রস্তুতকৃত একটি নতুন ধর্ম গেলাচ্ছে, যার নাম তারা দিয়েছে 'যিশুর ইসলাম'। এই ধর্ম গ্রহণকারীদের 'ঈসায়ী মুসলিম' বলা হয়। তাদের বলা হয় যে, তোমরা ইসলামের উপর অবিচল থাকো। কিন্তু তাকে ইনজিল শরিফে অনুসন্ধান করো। তাদের কুরআন কারিমের বদলে কেবল বাইবেলের বাংলা অনুবাদ পাঠ করবার প্ররোচনা দেওয়া হয়ে থাকে।

তাদের চার্চগুলোতে থাকে মসজিদের মতন মিম্বার। তাদের উপাসনা হয় প্রতি শুক্রবার জোহরের পর। উপাসনার পূর্বে ইসলামি পদ্ধতি অনুসারে অজু করা হয়। উপাসনা দুই ভাগে বিভক্ত করে পালিত হয়ে থাকে। প্রথম অংশে ইমাম মিম্বারে বসে বাইবেল পাঠ করেন। এবং দ্বিতীয় অংশ প্রার্থনার। প্রার্থনা-অংশে মুসলমানদের মতোই হাত তোলা হয় এবং সেইভাবেই 'ইয়া আল্লাহ' বলে দোয়া করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রার্থনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলে যিশুর নাম নেওয়া হয়।

যুদ্ধের প্রশিক্ষণ : বাংলাদেশে চলমান মিশনারি কার্যক্রমের একটি ভয়াবহ দিক হলো, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পাহাড়ি অঞ্চলে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত লোকদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই প্রশিক্ষণ ইন্টারন্যাশনাল চার্চ কমিটির অধীন দেওয়া হচ্ছে। এইসব

যোদ্ধাকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং এমন সব যুদ্ধের সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হচ্ছে, যা ইসলামি বিশ্বের কোনো বাহিনীর কাছেও নেই। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এখানে সেই কৌশলই প্রয়োগ করা হচ্ছে, যে কৌশলে ইন্দোনেশিয়ায় পূর্বতিমুরকে স্বতন্ত্র খ্রিষ্টান রাজ্যে পরিণত করা হয়েছে। বরং এমন সম্ভাবনাও আছে যে, যেভাবে ফিলিপাইনকে মুসলিম এবং খ্রিষ্টান ফিলিপাইনে ভাগ করে ফেলা হয়েছে একইভাবে বাংলাদেশকেও দুটি বড় ভাগে ভাগ করে ফেলা হতে পারে।

আফ্রিকা : মিশনারিদের সবচেয়ে বড় কার্যক্ষেত্র

সবচাইতে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আফ্রিকাতে, যাকে বলা হয়ে থাকে মুসলিম মহাদেশ। কিন্তু মিশনারি সংস্থাগুলো ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে তাকে খ্রিষ্টান মহাদেশে পরিণত করবার লক্ষ্য নিয়ে অভাবনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। যদিও এখন পর্যন্ত তারা ওই মহাদেশকে পুরোপুরি খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ মহাদেশে রূপান্তরিত করে উঠতে পারেনি; কিন্তু কিছু দেশে তাদের সাফল্য দুশ্চিন্তাজাগানিয়া।

দুশ্চিন্তার কারণ অনুমান করা যেন সহজ হয় এজন্য বলছি, মালাবি (Malawi), যেখানে ৫০ বছর পূর্বে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ছেষট্টি-শতাংশ; বর্তমানে সেখানে মুসলিম জনবসতি মাত্র সতেরো-শতাংশ। মিশনারি এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে ৬০০ কূপ খনন করে স্থানীয় লোকদের জন্য পানির ব্যবস্থা করেছে। এবং ২০টি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে তাদের চিকিৎসাব্যবস্থা সহজলভ্য করে দিয়েছে। আর এসবের মধ্য দিয়ে তারা সমর্থ হয়েছে স্থানীয় লোকদের হৃদয় জয় করে নিতে।

বর্তমানে সেখানে ২০০টি গির্জা এবং ৫০টি মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছে। রোমের সাবেক পোপ এই ছোট্ট দেশটিতে সাতবার সফর করে সেখানকার মিশনারিদের উদ্দীপিত করে তুলেছেন। বিপরীতে কোনো মুসলিম দেশ কিংবা প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো বড় ব্যক্তি কখনোই সেখানে যাননি।

সোমালিয়াতে মিশনারিদের আধিক্যের কারণে কেবল রাজধানী মোগাদিসুতে (Mogadishu) চারটি বড় গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও শহরের অধিবাসীদের মধ্যে খ্রিষ্টান এক-শতাংশও নয়। আফ্রিকার ছোট ছোট দেশের স্থানীয় ভাষায় রেডিও-টিভিতে মিশনারিদের প্রোগ্রাম সম্প্রচার করা হচ্ছে। এবং লোকেরা নিজের দীন ও ঈমান সম্বন্ধে বেপরোয়া হয়ে উঠছে। প্রায় পঞ্চাশ-শতাংশ শিশুর লেখাপড়ার জন্য মিশনারি স্কুলই ভরসা। জাম্বিয়াতে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা পঁচিশ-শতাংশও নয়। কিন্তু সেখানকার সরকার নিজের দেশকে খ্রিষ্টান দেশ বলে উল্লেখ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

সুদানের রাজধানী খুরতুমে, যাকে ব্রিটেনের ইউনিয়ন জ্যাকের (Union Jack) ডিজাইন অনুসারে বানানো হয়েছে, স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান। কিন্তু শহরের নকশা দেখে মনে হয় এখানে খ্রিষ্টানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। নতুন এয়ারপোর্টের একদম কাছে এক লাখ বর্গমিটারের ভূমির উপর ক্যাথলিক চার্চ তৈরি করা হয়েছে।

আবাসিক এলাকাগুলোতে চার্চের সংখ্যা অত্যধিক। এমনকি পুরাতন এলাকাগুলোতে গির্জার সংখ্যা মসজিদকেও ছাড়িয়ে গেছে।

যেখানে সেখানে অল্পবয়সি বাচ্চাদের খ্রিষ্টীয় সাহিত্য বিক্রি করতে দেখা যায়, যার মধ্যে শিশুসাহিত্য এবং বাইবেলের বিবরণ অনুযায়ী নবী-রাসুলের কাহিনি ও বিভ্রান্ত চিন্তাচেতনা বিস্তারকারী বইপুস্তকও থাকে। আর এভাবে ইসলাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে শিশুমনে সন্দেহ-সংশয়ের বীজ বুনে দেওয়া হয়।

মিশনারিরা জনকল্যাণকর ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে আফ্রিকার লোকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। কেননা বাহ্যত তো তারা মুসলিম-সমাজে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি-সেবাই প্রদান করছে। আর এ তো অন্যায় কিছু নয়!

৪.৪.১৬: আমেরিকা এবং মিশনারি কার্যক্রম

বর্তমান পৃথিবীতে আমেরিকান মিশনারি সংস্থা সবচাইতে উদ্যমের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। প্রতিবছর তারা কেবল আফ্রিকাতেই খ্রিষ্টবাদের প্রচার ও প্রসারে প্রায় ৩ থেকে ৪ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করছে। এই অর্থ দিয়ে প্রতিবছর প্রায় ৭০ লাখ মিশনারিকে ধর্মপ্রচারের জন্য প্রস্তুত করা হয়। প্রায় ১৫ কোটি ইনজিল বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এই সময় পর্যন্ত ১ হাজার ৮৯৬টি রেডিওস্টেশন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে, খ্রিষ্টবাদের প্রচারের জন্য যেগুলো 'নিবেদিত'।

আমেরিকা বর্তমানে আফগানিস্তানেও জনহিতকর ও কল্যাণমূলক কাজের আড়ালে খ্রিষ্টবাদের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এবং অজস্র মিশনারি সদস্য এই কাজে লেগে রয়েছে। তাদের জালে ফেঁসে গিয়ে এই পর্যন্ত প্রায় এক লাখ মুসলমান ধর্মান্তরিত হয়ে পড়েছে।

তালেবানের সময়ে মিশনারিদের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিল। মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড—এটা আইন হিসেবে কার্যকর করা হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা আফগানিস্তানের নতুন আইনের মধ্যে জাতিসংঘের সনদ কার্যকর করেছে, যার ১৮ নম্বর দফার অধীন কোনো ব্যক্তিকে ধর্মের ভিত্তিতে কোনো প্রকার শাস্তি দেওয়া যাবে না। আর জাতিসংঘ সনদের এই ধারার নির্ভরতায় মিশনারিরা সম্পূর্ণ নির্ভাবনায় নিজেদের ধর্মপ্রচারের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এবং দুর্বল ঈমানের লোকদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করে চলেছে। কারজায়ি সরকারের মাধ্যমে আমেরিকা এই নয়া খ্রিষ্টানদের আফগানিস্তানে সংখ্যালঘু অধিকারও পাইয়ে দিয়েছে।

৪.৪.১৭: মিশনারি কার্যক্রমের তিনটি পর্ব

মিশনারিদের কার্যক্রম পরিচালনার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব রয়েছে। তা হলো :

১. মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস ও আমল দুর্বল করে দেওয়া।
২. মুসলমানদের ইসলামের বৃত্ত থেকে বের করে আনা।
৩. মুসলমানদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা।

মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস ও আমল দুর্বল করে দেওয়া : এই পর্বকে সফলতার শীর্ষে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে মিশনারি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একে অপরের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। এবং প্রতিটি সম্ভাব্য পন্থায় মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় আঘাত করবার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অশ্লীলতা, নগ্নতা, অনৈতিকতা এবং অন্যান্য চারিত্রিক ভ্রষ্টতামূলক কাজকর্মের বিস্তৃতি ঘটানো হচ্ছে, যাতে মুসলমান অনর্থক সব কাজেকর্মে ব্যাপৃত হয়ে নিজের দীন থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। এবং আত্মপরিচয় ভুলে কেবল নামসর্বস্ব মুসলিমে পরিণত হয়ে পড়ে। আর একথা কে না বোঝে, এরপর এমন নামসর্বস্ব মুসলমানকে দীন থেকে অপসারণ করে দেওয়া খুব কঠিন কাজ নয়!

গ্রেডেনার, যিনি মিশরের পাদরি ছিলেন, বিভিন্ন মুসলিম দেশে মিশনারি সংস্থাগুলোর এই প্রাথমিক প্রভাবের বিশ্লেষণ করে লিখেছেন :

"এটা সত্য যে, ধর্মান্তরের কাজ ধীরগতিতে এগোচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের চারিত্রিক, সামাজিক এবং জাতীয় জীবনে যে 'খ্রিষ্টীয় চিন্তাধারা' ব্যাপকতা লাভ করছে—তা মোটেই সামান্য বিষয় নয়। বিয়েশাদি, বহু বিবাহ, নারীশিক্ষা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা, জাতিগত সংহতি, পারস্পরিক সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে আমরা মুসলমানদের মুখ থেকে আজ খ্রিষ্টীয় চিন্তার বহিঃপ্রকাশ শুনতে পাই। এভাবে খ্রিষ্টবাদের দীক্ষার মাধ্যমে তাদের পরিবারকে প্রভাবিত করবার সুযোগ দেখা দিয়েছে। নিশ্চিতভাবেই এটা অনেক বড় অর্জন। যার ফলে শক্ত ভূমিতে ফাটল ও চিড় তৈরি হচ্ছে। এখন মুসলমানদের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হচ্ছে। অথচ এই কিছুকাল পূর্বেও তারা প্রতিরোধ করাটা নিষ্প্রয়োজন মনে করেছিল।"

মুসলমানকে ইসলামের বৃত্ত থেকে বের করে আনা : এই পর্বে মিশনারিরা মুসলমানদের মধ্যে নাস্তিকতা এবং বস্তুপূজার আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনা প্রসারিত করে দেয়। যার ফলে মুসলমান ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়। হতে পারে সে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে নেবে না, তার নাম মুসলমানের মতোই থাকবে; কিন্তু ভেতর থেকে সে নাস্তিক ও দীনহারা হয়ে পড়বে। ইসলামের প্রতি তাদের কোনো ধরনের আগ্রহ বা আকর্ষণ থাকবে না। এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের সমস্ত বাহিনী মিশনারিদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

মুসলমানদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা : দ্বিতীয় স্তরের পর একজন মুসলমান ও খ্রিষ্টানের মধ্যকার পার্থক্য খুব সামান্যই রয়ে যায়। একজন নামধারী মুসলমান সামান্য প্ররোচনা, আর্থিক সুবিধা এবং ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণহীনতার লোভে নিজের ধর্ম থেকে বের হয়ে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে পড়ে। আর এর মধ্য দিয়েই মিশনারিদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়ে যায়।

৪.৪.১৮: মিশনারি কার্যক্রমের মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ

এক শতাব্দীকাল পূর্বে মিশনারিরা অলিগলি ঘুরে ঘুরে ধর্মপ্রচারের কাজ করত। পাদরি প্রকাশ্যেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের বিতর্কের জন্য উসকানি দিত। কিন্তু বর্তমানে তারা অভিনব ও আধুনিক সব পন্থা গ্রহণ করেছে, যা আরও অধিক সফল ও প্রভাবক। মঞ্চে বিতর্কের পর্ব বহুপূর্বেই সমাপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। কারণ সেইসব বিতর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংঘটিত হতো মুসলিম আলেম ও খ্রিষ্টান পাদরিদের মধ্যে। আর মুখোমুখি বিতর্কে পাদরিদেরই পরাজয় ঘটতো। এ কারণে বেশ কাল ধরে তাদের টার্গেট কেবল জ্ঞান'শূন্য' মানুষ। তারা তাদের এমনসব ক্ষেত্র থেকে নিজেদের ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করে, সাধারণত আলেমদের পদচারণা যেখানে পড়ে না।

এই ধরনের কার্যক্রমের জন্য মিশনারিরা নানা ধরনের মাধ্যম ও উপকরণ ব্যবহার করে থাকে, যে সম্পর্কে আমাদের জানাশোনা থাকা জরুরি। নিচে এ ধরনের কিছু মাধ্যম ও উপকরণের উল্লেখ করা হচ্ছে, খ্রিষ্টবাদের প্রচার ও প্রসারে যার ব্যবহার হয়ে থাকে :

স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় : মিশনারিদের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার মিশনারি স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদিতার কালে রাওয়ালপিন্ডিতে গার্ডেন কলেজ, লাহোরে কানোন্ট স্কুল এবং এফসি কলেজ, শিয়ালকোটে মিশন স্কুল, মুরি কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মিশনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সূচনা ঘটেছিল। বর্তমানে প্রতিটি মুসলিম দেশের ছোট-বড় প্রতিটি শহরে মিশন স্কুল চালু আছে। মেধাবী মুসলিম সন্তানদের একটি বড় অংশের প্রতিপালন এইসব খ্রিষ্টান স্কুলই করে থাকে। মিশন স্কুলে খ্রিষ্টান বাচ্চাদের লেখাপড়া হয় বিনামূল্যে। বিপরীতে মুসলিম বাচ্চাদের থেকে মোটা অংকের ফিস গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও মিশন স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই হয়ে থাকে মুসলিম ঘরের। অন্যদিকে প্রযুক্তি মিশনারি বিদ্যালয়ে কেবল খ্রিষ্টান বাচ্চাদেরই সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে।

সচ্ছল মুসলিম ঘরানার লোকজন অত্যন্ত গর্বের সাথে নিজের সন্তানদের এসব স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। সেরা মানের শাস্ত্রীয় পাঠপ্রাপ্তির কারণে পরবর্তীকালে এরাই বড় বড় পদ লাভ করে। সিভিল অফিসার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং বিজ্ঞানী হয়ে ওঠে। কিন্তু শিক্ষাপর্বের এই সময়ের ভেতর তাদের অধিকাংশই দীন সম্পর্কে হয়ে পড়ে একেবারে বেপরোয়া।

মুসলিমবিশ্বে মিশনারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও রয়েছে তাদের সমচিন্তার কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়। যেমন : বৈরুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, কায়রোর আমেরিকান ইউনিভার্সিটি। আবার কিছু মিশন স্কুল বর্তমানে কলেজ ও ইউনিভার্সিটি স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এ ছাড়াও মুসলমানদের এমন কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা নিজেদের নাম 'উজ্জ্বল' করবার জন্য মিশনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে নেয়। তারা মিশনারিদের পছন্দমাফিক কারিকুলাম প্রণয়ন করে, যার

মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গোচরে কিংবা অগোচরে ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে থাকে এবং নিকটবর্তী হতে থাকে খ্রিষ্টবাদের; যদিও সে-সব প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা দেখানোর জন্য ইসলামি সাবজেক্টগুলো মুসলমান শিক্ষকের মাধ্যমে পড়ানো হয়ে থাকে। কিন্তু তারপরও শিক্ষাব্যবস্থা ও কারিকুলাম এমনভাবে সাজানো হয়ে থাকে যে, শিক্ষার্থীবৃন্দ দীনহীনতার প্রতি সেভাবেই প্রভাবিত হতে থাকে, মিশনারিরা যেমনটা কামনা করে।

প্রিন্ট মিডিয়া : মিশনারিদের অজস্র পত্রপত্রিকা জার্নাল-ম্যাগাজিন ইসলামি নামে প্রকাশিত হচ্ছে। যেমন 'আল-মাজাল্লাতুল ইসলামিয়্যা' এবং 'মুসলিম ওয়ার্ল্ড'। প্রতিবছর অসংখ্য বইপুস্তক প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বাচ্চাদের জন্য আলাদাভাবে রঙিন ছবিওয়ালা বই বের করা হয়। এইসব লেখাজোখা ও সাহিত্যসামগ্রী সাধারণত বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এসব বইপত্রের ভাষা হয়ে থাকে একেবারেই সরল ও সাবলীল। চিন্তাভাবনা যতদূর সম্ভব সহজ করে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ বইপত্রই ভরপুর থাকে ছবি এবং নানা ধরনের রঙিন চিত্রকর্মে। তাদের সকল লেখাজোখার কেন্দ্রীয় বিষয় মূলত একটাই—যিশু ছাড়া মুক্তি লাভ সম্ভব নয়।

শিশুদের জন্য লিখিত বইপত্রে এই চিন্তাই গল্পের আড়ালে তাদের মস্তিষ্কে ফুঁকে দেওয়া হয়। কিছু বইপত্র আবার প্রস্তুত করা হয় তর্কবিতর্ক ও বাহাস-মুনাজারার জন্য। মুসলমানদের সাথে কীভাবে কথাবার্তা বলতে হবে—এইসব তাতে শেখানো হয়। কিছু বইপত্রে প্রথমে এমন বিষয়ের আলাপ করা হয়ে থাকে, যেগুলো কুরআন কারিম ও ইনজিল সবখানেই সমানভাবে আছে। সেই সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় হাজির করবার পর ইসলামি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উপলব্ধিকে বিলুপ্ত করা এবং নিজেদের ব্যাখ্যা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার কাজ করা হয়ে থাকে। এই কাজ তখন অনায়াসেই সম্পাদন করা সম্ভব হয়ে যায়।

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া : মিশনারিদের অসংখ্য রেডিওস্টেশন, টেলিভিশন চ্যানেল এবং ওয়েবসাইট রয়েছে, যেগুলো কাজ করে থাকে ইসলামের নামে। রেডিওপ্রোগ্রাম তাদের অত্যন্ত প্রভাবশালী মাধ্যম। এই সকল সম্প্রচারের আন্দাজ ও ভঙ্গি খুবই আকর্ষণীয়। প্রকাশ্যেই ধর্ম পরিবর্তনের কথা বলা হয় না বটে; তবে ধর্মীয় পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব পুরোপুরি আড়াল করে দেওয়া হয়। এবং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক শিরোনামের মাধ্যমে আলাপচারিতা করা হয়ে থাকে। যেমন, তাদের কিছু চটকদার শিরোনাম :

'মুক্তির পথ অবলম্বন করুন।'

'যিশুর বরকতে আত্মিক এবং শারীরিক শুশ্রূষা লাভ করুন।'

'সমবেত দোয়া মাহফিলে অংশ নিন; আপনার বিপদ ও দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে।'

এইরূপ শিরোনাম শ্রোতা এবং দর্শকের হৃদয়-মন জয় করে নেয়। আর এ ধরনের অনুষ্ঠানও একজন মানুষকে প্রভাবিত করে ভীষণভাবে।

অ্যাকাডেমিক প্রতিনিধি : বিভিন্ন ইসলামি দেশের মেধাবী ও অগ্রসরমান শিক্ষার্থীদের ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক সেমিনারে আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। সেখানে তারা খ্রিষ্টান লেকচারারদের বক্তব্য শুনে বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ইসলামি দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও নিজেদের শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিদলকে বিদেশ সফরে পাঠিয়ে থাকে। সেইসব সফরে শিক্ষার্থীরা খ্রিষ্টান স্কলারদের থেকে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান নিয়ে মনস্তাত্ত্বিকভাবেই তাদের শাগরেদে পরিণত হয়ে পড়ে।

মিশন হাসপাতাল, স্বাস্থ্য ও জনসেবা : মিশনারিদের একটি সফল হাতিয়ার মিশন হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবা। মিশনারি সংস্থাগুলো বিভিন্ন শহরে হাসপাতাল এবং ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করে। গ্রামীণ এলাকায় ডিসপেন্সারি চালু করে। বিশেষ স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করে নারীদের জন্য। তাদের ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোকেদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করে থাকে।

রেডক্রসও তাদের একটি বড় কার্যকরী সহায়ক প্রতিষ্ঠান, যারা ক্রুসেডের প্রতীক বহন করে যুদ্ধকবলিত, দুর্ভিক্ষপিড়ীত মুসলিম দেশ এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই ধরনের মিশনারি সংস্থা বিভিন্ন রূপ ধরে চিকিৎসা ও কল্যাণকর সেবা আনজাম দিয়ে মানুষের হৃদয়ে পাকাপোক্ত জায়গা করে নেয়। আর তারপরই প্রবেশ করে সরাসরি খ্রিষ্টবাদের প্রতি আহ্বান-পর্বে।

জনৈক পাদরি লিখেছেন :

"অশিক্ষিত এবং গোঁড়া মুসলমানদের পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য চিকিৎসাসেবার চেয়ে ভালো ও শক্তিশালী দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই।"

মিশনারিদের পত্রিকা মাসিক 'মুসলিমবিশ্ব' মিশনকর্মীদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, "খ্রিষ্টান হাসপাতালগুলোতে খ্রিষ্টবাদের প্রচারের কাজটি উত্তম পন্থায় প্রকাশ্যেই হতে পারে। হাসপাতালে আসা অসুস্থ ব্যক্তি আমাদের বিশেষ অনুগত হয়ে থাকে, যাদের আমরা 'যথাযথ' হেদায়েত দিতে পারি। চিকিৎসাকর্মী মিশনারিদের কর্তব্য, তারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার অসুস্থ ব্যক্তিদের আমাদের হাসপাতালগুলোর প্রতি আকৃষ্ট করে তুলবে, যার মাধ্যমে আমরা লোকদের সাথে আরও পোক্ত সম্পর্ক তৈরি করে উঠতে পারবো।"

আরও জোর দিয়ে বলা হয় যে, চিকিৎসাকর্মী মিশনারিদের একমুহূর্তের জন্যও এই কথা বিস্মৃত হলে চলবে না, আমি প্রথমত একজন খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক তারপর চিকিৎসক। যে কারণে আমার সার্বক্ষণিক কর্তব্য মানুষের কাছে 'হক' তুলে ধরা।

পাদরি বেস্টপোস্ট বলেন :

"আমাদের বহুদিনের প্রত্যাশা, চিকিৎসাসেবাকে ধর্মপ্রচারের এজেন্সি হিসেবে ব্যবহার করা হোক। হাসপাতালগুলোতে নিয়মতান্ত্রিক পরিসেবা আরম্ভ হবে। খ্রিষ্টীয় সাহিত্যের পাঠ চলবে। অসুস্থের উপর ব্যক্তিগত 'মেহনত' হবে এবং সুস্থ হবার পর দাওয়াত নিয়ে যাওয়া হবে তার ঘর অবধি। স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমেই সন্দেহাতীতভাবে

মানুষের হৃদয় জয় করে নেওয়া সম্ভব। প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মী মিশনারির প্রধান কর্তব্য ঈসা মাসিহের সম্মানের প্রকাশ এবং তার বাদশাহির অগ্রগতি সাধন। এ কাজ অনেক বন্ধ দরজা খুলে দেয়। এমনকি নারীদের পর্যন্ত পৌঁছারও রাস্তা তৈরি করে দেয়।”[৯২]

এইসব হাসপাতালের ওয়েটিংরুমের টেবিলে খ্রিষ্টবাদের প্রচারপত্র বিছিয়ে রেখে দেওয়া হয়, যেগুলো চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রভাবক পদ্ধতিতে লেখা হয়ে থাকে। সেখানে আগন্তুক কিংবা অপেক্ষমাণ ব্যক্তি সময় কাটাবার জন্য সেইসব বইপত্র হাতে নিয়ে পাঠ করে যখন, তখন সে প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারে না।

কোনো কোনো সময় অসুস্থ ব্যক্তিকে ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যে কুরআনের কোনো আয়াত বা বিসমিল্লাহ উচ্চারণ করে অকার্যকর; বরং ক্ষতিকর ওষুধ তাকে সেবন করানো হয়ে থাকে। যখন রোগীর অবস্থা বেগতিক হয়ে ওঠে, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন ঈসা মাসিহের নাম উচ্চারণ করে তাকে সঠিক ওষুধ দেওয়া হয়। আর এই চমৎকার নাটকীয়তায় সেই অসুস্থ ব্যক্তি সংশয়ের মধ্যে পড়ে যায় যে, কুরআনের কোনো প্রভাব দেখা দিলো না; অথচ মাসিহের নাম নিতেই তার অসুখ সেরে গেল! আর এর পরিণাম এই হয়—এই ক্যারিশমাটিক চিকিৎসাপদ্ধতির প্রভাবে কিছু কিছু রোগী হাসপাতালেই মুরতাদ হয়ে বসে; আর কিছু পরবর্তীতে অন্য কোনো সময়ে।

কনফারেন্স, ক্লাব এবং জিম : মিশনারি সংস্থাগুলো বিভিন্ন চটকদার শিরোনামে কনফারেন্সের আয়োজন করে থাকে। যেমন :

‘আসুন, শান্তি প্রতিষ্ঠা করি।’

‘সবার কল্যাণ কামনা করুন।’

‘এই বিশ্ব আমাদের।’

এইসব কনফারেন্স এবং তাতে উপস্থাপিত বিষয় মুসলমানের ধর্মীয় মূল্যবোধকে গভীর নিদ্রায় তলিয়ে দিতে কাজ করে থাকে। কনফারেন্সের সমাপ্তির সময় খ্রিষ্টীয় লিটারেচার বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এইসব লিটারেচার ও লেখাজোখা সংশয়বাদী মস্তিষ্ককে বিভ্রান্তির আরও অতলে নিমজ্জিত করে ফেলে।

মিশনারিদের কিছু ক্লাব এবং জিমও রয়েছে, যেখানে তরুণ ও উঠতি প্রজন্ম সাধারণত আনন্দ উদযাপন, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার নামে সমবেত হয়ে থাকে। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ ধর্মীয় স্বাধীনতার সাথে সাথে ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণাভাব উসকে দেয়। এইসব ক্লাব ও জিমের সদস্যদের সাহিত্যসামগ্রীও সরবরাহ করা হয়। এবং তাদের মাঝেমধ্যে উল্লিখিত কনফারেন্সগুলোতেও আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সাংস্কৃতিক কেন্দ্র : আধুনিক-মনস্ক লোকদের হৃদয় জয় করবার জন্য মিশনারি সংস্থাগুলো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে, যেখানে চিত্র, ক্যালিগ্রাফি, প্রাচীন মুদ্রা এবং বিভিন্ন আর্ট কালচারের প্রদর্শন হয়ে থাকে। এই ধরনের

---

[৯২] মুসলিম ওয়ার্ল্ড, পৃষ্ঠা : ১০৫

কেন্দ্রগুলোও পশ্চিমা চিন্তা লালনকারীদের খ্রিষ্টবাদের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। সংস্কৃতির আড়ালে খ্রিষ্টধর্মের প্রচারের কাজ সম্পাদন করে থাকে।

লাইব্রেরি : গ্রন্থাগার এবং লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে সর্বসাধারণকে অধ্যয়ন ও পাঠগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হয়। এ ছাড়াও এসব লাইব্রেরিতে মিশনারিদের অধ্যয়ন, গবেষণা এবং বিতর্কের প্রস্তুতির জন্যও বইপত্র সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

প্রেস : মিশনারিদের নিজস্ব প্রেস রয়েছে। বাইবেলের প্রকাশের জন্য বিশেষ ধরনের উন্নতমানের কাগজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাইবেলের পূর্ণ ও খণ্ডিত সংস্করণের হাজার হাজার কপি স্থানীয় ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এসব প্রেসে অন্যান্য সাহিত্যকর্মও ছাপানো হয়ে থাকে। পাকিস্তানে মিশনারিদের একাধিক বড় ও প্রাচীন প্রকাশনাসংস্থা রয়েছে। যেমন, শাদাব মারকাজ লাহোর এবং বাইবেল সোসাইটি লাহোর।

নারী : মিশনারিরা নিজেদের উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুন্দরী, লাস্যময়ী, বুদ্ধিমতী নারীদের ব্যবহার করে থাকে। তারা বুদ্ধিমতী এবং লাস্যময়ীই কেবল নয়; বরং নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও ধর্মীয় উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে থাকে। মিশনারি মেয়েরা বিভিন্ন কায়দায় মুসলমানদের নিজেদের হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয়। বিশেষ করে যে-সকল তরুণ তীব্র পাপ ও অপরাধবোধের শিকার, তাদের সাথে মেলামেশা করে খ্রিষ্টবাদের প্রতি তাদের আগ্রহী করে তোলে। এই নারী মিশনারিদের দাওয়াতি-পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন। খ্রিষ্টবাদের প্রতি তাদের আহ্বান সরাসরি হয় না; বরং তারা প্ররোচনা ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে থাকে। নারী মিশনারিদের একটি বিশেষ টার্গেট হয়ে থাকে স্থানীয় মেয়েরা। কারণ একজন মেয়ে আরেকজন মেয়ের কথায় খুব দ্রুতই প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

শিক্ষার্থী : খ্রিষ্টবাদের প্রসারে মিশনারি স্কুল এবং কলেজের মুসলিম শিক্ষার্থীদের ভূমিকাও সহায়ক হয়ে দেখা দেয়। মিশনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো তাদের উন্নত ও উচ্চশিক্ষা প্রদান করে উঁচু পদে আসীন করিয়ে থাকে। এরপর তাদের মাধ্যমে নিজেদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়ে নেয়। তা ছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমাদের পরিচিত স্কাউট আন্দোলনও তাদেরই প্রসারিত একটি জাল। স্কাউটদের তিন আঙুলের স্যালুট মূলত ত্রিত্ববাদের প্রতি ইঙ্গিত; বাহ্যত যদিও তাকে ভিন্ন শিরোনামে চিহ্নিত করা হয়।

শিক্ষাসফর কিংবা উৎসব পালনের ক্যাম্পগুলোতে মেলামেশার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টান মেয়েরা মুসলিম ছেলেদের ইসলামি মূল্যবোধ ও মুসলিম-সমাজের প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে নিজেদের জালে ফাঁসিয়ে নেয়। এবং ধীরে ধীরে তাদের নিয়ে যায় খ্রিষ্টবাদের দিকে।

সুস্থতার জন্য প্রার্থনার মজলিস : বিভিন্ন স্থানে (সাধারণত চার্চে) দোয়ার আয়োজন করা হয়ে থাকে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এসব দোয়া ও প্রার্থনা মজলিসে অংশগ্রহণের দাওয়াত দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত হওয়া অধিক সংখ্যকই হলো

হতাশ এবং দুরারোগ্য ব্যাধির মুসলমান। উপস্থিত লোকদের সুস্থতা কামনা করে পাদরি যিশুর সমীপে প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার পর স্ট্রেচার এবং হুইলচেয়ারে করে আগত বহুলোককে সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে ফিরে যেতে দেখা যায়। মূলত এটা একটা নাটক। কিন্তু দুঃখজনক হলো, বহু মুসলমান এই দৃশ্য দেখে প্রভাবিত হয়ে খ্রিষ্টবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে; এবং তাকে সত্যধর্ম বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে।

হাতে-কলমে বাইবেল কোর্স : পত্রপত্রিকার প্রচারণাকে কাজে লাগিয়ে ঘরে বসেই বিনামূল্যে ধর্মীয় জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃতি করবার প্রলোভন এবং উঁচু পর্যায়ের সনদের লোভ দেখিয়ে তরুণদের বাইবেলের কোর্স করানো হয়। এইসব কোর্স সম্পন্ন করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে এমন তরুণের সংখ্যা অনেক।

এনজিও : এনজিও তথা বেসরকারি সাহায্য সংস্থা মিশনারিদের এক বিশেষ ফাঁদ। এমন অনেক প্রতিষ্ঠান খ্রিষ্টানরা নিজেরাই পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু কিছু এনজিও এমনও আছে, যার পরিচালক কোনো পশ্চিমা মুসলমান; তবে অধিক ফান্ড কালেকশনের উদ্দেশ্যে কোনো-না-কোনো মিশনারি সংস্থার সাথে সম্পর্ক তৈরি করে রাখে। মিশনারি সংস্থাগুলো নিজেদের সরকারের মাধ্যমে তাদের সহায়তা প্রদান করে। এবং বদলে এই ধরনের এনজিওগুলো তারা ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তাদের সহায়তায় নিজেদের বইপত্র বণ্টন করিয়ে নেয়। কোনো এলাকায় যদি ধর্মপ্রচার বিষয়ক কোনো অনুষ্ঠান কিংবা আরোগ্য লাভের দোয়ার আয়োজন করতে হয় তবে স্থানীয় এনজিও তার জন্য জমকালো পরিবেশ তৈরি করে এবং খ্রিষ্টবাদ প্রসারের সকল পথ মসৃণ করে দেয়।

আরও কয়েকটি উপকরণ

পরিস্থিতি বদলের পাশাপাশি মিশনারিরা তাদের উপায়-উপকরণ ও মাধ্যমেও পরিবর্তন নিয়ে আসে। খ্রিষ্টবাদের প্রচার ও প্রসারের কাজে অভিনব এবং নিত্যনতুন উপায়-উপকরণ তারা প্রয়োগ করে থাকে। কখনো ফুলের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। কখনো ফ্যামিলি শো আয়োজন করা হয়। আবার কখনো বিমূর্ত চিত্রকলারও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই ধরনের প্রোগ্রাম শেষে বিভিন্ন বইপত্র বিলি-বণ্টন করা হয়। আজকাল অডিও-ভিডিও ক্যাসেট ও সিডি বিতরণের প্রচলনও আরম্ভ হয়েছে। এই আকর্ষণীয় অডিও-ভিডিওগুলো হয়ে থাকে ধর্মীয় বিভিন্ন উপদেশ, খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণকারীদের স্বীকারোক্তিমূলক সাক্ষাৎকার এবং নবীদের জীবন নিয়ে নির্মিত সিনেমা বিষয়ে। বহু এয়ারলাইন্স কোম্পানিকেও আজকাল এই সিডিগুলো বিতরণ করতে দেখা যায়। পাঞ্জাবে বিনামূল্যে একটি রেলওয়ে সার্ভিস চালু করা হয়েছে, যেখানে যাত্রীদের ধর্মীয় সিনেমা দেখানো হয় এবং সিডি বিতরণ করা হয়। ধর্ম সম্বন্ধে মজবুত জানাশোনা ব্যতিরেকে এইসব বিষয় পাঠ করা, দেখা এবং শোনার ফলে বহু মানুষ অজান্তেই ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

৪.৪.১৯: ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল অব পাকিস্তানের ঘোষণাপত্র

পাকিস্তানে পুরোদস্তুর 'ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল অব পাকিস্তান' বিদ্যমান। এই সংস্থা কিছুদিন পূর্বে নিজেদের একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছিল। সেখানে তারা পাঁচটি কৌশলের কথা উল্লেখ করে। তা হলো :

১. শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠানকে আরও বিস্তৃত করা। এবং বয়স্কদের জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
২. চিকিৎসাসেবায় বৃদ্ধি ঘটানো। বড় বড় শহরগুলোতে অধিক সংখ্যক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা। এবং ছোট শহরে ডিসপেন্সারি গড়ে তোলা।
৩. বাইবেল কোর্সগুলো আরও ব্যাপক করা। তরুণ প্রজন্মকে উন্নত সার্টিফিকেটের প্রতি আসক্ত করে তোলা।
৪. কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান তথা এনজিওর সহায়তা গ্রহণ করা, মানুষের সাধারণ প্রয়োজন পূরণে তারা এগিয়ে আসবে।
৫. মুসলমানদের ভেতর ইসলামি ধাঁচের সাহিত্য সরবরাহ করা অর্থাৎ বইপুস্তক নামে ইসলামি হবে; কিন্তু ভেতরের বিষয় হবে খ্রিষ্টধর্মীয়। যেমন : শিরোনাম হবে 'আল্লাহর বাণী'; কিন্তু ভেতরে থাকবে বাইবেল।

৪.৪.২০: মিশনারি কনফারেন্স

মিশনারি সংস্থাগুলো একজোট হয়ে প্রতিবছর একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করে। সেখানে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের গতি, এ বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যাদি, বিভিন্ন অঞ্চলে সফলতার সম্ভাবনা এবং নতুন কৌশলপ্রয়োগের ব্যাপারে আলোচনা-পর্যালোচনা হয়ে থাকে। এই ধরনের একটি কনফারেন্সের সারাংশ উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেন অনুমান করা যায়, এরকম কনফারেন্স ও সেমিনারগুলোতে কী হয় আসলে! মিশনারি পত্রিকা 'মুসলিম ওয়ার্ল্ডে'র সম্পাদক কনফারেন্সের সাফল্য প্রকাশ করে অভিব্যক্তি জানিয়েছেন :

১. এই কনফারেন্স থেকে মুসলিমবিশ্বে মিশনারি কার্যক্রমের একটি বিস্তারিত চিত্র চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। এই ময়দানের বিস্তৃতি এবং উর্বরতা নিয়ে চার্চের মনে এই পরিমাণ আশা ও প্রত্যাশার সঞ্চার হয়েছে যে, এর পূর্বে কখনো এমন হয়নি।
২. বিভিন্ন মিশনারি কাজের মধ্যে সমতা অনুসন্ধান করা হয়েছে। কিছু ভুল, মুসলমানদের মধ্যে কাজ করবার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ও অজ্ঞতা থাকার কারণে যেগুলো সংঘটিত হয়েছে, স্পষ্ট হয়ে গেছে। সেগুলো দূরীভূত করবার এবং আরও সাহসিকতার সাথে কাজ করে যাবার ব্যাপারে উৎসাহ যোগানো হয়েছে।
৩. মুসলমানাদের জন্য সাহিত্যসামগ্রীর প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থাপনা আরও সুন্দর করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। এবং এই বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে কার্যকর প্রয়াস-প্রচেষ্টার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪. সকল খ্রিষ্টান গির্জাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, তারা যেন নিজের 'কর্তব্যটুকু' ইসলামি বিশ্বে পাঠিয়ে দেয়। খ্রিষ্টবাদের জন্য সারা দুনিয়া জয় করবার ক্ষেত্রে কেবল ইসলামই একমাত্র শত্রু ও প্রতিপক্ষ—এটা মেনে নেওয়া সবার জন্যই জরুরি। এজন্য সকল মিশনারি সোসাইটির কর্তব্য সাধারণ করণীয় পালনের সাথে সাথে ইসলামি বিশ্বে খ্রিষ্টবাদের প্রচারের কাজটি প্রধান ও মূল কাজ হিসেবে গ্রহণ করা। পুরুষ হোক কিংবা নারী, যে-ই এই কাজের জন্য প্রস্তুত হবে, তার কর্তব্য অনতিবিলম্বে কোনো ধরনের কালক্ষেপণ না করে মুসলিম অঞ্চলে পৌঁছে যাওয়া। এবং নিজের চাতুর্য ও কৌশলপূর্ণ প্রচেষ্টা দিয়ে মুসলমানদের যিশুখ্রিষ্টের ধর্মের 'বাহকে' পরিণত করা। নিশ্চয় যিশুখ্রিষ্টই সারা বিশ্বের ত্রাণকর্তা।

সম্পাদক পরিতৃপ্তি প্রকাশের উদ্দেশ্যে লিখেছেন : "এখন মুসলিম প্রজন্মকে এই চিন্তাধারা লালন করতে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম কেবল আল্লাহ ও তার বান্দার মধ্যকার সম্পর্কের নাম। তার সাথে মানুষের যাপিত জীপন কিংবা সামাজিক বিধানাবলির কোনো সম্পর্ক নেই।"

৪.৪.২১: মুসলমানদের তিনটি দুর্বলতা

মিশনারি সংস্থাগুলো নিজেদের লক্ষ্যে সফলতা লাভের জন্য মুসলমানদের দুর্বলতার প্রতি নজর রাখে। মুসলিম-দুনিয়ার তিনটি প্রধান দুর্বলতা, যেগুলো কাজে লাগিয়ে মিশনারি সংস্থা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করছে, তা হলো :

১. দারিদ্র্য (Poverty)
২. অজ্ঞতা (Illiteracy)
৩. রোগ-ব্যাধি (Diseases)

দারিদ্র্য : এশিয়া এবং আফ্রিকায় দারিদ্র্য অতি ব্যাপক। আর অধিকাংশ মুসলমানের বসবাস এই দুই মহাদেশেই। মিশনারি সংস্থাগুলো এই দুই মহাদেশকে নিজেদের টার্গেট বানিয়ে নিয়েছে। তারা গ্রামাঞ্চলে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের আকৃতিতে কাজ করে থাকে। এবং সাহায্য-সহায়তার মাধ্যমে স্থানীয় লোকদের হৃদয় জয় করে তাদের খ্রিষ্টবাদের প্রতি আহ্বান করে। খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য তাদের অনেক সময় বেতন-ভাতা, আয়-রোজগার এবং বাইরের দেশে চাকুরির প্রলোভনও দেখানো হয়। এমন দরিদ্র মানুষজন, যারা সময়মতো আহারযোগ্য খাবার পায় না, রুটি-রুজির জন্য যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত থাকে। আর এভাবেই মিশনারি সংস্থাগুলো তাদের দারিদ্র্যকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে নিজেদের মিশন বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যায়।

অজ্ঞতা : দারিদ্র্যের সাথে সাথে মুসলিমবিশ্বের আরেকটি দুর্বলতা হলো অজ্ঞতা। আমাদের তরুণপ্রজন্ম 'আধুনিক' শিক্ষায় অনেক শিক্ষিত হয়ে থাকলেও দীনের মৌলিক জ্ঞানও তাদের থাকে না। এই অজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মিশনারিরা তাদেরকে

অনায়াসেই ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিতে সমর্থ হয়। এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের জন্য তারা কখনো কখনো এই বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয় যে, ইসলাম আর খ্রিষ্টধর্ম ভিন্ন কিছু নয়; বরং একই ধর্ম। তারা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে থাকে ঈসা মাসিহকে নবী মানতে এবং তাওরাত ও ইনজিলের প্রতি ঈমান রাখার কথা খোদ কুরআন কারিমেই বলা হয়েছে। সেই তাওরাত আর ইনজিলই আমরা তোমাদের বাইবেলের আকৃতিতে দিচ্ছি। তার উপর ঈমান এনে তোমরা কুরআন কারিমের আদেশ পালন করো।

মিশনারি সদস্যরা অপরাধবোধ এবং বিবেকের ভারে ন্যুব্জ তরুণপ্রজন্মের ধর্মীয় অজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তাদের ভুল সবক পড়াতে থাকে। তাদের এই বলে বিভ্রান্তির পাঠ দিতে থাকে যে, তোমাদের পাপ মোচন সম্ভব যিশুর শূলে চড়বার মাধ্যমেই। তবে শর্ত হলো, ত্রিত্ববাদের প্রতি তোমাদের ঈমান আনতে হবে। যে ব্যক্তি ত্রিত্ববাদে ঈমান নিয়ে আসে, তাকে ইসলাম সম্বন্ধে এমন সব বিভ্রান্তিমূলক বিষয় সরবরাহ করা হয়, যার কারণে তারা ইসলামকে একটি অপূর্ণাঙ্গ, অস্থায়ী, হতাশাজনক এবং অকল্যাণকর ধর্ম হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে তাকে অপছন্দ করতে আরম্ভ করে। এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে খ্রিষ্টবাদের জালে ফেঁসে যেতে থাকে।

রোগ-ব্যাধি : মুসলমানদের তৃতীয় বড় দুর্বলতা হলো ব্যাধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। অধিকাংশ মুসলিম দেশেই স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়টি উপেক্ষিত ও অবহেলিত; কিংবা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত না হলেও যথার্থ ব্যবস্থাপনার অভাব অতি প্রকট। সাধারণ মানুষ পান করার জন্য স্বচ্ছ মিঠা পানি পর্যন্ত পায় না। ফলে আবশ্যিকভাবে রোগ-ব্যাধির হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ছাড়াও কোনো দেশে যখন মহামারি আঘাত হানে কিংবা অন্যকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তখন স্থানীয় সরকার বিদেশি ও অমুসলিম সাহায্য-সংস্থার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় মিশনারি সংস্থাগুলো জনকল্যাণমূলক কাজের আড়ালে নিজেদের লক্ষ্যের বাস্তবায়নে পুরোদস্তর সক্রিয় হয়ে ওঠে।

এমন লোক—মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে জীবন সম্পর্কে যে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছে—যখন মিশনারি সংস্থার সহায়তায় চিকিৎসার সুযোগ লাভ করে তখন মিশনারি চিকিৎসক, নার্স এবং হাসপাতালকেই সে সমস্যা সমাধানের প্রধানকেন্দ্র ভাবতে শুরু করে। আর এই ভালোবাসা, দুর্বলতা ও নির্ভরতার ফায়দা নেয় মিশনারিরা। এই পর্যায়ে এসে সাধারণ মুসলমানকে তারা খ্রিষ্টবাদের সবক পড়াতে আরম্ভ করে।

৪.৪.২২: মিশনারিদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যসমূহ

মিশনারিদের প্রধান লক্ষ্য মানুষকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা। তবে যেহেতু মিশনারি সংস্থাগুলো প্রাচ্যতত্ত্ব, সাম্রাজ্যবাদ এবং বর্তমানে বিশ্বায়নের আন্দোলনের সাথে কাঁধ মিলিয়ে চলছে, সে কারণে তাদের প্রচার কার্যক্রমে নিম্নযুক্ত বিষয়গুলোও সবিশেষ গুরুত্ব রাখে :

১. ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস নির্মূল করা। এবং ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা।
২. দীন ইসলামের উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা।
৩. কুরআন কারিমে বিকৃতি এবং তার অর্থের মধ্যে পরিবর্তন এনে কুরআন কারিমের সাথে মুসলমানের দূরত্ব তৈরি করা।
৪. নবীজির রিসালাত ও নবুওয়াতের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করা।
৫. শরিয়ত এবং রাজনীতি বা ইসলাম ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্কহীনতা সাব্যস্ত করা।
৬. সমাজ থেকে ইসলামি আখলাক ও মূল্যবোধ নিঃশেষ করে দেওয়া।
৭. পশ্চিমা সমাজে ইসলামের প্রবেশে বাঁধা সৃষ্টি করা।
৮. ইসলামি বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাচ্যতত্ত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদ থেকে সহায়তা নেওয়া।
৯. মুসলমানের অর্থনীতি দুর্বল করে দেওয়া এবং তাকে নিজেদের হাতে নেওয়া।
১০. মুসলমানদের ধর্মীয়, পার্থিব, বস্তুগত, আত্মিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি-সামর্থ্য নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা।

৪.৪.২৩: মিশনারিদের জন্য দিকনির্দেশনা এবং প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম

মিশনারি সংস্থাগুলো তাদের সদস্য ও ধর্মপ্রচারকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করে। এবং বহু গবেষণার পর্যালোচনা মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। মিশনারিদের দূরদর্শিতার অনুমান করুন—তাদের প্রশিক্ষণকেন্দ্রে প্রথম বছরেই মুসলমানদের বিভিন্ন দল-উপদল এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধ-বিসংবাদ সম্পর্কে বিস্তারের সাথে অধ্যয়ন করানো হয়ে থাকে। এবং ইসলামের ইতিহাসও গভীরভাবে পড়িয়ে দেওয়া হয়। বিপরীতে আমাদের আট বছরের দরসে নেজামিতে এখন পর্যন্ত সে-সব বিষয় বিশেষ গুরুত্বের সাথে নেওয়া হয়নি।

এখন খ্রিষ্টবাদ প্রচারের উপায়-উপকরণ সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধের কয়েকটি অধ্যায়ের শিরোনাম দেখে নেওয়া যাক :

১. অশিক্ষিত মুসলমানদের সাথে কীভাবে সম্পর্ক তৈরি করা যেতে পারে এবং তাদের শিক্ষা প্রদানের পন্থা কী হতে পারে।
২. অশিক্ষিত মুসলমানদের মাঝে কাজ করার পদ্ধতি কী হবে।
৩. শিক্ষিত মুসলিম-সমাজে কোন উপায়ে কাজ করা হবে।
৪. মুসলমানদের জন্য খ্রিষ্টান সাহিত্য।
৫. স্বাস্থ্য মিশনারি।
৬. নারীসমাজে মিশনারি কার্যক্রম।
৭. মুসলিম ভবিষ্যৎপ্রজন্মকে কোন উপায়ে খ্রিষ্টবাদের জন্য নির্বাচন করা হবে।
৮. খ্রিষ্টীয় আকিদা-বিশ্বাস উপস্থাপনের পদ্ধতি কী হবে।
৯. মুসলমানদের মাঝে কাজ করবার জন্য ব্যক্তি প্রস্তুত করা।
১০. ছাত্র-আন্দোলন এবং ইসলাম।

প্রবন্ধের শিরোনামই বলে দিচ্ছে, মুসলমানদের বিভ্রান্ত করবার জন্য এবং খ্রিষ্টবাদ প্রসারের জন্য নামসর্বস্ব কোনো কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে না। বরং প্রতিটি দিক নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনার পর পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোনো হচ্ছে।

৪.৪.২৪: পশ্চিমা ভাষার প্রসার এবং মিশনারি লক্ষ্য

মুসলিম-দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত সেই আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলোও মিশনারিদের পথ মসৃণ করবার জন্য কাজ করে যাচ্ছে, যেখানে কেবল বিবেক এবং বস্তুপূজা শেখানো হয়ে থাকে। একইভাবে পশ্চিমা ভাষার প্রসারও সেক্ষেত্রে তাদের সহায়ক হয়ে দেখা দিচ্ছে। মিশনারি পত্রিকা মুসলিম ওয়ার্ল্ডের ফরাসি সম্পাদক 'লোশাতালিয়া' নিজের এক কলামে লিখেছেন :

"প্রাচ্যে নিজেদের কার্যক্রমের জন্য ফ্রান্সের চৈন্তিক দীক্ষার রীতিনীতিকে মূলভিত্তি বানিয়ে দেওয়া দরকার। এই লক্ষ্য কেবল ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রদত্ত শিক্ষার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হতে পারে। কেননা এই শিক্ষাব্যবস্থায় ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল জ্ঞানগত এবং চৈন্তিক মাধ্যমগুলো বিদ্যমান আছে। এই বিষয়গুলোই ফরাসি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হবে।"

মিশনারি কলেজের সম্বন্ধে তিনি লেখেন :

"বৈরুতের খ্রিষ্টান স্কুল এবং মিশনারি দলগুলো—যাদের পেছনে বহু সম্পদ ব্যয়িত হচ্ছে এবং যাদের অত্যন্ত হেকমত ও প্রজ্ঞার সাথে কাজ করতে হয়—ইসলামি বিশ্বে পশ্চিমা চিন্তার প্রসারে তারা বিরাট কাজ আনজাম দিয়ে যাচ্ছে।"

পশ্চিমা ভাষার প্রভাবের বিষয়ে তিনি লিখেছেন :

"পশ্চিমা ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমা চিন্তাধারা বিস্তার লাভ করে। ইংরেজি, জার্মান, ডাচ এবং ফরাসি ভাষার যদি বিস্তৃতি ঘটানো যায় তাহলে সবাই ইসলামের ইতিহাস পাঠ করবে পশ্চিমা সাহিত্য থেকে। এবং ক্রমেই সেই সাহিত্যের মাধ্যমে একটি 'বস্তবাদী ইসলাম' সমাজে হাজির করবার অবকাশ হবে। আর এভাবে মিশনারি কার্যক্রম ইসলামের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা ধ্বংস করবার লক্ষ্যে সফলতার চূড়া স্পর্শ করে উঠবে।"

সম্পাদক মহোদয় মিশনারিদের কার্যক্রমের উদ্যম সম্বন্ধে নিজের প্রতিক্রিয়া এভাবে ব্যক্ত করছেন :

"মিশনারিদের কার্যক্রমের ফলাফলে যতই বিরোধ দেখা যাক; বাস্তবতা হলো, ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের বিনাশ তাদেরই প্রয়াস-প্রচেষ্টার ফল, যা তারা খ্রিষ্টবাদের জন্য করেছেন। ইসলামি বিশ্বের রাজনৈতিক বিভক্তি ও বিরোধও পশ্চিমা সভ্যতার জন্য পথ সুগম করে দিয়েছে। কেননা ইসলাম যখন রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে তখন কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর প্রতিটি মুসলিম দেশই পশ্চিমা সভ্যতার জালে ফেঁসে যাবে।"

৪.৪.২৫: এক নজরে মিশনারি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

এখন মিশনারি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ ও মগজধোলাই কার্যক্রমের কিছু মৌলিক নির্দেশনার উপর নজর বুলানো যাক :

১. খ্রিষ্টবাদের প্রচারের জন্য এমন উদ্দীপ্ত বইপত্র রচনা করা হবে, যা মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট করবে, যাতে 'পাপ' এবং 'মুক্তি'র গুরুত্ব তুলে ধরা হবে।

২. ইসলামের ভালো ভালো বিষয় গ্রহণ করা হবে। এবং তারপর বলা হবে যে, সেগুলোর পূর্ণতা সাধিত হয়েছে ইনজিলে। ইসলামে নির্দেশিত কল্যাণকর বিষয়ের পূর্ণতা ইনজিলে কীভাবে করা হয়েছে—তা মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে।।

৩. কুরআন কারিমের যেসব কল্যাণকর নির্দেশনা আছে সেগুলো নিয়ে প্রমাণ করা যে, এইসব বিষয় ইনজিলের মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করে।

৪. 'খ্রিষ্টধর্ম' এবং 'ঈমানে'র সারাংশ তৈরি করা।

৫. পাপের বাস্তবতা এবং তা 'মোচনে'র প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।

৬. আমাদের মুক্তির প্রয়োজন—এটাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া। আর এই মুক্তি কেবল ইনজিলের মাধ্যমেই হতে পারে। ইনজিলের মাধ্যমেই পাপমুক্তি ঘটতে পারে। কেবল তার মাধ্যমেই সম্ভব মানসিক প্রশান্তি এবং খোদার সন্তোষ হাসিল করা।

৭. লোকজনকে এই বিষয়টি ভাবার ব্যাপারে বাধ্য করা যেতে পারে যে, সঠিক ধর্মের মূল বিষয় হলো 'আবদিয়্যাত' বা 'বংশ'। অর্থাৎ কোনো বাদশাহর সেই ফরমানই তো অধিক নির্ভরযোগ্য হবে, যা কোনো দাস বা গোলাম নিয়ে আসে। কিংবা যা নিয়ে আসে তার পুত্র।

৮. প্রচার করা যেতে পারে, মানুষ 'সামাজিক জীব' হলে তাদের স্রষ্টা কি সামাজিক হবেন না? এই জন্যই এক সামাজিক খোদা তিন খোদার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

৯. সাধারণ্যে এই জিজ্ঞাসা ছড়িয়ে দেওয়া হবে যে, একজন জীবন্ত 'রক্ষাকারী' উত্তম নাকি একজন মৃত 'পয়গাম্বর'? (নাউযুবিল্লাহ)

১০. পাপ এবং তার সংশোধন বিষয়ে বক্তব্য দেওয়া।

১১. তাওবা ও ঈমান বিষয়ে বয়ান করা।

১২. কুরআনের সুরা ফাতিহা এবং বাইবেলের 'লর্ডস প্রেয়ার' দুটোকে তুলনা করে সুরা ফাতিহাকে নিম্নমানের প্রমাণ করা।

১৩. অশিক্ষিত মুসলিমশ্রেণির মধ্যে অনুপ্রবেশের সবচাইতে সেরা মাধ্যম হলো স্কুল। প্রথমে তাদের শিক্ষা দেওয়া হবে। স্কুলের মাধ্যমে মিশনারি তৎপরতা মুসলিমদের গৃহাভ্যন্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব। ঈসা মাসিহের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্কুল অত্যন্ত সহায়ক।

১৪. মুসলমানদের সাথে আলাপ শুরু করতে হবে সর্বসম্মত সত্য দিয়ে। প্রথমেই তাদের মাঝে ত্রিত্ববাদ বা খোদার পুত্র বিষয়ক আলাপের অবতারণা করলে বিরোধ তৈরি হয়ে যাবে। সে কারণে তাদেরকে নিজেদের কথা শোনার জন্য প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্যে কথা শুরু করতে হবে ঈসা মাসিহের বিস্ময়কর জন্ম, নবুওয়াত এবং তার মুজেজার মাধ্যমে। এই সত্যগুলো ইসলাম দ্বারাও স্বীকৃত। এরপর ধীরে ধীরে এমনভাবে খোদার পুত্র ধারণার প্রতি তার চিন্তা ঘুরিয়ে দিতে হবে, যেন সে কৌশলটা ধরে ফেলতে না পারে।
১৫. ঈসা নামের সাথে মুসলমানদের মতো 'হজরত' শব্দ যুক্ত করা। এবং কুরআনকে কুরআন শরিফ বলা। সাধারণ মানুষের সামনে কুরআনের আদব বজায় রাখতে হবে। তাকে কোনো নাপাক স্থানে রাখা যাবে না। তাহলে একজন মুসলমান প্রথমেই ধাক্কা খেয়ে যাবে। আঘাত পাবে। ফলে, তাকে দাওয়াত দেওয়া আর সহজ হবে না।
১৬. প্রতিজন মিশনারির উচিত কুরআনের ২০-২৫টি আয়াত একদম বিশুদ্ধ উচ্চারণের সাথে তাফসিরসহ মুখস্থ করে নেওয়া। এবং অবস্থা বুঝে মুসলিম উপস্থিতির সামনে পাঠ করা।
১৭. মুসলমানদের মতবিরোধের বিশেষ দিকগুলো সম্পর্কে খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারকদের বিশেষ দক্ষতা থাকতে হবে। এমনকি ইসলামি আকিদার দুর্বল দিকগুলো সম্বন্ধেও থাকতে হবে পূর্ণ অবগতি। এ ছাড়া সে-সব মানসিক প্রতিবন্ধকতা ও আপত্তির জবাবও একজন মিশনারির জানা থাকতে হবে, খ্রিষ্টবাদ গ্রহণে যা একজন মুসলমানকে দ্বিধান্বিত করে রাখে।
১৮. মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে রাখতে হবে। সবচাইতে ভালো হয়, যদি মিশনারি সদস্যগণ মুসলমানদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এবং তাদের সাথে 'সাগ্রহ সম্পর্ক' বজায় রাখে। উদ্দেশ্য কেবল এর মাধ্যমে তাদের সাথে খ্রিষ্টবাদ বিষয়ে আলাপের পথ উন্মুক্ত করা। এই কৌশলটি যদি নারী মিশনারি সদস্যরা গ্রহণ করে নিতে পারে তবে সেটা হবে তাদের জন্য অধিকতর শ্রেয়।

৪.৪.২৬: মিশনারিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

একটি লেখায় মিশনারিদের লক্ষ্য করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হলো :

১. ধর্মপ্রচারের কাজটি অন্তর্দৃষ্টি এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে করতে হবে।
২. মিশনারি সদস্যরা ব্যক্তি-জীবনে রুহানিয়্যাতের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করবে।
৩. ঈসা মাসিহের নৈকট্যলাভের জন্য ধারাবাহিক চেষ্টা ও অধ্যবসায় অব্যাহত রাখবে।
৪. বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য ও লিটারেচার প্রস্তুত করতে হবে।

৫. বিরোধ সম্বন্ধীয় সাহিত্য ও লেখাজোখা খুব সতর্কতার সাথে তৈরি করা।
৬. পুরোনো লিফলেট ও প্রচারপত্রগুলো আদ্যোপান্ত নতুনভাবে বিন্যস্ত করে বর্তমান সময়ের উপযোগী করে প্রস্তুত করতে হবে।
৭. তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। এই বিষয়ের অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা অন্য ধর্মকে ভিন্ন আঙ্গিকে দেখবার অবকাশ পাবো। এর মাধ্যমে আমরা তাদের বোঝাতে পারবো যে, তারা 'অজ্ঞতাসুলভ ইবাদত' করে। মুসলমানদের ধর্মীয় বিরোধ সম্বন্ধে জানার উপকার অনেক। এই বিষয়ের জ্ঞান লাভ হবে তাদের বিভিন্ন ফেরকা ও দল-উপদলের বইপুস্তক পাঠ করে।
৮. সাধারণ মানুষের সাথে কেবল এমন বিষয়েই আলাপ করা হবে, যা পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। আবার আমাদের বিপক্ষেও যাবে না।
৯. সাহিত্য ও লেখাপত্রের মাধ্যমে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস এমনভাবে উপস্থাপন করা, যাতে তার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে মুসলমান বাধ্য হয়।

৪.৪.২৭: মিশনারিদের সবচাইতে বড় লক্ষ্য : বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত পৌঁছার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করা

এখানে একটি বিষয় ভালো মতন জেনে নেওয়া দরকার। বিগত দুই শতাব্দীর প্রয়াস-প্রচেষ্টার ফলে মিশনারিরা ভালোভাবেই জেনে গেছে যে, তারা সমস্ত মুসলমানকে সামগ্রিকভাবে খ্রিষ্টান বানিয়ে ফেলতে পারবে না। সে কারণে বর্তমান সময়ে তাদের সকল কার্যক্রমের সবচাইতে বড় এবং প্রধান লক্ষ্য হলো, যেকোনোভাবে দুনিয়াকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখা; এখন এই কাজ মানুষকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার মাধ্যমে হোক কিংবা অন্য কোনো উপায়ে। বর্তমানে এই মিশনটাই সামনে রেখে এগিয়ে চলছে প্রাচ্যতত্ত্ব এবং বিশ্বায়নের 'সেনাদল'।

ইসলাম যেহেতু স্বভাবধর্ম; এবং একটি সুস্পষ্ট সত্য, এজন্য যখনই কোনো সুস্থ ও স্বাভাবিক মানসিকতার মানুষ ইসলাম নিয়ে চিন্তা করে এবং হঠকারিতা ও বিদ্বেষমুক্ত হয়ে শান্ত মনে ইসলামের অধ্যয়ন করে তখন সে ইসলামের সততা ও সত্যতা অনুধাবন করে ওঠে। ফলে প্রাচ্যতাত্ত্বিক ও মিশনারিদের প্রধান প্রয়াস এটাই, ইসলামের আহ্বান-ধ্বনি কোনো উপায়েই যেন পশ্চিমা দুনিয়া পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে।

এটা হলো সেই পরিস্থিতিরই পুনরাবৃত্তি, যা মক্কাতে দেখা দিয়েছিল। মক্কার কাফিররা কুরআন কারিমের আওয়াজ দমিয়ে রাখবার জন্য হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলার অপকৌশল গ্রহণ করেছিল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَ الْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ

"আর কাফিররা বলে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং এর আবৃত্তিতে হট্টগোল সৃষ্টি করো, যাতে তোমরা জয়ী হও।"[৯৩]

---

[৯৩] সুরা হা-মীম সাজদা, আয়াত ২৬

হাজারো বছর পূর্বেকার মুশরিকদের এই চিন্তারই প্রতিফলন আরও জোরেশোরে ঘটছে বিংশ শতাব্দীর এই সময়ে এসে, যাকে প্রোপাগান্ডার নাম দেওয়া হয়েছে। প্রোপাগান্ডার অর্থ হলো কোনো মিথ্যা ও অবাস্তব কথা এমন জোর দিয়ে প্রচার করা যে, হাজারো মানুষ কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তার প্রসার ঘটাতে থাকে। এবং প্রত্যেকে তাকে সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়ে পড়ে।

শোনা যায়, জনৈক ইহুদি বুদ্ধিজীবী একবার তার কোনো এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। দুজনে কথা বলছেন এমন সময় ঘরের বাইরে কোথাও মেশিন চলছিল, যার আওয়াজ তাদের আলাপে বিঘ্ন তৈরি করে। মেশিনের শব্দের নিচে তাদের আওয়াজ তলিয়ে যায়। ইহুদি বুদ্ধিজীবী চিন্তা করে দেখলো, তার গুরুত্বপূর্ণ কথা মেশিনের একটি অনর্থক আওয়াজ নিঃশেষ করে দিয়েছে। তারপর সেখান থেকেই তার ভাবনাতে এলো যে, সত্যের বিপরীতে মিথ্যাকে যদি আরও পোক্তভাবে হাজির করা হয় তাহলে সত্য তলিয়ে যায়।

তিনি এই বিষয়টাকে একটা মূলনীতি আকারে হাজির করলেন—"মিথ্যা এই পরিমাণ বলো, যেন লোকে তাকে সত্য ভাবতে আরম্ভ করে।"

ইহুদি লবি প্রোপাগান্ডার এই শয়তানি নীতিটা সাগ্রহে গ্রহণ করে নিয়েছে। এবং এই কাজই মিশনারি এবং প্রাচ্যবিদেরা প্রত্যহ করে যাচ্ছে। মিডিয়া এবং আরও অন্যান্য মাধ্যমের সহায়তায় ইসলামবিরোধী প্রোপাগান্ডা সৃষ্টি করে এবং বাতিল চিন্তাধারা জোরোশোরে প্রচার করার মাধ্যমে তারা ইসলামের আহ্বান-ধ্বনি হাওয়ায় মিলিয়ে দিতে চাচ্ছে; কিন্তু ইসলাম তার সত্যতা প্রতিষ্ঠা করেই নেবে।

যাজক এবং রিসালাতের নিন্দা করা

বহু বছর ধরে পশ্চিমা বিশ্ব বাকস্বাধীনতার আড়ালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বেয়াদবি ও ধৃষ্টতামূলক আচরণ করে যাচ্ছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশ করে, ন্যাক্কারজনক ফিল্ম তৈরি করে এবং ওয়েবসাইটে নানা আয়োজনের মাধ্যমে নবীজিকে আত্মিক কষ্ট দেওয়ার ধারাবাহিক ও বিরতিহীন উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। ইউটিউব এবং ফেসবুকে নবীজির শানে বেয়াদবিমূলক বিষয় প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কেবল নয়; বরং তার শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শনের কাজে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। (নাউযুবিল্লাহ)

এই নাপাক কাজের পেছনে মূল কলকাঠি নাড়ছে ধর্মান্ধ ইহুদি এবং উন্মাদ যাজক সম্প্রদায়। আন্দালুসের উমাইয়া শাসনকালে মুসলমানদের আভিজাত্য এবং শান-শওকত দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে স্থানীয় যাজকেরা খ্রিষ্টান নাগরিকদের উসকে দিয়েছিল নবীজির শানে বেয়াদবিমূলক আচরণ করতে। পাদরিদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কিছু দুর্ভাগা এই নিকৃষ্ট কাজ করে বসলে উমাইয়া শাসকগণ তাদের গ্রেফতার করে শাস্তিমূলক হত্যা করে ফেলেন। এই ঘটনার পর পাদরিরা নতুন কৌশল নিয়ে মাঠে

নামে। নবীজির শানে বেয়াদবি জান্নাত লাভের সহজ উপায় এমন ঘৃণিত বক্তব্য প্রচার করে সাধারণ খ্রিষ্টানদের আরও দ্বিগুণ প্ররোচিত করতে থাকে। আর এভাবেই নবীজির মর্যাদায় বেয়াদবি করার একটা ধারা চালু হয়ে যায়। তবে উমাইয়া শাসকবর্গ এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নেন। বেশ কিছু বেয়াদব ও অসভ্যের শাস্তি সম্পন্ন হবার পর যাজকেরা বুঝে নেয়, এখন নীরবতা অবলম্বন করার মধ্যেই তাদের নিরাপত্তা।

পরবর্তীকালে ক্রুসেডযুদ্ধের সময় আবারও নবীজির শানে বেয়াদবি করবার ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। রেজিনাল্ড নামের এক খ্রিষ্টান শাসক একটি হজযাত্রী কাফেলাতে লুটতরাজ চালায় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননা করে সমস্ত মুসলিম উম্মাহর আভিজাত্য ও মর্যাদাবোধকে আহত করে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তার এই নিকৃষ্ট কাজের প্রতি উত্তরে বলেন :

"আল্লাহর শপথ, আমি রেজিনাল্ডকে নিজের হাতে হত্যা করব।"

প্রথম কেবলা মুক্ত করবার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সুলতানের তরবারি কোষমুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর তার অভিযান আর থামেনি। শেষমেশ হিত্তিনের যুদ্ধে রেজিনাল্ড গ্রেফতার হয়। রেজিনাল্ডকে গ্রেফতারের পর তরবারির এক আঘাতে সুলতান তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেন।

কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই শাসক আর কোথায়, যারা দীনি মর্যাদাবোধে উজ্জীবিত! আর এ কারণেই পৃথিবী হয়ে উঠেছে জালিমের অভয়ারণ্য আর অনবরত কয়েকবছর ধরে 'শাতিমে রাসুল'গোষ্ঠী কোনো ধরনের বাধা-বিপত্তি ছাড়াই সকল প্রকারের প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে বিশ্বপরিমণ্ডলে মুসলমানদের আবেগ-অনুভূতি বিক্ষত করে চলেছে।

৪.৪.২৮: মিশনারিদের মোকাবেলা কীভাবে করা হবে?

এখন পরিশেষে প্রশ্ন হলো—মিশনারিদের এইসব হামলার প্রতিরোধ কীভাবে করা হবে? এই বিষয়ে কিছু উদ্যোগ সরকারকে নিতে হবে আর কিছু উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব ইসলামি প্রতিষ্ঠান এবং মুসলিম বিদ্বানশ্রেণি ও বুদ্ধিজীবীদের। সাধারণ মুসলিমদেরও এই বিষয়ে করণীয় অনেক কিছু আছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা এখানে পেশ করা হচ্ছে :

- মুসলিম শাসকদের কর্তব্য, তারা খ্রিষ্টধর্মের প্রচারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। এবং মুরতাদ হবার শরয়ি বিধান বাস্তবায়ন করবে।
- আলেম এবং মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের করণীয়, নিজের সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রমে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই, খ্রিষ্টবাদ, জায়োনিজম এবং আধুনিককালের ভ্রান্ত আন্দোলনগুলোর পরিচিতি অন্তর্ভুক্ত করবে।
- আলেমদের আরও করণীয়, তারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য উপযুক্ত কার্যপদ্ধতির সন্ধান করবেন।
- খ্রিষ্টীয় লিটারেচারের জবাবে ইসলামি লিটারেচার প্রস্তুতির কাজ গুরুত্ব সহকারে করা।

- খ্রিষ্টবাদের প্রতিরোধের জন্য যোগ্য ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা। বিভিন্ন দীনি প্রতিষ্ঠানে খ্রিষ্টবাদের মোকাবেলা ও প্রতিরোধে যে-সকল আলেম কাজ করছেন, তাদের আমন্ত্রণ করে এনে শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক কোর্সের আয়োজন করা। এই একই কাজ স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও করতে হবে।
- খ্রিষ্টবাদের খণ্ডনে প্রবীণ আলেমদের লিখিত বইপুস্তক নতুন করে পরিমার্জন, বিন্যাস এবং প্রকাশ করা।
- অমুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাস এবং চিন্তাভাবনা অনুধাবনের জন্য মাদরাসাগুলোতে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা।
- মুবাল্লিগ ও ইসলাম প্রচারকদের প্রশিক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং মাদরাসাগুলোতে তার শাখা প্রতিষ্ঠা করা।
- দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীবৃন্দের প্রতিমাসে কমপক্ষে একদিন নিজের নিকটস্থ ও প্রতিবেশী মহল্লাতে সত্য ধর্মের প্রচারের দায়িত্ব পালনের জন্য বের হওয়া।
- সম্মানিত আলেম এবং ইমামগণ তার জন্য সাপ্তাহিক কার্যসূচি তৈরি করবেন।
- অমুসলিম জনবসতি, বিশেষ করে খ্রিষ্টানদের বসতিতে গিয়ে অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে তাদের ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে হবে। সম্মানিত চিকিৎসক এবং ফার্মাসিস্টদের দায়িত্ব হলো, তারা নিজেদের মিশন হসপিটালের চিকিৎসকদের চাইতেও যোগ্য প্রমাণ করবেন। দরিদ্র ব্যক্তিদের ফি গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু ভাবনা-চিন্তা করবেন। চিকিৎসার পাশাপাশি ইসলামের দাওয়াতকেও নিজেদের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেবেন। আর জাতির অবুঝ শ্রেণির জন্য কল্যাণকর কাজের নেতৃত্ব দেবেন।
- ব্যবসায়ী, জমিদার এবং সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ নিজের সম্পদ ব্যয় করে হাসপাতাল, স্কুল এবং ইসলামি মিশন স্কুল প্রতিষ্ঠা করবেন, যাতে কোনো মুসলমান খ্রিষ্টানদের স্কুল ও হাসপাতালের মুখাপেক্ষী না হয়ে থাকে।
- সম্পদশালী মুসলমানেরা নওমুসলিমদের জন্য একটি নিরাপত্তা-বেষ্টিত এলাকা গড়ে তুলবেন, যেখানে নতুন ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিরা নিরাপত্তা অনুভব করবেন। তাদেরকে নিরাপদ রাখবেন তাদের আত্মীয়স্বজন ও এনজিওগুলোর চক্রান্ত থেকে, যাতে হালাল রিজিক উপার্জনের মাধ্যমে একটি নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের অবকাশ তারা পেয়ে যায়।
- সাধারণ মানুষ আলেমদের বিভিন্ন মজলিস, তাবলিগের জামাত এবং কুরআন ও হাদিসের দরসে অংশ নিয়ে দীনের মৌলিক বিষয়গুলো শিখে নেবেন এবং অপর ব্যক্তি পর্যন্ত তা পৌঁছে দেবেন। যেন প্রতিটি মানুষ নিজের ঈমানের সংরক্ষণ করতে পারে।
- ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে সাধ্যমতো সম্পদ খরচ করেও তারা নিজেদের দায়িত্ব বেশ ভালোভাবে পালন করতে পারেন।

- ইসলামি ওয়েবসাইটগুলোতে কাজের পরিধি আরও বিস্তৃত করা। সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে সম্পর্কিত তরুণেরা নিজের বৃত্তের অমুসলিমদের হেকমত ও প্রজ্ঞার সাথে ইসলামের দাওয়াত দেবে। সেজন্য প্রথমে নিজের ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো ভালো মতন শেখার এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে আলেমদের থেকে পাঠ গ্রহণ করার দরকার হবে।

৪.৪.২৯: হতাশ হবেন না, হতাশার কিছু নেই

প্রতিপক্ষের বিপুল সংস্থান এবং অভাবনীয় সব কৌশল ও পরিকল্পনা দেখে আমাদের আশাহত হবার প্রয়োজন নেই। নিশ্চিন্তির কথা হলো, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খ্রিষ্টধর্মের প্রচারের এই সকল প্রয়াস-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইসলামের দুশমনেরা ইসলামের প্রসারের ব্যাপারে শঙ্কিত। এই বিষয়ে লন্ডনের একটি মিশনারি প্রতিষ্ঠান 'ক্রিশ্চিয়ান রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনে'র এক্সিকিউট ডাইরেক্টর পিটার ব্রেইরের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। তিনি বলেন :

> "মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এটা ইসলামের শক্তির বহিঃপ্রকাশ, যা পৃথিবীব্যাপী অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বিস্তার লাভ করছে।"

এই প্রতিক্রিয়া ও অভিব্যক্তি কোনোভাবেই ভুল নয়। কেননা ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী ব্রিটেনের মসজিদগুলোতে নামাজির সংখ্যা ছিল ৫ লাখ ৩৬ হাজার। অন্যদিকে চার্চ অব ইংল্যান্ডের অধীন যে গির্জাগুলো, সেখানে গমনাগমনকারী খ্রিষ্টানের সংখ্যা ছিল ৬ লাখ ৫৪ হাজার। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মসজিদে যাতায়াতকারী মুসলমানের সংখ্যা প্রতিবছর ৩২ হাজার করে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিপরীতে এই সময়টাতে গির্জায় যাতায়াতকারী খ্রিষ্টানের সংখ্যা প্রতিবছর ১৪ হাজার করে কমতে থাকে।

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের পর যখন ইউরোপ এবং আমেরিকায় মুসলমানদের চরিত্রহননের কাজ ব্যাপক পরিসরে শুরু হয়েছে, তখন সেখানেই ইসলামগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অকল্পনীয়ভাবে। পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং আমেরিকাতে প্রতিবছর অজস্র মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে এবং সে-সব দেশে মসজিদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছাড়া মুসলিমদের জন্মহারও সেখানে সবচাইতে বেশি। পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন, যদি মুসলমানদের জন্মহার এভাবেই বাড়তে থাকে তাহলে বর্তমান শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইউরোপ এবং আমেরিকায় মুসলমানদের জনসংখ্যা দাঁড়াতে পারে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের চাইতেও বেশি।

এক অদ্ভুত 'নমনীয়তা' রেখেছেন স্রষ্টা ইসলামের স্বভাবে,
তাকে যত ছাই-চাপা দেবে সে তার অধিক অঙ্গার হয়ে জ্বলবে।

গ্রন্থপঞ্জি

—আত-তানসির: মাফহুমুহু ওয়া আহদাফুহু ওয়া ওয়াসায়িলুহু, আলী ইবনে ইবরাহিম আল-হাম্মাদ আন নামলাহ
—আল-মুসতাশরিকুনা ওয়াত তানসির, আলী ইবনে ইবরাহিম আল-হাম্মাদ আন নামলাহ
—আত তানসির: তা'রিফুহু, আহদাফুহু ওয়া ওয়াসায়িলুহু, আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ আস-সালিহ
—মুজাক্কিরাতুত তানসির, শায়েখ সুলাইমান বিন ফাহাদ আল-আওদা
—আসালিবুল গাজবিল ফিকরি, আলী মুহাম্মদ জারিশা, মুহাম্মদ শরিফ জিবাক
—আল-ইসতিশরাকু ওয়াত তাবসীর, ডক্টর মুহাম্মদ সাইয়েদ আল-জালান্দ
—আখিরি সালিবি জঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, আবদুর রশিদ আরশাদ
—আহদে মোগলিয়া মে আংরেজো কা জাল, আল্লামা আনওয়ার সাবেরী
—বাংলাদেশ মে ঈসায়ী মিশনারি সার গারমিয়া, মাওলানা আমিনুল হক মাহমুদী
—মাসিহিয়্যাত পাকিস্তান মে, ডক্টর নাদের রেজা সিদ্দিকী
—পাকিস্তান মে ঈসায়িয়্যাত কা আহওয়াল, ডক্টর নাদের রেজা সিদ্দিকী
—পাকিস্তান মে ঈসায়িয়্যাত কা ফুরুগ, ডক্টর নাদের রেজা সিদ্দিকী
—পাকিস্তান মে ঈসায়িয়্যাত কা উরুজ, ডক্টর নাদের রেজা সিদ্দিকী
—ইসলাম কে খেলাফ ঈসাইউ কে মানসুবে, ডক্টর নাদের রেজা সিদ্দিকী

পঞ্চম অধ্যায়

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ধারণা

এই অধ্যায়ে আমরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ চৈন্তিক আন্দোলনের বিশ্লেষণ করব, যা মুসলমানের আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা এবং আমল-আখলাকের শেকড় বিক্ষিপ্ত করে রেখেছে। এই আন্দোলন-দুটি হলো ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) এবং আধুনিকতা (Modernism)।

৫.১: ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা হলো :

فَصْلُ الدِّيْنِ عَنِ الدُّوَلِ وَالْحَيَاةِ.

ধর্মকে জীবন ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

অন্য ভাষায় সেক্যুলারিজম বলতে বোঝায় 'ধর্মহীনতা'। ক্যামব্রিজ ডিকশনারিতে সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :

Secularism: The belief that religion should not be involved with the ordinary social and political activities of a country.

অর্থাৎ, সেক্যুলারিজম দ্বারা উদ্দেশ্য একটি বিশ্বাস : কোনো দেশের সাধারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে ধর্মের জড়িত হওয়া উচিত নয়।

আরবি ভাষায় সেক্যুলার ব্যক্তির জন্য علماني শব্দ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সেক্যুলারিজমের জন্য ব্যবহৃত হয় اللادينية শব্দ। এবং সেক্যুলারিজমের সমর্থনকারীকে لادين-ও বলা হয়ে থাকে। সেক্যুলারিজমের প্রতি আহ্বানকারী প্রথমে এই বলে প্রতারণা করে যে, তারা ধর্মের বিরোধী নয়; বরং তারা বলতে চায়, জ্ঞানবিজ্ঞান, গবেষণা, রাজনীতি এবং সামাজিক উন্নতি-অগ্রগতির পথে ধর্মের প্রতিবন্ধক হওয়া অনুচিত। পার্থিব বিষয়ের সাথে কোনো ধর্মের কোনো প্রকারের সম্পর্ক নেই। পার্থিব জগতের বিষয়াদি বিজ্ঞান অনুযায়ী চলে এবং তাকে ধর্মের সাথে গুলিয়ে ফেলা ভুল। যে-সকল তরুণ তাদের প্রতারণার শিকার হয়ে পড়ে, এই লোকগুলো দীনের প্রতি তাদের আরও অধিক বিতৃষ্ণ করে তুলবার সুযোগ পায়। ফলে ধীরে ধীরে এই তরুণ প্রজন্ম দীনকে একটি সেকেলে বিষয় মনে করে কার্যত দীন পালন থেকে শুধু দূরেই সরে যায় না; বরং আকিদা ও বিশ্বাসের দিক থেকেও তারা 'ধর্মহীন' হয়ে পড়ে।

৫.১.১: সেক্যুলারিজমের ইতিহাস

সেক্যুলারিজমের সূচনা ইউরোপে ধর্মসংস্কার এবং মানবতাবাদী আন্দোলনের পর। ইউরোপের কাছে একসময় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, খ্রিষ্টবাদের বিবেকবিবর্জিত জীবনদর্শন বাস্তবতার সাথি হতে পারে না। সে কারণে তারা ধর্ম আর জীবনকে আলাদা করে ফেলে। চার্চ এবং হাউস অব কমন্স বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দুই প্রতিষ্ঠানের

কার্যক্রম সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে পরিচালিত হতে থাকে। সাধারণ জীবনযাপনের সাথে পাদরিদের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া হয়। মধ্যযুগে ইউরোপের সকল রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম গির্জার অধীনে সম্পন্ন হতো। শাসকেরা পোপের সিদ্ধান্তের সামনে মাথানত করতে বাধ্য ছিল। সেক্যুলারিজমের প্রতিষ্ঠার পর এই শাসকেরা চার্চের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, চার্চের ক্ষমতা কেবল গির্জার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর তারপর ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেখানেই গেছে, সেখানেই এই চিন্তার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছে যে, রাজনীতি এবং যাপিত জীবনের আটপৌরে বিষয়াদির মধ্যে ধর্মের অনুপ্রবেশ অনুচিত। রাজনীতি ও জীবনের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক রাখা ঠিক নয়। বৌদ্ধমত, হিন্দুদর্শনসহ অন্যান্য সকল ধর্মের অনুসারীদের কাছে শত বছরের অভিজ্ঞতায় এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের ধর্ম যাপিত জীবনে সঙ্গ দেওয়ার উপযুক্ত নয়। ইউরোপিয়ান চিন্তাবিদদের চর্চা ও প্রচারণায় তাদের পূর্ববৎ ধারণা আরও পোক্ত রূপ ধারণ করে। আর সে-কারণেই এই ধরনের সকল অঞ্চলে সেক্যুলারিজমের পথ সুগম হতে থাকে।

কিন্তু গোল বাঁধে ইসলামি দুনিয়ায় গিয়ে। সেখানে সেক্যুলারিজমের ঢেউকে নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। ইউরোপিয়ান বুদ্ধিজীবীরা দেখলো, অন্যান্য ধর্মের থেকে ইসলাম কিছুটা আলাদা। সে জীবনযাপনের ধারা থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায় না। বরং ইসলাম মানুষের যাপিত জীবনের ছায়া হয়ে তার সাথে সাথেই চলতে চায়। ইসলাম ব্যক্তির ঘর থেকে নিয়ে রাষ্ট্র পর্যন্ত যেখানেই প্রবেশ করে, সেখানেরই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কেবল এই নয়; বরং এই ব্যবস্থা পৃথিবীর যেকোনো অঞ্চলে বাস্তবায়িত হবার যোগ্যতা রাখে। এটা দেখে পশ্চিমা চিন্তকদের মনে শঙ্কা জেগে ওঠে, তারা ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা থেকে পালিয়ে আত্মপূজা এবং বিলাসিতার যে পথ মসৃণ করতে চায়, ইসলাম তাকে রুদ্ধ করে দিতে পারে। এবং নিজের কার্যকরী প্রভাবক ক্ষমতার কারণে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। সে-কারণে তারা সেক্যুলারিজমকে ইসলামি বিশ্বে আরও প্রবল বেগে প্রসারিত করবার চেষ্টা আরম্ভ করে। এবং সর্বাত্মক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকে, যেভাবে খ্রিষ্টধর্মকে কেবল চার্চের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছে, সেভাবে ইসলামকেও কেবল মসজিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলবে।

সেক্যুলারিজমের উদ্দেশ্য, মুসলমানকে তার দীন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। এখন এই উদ্দেশ্যে শত বছরেরও অধিক সময়ের প্রয়াসের পর বাস্তবিক অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, যদি আপনি রাষ্ট্রীয় পলিসি নির্ধারণের বেলায় শরিয়তের বিধান সামনে রাখবার প্রস্তাব করেন তবে বলা হবে, রাজনীতির সাথে ধর্মের সম্পর্ক কী? এমনকি যদি আপনি কোনো ব্যক্তিকে নামাজের কথাও বলেন তাহলে সে আপনাকে জবাব দেবে, ধর্ম মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলানোর কে? কিন্তু মুসলমানদের মনে রাখা দরকার, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতন

নয়। এই ধর্মে জীবনের প্রতিটি বিষয়ের জন্য নির্দেশনা বিদ্যমান। বস্তুত দীন হলো জীবনব্যবস্থা ও জীবনযাপন-পদ্ধতিরই আরেক নাম, যা সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টির জন্য তৈরি করেছেন। বলতে গেলে প্রায় সকল ধর্মের মানুষেরই দাবি তার ধর্ম সৃষ্টিকর্তারই তৈরী। কিন্তু ইসলাম ছাড়া এই দাবির সত্যতার প্রমাণ আর কোনো ধর্ম হাজির করতে পারেনি। তার অকাট্য প্রমাণ হলো, যে ধর্মের সৃষ্টি স্বয়ং স্রষ্টা কর্তৃক, তাতে কোনো ত্রুটি কিংবা দুর্বলতা থাকতে পারে না। ত্রুটিহীন ও দুর্বলতামুক্ত এমন পোক্ত ও সংরক্ষিত ধর্ম একমাত্র ইসলাম। এই কথাটি স্বতঃসিদ্ধ যে, ইসলাম ব্যতীত আর কোনো ধর্ম মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দিতে ব্যর্থ। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, আমার আপনার মতন ত্রুটিপূর্ণ মেধার অধিকারী মানুষই সেইসব ধর্মের অস্তিত্ব প্রদান করেছে; বিশ্বজগতের মহান স্রষ্টা নয়। যদি স্রষ্টা তাকে সৃষ্টি করতেন তাহলে তার মধ্যে এই দুর্বলতাগুলো কিছুতেই থাকত না।

যেহেতু মানুষের সৃষ্টি করা আইনকানুনের মধ্যে তার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা, বিশেষ আবেগ এবং ব্যক্তিগত অনুভূতি আবশ্যিকভাবে কাজ করে এবং যেহেতু প্রতিটি মানুষেরই জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং জানাশোনার পরিধি সীমাবদ্ধ; সুতরাং তার তৈরীকৃত ধর্মও কখনো পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। খ্রিষ্টবাদ, হিন্দুত্ব, বৌদ্ধমত এবং অন্যান্য ধর্ম এ কারণেই সামাজিক সমস্যার সমাধানে অসফল, অসম্পূর্ণ। এবং রাজনীতি ও যাপিত জীবনের দিকনির্দেশনা প্রদানে অক্ষম। কারণ, এই ধর্মগুলোর স্রষ্টা সৃষ্টিকর্তা নন। এই ধরনের বাধ্যবাধকতা ও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে এই ধর্মগুলোর অনুসারীদের দীন এবং দুনিয়ার পথ পৃথক করতে হয়েছে। এবং পরিবর্তে গ্রহণ করে নিতে হয়েছে সেক্যুলারিজম।

কিন্তু ইসলাম নিজের স্বয়ংসম্পূর্ণতার কারণে অতীতেও গৃহস্থালির জীবন থেকে শুরু করে রাজনীতি এবং বিচারালয় পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সফল নির্দেশনা প্রদান করেছে এবং বর্তমানেও ইসলাম সেক্যুলারিজমের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার সামর্থ্য রাখে। ইসলামের থেকে উপযুক্ত ও পোক্ত জবাব পাবার শঙ্কা পশ্চিমাদুনিয়া এখন আরও বহুগুণ বেশি অনুভব করে থাকে। কেননা আগের চেয়ে প্রচারমাধ্যম এখন দ্রুততর হয়ে পড়েছে। ইসলামি শিক্ষার বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছুক প্রতিটি মানুষ, তা সে যেকোনো ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, এই বিষয়টা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়ে পড়ে যে, ইসলাম মানুষের সমগ্র জীবন ধারণ করে। মানুষের প্রতিটি কাজ, তা ব্যক্তিগত হোক কিংবা সামাজিক, ইসলামি বিধান অনুযায়ী তা বৈধ হবে কিংবা অবৈধ। বৈধ হবার পরও ইসলামি বিধান তাকে আরও স্পষ্ট করে বলে দেয়, কাজটি কি কেবল প্রয়োজনীয় না বেশি প্রয়োজনীয়। গুরুত্বপূর্ণ নাকি উপযুক্ত। প্রশংসার যোগ্য নাকি কেবল বৈধ।

অবৈধ হবার ক্ষেত্রেও ইসলাম আরও স্পষ্ট করে বলে দেয়, কাজটি একদমই নিষেধ নাকি কেবল না করার উপযোগী।

জীবনের যেকোনো কাজ ইসলামি বিধানের সাত শ্রেণির কোনো-না-কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই হবে :

১. অত্যন্ত জরুরি (ফরজ)
২. জরুরি (ওয়াজিব)
৩. গুরুত্বপূর্ণ (সুন্নতে মুয়াক্কাদা)
৪. প্রশংসনীয় (সুন্নতে গাইরে মুয়াক্কাদা, মুসতাহাব)
৫. একেবারেই অবৈধ (হারাম)
৬. একটি সীমা পর্যন্ত অবৈধ (মাকরুহে তাহরিমী)
৭. অনুচিত (মাকরুহে তানজিহী)
৮. করা যেতে পারে (মুবাহ)

মোটকথা, জীবনব্যবস্থার যেকোনো বিষয় ইসলামি বিধানের কোনো-না-কোনো ছাঁচের সাথে মিলে যাবে। সেক্যুলারিজমের প্রচারকরা বিভ্রান্তিমূলকভাবে মুসলমানের মস্তিষ্কে এই কথা ফুঁকে দেয় যে, দীন এবং দুনিয়া দুটো ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। এবং অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামও জীবনের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ।

এই চিন্তাধারার ব্যাপকতার লক্ষ্যে পশ্চিম প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের শিষ্য-শাগরেদদের বিশেষভাবে ব্যবহার করছে। যেমন : আলী আবদুর রাজ্জাক। তিনি তার 'ইসলাম ওয়া উসুলুল হুকমি' গ্রন্থে এই ধরনের দাবি করেছেন যে :

১. শরিয়ত কেবলই একটি রুহানি বিষয়।
২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদ কেবল দেশজয়ের অভিলাষ ছিল। (নাউযুবিল্লাহ)
৩. স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কালেই মুসলিমদের ব্যবস্থাপনা ছিল অবিন্যস্ত।
৪. উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি একটি অবিবেচ্য বিষয়।
৫. খেলাফতে রাশেদা একটি ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা ছিল। খেলাফতের রাশেদার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার কারণ কেবল এটাই ছিল যে, তা ছিল একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা।

মোটকথা, এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক বিষয়বস্তুতে পূর্ণ লেখাজোখার স্তূপ তৈরি করা হচ্ছে। শরিয়ত, সিরাত এবং ইতিহাস—সবকিছুকে বিকৃত করে সেক্যুলারিজমকেই গ্রহণযোগ্য বানাবার নাপাক প্রয়াস সর্বত্র চলমান।

৫.১.২: সেক্যুলারিজমের মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ইসলামি বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত সেক্যুলারিজমের মূল লক্ষ্য হলো :

১. মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাসের মাঝে সন্দেহ-সংশয় তৈরি করে দেওয়া, যাতে তারা ধর্ম থেকে—যে ধর্ম তাদের আত্মরক্ষার সবচাইতে মজবুত দুর্গ—দূরে সরে যায়।

২. পশ্চিমের নাস্তিক্যবাদী চিন্তাভাবনা এবং বস্তুবাদের ব্যাপক প্রচলন ঘটানো।
৩. ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার স্থলে বস্তুবাদী দর্শনের প্রসার ঘটানো।
৪. ইসলামকে রাষ্ট্র, সমাজ এবং রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। এবং পশ্চিমা মূল্যবোধ অনুযায়ী 'সেক্যুলার' রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ দান করা।

৫.১.৩: সেক্যুলারিজমের তিনটি ভয়াবহ কৌশল

সেক্যুলারিজমের প্রসারের জন্য তিনটি বিষয় অত্যন্ত উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে দেয় : প্রথমত, মুসলমানের বিচ্ছিন্নতা এবং বিক্ষিপ্ততা। নানা দল-উপদলে তাদের বিভক্তি। দ্বিতীয়ত, যোগ্য ও উপযুক্ত নেতৃত্বশূন্যতা। তৃতীয়ত, মুসলিম নারীর অবাধ স্বাধীনতা। এবং তার ফলে সৃষ্ট সমাজে বিদ্যমান ব্যাপক অনৈতিকতা ও চরিত্রহীনতা। এই লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য সেক্যুলার শক্তি তিনটি কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। যথা :

১. জাহেলি জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটানো।
২. যোগ্য নেতৃত্বের ব্যাপারে মুসলমানদের মনে ঘৃণা তৈরি করা।
৩. নারীস্বাধীনতা।

(পরবর্তীতে 'বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের উপকরণ' শিরোনামের অধীন এই তিনটি কৌশল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।)

৫.২: আধুনিকতা

আধুনিকতা বা মডার্নিজমের অর্থ হলো পাশ্চাত্যকরণ এবং আধুনিক-মনস্কতা। আধুনিক-মনস্কতার আন্দোলন মুসলমানদের এই কথা বলে যে, প্রতিটি ধর্মই একটি অনর্থক ও বেহুদা জিনিস। বর্তমান সময় বিজ্ঞান ও চৈন্তিক জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগ। এমন বিষয়ই আমাদের উপকারে আসবে, যা অনুভূতি, দৃশ্যায়ন, অভিজ্ঞতা কিংবা যুক্তির নিরিখে উতরে যাবে। আমাদের সেই বিষয়গুলোর সাথেই সম্পর্ক রাখতে হবে।

আর যে-সকল বিষয় তার বিপরীত, সেগুলো সব পরিত্যাজ্য। তা জাতীয় রীতিনীতি বা প্রথা-পার্বণ হোক কিংবা হোক ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধ।

যেহেতু পশ্চিম নিজে তার থেকে ধর্ম, ঐতিহ্যবাদ এবং রক্ষণশীলতা পুরোমাত্রায় বের করে দিয়েছে এবং একটি আধুনিক-মনস্ক সমাজের বাস্তবায়ন ঘটিয়ে নিজেদের সারা দুনিয়ার সামনে আইডল ও অনুকরণীয় হিসেবে উপস্থিত করেছে, সে-কারণে তারা মুসলিম-সমাজকে আধুনিক-মনস্কতার দিকে আহ্বানের উদ্দেশ্যে বলে যে, দুনিয়ার অগ্রগতির জন্য এখন পশ্চিমা সমাজের অনুকরণ জরুরি, যে সমাজ পোক্ত জ্ঞানবিজ্ঞান, সঠিক অভিজ্ঞতা, স্বাধীন চিন্তাভাবনা, ন্যায়পরায়ণতা, সমতা এবং উজ্জ্বল মানসিকতার সমন্বয়ে তৈরি। আর এর ফলে মুসলিমবিশ্ব পশ্চিম থেকে এই পরিমাণ প্রভাবিত হয়ে চলেছে যে, সে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং আর্ট ও শিল্পকলাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে পশ্চিমকে আদর্শ মনে করতে আরম্ভ করেছে। মডার্নিজম

কিংবা আধুনিকতার বাহকেরা এই সময়ে মুসলিমবিশ্বে একাধিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজ করে চলেছে। এই মিশনের কর্মী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছেন প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের শিষ্য-শাগরেদরা। এই শ্রেণির আধুনিক-মনস্কদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো :

৫.২.১: ইসলামের প্রকৃত রূপের বিকৃতি ঘটানো, নতুন ইসলামের রূপায়ণ করা

সবচাইতে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বিকৃত করবার ও তার আসল আকৃতি পালটে দেবার পেছনে। এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দ্বিমুখী প্রয়াস চালানো হচ্ছে। এক দিকে ইসলামকে একটি ভয়ঙ্কর ধর্মের আকৃতিতে সামনে আনা হচ্ছে; কুরআন, হাদিস, সিরাত, ফিকহ এবং ইসলামের ইতিহাস থেকে বিভিন্ন অংশ তুলে ধরে তার পূর্বাপরের ভুল এবং প্রতারণামূলক ব্যাখ্যা হাজির করে ইসলামকে একটি ঘৃণাযোগ্য ধর্ম হিসেবে উপস্থিত করা হচ্ছে; অন্যদিকে এমনসব চিন্তাবিদ তৈরি করা হচ্ছে, যারা ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্বের নামে তাকে এমন এক নতুনরূপে রূপায়িত করছে, যা কেবল পশ্চিমের নিকটই গ্রহণযোগ্য। এইভাবে ঈমান, ইবাদত, মুয়ামালাত, রাজনীতি এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে চোদ্দশ বছরের ইসলামি ফিকহ এবং শরিয়ত পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। উপেক্ষা করা হচ্ছে ইসলামের মূল স্পিরিট ও বক্তব্য। সালাফ ও পূর্বসূরিদের উপর সাধারণ মুসলমানের যে আস্থা ও নির্ভরতা, তা নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য তাদের গবেষণাগুলো প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। গবেষকদের কাজের উপর কাঁদা ছোড়া হচ্ছে। প্রকৃত ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং সামাজিক রীতিনীতিকে বানানো হচ্ছে সমালোচনার প্রধান টার্গেট। হারামকে হালাল করা হচ্ছে। যে জিনিসগুলো ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ তাকে ইসলামের রঙে রাঙিয়ে সামনে আনা হচ্ছে। পোক্ত চিন্তার মুসলমানদের গোঁড়া এবং মৌলবাদী প্রমাণ করার সকল প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

এক নতুন ইসলামের রূপ প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকা এবং ইউরোপে অবস্থিত নামজাদা মুসলিম সব চিন্তাবিদ তাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পশ্চিমের বিভিন্ন জার্নালে তাদের লেখাজোখা প্রকাশ হয়ে থাকে। এই ম্যাগাজিনগুলোও ক্রমেই এই ধরনের আলোচনা প্রকাশ করে একটি লিবারেল ইসলাম সামনে আনার কাজ করে যাচ্ছে। ১৬ মার্চ ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের নিউজ উইকে প্রকাশিত প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। সেখানে বলা হচ্ছে, বর্তমানে (ইসলামে) সংশোধনের (Reformation) কাজ অব্যাহত রয়েছে। যেই দীনের ভিত্তিস্থাপিত হয়েছিল আরবে, সারা দুনিয়ার মুসলমান তাতে নতুনত্ব এবং আধুনিকতার সংযোজন করছে। মুসলমানদের মধ্যে এই আলোচনা জারি রয়েছে :

- ইসলাম কি পশ্চিমা গণতন্ত্রের সাথে সাদৃশ্য রাখে?
- ইসলাম কি বিজ্ঞানের সাথেও সাদৃশ্য রাখে?
- ইসলাম কি বর্তমান আধুনিক নারী-ভাবনার সাথেও একমত?

এইসব প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে মুকতাদির খান—যিনি আমেরিকাতে রাজনীতির অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন—ইতিবাচক জবাব প্রদান করে বলেন :

"আমেরিকান মুসলমান, যারা যুগপৎভাবে ধনসম্পদ ও ইসলামি আবেগ—উভয় বিত্তে বিত্তশালী এবং একটি দ্বন্দ্বমূলক সমাজের দ্বারপ্রান্তে তারা এমন মজবুত অবস্থানে রয়েছে, একটি তেরোশ বছরের পুরোনো ধর্মকে আগামী এক হাজার বছরে একটি মজবুত ও পোক্ত অবস্থান তারা এনে দিতে পারবে। এটা এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা, সারা দুনিয়ার মধ্যে আমেরিকাই ইসলাম পালনের জন্য সবচেয়ে উত্তম জায়গা (Best place)। এখানে বহু সাংস্কৃতিক এমন এক গণতন্ত্র রয়েছে, যা সকল মানুষের বাকস্বাধীনতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার নিরাপত্তা প্রদান করে। এবং মধ্য-এশিয়ার বহু ইসলামি দেশের চাইতেও মুসলমানদের জন্য জীবনযাপন আরও সহজ ও আরামসাধ্য করে তোলে। আমেরিকান আইনের যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে বলতে হবে এটি একটি পরিপূর্ণ ইসলামি রাষ্ট্র (Perfect Islamic State)। এই দেশ (আমেরিকা) মানবজীবন, স্বাধীনতা এবং ধনসম্পত্তির পূর্ণ সংরক্ষক।"

মনে রাখা দরকার, নিউজ উইক এমন ম্যাগাজিন, যা সিআইএ'র ইঙ্গিতে বিশেষভাবে ইসলামের সেই ব্রান্ডের প্রসারের কাজ করছে, পশ্চিম যার পৃষ্ঠপোষকতা এবং সমর্থন করে।

৫.২.২: ইসলামের ইতিহাসে সন্দেহ-সংশয় তৈরি করে মুসলমানকে তার অতীত সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে তোলা

আধুনিক-মনস্ক গবেষকেরা মুসলিম উম্মাহকে নিজের ইতিহাস সম্বন্ধে অবিশ্বাসী ও সন্দিহান করে তুলবার জন্য 'সংগ্রাম' চালিয়ে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য—মুসলিমজাতি যে এক অত্যুজ্জ্বল ইতিহাসের ধারক, সেই অনুভূতি কখনো কোনো পরিস্থিতিতেই যেন তাদের মধ্যে জেগে না ওঠে। কোনো সন্দেহ নেই, মুসলিমজাতির ইতিহাসে এমন অসংখ্য মহানায়ক অতীত হয়েছেন, যারা প্রোজ্জ্বল ও ঈর্ষণীয় সব কর্মের ধারক ছিলেন। এবং তাদের জীবন আমাদের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয়। ইসলামি ইতিহাসের গৌরবময় এবং জাঁকজমকপূর্ণ দাস্তান স্বয়ং ইউরোপিয়ান বুদ্ধিজীবী ও বিদ্বানদের জন্যও হিংসা ও ঈর্ষার কারণ। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহিমাহুল্লাহর কথাই ধরা যাক। পূর্ণ শক্তি ও এখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও বাইতুল মাকদিসের খ্রিষ্টানদের জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা তিনি প্রদান করেছিলেন। এবং নিজের সৈন্যদেরও কঠোরভাবে তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন, যেন কেউ কোনো নিরপরাধের গায়ে হাত না তোলে। ইউরোপের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কেবল কঠিনই নয়; বরং একপ্রকার অসম্ভব। বিপরীতে ইসলামের ইতিহাসে মক্কাবিজয় থেকে আরম্ভ করে কনস্টান্টিনোপল বিজয় পর্যন্ত এমন হাজারো দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। বিশেষ করে চুক্তির সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে তৃতীয় স্তরের মুসলিম শাসকদেরও দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে।

এর বিপরীতে ইউরোপে বাহাদুরির পরিমাপক ভিন্ন। সেখানে তাকেই বড় বাহাদুর বলা হয়ে থাকে, বিরোধী শক্তির উপর যার অন্যায়-অবিচার যত বেশি। ফিলিস্তিনে খ্রিষ্টানদের জুলুম-অবিচার, ধোঁকাবাজি এবং প্রতারণার আলোচনা লেন পুলও তার 'সালাহুদ্দীন আইয়ুবী' গ্রন্থে করেছেন।

যাই হোক, ইসলামি বিশ্বের 'নামজাদা' পশ্চিমা আধুনিক-মনস্ক বুদ্ধিজীবীদের চোখে কেবল ইউরোপিয়ান বীরদেরই আইডল মনে হয়। আর তাদের লেখালেখির মিশন হলো, মুসলমান যখন নিজেদের ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে দেখবে তখন যেন পাতায় পাতায় কেবল পূর্বসূরি বীরদের ত্রুটি-বিচ্যুতিই নজরে পড়ে। ফলে নিজেদের ইতিহাস সম্বন্ধে তারা লজ্জা অনুভব করে উঠবে। এমনকি ইতোমধ্যে ইতিহাস বিষয়ে এমন অসংখ্য বইপত্র লিখে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো পাঠ করে বর্তমান সময়ের তরুণেরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ছে।

৫.২.৩: বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে জাতিকে হতাশ করে তোলা

আধুনিক-মনস্ক এবং পশ্চিমপ্রেমী চিন্তাবিদদের দ্বিতীয় লক্ষ্য মুসলমানদের বর্তমান সময়ের কেবল নেতিবাচক দিকগুলো দেখিয়ে তাদের মধ্যে নৈরাশ্য ছড়িয়ে দেওয়া। যে-সকল মুসলমান পূর্বেই তাদের কথায় কান দিয়ে নিজেদের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছে এবং অতীতের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে নিয়েছে, উম্মতের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাদের হৃদয় ব্যথাভারাক্রান্ত করে তোলা আধুনিক চিন্তাবিদদের উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের জন্য অধিক সহায়ক।

জাতিকে হীনম্মন্য করবার এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মুসলিম তরুণদের বারবার একথা বোঝানো হয় যে, মুসলিমজাতির সাহস কম, মুসলিমজাতি হলো বেপরোয়া। বারবার তাদের সামনে উচ্চারণ করা হতে থাকে যে, এই সমগ্র জাতিই হলো কম বুদ্ধিসম্পন্ন, যারা সঠিকভাবে একটা কাজও সম্পাদন করতে পারে না। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুসলিম শাসক, নেতা এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কিছু সত্য আর কিছু বানোয়াট বোকামি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রচার করা হয়ে থাকে। এবং সে-সব ভ্রান্তিপূর্ণ প্রচারণার পরিণাম এই বের করা হয়ে থাকে যে, সমগ্র মুসলিমবিশ্বের অধঃপতনের কারণ কেবল এটাই, এখানে মুসলিমরা বসবাস করে। মুসলিমরা এক অন্ধ এবং বধির জাতি। যদি এই অঞ্চলে জার্মান, ইটালিয়ান কিংবা ফরাসিদের বসবাস হতো তাহলে তারা এই অঞ্চলের দেশগুলোকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যেত! বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, মুসলমানদের কাছে না বস্তুগত কোনো উপকরণ আছে আর না আছে কোনো প্রযুক্তি। মুসলমান হলো মেধার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এক নিঃস্ব জাতি।

এই ধরনের চিন্তাভাবনার প্রচারণার পরিণামে মুসলমান নিজের উপর থেকে বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়ে বসে। তাদের প্রতিরোধ-চেতনা হিম হয়ে আসে। তার মধ্যে যতই যোগ্যতা ও শক্তি বিদ্যমান থাকুক, এই কথাগুলো তার সেই শক্তি ও প্রতিভাও

আড়াল করে ফেলে। তারা নিজ জাতিকে অকেজো এবং নপুংশক ভাবতে আরম্ভ করে। হতাশা ও হীনম্মন্যতা তাকে ঘিরে ধরে প্রবল বিক্রমে। একা এক ব্যক্তির দ্বারা যতটুকু সম্ভব হতে পারতো, সে সেটুকু সামর্থ্যও আর কাজে লাগাতে যায় না। এক গভীর ও ব্যাপক নৈরাশ্য সবাইকে জাপটে ধরে। এবং সমস্ত জাতি শিকার হয়ে পড়ে এক করুণ ও নির্মম অচলায়তনের।

কী ধরনের চিন্তা এবং দর্শনের মাধ্যমে এই মস্তিষ্কগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে, তা বোঝার জন্য জর্জ বার্নার্ট শ'র এই উক্তিটি লক্ষ্য করুন :

"ইসলাম দুনিয়ার সর্বোত্তম ধর্ম আর মুসলমান সর্বনিকৃষ্ট জাতি।"

কথাটি বাহ্যত সহমর্মিতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলা হয়েছে। এ কারণে বহু বছর ধরে লাখো মুসলমান তা পড়েছে, শুনেছে এবং বিবৃত করে এসেছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বাক্যটিতে মুসলমানদের অত্যন্ত তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। জনৈক ব্যক্তি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধানমুফতি মুফতি মাহমুদ হাসান রহিমাহুল্লাহর সামনে এই বাক্যটি উচ্চারণ করে বার্নাট শ'র চিন্তার ব্যাপারে প্রশংসা কুড়াতে চায়। তখন মুফতি মাহমুদ হাসান রহিমাহুল্লাহ অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন :

"তিনি মধুর সাথে বিষ মিশিয়ে হাজির করেছেন। ইসলাম সর্বোত্তম ধর্ম—এই কথা বলে প্রথমে তিনি আপনাকে উৎকোচ প্রদান করেছেন। তারপর অকপটে মুসলমানকে সবচাইতে নিকৃষ্ট বলে দিলেন। আর আপনি নিশ্চুপে তার বক্তব্য মেনেও নিলেন। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তিনি প্রথমে এজন্যই উচ্চারণ করেছেন যেন আপনি তাকে ন্যায়পরায়ণ মনে করেন। এবং পরবর্তী বাক্যে তার গালি নির্দ্বিধায় হজম করে নিতে পারেন। যদি তিনি অন্তর থেকেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতেন তাহলে কি তিনি নিজে ইসলাম গ্রহণ করে নিতেন না!"

৫.২.৪: ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাহত করা

অতীতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন এবং বর্তমান সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়বার পর চিন্তাগতভাবে প্রত্যেক মুসলমান নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়ের দোলাচলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যখন তারা আধুনিক-মনস্ক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার উপর দৃষ্টিপাত করে তখন তার উপলব্ধ হতে থাকে যে, জ্ঞানের সকল ভান্ডার এবং উৎস তো অমুসলিমদের হাতে। আর মুসলমানদের ভাগ্যে কেবল নিপাট মূর্খতা। সুস্থতার সকল উপায়-উপকরণ এবং সুবিধা অমুসলিমদের কাছে। আর মুসলিম দেশগুলোতে কেবল রোগ-ব্যাধি আর জরা-জীর্ণতা। ইউরোপ আমেরিকার ভূমিতে ধনসম্পদ উৎপন্ন হচ্ছে। আর আমরা মুসলমানেরা জন্ম নিয়েছি বিরান মরুভূমিতে। এসব চিন্তা মন ও মননে স্থান দিয়ে একজন সাধারণ মুসলমান ক্রমেই নিমজ্জিত হয়ে পড়তে থাকে নিরাশার গভীর অন্ধকারে।

এখন যদি সে ধুকে ধুকে মৃত্যুবরণ করবার হাত থেকে বাঁচতে চায় এবং চায় জমানার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে তাহলে তাকে মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ এবং জীবনযাপন-পদ্ধতিকে চিরতরে 'বিদায়' বলে দিতে হবে। এবং নিজেকে

সম্পূর্ণরূপে রাঙিয়ে নিতে হবে পশ্চিমের রঙে। নিজের সমাজকে পশ্চিমের উপযোগী করে গড়ে নিতে হবে। এবং আপন সমাজের সেইসব পার্থক্যরেখা মুছে ফেলতে হবে, যা নিয়ে পশ্চিম চিৎকার করছে। স্যার সৈয়দ আহমদ খান, গোলাম আহমদ পারভেজ, ড. ফজলুর রহমান এবং বর্তমানে জাবেদ আহমদ গামেদী এই একই পদ্ধতিতে কাজ করবার কারণে প্রসিদ্ধ। একইভাবে নিউইয়র্কের মসজিদুল ফারহের ইমাম ফয়সাল আবদুর রউফ এই একই চিন্তাযাত্রার নতুন সংযোজন, যিনি পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র এবং স্বাধীন সমাজব্যবস্থাকে কুরআন-সুন্নাহ ও সিরাতের আলোকে প্রমাণ করবার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

সত্য বলতে, আধুনিক-মনস্কদের চিন্তাভাবনা, অভিযোগ এবং খাঁটি মুসলিম-সমাজের ব্যাপারে তাদের আপত্তি ও চিন্তা-দর্শন পাঠ করলে অনেক সময় উম্মাহর নিখাদ ও মুখলিস পথপ্রদর্শক এবং সঠিক চিন্তার নেতৃবৃন্দও ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশা হারিয়ে ফেলেন। অভিজ্ঞতা বলছে, বিবেক ও সততার পথে একবার নৈরাশ্য এসে ভর করলে অধিকাংশ সময় সৎ, যোগ্য এবং খাঁটি ভদ্র মানুষও নিজের পূর্বেকার আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এমনকি অনেক সময় মুসলিম নির্দেশক এবং নিখাদ রাহনুমাও চূড়ান্ত পর্যায়ের নিরাশার শিকার হয়ে ইসলাম ও দীনকে ভোঁতা হাতিয়ার ভাবতে শুরু করে। এবং পশ্চিমেই মুক্তির পথ খুঁজতে আরম্ভ করে।

৫.২.৫: উম্মাহর ব্যক্তিত্বকে মোমের মতন গলিয়ে ফেলা

পশ্চিমা ভাবাদর্শ ও চিন্তা-দর্শন চায়, ঈমানদার ব্যক্তির কাঠামো বদলে দিতে এবং তার ব্যক্তিত্বকে গলিয়ে মোমের পুতুল বানিয়ে ফেলতে, যাতে করে তাকে নিজেদের পছন্দমাফিক ছাঁচে ঢেলে নেওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে তারা উম্মাহর উপর এমন সব চিন্তা ও দর্শনগত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে প্রভাবিত হয়ে আমরা পশ্চিমের প্রতি বিপুল বিমুগ্ধ হয়ে পড়ছি। সামাজিক বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং রাজনীতির হাতিয়ার দিয়ে পশ্চিম প্রত্যহ আমাদের মস্তিষ্ক খোদাই করে চলছে। কেবল সাধারণ মুসলমানই নয়; বরং বিদ্বান ও বিশেষ শিক্ষিতশ্রেণিও না বুঝেই পশ্চিমের আধুনিক দর্শন ও বিশেষ অর্থবোধক পরিভাষা গ্রহণ করে নিচ্ছে। পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের প্রতিরোধ করবার বিপরীতে আমরা নিজেরাই তার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসছি। এবং সঠিক অর্থে মোমের পুতুল হয়ে তাদের সামনে নিজেদের হাজির করছি, যাতে তারা আমাদের পছন্দমতো যেকোনো আকৃতিতে তৈরি করে নিতে পারে।

৫.২.৬: আধুনিক সভ্যতার প্রসার

আমাদের ব্যক্তিত্বকে বিগলিত এবং নরমালাইজেশনের পর পশ্চিম কামনা করে যে, আমরা একটি স্বাধীন সমাজের রূপায়ণ করব, যাকে বলা হয়ে থাকে সুশীল সমাজ। আর যেহেতু ইতোমধ্যে আমরা পশ্চিমা চিন্তা ও দর্শনের উপর ঈমান নিয়ে এসেছি সে-কারণে কোনো প্রকারের দ্বিধা-সংশয় ব্যতিরেকেই সমাজকে পশ্চিমা ধাঁচে ঢেলে

সাজিয়ে এক নয়া সমাজের রূপ-কাঠামো দিতে আমরা সহজেই প্রস্তুত হয়ে যাই। আর তারপর না আমাদের চেহারা মুসলমানদের মতন থাকে আর না পোশাক; না নিজেদের ভাষা তার আকৃতি ধরে রাখে আর না প্রথা-পার্বণ ও রীতিনীতি। আমাদের মধ্যে না দীনি ইলমের প্রতি কোনো আগ্রহ বাকি থাকে আর না শরিয়ত বাস্তবায়নের কোনো চিন্তা। কারণ, তখন তো আমরা সুশীল সমাজের বাসিন্দা। আর সুশীল সমাজে ইসলাম কেন, কোনো প্রকার ধর্ম পালন করবারই অবকাশ থাকে না। এই সমাজ অনৈতিকতা, ব্যক্তিপূজা, আনন্দযাপন, স্বার্থপরতা এবং কৃপণতা ও হিংসার মতন আবেগের প্রতিপালন করে। এই সমাজে না ইসলামের কোনো নিদর্শন বেঁচে থাকতে পারে আর না সহিসালামতে টিকে থাকতে পারে তার রুহ ও আত্মা। ইসলাম এ সমাজে মৃতবৎ, নিষ্প্রাণ।

পশ্চিমের অন্ধ-অনুকরণের পর মুসলমানদের অবস্থা হয়েছে ওই কাকের মতন, যে হাঁসের মতন হাঁটতে শিখে নিজের হাঁটাই ভুলে গেছে। পশ্চিমের চাল-চলন এবং জীবনযাপন-পদ্ধতি রপ্ত করে কেউ না মেধাবী ও বুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে আর না অনর্গল ইংরেজি বলতে পেরে কেউ জ্ঞানবিজ্ঞানের ইমাম হতে পারে। হ্যাঁ, এতটুকু অবশ্যই হয়, পশ্চিমের সেই অন্ধ-অনুকরণের ফলে তিনেও থাকতে পারি না; আবার থাকতে পারি না তেরোতেও। কোথাও আমাদের ঠাঁই মেলে না। পশ্চিমের লোকেরা আমাদেরকে এখনো পশ্চিমা বলে মেনে নিতে নারাজ। তারা বরং প্রতিটি মুসলিমের মধ্যে—সেই মুসলিম নিজের আদল যতই বদলে নিক না কেন—একটি লুকানো ভয়ঙ্কর প্রেতাত্মা দেখতে পায়।

৫.২.৭: ইসলামি আন্দোলন এবং নেতৃত্ব নিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা

যেহেতু আল্লাহ তায়ালার বিধান অনুযায়ী একটি দল সবসময় এমন থাকে, যারা কোনো পরিস্থিতিতেই নিরাশ হয় না। এবং সর্বাবস্থায় তারা খাঁটি ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে। সে কারণেই আধুনিকতার বার্তাবাহীরা খাঁটি ইসলামি আন্দোলন এবং একনিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ নেতৃবৃন্দের প্রয়াস-প্রচেষ্টা বিনষ্ট করে দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যায়। চিন্তার ভ্রান্তি, লোভ বা হুমকি-ধমকির মাধ্যমে তাদের সত্য থেকে বিচ্যুত করবার কিংবা চক্রান্তের মাধ্যমে তাদের ফাঁসাবার কোনো সুযোগ তারা হাতছাড়া করতে চায় না।

এই প্রয়াস এখন পুরোমাত্রায় অব্যাহত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ এমন জয়ের দেখা দুশমন কখনো পাবে না। উম্মত সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিত্বশূন্য হয়ে পড়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত এমন লোক প্রতি যুগেই থাকবে, যারা যেকোনো মূল্যে সত্যদীনের পতাকা সমুন্নত রাখবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন :

اَلْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

জিহাদ অব্যাহত থাকবে কেয়ামত অবধি।

উম্মতের সকল আশা-ভরসার কেন্দ্র এখন উম্মতের সেই শ্রেণিই, যারা মাদরাসা, ইসলাহ ও সুলুকের মারকাজ, দাওয়াত ও তাবলিগ, ফেতনার প্রতিরোধ কেন্দ্র, জিহাদ এবং ইসলামি সাংবাদিকতার মোর্চাগুলোয় কঠোর অবস্থান ধরে রেখেছেন। এবং কালের আঘাত যাদের কোনোভাবেই নিজেদের মিশন থেকে পিছু হটাতে পারে না। তাদের পরিচয় ও মনোভাবনা দারুণভাবে ফুটে উঠেছে এই পঙক্তিতে :

প্রতিকূল বাতাস দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছ!
ভয় নেই- বাতাস তো বিক্ষুব্ধ হয়ই তোমাকে ওড়াবে বলে।

গ্রন্থপঞ্জি

—আল-গাজউল ফিকরি, দিরাসাত ফিস সাকাফাতিল ইসলামিয়্যাহ, লাজনাতুল মানাহিজ
—আসালিবুল গাজবিল ফিকরি, আলী মুহাম্মদ জারিশা, মুহাম্মদ শরিফ জিবাক
—আল-আলমানিয়্যাহ, বান্দার বিন মুহাম্মদ আর রবাহ
—আল-আলমানিয়্যাহ, ডক্টর সাফর বিন আবদুর রহমান আল-হাওয়ালি
—আল-আলমানিয়্যা : নাশাতুহা ওয়া তাতাউয়্যুরুহা, ড. সাফর বিন আবদুর রহমান আল-হাওয়ালি
—আল-আলমানিয়্যাহ ওয়া সামারুহাল খাবিসা, মুহাম্মদ বিন শাকের আশ-শরিফ
—আল-আলমানিয়্যা ওয়াল আওলামা ওয়াল আজহার, ড. কামালুদ্দীন আবদুল গনী আল-মুরসী
—আল-আলমানিয়্যাহ ফিল ইসলাম, ইনআম আহমদ কাদুহ
—জুজুরুন আলমানিয়্যাহ, ডক্টর সাইয়েদ আহমাদ ফারাজ
—মাজাহিবু ফিকরিয়্যাহ মুআ'সিরাহ, মুহাম্মদ বিন কুতুব বিন ইবরাহিম

ষষ্ঠ অধ্যায়

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের উপকরণ এবং মাধ্যম

পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা প্রথমে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের পরিচয় আর তারপর তার ইতিহাস উপস্থাপন করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে ক্রুসেডযুদ্ধের উপর আলোকপাত করেছি। যে ক্ষেত্রগুলোতে হক বাতিলের মধ্যকার বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই তীব্র আকারে সংঘটিত হয়, যেমন প্রাচ্যতত্ত্ব, সাম্রাজ্যবাদ, খ্রিষ্টবাদ এবং বিশ্বায়ন—তার বিশ্লেষণ আমরা করেছি চতুর্থ অধ্যায়ে। পঞ্চম অধ্যায়ে দুটি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন সেক্যুলারিজম এবং মডার্নিজমের চক্রান্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা এই বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন-দুটি ইসলামের বিপক্ষশক্তির প্রতিটি আগ্রাসনেরই কমন চিন্তা-দর্শন। এ দুটির উপস্থিতি আপনারা তাদের প্রতিটি চিন্তাযুদ্ধেই হাজির দেখতে পাবেন।

এখন আমরা সেই সকল উপায়-উপকরণ ও হাতিয়ারের আলোচনা করব, যেগুলো আমাদের প্রতিপক্ষ প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করে থাকে। এইগুলো হলো মেধা ও মনন পরিবর্তন করে দেওয়ার সেই সকল লাগাম, যা শত্রুরা নিজেদের আয়ত্তে রেখেছে। সেগুলো হলো :

- শিক্ষাব্যবস্থা।
- মিডিয়া।
- তথ্য ও যোগাযোগ-মাধ্যম।
- রাজনীতি।
- আইন।
- অর্থনীতি ও বাণিজ্য।
- জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, এনজিও।
- আধুনিক-মনস্ক মুসলিম চিন্তাবিদ।
- আর্ট কালচার।
- সাহিত্য।
- খেলাধুলা ও বিনোদন।
- সাংস্কৃতিক নায়ক।
- আঞ্চলিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি।
- জাহেলি গোত্রপ্রীতির প্রসার।
- যোগ্য মুসলিম-নেতৃত্বের প্রতি ঘৃণার বিস্তার।
- নারীস্বাধীনতা।

৬.১: শিক্ষা

বাতিলপন্থিদের অগ্রগতির উৎস হলো শিক্ষা (Education)। ভ্রান্ত চিন্তা-বিশ্বাসের প্রসারে শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষাকারিকুলামই তাদের প্রধান মাধ্যম। আর বর্তমান সময়ে এই শিক্ষাব্যবস্থাই সামান্য পরিবর্তিত হয়ে মুসলিমবিশ্বে অনুসৃত হচ্ছে।

শিক্ষা যেকোনো দেশের উন্নতি-অগ্রগতির প্রধান ভিত্তি। যে জাতির শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় চাহিদার অনুকূলে হয়ে থাকে, তারা উন্নতি ও সফলতার দিকে এগিয়ে যায় আর যেই জাতির শিক্ষাধারা অন্যরা সাজিয়ে-গুছিয়ে বিন্যস্ত আকারে হাজির করে, যে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে জাতির রুহ ও আত্মা বের করে ফেলা হয়, সেই জাতি সত্যিকারার্থে কখনোই সাফল্যের মুখ দেখতে পায় না; বরং সেই শিক্ষাব্যবস্থা অন্য জাতিগোষ্ঠীর অনুসারীই তৈরি করতে থাকে। পশ্চিম আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সেই আত্মা ও রুহ বের করে ছুড়ে ফেলেছে। আরবি এবং ফারসি ভাষায় পঠিত দীনি ও জাগতিক বিষয়াদি দাফন করে দিয়ে লর্ড ম্যাকলের শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে। এবং এখন পর্যন্ত সেই শিক্ষাব্যবস্থাই আমাদের মাথার উপর চেপে বসে আছে।

ইসলামের শিক্ষাব্যবস্থা ওহীর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। ইসলামি সমাজে আখিরাতের চিন্তাকে দুনিয়ার চিন্তার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। সে-কারণে যে ইলম আখিরাতের জন্য কল্যাণকর, তাকে সে-সব জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইলমের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়, যা কেবল পার্থিব জীবনেই কল্যাণ দিতে পারে; আখিরাতের জীবনে নয়। ইসলামি বিশ্বে তার অবস্থান ও মর্যাদা হয় সবচাইতে উঁচুতে, কুরআন, হাদিস এবং ফিকহে যার জ্ঞান ও দক্ষতা সবচাইতে বেশি। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইরত আমাদের প্রতিপক্ষ এমন শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়েছে, যেখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে দুনিয়াকে। এই শিক্ষাব্যবস্থা এবং তার কারিকুলাম আখিরাতের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা এবং ওহীর কল্যাণী-বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই শিক্ষাধারায় সেইসব জ্ঞান ও শাস্ত্রের কদর এবং মর্যাদা সর্বাধিক, যা পার্থিব সুযোগ-সুবিধা, উপকার, কল্যাণ এবং সুখ-আহ্লাদ আমাদের জন্য সবচাইতে বেশি সহজলভ্য করতে পারে, যা আমাদের অধিক অর্থের যোগান দিতে পারে। যে কারণে এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে দীনহীন মেধা-মস্তিষ্ক জন্ম নিচ্ছে। এই শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ গ্রহণ করে এমন সব ব্যক্তিত্ব তৈরি হচ্ছে, যারা দুনিয়ার ঊর্ধ্বে এবং মৃত্যুপরবর্তী কোনো বিষয় নিয়ে ভাবিত হবার পক্ষপাতি নয়। আর এই লোকগুলোই এক সময়ে বুঝে কিংবা না বুঝে শত্রুপক্ষের কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত হয়ে ওঠে।

৬.১.১: উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ

এই শিক্ষাব্যবস্থার কারণে ইসলামি বিশ্বের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে তা হলো :

শিক্ষার ভাষা-মাধ্যমের পরিবর্তন : শিক্ষার প্রধান মাধ্যম ভাষা বদলে দেওয়া হয়েছে, যাতে মুসলমানেরা আরবি কিংবা স্থানীয় ভাষায় বিদ্যার্জন করতে না পারে। আবার

দেখুন, ইউরোপের প্রতিটি দেশ তাদের স্থানীয় ভাষায় (জার্মান, ডাচ, ফরাসি প্রভৃতি) পাঠকার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু ইসলামি দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদীরা যার যার নিজের ভাষার প্রচলন ঘটিয়েছে। এবং স্থানীয় ভাষার সাথে মানুষের দূরত্ব তৈরি করে দিয়েছে। ফলে মুসলমান শিক্ষার্থীরা নিজেদের পূর্ববর্তী জ্ঞানভান্ডার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে পড়েছে।

লিপির পরিবর্তন : মুসলিমবিশ্বের বহু দেশের প্রচলিত লিখনপদ্ধতি পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। যেমন, একসময় তুরস্কে আরবি হরফের প্রচলন ছিল। তা পরিবর্তন করে রোমান বর্ণমালার প্রচলন ঘটানো হয়েছে। যার কারণে তুরস্কের মুসলমান তার অতীতের সকল প্রকার লেখাজোখা ও সাহিত্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এবং অসংখ্য মূল্যবান ও উপকারী বইপত্র, যা আরবি হরফে লিখিত ছিল, তা হয়ে পড়েছে একদমই অর্থহীন। এমন নির্মম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে বহু দেশ।

বিদেশি ভাষাকে আবশ্যিক করা : 'আধুনিক' বিদ্যালয়ে বিদেশি ভাষা বিশেষ করে ইংরেজিকে আবশ্যিক করা হয়েছে। যে কারণে মুসলিম শিক্ষার্থীদের সময় এবং প্রতিভার একটি বড় অংশ ভাষা শেখার পেছনেই ব্যয় হয়ে যায়। এবং তারা জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় দিক থেকে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে না। অধিকাংশ শিক্ষার্থীই কেবল বুলি মুখস্থ করে নেয়। এবং গভীর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। বিপরীতে ইউরোপের দেশগুলো এবং এশিয়ারও কিছু কিছু দেশ যেমন চিন, জাপান—এসব দেশে প্রাথমিক স্তর থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে তাদের স্থানীয় ভাষাতেই। এরই কারণে জাপানের ৫ বছর বয়সি একটি শিশুও নিজে নিজেই একটি মেশিন খুলে আবার জোড়া লাগিয়ে দিতে পারে। এই শিশুরা ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সে পৌঁছে একটি শাস্ত্রের ব্যবহারিক জ্ঞানে দক্ষ হয়ে ওঠে। এবং নিজের জাতি ও দেশের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। যেখানে ইসলামি বিশ্বের একজন শিক্ষার্থী মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেও সাধারণত কয়েকটি শব্দ আওড়ানো এবং উলটা-সিধা ইংরেজি বলে যাওয়া ছাড়া কোনো দক্ষতা রাখে না। তারা কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান বা প্রাইভেট কোম্পানিতে রোবটের মতন কাজ করে উঠতে পারে বটে; তবে জ্ঞানবিজ্ঞান ও অ্যাকাডেমিয়ায় নতুন কিছু যোগ করতে ব্যর্থই থেকে যায়।

দীনের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করা : শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষাকারিকুলাম প্রণয়নের ক্ষেত্রে দীনের মর্যাদা ও সম্মান উপেক্ষা করা হয়েছে। দীনের প্রতীক, শরিয়তের বিধান এবং ইসলামের সামাজিক রীতি ও মূল্যবোধের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে সে-সবের গুরুত্ব অন্তর থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। মানুষের মন থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেওয়া হয়েছে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের গুরুত্ব জাগরূককারী সমস্ত উপাদান ও উপকরণ।

ধর্মহীন উপাদানের অন্তর্ভুক্তি : কারিকুলামে এমনসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মস্তিষ্কে ধর্মহীনতা আসন গেড়ে বসে। এবং ইসলামি চিন্তা-বিশ্বাসের গুরুত্ব

অন্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে যায়। আর বর্তমানে নিয়ম করেই উৎসাহ যোগানো হচ্ছে ধর্মহীন সাহিত্য এবং শিক্ষাদীক্ষার প্রতি।

আলেম এবং দীনশিক্ষার্থীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন : আলেম এবং ধর্মীয় শিক্ষার ছাত্রদের অবজ্ঞা করবার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করা হয় না। এই শ্রেণিকে উন্নতি-অগ্রগতির পথে অন্তরায় এবং সকল ধরনের সামাজিক ও আর্থিক সমৃদ্ধির পথে বাঁধা মনে করা হয়।

শিক্ষক নির্বাচন : শিক্ষক হিসেবে এমনসব লোক বাছাই করা হয়, যারা তাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাযুজ্য রাখে। উদ্দেশ্য—তারা যেন তাদের ঘৃণিত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের সারথী হতে পারে। এমন শিক্ষকদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে, ধর্মের সাথে যাদের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই।

সহশিক্ষা : সহশিক্ষার প্রসার ঘটানো হয়ে থাকে (যদিও এই ধরনের সহশিক্ষা ও মিশ্রণের দ্বারা শিক্ষার মধ্যে কোনো উপরি ফায়দা যুক্ত হয় না; বরং নিত্যনতুন নানান সমস্যা তৈরি হয় কেবল)।

ধর্মীয় মাদরাসার সংকোচন : আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রসারের সমান্তরালে সরকারিভাবে ধর্মীয় মাদরাসাগুলোর পরিধি সংকুচিত করবার কাজ শুরু হয়। মাদরাসাগুলোর উপর উত্থাপন করা হতে থাকে বিভিন্ন আপত্তি। তাদের আয়-রোজগারের সংস্থান বন্ধ করবার জন্য বড় বড় ব্যক্তিদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা হতে থাকে এবং বদনাম রটনার উদ্দেশ্যে অনবরত তাদের গায়ে কাদা ছোঁড়া হতে থাকে। এই সকল কাজে মিডিয়া আবির্ভূত হয় পশ্চিমা লবির পূর্ণ সহায়ক হিসেবে।

মাদরাসা এবং আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করা : ধর্মীয় এবং আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালানো হয়, যাতে দীনি প্রতিষ্ঠানের নামে ছড়ানো প্রোপাগান্ডা বাতাসে মিশে না যায়। এবং আধুনিক শিক্ষাধারার শিক্ষার্থীদের সাথে আলেমদের যে দূরত্ব, তা-ও সহসাই ঘুচে না যায়। দীনি শিক্ষা প্রদান ও গ্রহণের ব্যাপারে তরুণপ্রজন্মের মনে তাচ্ছিল্য বহাল রাখতে পারাই উল্লিখিত ব্যবধান তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য।

৬.১.২: নতুন ধারার শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

সেই সাথে শিক্ষাকারিকুলামের অধিকাংশ বিষয় এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়, যার মাধ্যমে ধর্মীয় চিন্তার সম্পূর্ণ নির্মূল ও বিলুপ্তি ঘটে যায়। নতুনধারার শিক্ষা-কারিকুলামের বৈশিষ্ট্য হলো :

পশ্চিমা মূল্যবোধের প্রসার : ভাষা, সাহিত্য, কাব্য এবং সামাজিক জ্ঞানবিজ্ঞানে এমনসব লিখিত ও অঙ্কিত বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মুসলিম শিক্ষার্থীরা পশ্চিমের বাহ্যিক চাকচিক্য এবং প্রোজ্জ্বল সভ্যতা-সংস্কৃতির গভীর পাঠ গ্রহণ করে এবং তাকে মন থেকে আপন করে নেয়।

নাস্তিক্যবাদী এবং বস্তুবাদী মগজধোলাই : কোনো একটি শব্দ থেকেও যেন স্রষ্টার চিন্তা মাথায় না আসে—অত্যন্ত কৌশলে এই চেষ্টাটা করা হয়। এবং কোনো সমস্যাতেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের প্রামাণিকতা সাব্যস্ত না হয়ে যায় যেন—সে চেষ্টাও তাদের থাকে। তারা আরও প্রয়াস অব্যাহত রাখে, যেন শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানকেই ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড মনে করে। ধর্ম যেন তাদের কাছে উপেক্ষিত থাকে আর মেধা হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ বস্তুবাদী।

ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ রাখা, ভুল ও বিভ্রান্তিমূলক ইতিহাস পড়ানো : মুসলমানদের তাদের প্রোজ্জ্বল ইতিহাস থেকে অজ্ঞ ও উদাসীন রাখা হয়। মহান সব মুসলিমবিজেতা, আলেম-মনীষী, কবি-সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞানীদের স্থলে পশ্চিমাদের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়। ইসলামি ইতিহাসের মতন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ঐচ্ছিক করে রাখা হয়েছে। এরপর ইসলামের যেই ইতিহাস পড়ানো হয়, তাকে মূলত বিন্যস্ত করেছে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সনদধারী এবং প্রাচ্যতত্ত্বের শিক্ষার্থীরা। এই ইতিহাস মূলত ইতিহাসের সাথেই ন্যায়বিচার করে না। মুসলিমবিজেতাদের কথা না হয় বাদ দিলাম; সাহাবিদের পর্যন্ত আক্রমণের নিশানা বানানো হয়ে থাকে। যার কারণে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইতিহাস থেকে কিছু শেখার বদলে আরও অধিক বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। দুনিয়ার বড় বড় ব্যক্তিত্বের পরিচয়ের ক্ষেত্রে ইউরোপের পরিচিত মুখগুলোকেই বিশেষ অবস্থান দেওয়া হয় এবং তাদের সমগ্র পৃথিবীর নায়ক বানিয়ে উপস্থাপন করা হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদেরকেই নিজেদের আদর্শ এবং আইডল হিসেবে মেনে নিতে পারে। জর্জ ওয়াশিংটন এবং এডিসনের মহত্ত্বের গান গাওয়া হয়। লিঙ্কন এবং জিন্নাহকে রাখা হয় সমান পাল্লায়। আমাদের এক মহান কবি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় জাতির নতুন কুঁড়িদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন :

লিঙ্কনের মতন 'ব্যক্তিত্ব' যদি হতে পারো, তবে বুঝে নেব—
তোমার ভেতরে বাস করে কোনো 'কায়েদে আজম'।

পশ্চিম এবং পশ্চিমের এজেন্টদের দোষ ও অতিরঞ্জন আড়াল করা : ইতিহাস থেকে এমন সব কথা মুছে ফেলা হয়, যা দ্বারা পশ্চিম এবং তার এজেন্টদের ধূলিমাখা চেহারা সামনে চলে আসে। মিশরবাসীর উপর নেপোলিয়ানের অবিচার ও অত্যাচারের ইতিহাস আড়াল করে তাকে মহান বিজেতা বানিয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তুর্কি খলিফাদের নিয়ে উপহাস করা হয়। আর কামাল পাশাকে হাজির করা হয় মুসলমানদের ত্রাণকর্তা হিসেবে। হিন্দুস্থানে ইংরেজদের বাড়াবাড়ি এবং হিন্দুস্থান ভাগ হবার সময় হিন্দু ও শিখদের গণহত্যাকে পাঠ্যপুস্তক থেকে বের করে দিয়ে তাদের দেখানো হচ্ছে মুসলমানদের বন্ধু হিসেবে।

ইসলাম শিক্ষাকে কেবল একটি চিন্তা ও দর্শন বানিয়ে দিয়েছে : পাকিস্তানসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে; বরং পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ইসলাম শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র

বিষয়রূপে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নিম্নযুক্ত কৌশলগুলোর মাধ্যমে তাকে তাৎপর্যহীন ও অকার্যকর করবার কোনো কসুর রাখা হয়নি।

১. স্কুল এবং কলেজের পাঠ্যক্রমে ইসলাম শিক্ষার বিষয়বস্তু এতই সংক্ষিপ্ত যে, তা একজন মুসলমানের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না।

২. পাঠ্যসূচিতে যতটুকু অন্তর্ভুক্ত আছে, ততটুকুও আগ্রহ নিয়ে এবং সম্পূর্ণত পড়ানো হয় না।

৩. ইসলাম শিক্ষা পড়াবার জন্য যোগ্য এবং উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের কোনো প্রয়োজন অনুভব করা হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধার্মিক বরং বেনামাজি শিক্ষকেরা এই বিষয়গুলো পড়িয়ে থাকেন। তারা কেবল রিডিং পড়িয়ে দেওয়া ছাড়া তেমন কিছুই করবার যোগ্যতা রাখেন না। অনেক সময় তাদের আকিদা-বিশ্বাসও হয়ে থাকে বড্ড গোলমেলে।

৪. শরিয়তের যেসব টেক্সট (আয়াত এবং হাদিস) ইসলামের শত্রুপক্ষের উপর আঘাত হানে এবং তাদের ক্ষতি থেকে মুসলমানদের সতর্ক করে, সেগুলো পাঠ্যসূচি থেকে বের করে দেওয়া হয়। জিহাদ, ইসলামি আইন, ইসলামি রাজনীতি এবং কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের শরয়ি বিধান একদমই পড়ানো হয় না।

৫. পাঠ্যসূচিতে যদি এই ধরনের টেক্সট থাকেও, তবু যিনি তা পড়ান, সেই ভ্রান্ত আকিদাসম্পন্ন শিক্ষক তাকে নিজের মনমতো ব্যাখ্যা করেন। যেমন সুরা তাওবার জিহাদের আয়াতগুলো পড়ানোর সময় তার ব্যাখ্যা এমনভাবে করা হয়ে থাকে, মনে হয় এই বিধানগুলো কেবল সেইকালের সাথে সম্পর্কিত। বর্তমানকালের সাথে তার কোনো প্রকারের সম্পর্কই নেই।

এইসব কৌশলের মাধ্যমে ইসলাম শিক্ষাকে কেবল একটি চিন্তা ও দর্শনে পরিণত করা হয়েছে, যার কোনো বাস্তবিক প্রয়োগ শিক্ষার্থীদের সামনে হাজির থাকে না। এইভাবে ইসলাম শিক্ষা পড়াবার মাধ্যমে মূলত 'জীবনযাপন-পদ্ধতি এবং দৈনন্দিন কাজকর্মের সাথে দীনের কোনো সম্পর্ক নেই'—এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিই পাকাপোক্ত করে দেওয়া হয় কেবল।

ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিভাজন পোক্ত করা : শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কে ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক বিভাজনকে এতটাই পোক্ত করে দেওয়া হয় যে, তারা নিজের দেশের বাইরের মুসলমানকে আপন মনে করতে এবং তাদের উপর নির্ভর করা থেকে সবসময় অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে। অথচ এই ধরনের অধিকাংশ বিভাজন এবং সীমান্তের প্রতিবন্ধকতা বিগত এক শতকেই অস্তিত্বে এসেছে। ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ ছিন্ন করবার জন্য প্রতিটি মুসলিম দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি আলাদা হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এবং পারস্পরিক পার্থক্যগুলো উচ্চারণ করা হচ্ছে খুব জোর দিয়ে। আর এভাবেই শিক্ষার্থীদের মগজে অন্য আর কিছুর চাইতে ছোট ছোট এলাকা এবং অঞ্চলের গুরুত্বই অধিক হয়ে উঠছে।

৬.১.৩: শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখবার পদক্ষেপসমূহ

মুসলিমবিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখবার জন্য এবং তাকে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী তৈরি করবার জন্য ইসলামের বিপক্ষ শক্তি ও সংস্থাগুলো নিম্নযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে :

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জ্ঞানবিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্থাপন : আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইউনেস্কো এবং ইউনিসেফ সবচাইতে অধিক প্রভাবক। এই প্রতিষ্ঠান-দুটি তাদের ব্যবস্থাপনায় ইসলামি বিশ্বে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করে বিপুল পরিমাণ অর্থসহায়তা প্রদান করে থাকে। আবার পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে মুসলিমবিশ্বের শিক্ষাবিভাগে নিজের গভীর প্রভাব-প্রতিপত্তি তৈরি করে নেয়। তাদের প্রতিষ্ঠিত কিংবা তাদের থেকে সহায়তা গ্রহণকারী প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিজেদের পলিসি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। আর তারা সেইসব পলিসির মাধ্যমে এমন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটায়, যার ফলে মুসলমান শেষমেশ আর মুসলমান থাকে না।

টিচার্স ট্রেনিং কোর্স : শিক্ষক এবং প্রশিক্ষকদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেবার জন্য ইসলামি বিশ্বে টিচার্স ট্রেনিং কোর্সের আয়োজন করে থাকে। আর এ কাজে তারা বিভিন্ন বিদেশি প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওর সহায়তা গ্রহণ করে। এ সকল টিচার্স ট্রেনিং প্রোগ্রামে শিক্ষকদের মস্তিষ্কে গেঁথে দেওয়া হয় যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মের কোনো দখল থাকা উচিত নয়। ট্রেনিংয়ের অন্তরালে তাদের মূলত সেক্যুলারিজম, মডার্নিজম এবং পোস্ট মডার্নিজমের দীক্ষা প্রদান করে উম্মাহর শিশুদের দীন থেকে বিচ্ছিন্ন করবার উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

শিক্ষাখাতে বিদেশি সাহায্য : শিক্ষাব্যবস্থায় নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখবার আরেকটি মৌলিক কৌশল হলো, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈদেশিক সহায়তা। জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ছাড়াও বিভিন্ন উন্নত দেশের তরফ থেকে এসব সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। এই সহায়তাগুলো এমন সব শর্তে বেঁধে ফেলা হয়, যার বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মীয় এবং জাতিগত প্রভাব ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যায়।

বিদেশি শিক্ষাবিদদের নজরদারি : বিদেশি শক্তিগুলো অধিকাংশ মুসলিম দেশের সাথেই বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রক্ষার নামে শিক্ষাখাতের পৃষ্ঠপোষক হবার ভান করে থাকে। মুসলিমবিশ্বের শিক্ষামন্ত্রণালয়ে নিজেদের শিক্ষাবিদদের নিয়োগ নিশ্চিত করে। তারা সাধারণত উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার পলিসি নির্ধারণে তাদের প্রভাব একজন মন্ত্রীর চাইতে কোনো অংশে কম হয় না।

বিদেশি শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদদের প্রভাব : মুসলিমবিশ্বের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সাথে বিদেশি সরকারের গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাবার পর মুসলিম দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক এবং ব্যবস্থাপকদের সাথে বিদেশি শিক্ষা অধিদপ্তরের গবেষক এবং শিক্ষকদেরও অত্যন্ত প্রগাঢ় ও হার্দিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। নিজেদের মধ্যকার সম্পর্কের কারণে শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষাকারিকুলামের বহু বিষয়ে সমতা নিয়ে আসতে তারা উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন প্রোগ্রামের আয়োজন করেন। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেশি শিক্ষকদের চাইতে বিদেশি শিক্ষকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এই বিদেশি শিক্ষকেরা ইউরোপ-আমেরিকার ভালো বেতন এবং উন্নততর সুবিধাদি ছেড়ে কেবল এইজন্য এখানে চলে আসেন, যাতে মুসলিমবিশ্বের তরুণসমাজকে আপন করে নিতে পারেন। তারা নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং রীতি-রেওয়াজ মুসলিম শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দেন। যার পরিণামে এই কিশোর ও তরুণেরা অবচেতনভাবেই নিজেদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য ইসলামি বিশ্বের কল্যাণে ব্যয় করবার পরিবর্তে অমুসলিম শক্তির স্বার্থে ব্যয় করতে আরম্ভ করে।

স্কলারশিপ : যদিও মুসলিম দেশে প্রচলিত পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু কম ক্ষতিকর নয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও আরও অধিক মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিশেষ মগজধোলাইয়ের জন্য এতটুকু যথেষ্ট মনে করা হয় না। কারণ, এতকিছুর পরও নিজের দেশের পরিবেশে বেড়ে ওঠার কারণে কিছু হলেও ইসলামের শিক্ষা সে পেয়েই থাকে। কমপক্ষে নিজ দেশের ইসলামি পরিবেশে যারা প্রতিপালিত হয়, তারা জুমআ ও দুই ঈদে মুসলমানদের সাথে সম্মিলিত আমলে অংশ নিয়ে সামান্য হলেও দীনি পরিবেশের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয়। দীনি প্রভাবে আন্দোলিত হয়। মুসলিম তারুণ্যকে তাই সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমা ছাঁচে ঢালবার জন্য নিখাদ দীনহীন পরিবেশের কোনো বিকল্প নেই। আর সেই লক্ষ্যেই তাদের স্কলারশিপ প্রদান করে ইউরোপ এবং আমেরিকার বিদ্যাপীঠে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে বহু বছর পড়বার পর অধিকাংশ মুসলিম শিক্ষার্থীই দীন এবং আখলাকের দিক থেকে একদমই রিক্ত হয়ে পড়ে। একসময় তারা নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিতেও লজ্জা ও সংকোচ করতে থাকে।

এই মানসিকতার কারণে বহু শিক্ষার্থী পশ্চিমেই থিতু হয়ে পড়ে। মুসলিমবিশ্ব তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং শাস্ত্রীয় দক্ষতা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। আর পশ্চিম অনায়াসেই পেয়ে যায় একজন নবীন, যোগ্য ও দক্ষ কর্মী। বিপরীতে যে শিক্ষার্থী ফিরে আসে, কল্যাণের চাইতে অকল্যাণই তার দ্বারা বেশি হয়ে থাকে। সমাজে দীনহীনতা প্রসারের কোনো অবকাশ সে হাতছাড়া করে না। পশ্চিমা বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটের কারণে দ্রুতই সে উঁচু পদ বাগিয়ে নিতে পারে, যা তার ধর্মহীনতা প্রসারে আরও সহায়ক হয়ে ওঠে।

৬.১.৪: সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব

সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার যে ক্ষতিকর প্রভাব নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেখা যায়, তার কয়েকটি হলো :

১. আমাদের শিক্ষার্থী আজ কেবল নামসর্বস্ব মুসলমান। তারা ইসলামের মৌলিক বিধান এবং আকিদা পর্যন্ত জানে না।
২. তরুণ প্রজন্ম দীনি ইলম সম্পর্কে অনীহা লালন করে।
৩. জাগতিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষার দুটি ভিন্ন ভিন্ন পথ তৈরি হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে এত দূরত্ব যে, একটিকে আরেকটির প্রতিপক্ষ ভেবে নেওয়া হচ্ছে (যদি শিক্ষাব্যবস্থা দীনদার ব্যক্তিদের হাতে থাকত তাহলে এই প্রতিপক্ষসুলভ দৃশ্য আজ দেখতে হতো না)।
৪. মুসলিম দেশের সরকার এবং নীতিনির্ধারকেরা ক্রমেই দীনি চিন্তাবিদ এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন।
৫. মুসলমান নিজের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নয়। নিজেদের ইতিহাস উপেক্ষা করে চলে এবং পূর্বপুরুষ ও উত্তরসূরিদের জ্ঞানগত উত্তরাধিকার থেকে একেবারেই চোখ ফিরিয়ে রাখে।
৬. অ্যাকাডেমিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব চলে গেছে গণতন্ত্রপন্থিদের দখলে।
৭. দীন এবং দীনদার ব্যক্তিদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা আজ স্বাভাবিক কাজে পরিণত হয়েছে।
৮. তরুণপ্রজন্মের মধ্যে হতাশা বৃদ্ধি পেয়েছে চরমমাত্রায় এবং চিন্তাগতভাবেই তারা পশ্চিমের দাস ও গোলামে পরিণত হয়ে পড়েছে।

৬.২: মিডিয়া

প্রতিপক্ষের সবচাইতে ভয়ঙ্কর এবং প্রভাবশালী হাতিয়ার হলো মিডিয়া (Media)। কোনো দেশের বাসিন্দাদের মেধা ও মনন সেভাবেই চিন্তা করে, মিডিয়া যেভাবে চায়। মিডিয়াতে যেই শ্রেণির লোকের প্রাধান্য থাকে, সাধারণ মানুষ তাদেরই চিন্তাচেতনা ও মনমস্তিষ্কের অনুসরণ করে থাকে।

বহু শতব্দীকাল মিডিয়া কেবল গদ্য-পদ্য আর বয়ান-বক্তৃতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেইকালেও পৃথিবীতে কেবল ওই চিন্তারই প্রসার ঘটতো, কলমবাজ এবং বাগ্মীরা যার প্রচার করত। তবে পার্থক্য কেবল এতটুকুই প্রচার ও প্রসারে কিছু কালক্ষেপণ হতো।

মিডিয়ার এই প্রাথমিক পর্বে অর্থাৎ গদ্য ও পদ্যের কালে মুসলমান বাতিল ও বিপক্ষশক্তির বরাবর ছিল। এবং এই হাতিয়ারটি তারা ব্যবহার করত খুবই দক্ষতার সাথে। কিন্তু বিগত দুই শতাব্দীকাল ধরে মুসলমান ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। ইউরোপে প্রিন্টমিডিয়ার যাত্রা শুরু হয় প্রায় চারশ বছর পূর্বে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে ইউরোপে

পত্রিকা ছাপা আরম্ভ হয়। প্রেস ও ছাপাখানা আবিষ্কার হয়ে গিয়েছিল তারও পূর্বে ১৪৫৪ খ্রিষ্টাব্দে, জার্মানিতে। খ্রিষ্টীয় উনিশ শতকে এসে লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে ছাপার কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। প্রতিটি শহর থেকে সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন এবং পত্রিকা বের হতে থাকে। এই সময়েই টেলিগ্রাফ এবং আরও কিছুকাল পরে রেডিও আবিষ্কার হয়। এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো নিজেদের আওয়াজ ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার কাজ আরম্ভ করে দেয়। খ্রিষ্টীয় বিশ শতকের শুরুর দিকে সিনেমা বের হয়ে যায়। তার কিছুকাল পরেই টেলিভিশনের আবিষ্কার দর্শকদের বিমোহিত ও বিমুগ্ধ করতে আরম্ভ করে। রেডিওর মাধ্যমে এতকাল কেবল শব্দধ্বনি শোনা যেত; যে কারণে প্রভাব অত পোক্ত ও গভীর হতো না। কিন্তু টেলিভিশন প্রকৃত অর্থেই বিরাট এক ম্যাজিক হয়ে সামনে আসে। আর তার পরবর্তীকালে ভিডিও ক্যাসেট, ভিসিআর, ডিশ এবং ক্যাবল নেটওয়ার্ক তো এক দুর্যোগের মতোই ছেয়ে যায়। একুশ শতকের শুরুর দিকে একদিকে শুরু হয় ব্যক্তি-মালিকনাধীন চ্যানেলের প্লাবন; অন্যদিকে সিডি, কম্পিউটার, মোবাইল এবং ইন্টারনেট প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়।

বর্তমান সময়ে মাত্র বিশ-শতাংশ যুদ্ধ সংঘটিত হয় রণাঙ্গনে। বাকি আশিভাগ যুদ্ধই সংঘটিত হয় মিডিয়াতে। কেননা প্রতিটি যুদ্ধের পেছনেই শক্তিশালী ও মজবুত স্নায়ু শক্ত পোক্ত প্রতিপক্ষের ভূমিকা পালন করে। সেখানে যদি স্নায়ু সঙ্গই না দেয় এবং মস্তিষ্ক ও মনন যদি নিথর হয়ে পড়ে তাহলে বড় বড় ক্ষমতাধর বাহিনীও যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়ে পড়ে। আমাদের প্রতিপক্ষ নিয়মিত আমাদের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে মিডিয়ার মাধ্যমে। এবং ব্যাপকভাবে আমাদের জাপটে ধরছে নিরাশা, ভীরুতা এবং বক্র চিন্তার আষ্টেপৃষ্ঠে।

মিডিয়াতে সরাসরি দোষারোপ কিংবা প্রত্যক্ষ চরিত্রহননের মাধ্যমে কোনো আক্রমণ করা হয় না। বরং মিডিয়ার আক্রমণ হয়ে থাকে পরোক্ষে; টেক্সট ও অডিও-ভিজ্যুয়াল সামগ্রীর আপাতনিরপেক্ষ ও উদ্দেশ্যমূলক উপস্থাপনার মাধ্যমে। কিন্তু আপাতনিরপেক্ষ এইসব তথ্য-উপাত্ত ও বিষয়বস্তু থেকে সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ক সেই ফলই বের করে, বাতিলপন্থিরা যেমনটা চায়। তারা তাদের প্রোগ্রাম এমন চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করে থাকে, মানুষের মন ও মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতন নিথর হয়ে পড়ে থাকে। আর সেই অবকাশে নিজেদের উদ্দেশ্য ও বার্তা অবেচতনভাবে তারা দর্শক-শ্রোতার মন ও মননে পোক্তভাবে বসিয়ে দেয়।

এক প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমান সময়ে রেডিও-টিভির মোট প্রোগ্রামের চল্লিশ শতাংশ বরাদ্দ থাকে নাচ-গানের জন্য। আর নাটক, সংগীত ও খেলাধুলার মধ্যে অতিবাহিত হয় আরও ত্রিশ-শতাংশ। দশভাগ সময় বরাদ্দ খবরের জন্য। পনেরো-শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয় বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের জন্য আর পাঁচ-শতাংশ রাখা হয় কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য। মোটকথা রেডিও-টিভি ইত্যাদি মাধ্যমের প্রায় পঁচাশি-শতাংশ সময় নিখাদ হারাম, অনর্থক এবং বেহুদা বিষয়ের জন্য বরাদ্দ থাকে।

নারীদের মধ্যে বেহায়াপনার বিস্তৃতি ঘটাবার জন্য সুন্দরী প্রতিযোগিতা এবং অভিনব ফ্যাশন-শোয়ের আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে শিশুদের মস্তিষ্ক প্রভাবিত করবার উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে বিভিন্ন প্রকারের কার্টুন, কমিক বুক, সিনেমা এবং ভিডিও গেম। গোমরাহি ও মূর্খতার বিস্তার ঘটাবার লক্ষ্যে সিনেমার তারকাদের নানা প্রকারের অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়ে থাকে। অনর্থক খেলাধুলার বিস্তৃতি ঘটাবার উদ্দেশ্যে খেলোয়াড়দের মাঝে বিতরণ করা হয় বড় অংকের অর্থমূল্য, বিভিন্ন প্রাইজ এবং অ্যাওয়ার্ড। মিডিয়া এই সকল অ্যাওয়ার্ড শো ও প্রাইজ প্রদান অনুষ্ঠানের সম্প্রচার করে সাধারণ মানুষের সামনে তাকে আকর্ষণীয় করে তোলে এবং তাদের সে-সব অনর্থক খেলাধুলা ও কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে সচেষ্ট হয়।

৬.২.১: মানুষের প্রকার এবং মিডিয়ার সংশয়বাদী ও প্রবৃত্তিময় ফাঁদ

মিডিয়া সাধারণ মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্য তাদের মানসিকতার গভীর বিশ্লেষণ শেষে এই পর্যবেক্ষণ হাজির করেছে যে, মানুষ দুই প্রকার :

১. দায়িত্বসচেতন।

২. দায়িত্বজ্ঞানহীন।

প্রথম শ্রেণি অর্থাৎ দায়িত্বসচেতন ব্যক্তিদের ফাঁসানো সম্ভব সন্দেহ-সংশয়ের মাধ্যমে। আর দ্বিতীয় শ্রেণি অর্থাৎ দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকেদের ফাঁদে ফেলা যাবে কাম ও প্রবৃত্তির সমুদ্রে ডুবিয়ে।

কারণ, দায়িত্বসচেতন লোকেরা সমাজের তৈরীকৃত কায়দাকানুন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনুসারী হয়ে থাকেন, নিজেদের দায়িত্ব অনুভব করেন এবং তাকে সম্পন্ন করবার জন্য নিজের আশপাশ ও অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের খবর সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকতে চান। সে-কারণে মিডিয়া তাদের জন্য সংবাদ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে, যেখানে নিয়মিত তরতাজা সংবাদ, ছবি, বিভিন্ন সম্পাদকীয়, কলাম, নিবন্ধ এবং ফিচার প্রকাশ করা হয়ে থাকে। টিভি চ্যানেল আবিষ্কারের পর সে-সবের সাথে আরও যুক্ত হয়েছে টকশোর উপস্থাপক এবং বিশ্লেষকদের নানামুখী আলোচনা। কিন্তু এই সকল খবর, টকশো ও ছবির যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে, এগুলো কেবল আশঙ্কা ও সংশয় ছাড়া আর কিছুই নয়। সংবাদপত্র পাঠের দ্বারা কিংবা টিভি চ্যানেল দেখার মাধ্যমে কোনো প্রকারের নিশ্চিত জ্ঞান বা সংবাদ কখনোই অর্জিত হয় না। বরং সন্দেহ-সংশয়ই কেবল বৃদ্ধি পায়। যদি খবর থেকে সত্যই কোনো নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করার থাকে তবে তা হলো, প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর সংবাদ থেকে নিজের মৃত্যুর চিন্তা গ্রহণ করা। এবং সরকারের গদি উলটে যাবার সংবাদ দেখে ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির লোভ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়ে যাওয়া। কিন্তু ফল তার উলটোই ঘটতে দেখা যায়। সংবাদ থেকে কোনো পাঠক বা দর্শক এমন শিক্ষা গ্রহণ করে না। তার কারণ হলো, এক সংবাদ ফুরোনোমাত্র আরেক সংবাদ এমন দ্রুত ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে সামনে আসতে থাকে

যে, চিন্তা করবার মতন সুযোগই থাকে না। মস্তিষ্ক কেবল পাঠ করতে, দেখতে এবং শোনার কাজেই ব্যস্ত থেকে যায়। আর এভাবেই একজন দায়িত্বসচেতন মানুষকে সংবাদ ও টকশোর মাধ্যমে কেবল সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত ও সংশয়বাদীই করে তোলা হয়। আখেরে তার ফায়দা কিছু হয় না।

বাকি রইলো দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক, যাদের সামনে জীবনের কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই, যারা কেবল আনন্দ-উল্লাসের মধ্যেই জীবন পার করে দিতে চায়। তাদের বিভ্রান্ত করবার জন্য বিনোদন বিভাগ (Entertainment) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিনোদনের শিরোনামে নাচ, গান, কমেডিসহ আরও নানাবিধ চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে। সিনেমা এবং নাটক এই জনরারই অংশ। বাস্তবে বিনোদনের নামে এটা প্রবৃত্তির প্রসারের একটা উদ্যোগ। টিভি সেট বা সিনেমা হলের কোনায়ও বসে যে লোকটি এমনতর বিনোদন উপভোগ করে, সেও তার মধ্যে গভীরভাবে ডুবে থাকে। আর দীন তো দূরের কথা, দুনিয়ার কল্যাণ থেকেও তারা উদাসীন রয়ে যায়।

আজকাল সিনেমার মাধ্যমেও খবরের মতো প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর কাজ করা হচ্ছে। যেমন Escape from Taliban (তালেবান থেকে পলায়ন) নামের একটি সিনেমা বানানো হয়েছে, যার গল্প সম্পূর্ণই বাস্তবতা-বিবর্জিত। কিন্তু তাতে এমনসব দৃশ্য দেখানো হয়েছে, দর্শক যা দেখামাত্র তালেবানকে ঘৃণা করতে বাধ্য হবে। একইভাবে পাকিস্তানে মুক্তিপ্রাপ্ত 'খোদা কে লিয়ে' এবং 'বোল' সিনেমা-দুটিতেও দীনদার মুসলমান এবং মুজাহিদদের চরিত্র হনন করে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ইসলামি বিধান নিয়ে উপহাস করা হয়েছে। কিন্তু সিনেমার প্রকাশ এমন জাদুকরী ছিল যে, লাখো মানুষ তা দেখে বিভ্রান্তই হয়েছে কেবল। আমাদের এই পরিস্থিতির সমাধান বের করতে হবে।

৬.২.২: আমেরিকান মিডিয়া

আমেরিকান মিডিয়া কতটা বিস্তৃত তার অনুমান করা যেতে পারে সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনের সার্কুলেশন ও প্রচারসংখ্যার মাধ্যমে। দৈনিক পত্রিকার মধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস ১৭ লাখ, ডেইলি নিউজ ১০ লাখ এবং ওয়াল স্ট্রিট জেনারেল ৭ লাখ কপি পর্যন্ত ছাপা হয়। ম্যাগাজিনের মধ্যে রিডার্স ডাইজেস্টের সার্কুলেশন আড়াই কোটি এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফির সার্কুলেশন দেড় কোটিরও অধিক। এ ছাড়াও নিউজ উইকও আমেরিকার ব্যাপক গ্রহণযোগ্য একটি পত্রিকা। দুনিয়াজুড়ে সবচাইতে বেশি দেখা হয় হলিউডের সিনেমাগুলো। সারা দুনিয়ার অধিকাংশ ইংরেজি সিনেমা এখানেই তৈরি করা হয়।

বর্তমান সময়ে আমেরিকাতে প্রায় ১১০০ টিভি চ্যানেল চলমান। টিভি চ্যানেলের মধ্যে এনপিসি, এবিসি এবং সিএনএন বিশ্বপরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিচিত। সিএনএন-এর সম্পাদকের বক্তব্য হলো :

"যখন দর্শক টিভিস্ক্রিনের এক কোনায় 'LIVE' (সরাসরি) লেখা দেখতে পায় তখন তারা কিছু সময়ের জন্য চ্যানেল পালটানো বন্ধ রাখে। এবং গভীরভাবে আমাদের চ্যানেলে প্রচারিত সংবাদ দেখতে থাকে। তাদের বিরক্তি কিংবা ক্লান্তি চলে আসার পূর্বেই আমরা আরেক সংবাদের সরাসরি সম্প্রচার আরম্ভ করে দিই।"

অনবরত যে ব্যক্তি টিভি দেখে, সে নিজের মেধা, মনন ও মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে অনুষ্ঠানের বিচার-বিশ্লেষণেই মাতোয়ারা হয়ে পড়ে। এবং সেই অনুষ্ঠানে হাজির করা প্রতিটি বার্তাই সে গ্রহণ করে নিতে থাকে অকাট্য সত্যরূপে।

৬.২.৩: ইহুদি লবি এবং মিডিয়া

এই সময়ে দুনিয়াতে সবচাইতে গ্রহণযোগ্য এবং মানোত্তীর্ণ মনে করা হয় যে নিউজ এজেন্সিগুলোকে তার অধিকাংশই ইহুদিদের। কোনো মুসলিম দেশ এখন পর্যন্ত বিবিসির মোকাবেলা করবার মতন সংবাদসংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। আমরা তাই সংবাদ ও তথ্যের সকল ক্ষেত্রে অন্যের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাদেরই সরবরাহকৃত সংবাদ শুনে থাকি এবং তারা যে সংবাদ যেই ভঙ্গিতে সম্প্রচার করে, আমরা তা গ্রহণ করে নিই। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানানো তাদের বাঁ হাতের কাজ।

বর্তমান সময়ে সারা দুনিয়ার মিডিয়ায় ইহুদিদের ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত। তাদের জগদ্বিখ্যাত প্রটোকলসমূহের ১২নং প্রটোকলে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, সারা দুনিয়ার খবরের সকল মাধ্যম ইহুদিদের কাছে থাকবে। মিডিয়ার উপর সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তারা নিম্নযুক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে নিয়েছে।

১. কোনো সংবাদ আমাদের গোচরে আসবার পূর্বে দুনিয়ার কারুর কাছে পৌঁছানো হবে না।
২. আমরা বিভিন্ন দল-উপদলের সমর্থন কিংবা বিরোধিতা করব।
৩. সাধারণ মানুষের আবেগ থাকবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে। আমরা যাদের যেভাবে চাইবো ব্যবহার করব। আর আমাদের আঙুলগুলি থাকবে জনমতের স্পন্দনের উপর।
৪. আমরা চরিত্রহীন কিংবা টাকার কাছে বিক্রি-হওয়া সাংবাদিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাব।
৫. আমরা যেই নেতাকে সামনে আনতে চাইবো, সেই সামনে আসবে। আর যাকে অপদস্থ করতে চাইবো সে-ই অপদস্থ হবে।
৬. ঘটনা যেমনই হোক, দুনিয়া তাকে সেই রঙেই দেখবে, যে রঙে তাকে আমরা রাঙিয়ে তুলবো।

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ইহুদিরা সারা দুনিয়ার নিউজ এজেন্সিগুলো নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নিয়েছে, যার মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলো রয়টার্স, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, ইউনাইটেড প্রেস এবং ফরাসি নিউজ এজেন্সি।

রয়টার্স : রয়টার্স (Reuters) ইহুদিদের সবচাইতে প্রসিদ্ধ নিউজ এজেন্সি, যার প্রতিষ্ঠাতা থমসন রয়টার্স (Thomson Reuters)। ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানের এক ইহুদি পরিবারে তার জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং ব্যাংকের লেনদেন বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে তার ধারাবাহিক প্রচার-প্রসার আরম্ভ করেন। এ কাজে তিনি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে মোটা অর্থমূল্য গ্রহণ করতেন। ধীরে ধীরে তিনি অর্থনীতির সংবাদের বাইরে রাজনীতি, যুদ্ধ, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা এবং জীবনের আনুষঙ্গিক আরও নানা বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহ করে তা প্রচার করতে থাকেন। বলা হয়ে থাকে, ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে এই সংবাদসংস্থা সেই সময়ের সবচাইতে দ্রুত বার্তাপ্রচারকের রেকর্ড তৈরি করে। এটা সেই সময়ের কথা, যখন ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের বক্তৃতা এক ঘণ্টার মধ্যে সারা দুনিয়ায় তারা পৌঁছে দেয়। রয়টার্স ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের সংবাদমাধ্যমগুলোতে সবচাইতে বেশি পরিমাণ সংবাদ সরবরাহ করে থাকে।

বর্তমানে রয়টার্সের প্রায় ১৫০০ এডিটর রয়েছে। সংবাদকেন্দ্র রয়েছে ১০০ প্রায়। ১৫০টি দেশের সংবাদমাধ্যম এই এজেন্সি ও বার্তাসংস্থা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে। এই এজেন্সি ৪৮টি ভাষায় তথ্য প্রদান করে থাকে। প্রতিদিন প্রায় ২০ থেকে ২৫ লাখ শব্দ এই সংস্থার মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় পৌঁছে যায়।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস : আমেরিকার পাঁচটি বড় দৈনিক পত্রিকা একবার চিন্তা করল, অন্যের থেকে সংবাদ কিনে আনার চাইতে আমরা নিজেরাই সংবাদ সংগ্রহ করে প্রচার করব। সুতরাং সেই ইচ্ছা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা ঐক্য গড়ে তোলে। পরিণামে ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (Associated Press) নামের একটি বার্তাসংস্থা অস্তিত্ব লাভ করে। বর্তমান সময়ে এই এজেন্সির প্রায় নব্বই-শতাংশ সংবাদকর্মী ইহুদি, যারা ৯০টি দেশে সংবাদ সরবরাহ করে থাকে।

৩ হাজার ৯৯৭টি টিভি চ্যানেল এবং রেডিওস্টেশন তাদের থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে। আমেরিকার বাইরে তাদের ৯ হাজার ৫৩৬টি তথ্যকেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে তারা সারা দুনিয়ায় রোজ প্রায় ১ কোটি ১৩ লাখ শব্দ সরবরাহ করছে।

ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল : সংস্থাটি ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিও পরিচালিত হয় ইহুদি পুঁজিপতিদের তত্ত্বাবধানে। আমেরিকাতে ১১৩৪টি দৈনিক পত্রিকা, পাবলিশিং হাউস এবং ৩ হাজার ৬৯৯টি রেডিওস্টেশনে এরা সংবাদ সরবরাহ করে থাকে। সারা দুনিয়াতে এই এজেন্সির ১৭৭টি তথ্যকেন্দ্র, আমেরিকাতে ৯৬টি শাখা এবং আমেরিকার বাইরে ৫৭৮টি শাখা কাজ করছে। ১২৪৫জন এডিটর এবং অজস্র সংবাদদাতা ও প্রতিবেদক এই সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত। দুনিয়াব্যাপী এই সংস্থার প্রতিদিন সরবরাহকৃত শব্দের পরিমাণ ১ কোটি ৮০ লাখ।

ফরাসি নিউজ এজেন্সি : ফ্রান্সে যদিও ইহুদিদের সংখ্যা খুবই কম; কিন্তু মিডিয়াগুলোর পঁচাশি-শতাংশই ইহুদিদের দখলে। ফরাসি নিউজ এজেন্সিও তাদের হাতে, যারা ৪২টি ভাষায় সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। এই এজেন্সির অধীনে তিনটি নিউজ এজেন্সি কাজ করে। এবং এজেন্সিগুলো প্রতিদিন ৩৩ হাজার ৪৪২ শব্দের সংবাদ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়।[১৪]

মোটকথা, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ আন্তর্জাতিক সংবাদই আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছয় ইহুদিদের মধ্যস্থতায়। দুনিয়াজুড়ে মিডিয়াতে ইহুদি পুঁজিপতিদের ইজারাদারির অংশ নব্বই-শতাংশ। বিবিসির প্রতিষ্ঠাতা যদিও ইহুদি ছিলেন না; কিন্তু বিগত ৫০ বছর ধরে লাগাতার তার কর্তাব্যক্তির দায়িত্ব পালন করে আসছে ইহুদিরাই। বিগত এক শতাব্দীকালে পৃথিবীর যেখানে কোনো প্রভাবশালী মিডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইহুদিরা তাকে নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছে। লন্ডনের বিখ্যাত পত্রিকা লন্ডন টাইমস ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রকাশ হচ্ছে। কিন্তু ৫০ বছর পূর্বে একজন ইহুদি পুঁজিপতি সেটা কিনে নেয়। একইভাবে ব্রিটেনের সানডে টাইম, উইকেন্ড, সিটি ম্যাগাজিন সব ইহুদিদের দখলে।

আমেরিকাতেও ইহুদিরা গ্রহণযোগ্য সব প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া কিনে নিয়েছে। এই উদ্যোগের সূচনা ঘটে ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে। সেই সময় আমেরিকার কিছু বুদ্ধিজীবী ইহুদিদের এই কাজের সমালোচনা করেন। কিন্তু ফল হয়, যেই পত্রিকাতে এই সকল সমালোচনা প্রকাশ পায়, ইহুদিরা সেই পত্রিকাগুলো বন্ধ করে দেয়। সুতরাং আমেরিকান মিডিয়া, যার ভিত্তি পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার উপর, বিগত পাঁচ-ছয় দশক ধরে তা ইহুদিদের বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আমেরিকান পত্রপত্রিকা ও বার্তাসংস্থার মালিকদের কিছু বিশেষ পলিসি আছে। পৃথিবীর যেখানেই কোনো ঘটনা ঘটে, সেটাকে সেই পলিসির সামনে রেখে এক বিশেষ আন্দাজে হাজির করে। জনমত তার পক্ষে হোক কিংবা বিপক্ষে। সেই বিশেষ পলিসির মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো :

১. খ্রিষ্টান এবং ইহুদি শক্তির ঐক্যে কখনো আঘাত আসতে দেওয়া যাবে না।
২. তারা সবসময় মার্কিন রাজনীতির মুখপত্রের ভূমিকা পালন করে যাবে।
৩. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ওকালতি ত্যাগ করা যাবে না। সর্বদা পুঁজিবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে।

আমেরিকা এক দফাতেই ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পড়েনি। বরং ইহুদি মিডিয়া তাকে ধীরে ধীরে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আক্রমণের পর এই মিডিয়াগুলোই সারা দুনিয়াকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছে। এবং বিষাক্ত প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে সারা দুনিয়াতে এটা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে

---

[১৪] মাগরিবি মিডিয়া অওর উসকে আসারাত, পৃষ্ঠা : ১১৩

যে, মুসলমান সন্ত্রাসবাদী। পরিণামে মুহূর্তেই সারা দুনিয়া কোনো প্রকার সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই তালেবান ও আল-কায়েদার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়।

মিডিয়াতে ইহুদিদের ইজারাদারির কারণেই হলোকাস্ট (The Holocaust) কেউ পছন্দ করুক কিংবা না করুক, তাকে সত্য হিসেবে মানুক বা না মানুক, সত্য হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। হলোকাস্ট দ্বারা উদ্দেশ্য হলো (ইহুদিদের দাবি অনুযায়ী) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিতে ৫০ লাখ ইহুদি নিধন। কিন্তু গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই ঘটনা ইতোমধ্যে মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেছে। কারণ, এত বিপুল সংখ্যক ইহুদি জার্মানিতে সেইকালে ছিলই না। কিন্তু ইহুদিরা হলোকাস্টের মিথ্যাচার নিয়ে কোনো রিপোর্ট মিডিয়াতে আসতেই দেয় না। কিছু ওয়েবসাইট এই মিথ্যার পর্দা উন্মোচন করতে চেয়েছিল বটে; কিন্তু সেগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ফিলিস্তিনে একটি বোমা হামলায় ৬০জন ইহুদি মারা যায়। তখন এক সপ্তাহের মধ্যে সকল আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আকাশ মাথায় তুলে নেয়। কিন্তু জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ইরাকে খাদ্য এবং ওষুধপথ্য সরবরাহে নিষেধাজ্ঞার কারণে যখন ৬ লাখ ইরাকি শিশু ধুকে ধুকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তখন এই আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলো আশ্চর্য নীরবতা পালন করে। অমন নির্মমতার প্রতিবাদে কোনো ধরনের প্রতিবেদন তারা প্রকাশ করেনি।

৬.২.৪: নেতৃত্ব তৈরিতে মিডিয়ার ভূমিকা

মিডিয়াতে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর ইসলামের বিপক্ষশক্তির জন্য এটা অনায়াস হয়ে পড়ে যে, সে তার পছন্দমাফিক নেতৃত্বই কোনো দেশের সরকার-ব্যবস্থায় আসীন করবে। মিডিয়ার মাধ্যমে সে যাকে ইচ্ছা নেতা হিসেবে হাজির করে; বদনাম রটিয়ে যাকে ইচ্ছা রাজনীতির দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেয়। পরিণামে মুসলমানের প্রকৃত, একনিষ্ঠ এবং যোগ্য প্রতিনিধিগণ রাজনীতির ময়দানে পেছনেই থেকে যায়। আর প্রথম সারিতে চলে আসে কৃত্রিম ও অযোগ্য নেতার দল।

যেমন মুসতফা কামাল পাশার মতন ভুয়া নেতাকে মিডিয়ার মাধ্যমেই দুনিয়াজুড়ে গ্রহণযোগ্যতা দেওয়া হয়েছে। এমনকি আবুল কালাম আজাদের মতন মানুষও পশ্চিমা মিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আল-হেলালের বিভিন্ন সংখ্যায় তার স্তুতি গেয়েছেন। কেননা তার কাছে পৌঁছানো তথ্যগুলো এসেছিল বিদেশি মিডিয়ার মাধ্যমে। এই একই কথা বলা যায় লিবিয়ার শিয়া-নেতা হাসান নাসরুল্লাহর ব্যাপারে, যাকে পশ্চিমা মিডিয়া সমগ্র আরবের নেতা হিসেবে প্রসিদ্ধি পাইয়ে দেয়; অথচ বাস্তবতা হলো হাসান নাসরুল্লাহকে তার দেশ লেবাননেরই আহলে সুন্নাহর সাধারণ জনগণ ভীষণ অপছন্দ করে। এই একই পদ্ধতিতে পাকিস্তানে তাহের আল-কাদরিকে রাতারাতি খ্যাতির আসমানে তুলে ধরার পেছনের আসল কলকাঠি নেড়েছে ওই পশ্চিমা মিডিয়াই।

৬.২.৫: মিডিয়ার নিকৃষ্ট ব্যবহার, বাকস্বাধীনতার নামে রাসুলের অবমাননা

পশ্চিমা দুনিয়ার পত্রপত্রিকা এবং ওয়েবসাইটগুলোতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অবমাননাকর কিছু প্রকাশ করবার পর যখন সমগ্র ইসলামি বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে তখন বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্র এই চিন্তায় ভাবিত হয়ে পড়তে বাধ্য হন যে, পশ্চিমের তো উচিত ইসলামি বিশ্বে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ, মিশনারি কার্যক্রম এবং বিশ্বায়নের পূর্ণতা প্রদানের লক্ষ্যে মুসলমানদের গভীর নিদ্রায় বিভোর রাখা। তাহলে তারা বারবার ঘৃণার আগুন উসকে দিয়ে ইসলামি বিশ্বে কেন আলোড়ন সৃষ্টি করে? নবীজির শানে ধৃষ্টতা দেখিয়ে কেন মুসলমানদের ঘুম ভাঙিয়ে তোলে? এসব কাজকর্ম না করেও তো তাগুতি শক্তি ইসলামি বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত তাদের উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন ঘটাতে পারে! তাদের মিশনারি সংস্থা ইসলামি বিশ্বের প্রতিটি শহর, উপশহর এবং প্রত্যন্ত গ্রামে কাজ করে অসংখ্য মানুষকে মুরতাদ বানিয়ে ফেলছে। তাদের মিডিয়াগুলো সেই সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রসার ঘটাচ্ছে, যার উৎসের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। এবং মুসলিমবিশ্বে প্রতিদিন তার গ্রহণযোগ্যতা অর্জন হচ্ছে। বরং ইসলামি বিশ্বের মিডিয়াগুলোও কমবেশি তাদের পথেরই অনুসরণ করে চলেছে। ভৌগোলিকভাবে ইসলামি দেশের সীমানা প্রতিদিন বিক্ষত হয়ে উঠছে। ফিলিস্তিন, কাশ্মির, আফগানিস্তানসহ মুসলিমবিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো পশ্চিমা শক্তি কিংবা তাদের সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে বারবার এই ধরনের কাজের মাধ্যমে ইসলামি দেশগুলোকে কেন উত্তেজিত করে তোলা হচ্ছে? এমন পরিস্থিতি তো পশ্চিমা দুনিয়ার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থি এবং তাদের সকল পরিকল্পনায় পানি ঢেলে দেওয়ারই নামান্তর!

এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা ডেনমার্কের জঘন্য পত্রিকা জেলান্ডাস পোস্টেন (Jyllands-Posten)-এর এডিটর ফ্লেইমিং রোজের একটি রচনার উপর চোখ বুলাতে পারি, যাতে তিনি সেই নিকৃষ্ট কাজের ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। এই উদ্ধৃতি থেকে ইসলাম এবং ইসলামের নবী সম্বন্ধে পশ্চিমাদের চিন্তাধারা ও মানসিকতা কেবল অনুমান করতেই আমরা সমর্থ হবো না; বরং স্পষ্টভাবে এটাও বুঝে নিতে পারব যে, তারা এই বিষয়ে মুসলমানকে কী পরিমাণ অনুভূতিহীন ও নিষ্প্রাণ দেখতে চায়। নির্লজ্জ এই সম্পাদক লিখেছেন :

"কার্টুন প্রকাশের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামিক ইস্যুতে কথা বলার যে প্রতিবন্ধকতা—তার ভয় আমার ভেতর কাজ করছিল। এই প্রতিবন্ধকতার কারণেই ইউরোপের বিভিন্ন বিষয়ে স্ব সেন্সরশিপ তৈরি হয়ে গেছে। আমি মনে করি, আমাদের ইউরোপিয়ানদের এই বিষয়টি সাহসের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। ইসলামের বিষয়ে মুক্তমত দেয়া যাবে না, স্বাধীনভাবে কথা বলা যাবে না—এই ভয় ও বাঁধাগুলোকে দূর করে ফেলতে হবে। আর এই লক্ষ্যে 'মধ্যপন্থি' মুসলমানদের এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলবার জন্য উৎসাহ দিয়ে যেতে হবে।"

উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে এই বিষয়টি স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিমা মিডিয়া নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর প্রতি আদব ও সম্মানের আবশ্যিক ব্যাপারটা আমলে নিতে একদমই প্রস্তুত নয়। তারা তাকে ভয় ও আতঙ্কের অধীন সৃষ্টি হওয়া 'স্ব সেন্সর'র নাম দিতে ইচ্ছুক। এবং তারা এই প্রতিবন্ধকতা বা সেন্সরটির পরিবর্তন ও তাকে পরিত্যাগ করবার দাবি করে। যাই হোক, পশ্চিমা মিডিয়া প্রত্যাশা করে ইসলাম এবং ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের প্রচলন এমন ব্যাপক হয়ে উঠুক, যাতে করে কেউ সে ব্যাপারে আর আপত্তি না করে। কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে না পারে। কারুর কোনো প্রকার জবাবদিহিতার ভয় যেন না থাকে। কেবল এই নয়; বরং তাগুতের এই এজেন্টদের আরও প্রত্যাশা, বাকস্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার নামে বেয়াদবি ও অশোভন আচরণের এই ব্যাকটেরিয়া মুসলমানদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ুক, যেন তারা কেবল নামসর্বস্ব মুসলমানও আর না থাকে। বরং প্রকাশ্যেই কাফির, মুরতাদ, নাস্তিক ও বেয়াদব হয়ে ওঠে।

এডিটর এই সূত্র ধরে দুর্ভাগা কার্টুনিস্টের দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ করে লেখেন :

"আমরা আপনাদের (ইউরোপিয়ান মুসলমান) বিদ্রুপ ও উপহাসের এই ট্রাডিশনে শামিল করছি; কেননা আপনারা আমাদেরই সোসাইটির একটি অংশ। বহিরাগত কেউ নন।"

কল্পনা করুন, কত নির্লজ্জতার সাথে এই ঘৃণিত মানুষটি স্বয়ং মুসলমানদেরই আহ্বান জানাচ্ছে নবীজিকে অসম্মান করার মতন ভয়ানক অপরাধে অংশ নেওয়ার জন্য। এবং এই বিষয়ে নম্রতা অবলম্বনকারী মুসলমানকে মধ্যপন্থি বলে সম্বোধন করছে। অপমানজনক কার্টুন-চিত্রটি প্রকাশ হবার পর বিবিসিসহ পশ্চিমা মিডিয়ার বিভিন্ন টিভি চ্যানেল এবং সংবাদপত্র 'মধ্যপন্থি মুসলিম চিন্তাবিদ' হিসেবে এমনসব ব্যক্তিবর্গকে সামনে এনেছে, যাদের আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পূর্ণতই নাস্তিকসুলভ, যারা সালমান রুশদি এবং তসলিমা নাসরিনদের শ্রেণিভুক্ত। পশ্চিম নবীজির অবমাননার এই ঘটনার বিষয়ে তাদের ঈমানবিধ্বংসী চিন্তাভাবনার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছে। তারা সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছে যে, মুসলমানদের এই বিষয়ে কোনোভাবেই আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করা অনুচিত। বরং ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে পশ্চিমের কর্মকাণ্ড নিয়ে তাদের ভাবনা-চিন্তা করা দরকার। এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বৈশ্বিক ধারার সাথে সম্পৃক্তও হওয়া দরকার।

এই কার্টুন-চিত্র প্রকাশ যে এক দীর্ঘ পরিকল্পনার অংশ, তার প্রমাণ স্বয়ং এডিটরের এই বক্তব্য, যা তিনি উল্লিখিত পরিস্থিতির বয়ানের পর উল্লেখ করেছেন :

"আমি ড্যানিশ কার্টুনিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের আহ্বান জানিয়েছি, যেন তারা নিজেদের চিন্তামাফিক নবী মুহাম্মদের চিত্রাঙ্কন করে।"

আর এটা তো স্পষ্টই যে, কার্টুনিস্টদের কোনো ব্যক্তির কার্টুন অঙ্কনের আহ্বান জানাবার উদ্দেশ্য তাকে অপমান বৈ কী হতে পারে! গোস্তাখে রাসুল এডিটর স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, তিনি জানতেন—এই কাজের মাধ্যমে মুসলমানেরা খুবই ব্যথিত হন, তারপরও বলেছেন :

"আমরা এই ধরনের কন্টেন্টই কেবল নয়; বরং ব্যথাজাগানিয়া কন্টেন্টও প্রকাশ করবার অধিকার রাখি। এবং তার জন্য সামান্যও অনুতপ্ত নই।"

মোটকথা, পশ্চিমা মিডিয়া যেকোনো মূল্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, ইসলাম ও ইসলামের নবীর ব্যাপারে আদব-সম্মান এবং শিষ্টাচারের যে পরিবেশ তৈরি আছে, তাকে নিঃশেষ করে দেবার উদ্যোগ তারা ত্যাগ করবে না। নবীজির শানে তারা আঘাত করেই যাবে। তার প্রধান ও মৌলিক কারণ এই সম্পাদকের কলম থেকেই জানা যায় :

"কোল্ড ওয়ারের শিক্ষা হলো, যদি আমরা একবার পরম স্বার্থপরতার উপর নির্ভরশীল আবেগের কাছে পরাস্ত হয়ে পড়ি তাহলে প্রত্যাশা ও চাহিদা বাড়তেই থাকবে। পশ্চিম কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ুযুদ্ধে এ কারণেই জয়ী হতে পেরেছিল; কেননা আমরা আমাদের মৌলিক নীতির উপর অবিচল ছিলাম। এবং স্বৈরাচারী একনায়কদের খুশি করতে চাইনি।"

এই প্রবন্ধ কি একথাই স্পষ্ট করছে না যে, পশ্চিম মুসলমানদের চতুর্দিক থেকে শোষণ করবার পরও তাদের তরফ থেকে কেবল ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার আওয়াজকে 'পরম স্বার্থপরতা' মনে করছে। এর স্পষ্ট অর্থ হলো, পশ্চিমা শক্তি মুসলমানকে একদমই পোকা-মাকড়ের মতন মূল্যহীন গণ্য করে। তাদের কোনো অধিকার পশ্চিমের কাছে আদৌ মূল্য রাখে না। পশ্চিমের মতে মৌলিক অধিকার এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের লক্ষ্যে উচ্চকিত আওয়াজও এমনভাবে মিটিয়ে দেওয়া দরকার, যেভাবে কোনো অত্যাচারী ও নিপীড়কের নিরঙ্কুশ অত্যাচার মিটিয়ে দেওয়া হয়। হাহ! এর চাইতে বিদ্রূপাত্মক আর কী হতে পারে; এমন প্রকাশ্য নিপীড়ন সত্ত্বেও পশ্চিমারা সহনশীলতা এবং সহিষ্ণুতার দাবি করে! পশ্চিমের বুদ্ধিজীবীদের এই পরিমাণ নীচ মানসিকতার পরও কি আমরা তাদের থেকে কোনো ধরনের কল্যাণের আশা করতে পারি!

যাই হোক, এই সকল শয়তানি কৌশল প্রয়োগের পরও মুসলমানদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি যে আবেগ, পশ্চিম তাতে বিন্দুমাত্র ঘাটতি তৈরি করতে পারেনি—এই বিষয়টি অত্যন্ত প্রশান্তির। বরং আমরা দেখি—এই আঘাতের কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাধারণ মুসলমানের প্রেম ও ভালোবাসা আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে। সারা দুনিয়ার মুসলমান এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার বিপুল প্রতিবাদের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছে, তারা পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণের পরও এতটা দিগভ্রান্ত হয়নি যে, নিজেদের প্রেমাস্পদের নামের আদব ও মর্যাদা পর্যন্ত ভূলুণ্ঠিত করে বসবে।

একজন বেয়াদব, লাগামহীন, মৃতহৃদয় ও কলুষমনের কলমবাজ তাকে যতই বুদ্ধিবৃত্তি কিংবা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নাম দিক, তাকে মধ্যপন্থা বলুক কিংবা এনলাইটেনমেন্ট, তার উপর স্ব সেন্সর লেবেল লাগিয়ে দিক কিংবা তাকে পরম স্বার্থপরতার উৎসাহ বলে ব্যক্ত করুক, মুসলমান কোনোভাবেই নবীজির শানে বেয়াদবি মেনে নিতে পারে না। একজন মুসলমান, সে যেভাবেই জীবনযাপন করুক না কেন, যতই পাপী, মদ্যপ এবং আয়েশি হয়ে উঠুক না কেন, এই ঘৃণ্য কাজটি সে নবীজির শানে বেয়াদবি বলেই নির্দেশ করবে। সে নিজের প্রিয়তমের জন্য নিজের প্রাণ হাতে করে ময়দানে নেমে আসে। তার এই অনুভূতি আছে যে, সে গুনাহগার, সে পাপী ও দুষ্ট। সে আল্লাহর চোখে অপরাধী-এই বোধও তার রয়েছে। এটাও তার অজানা নয় যে, তাকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুতকারী শয়তানের এজেন্ট এই পশ্চিমা মিডিয়ারই হর্তাকর্তারা। সে এই সবকিছু জানা সত্ত্বেও দিনরাত তাদের হাতেই বন্দি থাকে। ইসলামি বেশভূষা, পোশাক-পরিচ্ছদ সব তাদের জন্যই বিসর্জন দেয়। কিন্তু যখন সে দেখে, এই দুর্ভাগাদের হাত নবীজির মর্যাদার দিকে ছুটছে তখন সে আর বরদাশত করতে পারে না। পশ্চিমের নেশা মুহূর্তেই কেটে যেতে থাকে। ঈমানের অঙ্গার, যার উপর অজস্র পাপের ছাই জমেছে, ঈমানি আভিজাত্যের এক ঝড়ে মুহূর্তেই তা ঝলসে ওঠে এবং পরিণত হয় জ্বলন্ত অগ্নিশিখায়। তারপর ইউরোপের পণ্যসামগ্রী জঞ্জালের মতন আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হতে দেখা যায়। সড়ক মহাসড়ক প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সরব ও মুখরিত হয়ে ওঠে। তারপর প্রকাশ্য লিবারেল মুসলমানদেরও 'চরমপন্থিদের' সাথে দেখা যেতে আরম্ভ হয়। এসব ঘটতে শুরু করে যখন, তখন পশ্চিমের প্রতিটি দুর্ভাগাকে বলতে হয় :

> "সমস্ত মধ্য-এশিয়া এবং এশিয়াতে যে ব্যথাজাগানিয়া দৃশ্যের অবতারণা ঘটেছে সে বিষয়ে আমরা অবগত ছিলাম না। আর না আমরা এমনটা প্রত্যাশা করি। আমাদের পত্রিকাকে ১০৪টি হুমকি পাঠানো হয়েছে। দশজন জেলখানায় আছে। হত্যার হুমকি পাওয়ার কারণে কার্টুনিস্ট আত্মগোপনে আছে। জেলান্ডাস পোস্টেন পত্রিকার হেডকোয়ার্টার বোমা হামলায় উড়িয়ে দেবার হুমকি পাওয়ার কারণে কয়েকবার খালি করে ফেলা হয়েছে। এমন পরিবেশে সেন্সরশিপকে নরম করা সম্ভব নয়।"

সর্বোপরি এমন কেনই-বা হবে না! পবিত্র 'কমলে' কলঙ্কের দাগ লাগাবার অপচেষ্টা করবার পর কেউ শান্তিতে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে কীভাবে থাকতে পারে! আসমানের দিকে থু-থু ছিটালে তা তো নিজেরই গায়ে এসে পড়ে!

৬.৩: জ্ঞানের উৎস

দুনিয়ার মানুষের জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহের উৎসের উপর পশ্চিম একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। প্রতিটি সংবাদ এবং অনুসন্ধানযোগ্য প্রতিটি জিনিস তাদেরই ছাঁচে পরিবেশিত হয়ে তাদেরই উদ্দেশ্যমাফিক সকলের সামনে হাজির হয়। পশ্চিম নলেজ বা তথ্যের উৎসগুলো নিজেদের হাতেই রেখে দিয়েছে। যেকোনো বিষয়ের

যেকোনো তথ্য সন্ধান করতে গেলে সাধারণত আমরা পশ্চিমা লেখক, পশ্চিমা লাইব্রেরি, পশ্চিমা বিশ্বকোষ এবং তাদেরই ওয়েবসাইট ইত্যাদির মুখোমুখি হই। আর এই উৎসগুলোতে এই সকল বিষয়ের পূর্ণ লক্ষ রাখা হয় যে, পাঠকের মেধা ও মনন যেন বস্তুবাদের মধ্যেই আটকে থাকে। কোনোভাবেই যেন রুহানিয়্যাত-আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম এবং সৃষ্টিকর্তার অভিমুখী হতে না পারে।

তথ্যের এই প্লাবন প্রচারমাধ্যমের সহায়তায় অর্থাৎ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাহায্যে কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এমনকি স্বয়ং ধর্মীয় এবং ইসলামপ্রেমী মানুষদেরও এইসব তথ্যের দরকার পড়ে। এই প্রয়োজনের ফায়দা উঠিয়ে সাধারণ মানুষকে ধর্মহীনতার প্রতি আহ্বানকারীরা কোনো-না-কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে সফলতা লাভ করে এবং ধীরে ধীরে তারা অন্যান্য উদ্দেশ্যেও কামিয়াবি পেয়ে যায়। এইসব উৎসের সংস্পর্শের পরিণামে এতটুকু তো অবশ্যই ঘটে যে, সাধারণ মানুষ বিধর্মী লেখক, সাংবাদিক এবং গবেষকদের শাস্ত্রীয় দক্ষতা ও কার্যক্রমে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এবং পরবর্তী সময়ে তাদের বহু চিন্তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করে বসে।

মিডিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত হয়ে নতুন বইপত্র, গবেষণাপ্রবন্ধ এবং নিত্যনতুন বিশ্বকোষের আকার লাভ করছে। মানবীয় তথ্য ও জ্ঞানের এই ভান্ডার বইপত্র, লাইব্রেরি, সিডি এবং ওয়েবসাইটগুলোতে স্থানান্তরিত হয়ে বহু বছরের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে।

আর এ কারণেই পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, আজ যদি কোনো মুসলমান সাংবাদিক বা গবেষক এমন কোনো বিষয়েও কাজ করতে চান, যার মাধ্যমে পশ্চিমের দ্বৈত নীতি ও ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে পড়বে তবে তাকে সাধারণত পশ্চিমের প্রস্তুতকৃত ওইসব ডাটা ও তথ্যভান্ডারের উপরই নির্ভর করতে হবে, যেগুলো শুধু একতরফা তথ্যে ভরপুর। পশ্চিমের বিশ্বকোষগুলোতে আজও কাশ্মিরকে ভারতের অংশ দেখানো হয়। এবং ইসরাইলকে একটি বৈধ রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া হয়।

৬.৪: রাজনীতি

পশ্চিমা চিন্তাধারা ও দর্শনের প্রসারের জন্য রাজনীতি একটি বড় মাধ্যম। বাতিল শক্তি সেই শুরু থেকেই মুসলিম খলিফা ও সুলতানদের শান-শওকত দেখে শঙ্কিত ও ভীত-বিহ্বল ছিল। ইউরোপে গির্জা এবং শাসকদের দ্বন্দ্ব থেকেও এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, রাষ্ট্রশক্তি এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতার মালিক যদি এক ব্যক্তিই হয়ে পড়ে তাহলে কোনো দেশে নিজের চিন্তাধারার প্রসার ঘটানো খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। বাদশাহ এবং খলিফাদের বংশপরম্পায় চলে আসা ধর্মীয় সম্পর্ক সাধারণত কোনো নতুন চিন্তা বা দর্শনের প্রসার কিংবা মুক্তচিন্তার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সাধারণ নেতৃবৃন্দকে সামনে আনার একটা আয়োজন সম্পন্ন করা হয়, যে নাটকের প্রথম প্রদর্শনী সম্পন্ন হয় ফ্রান্সের রঙ্গমঞ্চে। তারপর এই শাসনপদ্ধতি ব্রিটেন এবং অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশেও গ্রহণযোগ্যতা লাভ

করে। দেখা যায়, যেখানে গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা অর্জিত হচ্ছে সেখানেই গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে ধর্মের চাদর। এই সফল অভিজ্ঞতার পর মুসলিম দেশগুলোতেও গণতন্ত্রের নাট্যমঞ্চ প্রস্তুত করা হতে থাকে। এবং এর মাধ্যমে বাতিল শক্তির জন্য সেখানে নিজেদের এজেন্ডদের সক্রিয় করে তোলা এবং তাদের মাধ্যমে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের পথ অনায়াস হয়ে ওঠে।

দেখা যায় প্রতিবছর মুসলিম-দুনিয়ার রাজনীতির কেন্দ্রে এবং প্রধান সব পদে তারাই আসছেন, যারা দেশি কিংবা বিদেশি আধুনিক ও সেক্যুলার শিক্ষাধারা থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ পশ্চিমা বিদ্যাপীঠ থেকে প্রস্তুত হয়ে এক বিশেষ চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি সাথে করে নিয়ে আসে। আর তারপর পশ্চিমের ইচ্ছানুযায়ীই প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। প্রায় এক শতাব্দীকাল যাবৎ আমাদের উপরতলার নেতৃবৃন্দ হিঁসেবে আমরা তাদেরকেই পেয়ে আসছি, যারা ইউরোপ-আমেরিকা থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছেন। যদিও তাদের মধ্যে কদাচিৎ ডক্টর ইকবালের মতন দুয়েকজন ব্যক্তি এমন দেখা গেছে, যারা মাথা উঁচু করবার লক্ষ্যে কাজ করেছেন। কিন্তু তার মূলে হয়তো-বা ছিল তার বংশগত ধর্মীয় আবহের প্রভাব। কিংবা আলেমদের সাথে তার সম্পর্কের দৃঢ়তা। বর্তমান সময়ে ইসলামি বিশ্বের অধিকাংশ রাজনীতিবিদ পশ্চিমের অনুগত এবং সেক্যুলারিজমের পতাকাবাহী হিসেবে চিহ্নিত। আর তাদের এই সেক্যুলার চিন্তা-দর্শনের প্রসারের কারণেই ওইসব ক্ষতি—যা মানুষের সীমাবদ্ধ চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জন্ম নেয়—সামনে আসছে।

পশ্চিমা বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য—যেন কোনো স্বৈরাচারী শাসক কিংবা কট্টরপন্থি ধর্মীয় নেতা সমাজের চয়েজের পথে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। এবং সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির পথে বাঁধা হয়ে না ওঠে। পশ্চিমে সাধারণ মানুষকে অধিকার দেওয়া হয়, তারা দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে, আইনকানুন সামনে এগিয়ে নিতে, সমস্যার সমাধানে এবং নতুন সরকার নির্বাচনের জন্য ভোটের অধিকার প্রয়োগ করবে। এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজেদের পছন্দমাফিক ব্যক্তিকে ক্ষমতায় রাখবার চেষ্টা করবে। এই গণতন্ত্র পশ্চিমের দীনহীন সমাজকে স্বৈরাচার থেকে উদ্ধার করেছে। এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ ও খুনখারাবির হাত থেকে রক্ষা করে সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে উঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই সাথে এই নতুন ও শক্তিধর শাসকগোষ্ঠী বহির্বিশ্বের জন্য আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধরে সামনে আসে। এবং তাদের সমস্ত দৃষ্টি বহির্বিশ্ব জয় করবার বাসনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

পশ্চিম যখন প্রাচ্যে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটায় তখন তাদের লক্ষ্য ছিল এর মাধ্যমে প্রাচ্যের দেশগুলো দুর্বল করে ফেলা এবং তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা। আর এরপর গণতন্ত্র যখন ইসলামি দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠা পেলো, তখন এখানে ঐক্য-সংহতি এবং উন্নতি-অগ্রগতির কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। বিপরীতে বরং অনবরত রাজনৈতিক অধঃপতন চোখে পড়তে লাগলো। এখানকার গণতন্ত্র ধান্ধাবাজি,

লুটপাট, দুর্নীতি, অনিয়ম এবং বিবেক বিক্রির বাজারে পরিণত হলো। এখানে নির্বাচনের সময় জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের সাফল্যের জন্য পর্যাপ্ত মূলধন ও দুর্দান্ত প্রচারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। আর এই সুযোগে বহু রাজনীতিক বাইরের দেশের সাথে গোপন সম্পর্ক তৈরি করে নেয়। বহিঃরাষ্ট্র তাকে নিজেদের পছন্দমাফিক শর্তানুযায়ী মোটা অংকের অর্থসহায়তা প্রদান করে এবং মিডিয়াতে তাকে প্রসিদ্ধ করে তোলে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের সময় নিজেদের ইশতেহার, চিত্তাকর্ষক প্রতিশ্রুতি এবং অঙ্গীকারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করে নেবার চেষ্টা করে। এবং যতদূর সম্ভব হয় নির্বাচনের দিন অনিয়ম করে নিজেদের জয় নিশ্চিত করে নেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে।

এই অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে জয়ী-হওয়া রাজনীতিক জনপ্রতিনিধি হিসেবে আইনপরিষদে পৌঁছে যায়, যাকে পার্লামেন্ট (নিম্নকক্ষ) এবং সিনেট (উচ্চকক্ষ) বলা হয়। এই কক্ষ-দুটি দেশের শাসনব্যবস্থার জন্য আইনপ্রণয়ন করবার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু কক্ষ-দুটি তাদের দায়িত্ব খুব সামান্যই পালন করতে পারে।

মুসলিমবিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পূর্বে খুব সরল ছিল। তা সম্পৃক্ত ছিল শুরায়ী ব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিচালিত খেলাফতের সাথে। যখন সেই ব্যবস্থা নির্মূল করে দুর্নীতিগ্রস্ত গণতন্ত্রকে প্রসারিত করা হলো তখন বহু মুসলিম দেশেই ইসলামবিরোধী আইন বাস্তবায়ন করা সহজ হয়ে পড়ে। কেননা গণতান্ত্রিক দর্শন আইনপ্রণয়নের অধিকার বাস্তবায়ন করবার কথা বলে। এমন অধিকার—যার অধীনে মানবিক সমাজ মতপ্রকাশের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে যেকোনো আইন বাস্তবায়ন করে ফেলতে পারে; সে আইন সমস্ত আসমানি ধর্মের স্বীকৃত মূল্যবোধ ও বিধানের বিপরীত হলেও!

পাকিস্তানের আইনে নির্ধারিত কিছু ধারার কারণে দেশে ইসলামি নিদর্শন এবং বিধানের সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে, যা প্রবীণ ও বরেণ্য আলেমদের বিপুল পরিশ্রমের ফল। নতুবা সিরিয়া, জর্ডান, মিশর, তিউনিস এবং আরও বহু মুসলিম দেশে ইসলামি শরিয়তকে সম্পূর্ণতই বিদায় করে দেওয়া হয়েছে।

৬.৫: আইন

ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও দর্শন প্রসারের চতুর্থ বড় মাধ্যম হলো ইসলামবিরোধী আইন। ইসলামের সাড়ে তেরোশ বছরের ইতিহাসে এমন কোনো অবকাশ আসেনি যে, মুসলিমজাতি ইসলামি শরিয়তের বাইরে অন্য কোনো বিধান গ্রহণ করেছে। শরিয়তের প্রধান ভিত্তিই اَلْحُكْمُ لله (বিধান আল্লাহর)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামি বিশ্বে সবসময়ই কেবল ইসলামি বিধানই চালু ছিল। এবং বিচারবিভাগের সকল কর্মকাণ্ড ইসলামি বিধান অনুসারেই পরিচালিত হতো। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ

"তোমার রবের শপথ, এই লোকেরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তারা নিজেদের বিবাদের সমাধানে আপনাকে ন্যায়বিচারক না মানবে। এবং তারপর আপনার সিদ্ধান্তে কোনো সন্দেহ-সংকীর্ণতা রাখবে না।"[৯৫]

সুতরাং মুসলমানদের জন্য শরিয়ত ব্যতিরেকে আর কোনো বিধান গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু পশ্চিম ইসলামি বিশ্বের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দমাফিক শাসকদের ক্ষমতায় বসিয়ে রেখেছে। আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল প্রতিষ্ঠানে নিজেদের সমচিন্তার লোকদের প্রবেশ ঘটিয়েছে। এই কাজটি একবারে সম্পন্ন হয়নি। বরং হয়েছে ধীরে ধীরে। প্রথমে তার জন্য শিক্ষা ও রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। এরপরে ব্যক্তি তৈরি করে আইনপ্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠানো হয়েছে। সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রণীত আইন আবার বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে আদালত, বিচারবিভাগ এবং ব্যুরোক্রেসির মাধ্যমে।

আদালত এমন প্রতিষ্ঠান, যেখানে দেশে প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তি করা হয়। দেড় শতক পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র ইসলামি বিশ্বের আদালতে কেবল ইসলামি ফিকহের অনুসারেই বিচার করা হতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে আদালতে যেসব আইন বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে, তার অধিকাংশই পশ্চিমা আইনকানুনেরই প্রতিচ্ছবি মাত্র। দীর্ঘকাল ধরে অধিকাংশ মুসলিম দেশেই ফিরিঙ্গিদের সেক্যুলার আইন এবং তাদেরই বিচার-ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। ইসলামি বিশ্বে প্রকাশ্যেই ইসলামি দণ্ডবিধির লঙ্ঘন করা হচ্ছে। কিন্তু তাতে কোনো বাধা-বিপত্তি আরোপ করা হচ্ছে না। কারণ সেক্যুলার এবং লিবারেল বিধানে তাকে অপরাধ বলে মনেই করা হয় না।

ইসলামি বিধানের অচলাবস্থার কারণে ফকিহ, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস এবং আলেমদের সাড়ে তেরোশ বছরের পরিশ্রমে পানি ঢেলে দেওয়া হয়েছে। যদিও দীনি মাদরাসাগুলোতে ইসলামি বিধানের পঠন-পাঠন চলছে; কিন্তু কার্যত কিছু ইবাদত ছাড়া অবশিষ্ট বিধানের কোনো প্রয়োগক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজনীতি, সমাজনীতি এবং অর্থনীতির কোথাও কার্যত ইসলামি মূলনীতির কোনো প্রয়োগ নজরে পড়ে না।

৬.৫.১: ব্যুরোক্রেসি

বিচারবিভাগ দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী যে ফায়সালা দেয়, তাকে বাস্তবায়নের কাজটি করে থাকে ব্যুরোক্রেসি (রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র)। তার ধারাবাহিকতা পুলিশ, ডেপুটি কমিশনার এবং গভর্নর থেকে নিয়ে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত ব্যাপৃত। এই প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় আইনের সংরক্ষণকারী। কিন্তু সমাজে সেক্যুলারিজমের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে

[৯৫] সুরা নিসা, আয়াত ৬৫

এই প্রতিষ্ঠানটিও সেক্যুলার ও লিবারেল আইনের সংরক্ষক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে পড়েছে। ব্যুরোক্রেসি বা আমলাতন্ত্র সরকারি মেশিনের সেই পার্টস, যার মাধ্যমে সরকার এবং আদালত নিজের আইন বাস্তবায়ন করে থাকে। পার্লামেন্ট একটি আইন বানিয়ে দেয়। বিচারবিভাগ সেই আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আর আমলাতন্ত্র তা বাস্তবায়ন করে। কার্যত একটি দেশের সরকার পরিচালনা করে থাকে এই ব্যুরোক্রেসি বা আমলাতন্ত্র। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার জন্য উচ্চশিক্ষা, সংশ্লিষ্ট বিভাগে বিশেষায়িত হওয়া এবং বিদেশি ভাষায় দক্ষতা থাকা জরুরি। এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তরুণেরা সাধারণত আধুনিক বিদ্যাপীঠেরই শিক্ষার্থী হয়ে থাকে। এবং হৃদয়ে লালন করে থাকে পশ্চিমা রীতিনীতির প্রতি অসীম মুগ্ধতা। এ কারণে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোনো আগ্রহ তাদের মধ্যে দেখা যায় না। বরং সে ধর্মহীনতা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার প্রতিই অধিক মনোযোগী হয়ে থাকে। ইসলামি আন্দোলনগুলোর বিরুদ্ধে ক্রাকডাউন, মাদরাসা বন্ধ, আলেমদের নজরবন্দি রাখা, মুসলিম নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার এবং পোক্ত চিন্তার মুসলমানদের ঘরে ঘরে তল্লাশির মতন পদক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে এই ব্যুরোক্রেসিই। ব্যুরোক্রেসি ইসলামি আন্দোলনগুলোর পেছনে পড়ে থাকে; অথচ বিদেশি শক্তির এজেন্টদের নিষিদ্ধ কার্যক্রম তারা চোখ বন্ধ করে এড়িয়ে যায়। বাতিলপন্থিরা তাদের প্রয়োজন পরিমাণ অর্থসম্পদ, দ্রুত পদোন্নতি এবং ইজ্জত-সম্মান ও খ্যাতির প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে সফলভাবে ব্যবহার করে থাকে।

৬.৬: ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং অর্থনীতি

ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে শক্ত অবস্থান যেকোনো জাতির উন্নতি-অগ্রগতি ও দৃঢ়তার জন্য মেরুদণ্ডের ভূমিকা পালন করে। বাতিলপন্থিরা অর্থনীতির দুটি ব্যবস্থার প্রসিদ্ধি ঘটিয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা এবং মিশ্র অর্থব্যবস্থা। মিশ্র অর্থব্যবস্থা তো দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বর্তমান সময়ে সারা দুনিয়াকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে। পরিণামে ইসলামি বিশ্ব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণত শত্রুর বিছানো জালে জড়িয়ে পড়েছে (এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে বিশ্বায়ন [Globalization] এর অধীনে)।

৬.৭: জনকল্যামূলক প্রকল্প, এনজিও

দুনিয়াজুড়ে পশ্চিমা দেশের অজস্র জনকল্যাণমূলক সংস্থা কাজ করছে, যারা দুর্যোগপূর্ণ এলাকাতে সাহায্য-সহায়তা পৌঁছে দেয়; হাসপাতাল এবং ফার্মেসির ব্যবস্থা করে; বন্দিদের কষ্ট লাঘব করে; গরিব দেশগুলোর সমস্যার শেকড় তালাশ করে; বিভিন্ন স্থানে স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে; নারী এবং শিশু-অধিকারের জন্য আন্দোলন করে এবং সহায়তা করে নিঃস্ব মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য। এই জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে অজস্র এনজিও, মিশনারি প্রতিষ্ঠান এবং জাতিসংঘের

অঙ্গসংগঠন অন্তর্ভুক্ত। এইসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা মুসলিমবিশ্বের পিছিয়ে পড়া মানুষদের ভরসা ও আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়। এর মাধ্যমে তারা মুসলিমবিশ্বে নিজেদের বিশ্বস্ত ব্যক্তি তৈরি করে। নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটায়। এই উদ্যোগগুলোর মাধ্যমেই তাদের জন্য মুসলিমবিশ্বের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর পথ তৈরি হয়ে যায় (এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে 'খ্রিষ্টান মিশনারি' শিরোনামের অধীনে)।

৬.৮: আধুনিক-মনস্ক ইসলামি চিন্তাবিদ

আধুনিক-মনস্ক ইসলামি চিন্তাবিদেরা বাতিলপন্থিদের জন্য কার্যকর হাতিয়ার হয়ে দেখা দেন। এই বুদ্ধিজীবীশ্রেণি দীনি মাদরাসা এবং খানকাহ থেকে উঠে আসা খালেস ও নিখাদ ইসলামি জ্যোতিষ্কদের অপছন্দের নজরে দেখে। কেননা ইসলামের এই প্রকৃত রূপ দেখে পশ্চিম নাখোশ হয়। এরা পশ্চিমকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই ইসলামের হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করে ফেলে। ইসলামি প্রতীকগুলো মিটিয়ে দেওয়া, জিহাদের বিলুপ্তি ঘোষণা করা, ইসলামি সমাজব্যবস্থা নিয়ে বিদ্রুপ ও উপহাস করা, মুসলিম-সমাজের কাঠামো সেক্যুলার চিন্তাবিদদের চিন্তার ভিত্তিতে দাঁড় করানো এবং পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ইসলামের পোশাক পরানো এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণির অন্যতম প্রিয় কাজ।

৬.৯: চারুকলা ও ফাইন আর্টস

চারুকলা তথা সংগীত, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য নির্মাণ, নাচ, গান ইত্যাদিও বাতিলপন্থিদের বিছানো অনেক বড় এক জাল। এই বিষয়গুলো মানবীয় আত্মাকে আনন্দিত করে। বরং আত্মিক বা মানসিক আনন্দ ও প্রশান্তিকে চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে দেয়। পরিণামে তারা নিজেদের জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে। একজন মুসলমানকে ধর্মহারা করবার জন্য এইসব জাদুকরী হাতিয়ারের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

ইসলাম প্রতিটি উপকারী শাস্ত্র এবং সাহিত্যচর্চার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে; তবে অবশ্যই কিছু সীমাবদ্ধতার সাথে। কিন্তু বাতিলপন্থিরা কোনো প্রকার সীমার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে মুসলিম-দুনিয়ায় এমনসব শাস্ত্রের প্রচলন ঘটিয়েছে, যার কারণে ইসলামি ঐতিহ্য পদদলিত হয়ে পড়েছে। চিত্রাঙ্কন এবং ভাস্কর্য নির্মাণের মতন শাস্ত্র, যা অতীতে কিছু দরিদ্র অমুসলিমের রুটিরুজির মাধ্যম ছিল, তা এখন মুসলমানদের সম্মান, মর্যাদা ও আভিজাত্যের প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

৬.১০: সাহিত্য

সাহিত্য, যার মধ্যে গদ্য-পদ্য দুটোই অন্তর্ভুক্ত, বিগত দুই-আড়াই শতাব্দীকাল ধরে বাতিলপন্থিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার প্রসারে বৈশ্বিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। সাহিত্যের নামে প্রেম ও অশ্লীল কবিতার প্রসার ঘটানো হয়েছে কেবল নয়; বরং এসব নাস্তিক্যবাদী কথাবার্তার জন্য অ্যাওয়ার্ড পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। মদ্যপান এবং

চরিত্রহীন কাজগুলোকে এমন মোহন করে উপস্থাপন করা হয় যে, সাধারণ মানুষ অবচেতনভাবেই সে-সবকে একটি বৈধ ও সাধারণ দুষ্টুমি মনে করতে আরম্ভ করে। দীন-ধর্ম এবং আল্লাহ-রাসুল নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপকারী সাহিত্যিক এবং কবিদের দুঃসাহসকে প্রশংসাযোগ্য হিসেবে হাজির করা হয়। এভাবে কলা ও সাহিত্যের নামে ইসলামি চিন্তাধারা, আইন, সংস্কৃতি এবং সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথার মূল উপড়ে ফেলা হচ্ছে।

গল্প, উপন্যাস, গান ও প্রেমকাব্য মানুষকে পার্থিব জীবনের নিছক রোমান্টিকতার জালে জড়িয়ে ফেলে কেবল নয়; বরং তারও বেশি একজন মানুষের মধ্যে আল্লাহ, তাকদির এবং আসমানি দিকনির্দেশনার অস্বীকার পর্যন্ত ছলকে উঠতে থাকে। উপমহাদেশের খ্যাতি ও উন্নতি-প্রত্যাশী অধিকাংশ লেখকের আন্দোলন হয়ে থাকে মূলত ধর্মঅস্বীকারের উপর ভিত্তি করে। এই আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট সদস্যরা নাস্তিক্যবাদী সাহিত্য ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে অসংখ্য মানুষকে দীনবিমুখ করে ফেলেছে।

যখন মুসলিম চিন্তাবিদ এবং আলেমগণ এই বিষয়গুলোর বিরোধিতা করেন তখন জবাবে এই প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয় যে, ইসলাম যেকোনো ধরনের কলা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। অথচ বাস্তবতা হলো, ইসলাম এমন কোনো শাস্ত্রের বিরোধিতা করে না, যার দ্বারা মানুষের কল্যাণ হয়। এবং তা শরিয়তের সীমার মধ্যেও থাকে। ফলে ইতিবাচক সাহিত্য, গদ্যচর্চা এবং কাব্যচর্চার উপর শরিয়তের কোনো পাবন্দি নেই। কিন্তু ধর্মহীন ব্যক্তিদের প্রোপাগান্ডা হলো, ইসলাম মানুষের জীবন উপভোগ করতে দেয় না। সে কারণে ইসলামকে দুনিয়ার জীবন থেকে দূরেই রাখা দরকার। এবং ধর্মকে দূর থেকেই 'সালাম' জানিয়ে এড়িয়ে চলা উচিত।

৬.১১: বিনোদন, স্পোর্টস

বিনোদন ও খেলাধুলার ময়দানও ভিনদেশি সভ্যতা-সংস্কৃতির আক্রমণের একটা মাধ্যম। কিছু খেলা তো শরিয়তের দৃষ্টিতে একেবারেই বৈধ নয়। আর যেগুলো বৈধ, তার পরিপার্শ্ব এমন ঈমানবিধ্বংসী হয়ে থাকে যে, সে-সব খেলাকে 'জীবন-মরণ' লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে যেই তরুণেরা, তারা সাধারণত দীনধর্ম থেকে একেবারেই সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে।

৬.১২: সাংস্কৃতিক নায়কেরা

সাংস্কৃতিক নায়ক বলতে বোঝানো হয়—খেলোয়াড়, অভিনেতা এবং শিল্পীদের, যারা বর্তমান সময়ে সমাজের আইডল ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে। নাচ-গান এবং অভিনয়, যাকে এই সেদিন পর্যন্ত নিকৃষ্ট পেশা হিসেবে মনে করা হতো, এখন একেকজন 'ডিস্কো ড্যান্সার' এবং 'প্লেয়ার' ধর্মীয় দিকনির্দেশকদের চাইতেও অধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠেছে। গায়ক এবং অভিনয়শিল্পী, যাদের কিছুদিন আগেও ভাঁড়, মুখরা এবং জাদুকর বলা হতো, বর্তমানে তাদের জাতির নায়ক এবং

শিল্পী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকেরা কেবল তাদের নায়কোচিত স্টাইল, পোশাকআশাক, চাল-চলন, চলাফেরার ধরন এবং জীবনযাপন-পদ্ধতির অন্ধ-অনুকরণই করছে না; বরং তাদের সকল চিন্তাভাবনাও কোনো প্রকার বাছবিচার ও চিন্তাভাবনা ছাড়া গ্রহণ করে নিচ্ছে।

সাংস্কৃতিক নায়কেরা জীবন-দর্শন এবং রাজনীতি থেকে আরম্ভ করে ধর্ম এবং শরিয়ত পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করে। আর সাধারণ মানুষ তাদের মন্তব্য ও মতামতকে একজন আলেমের ফতোয়ার চাইতেও অধিক গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করে নিচ্ছে। মোটকথা, বাতিলপন্থিরা নিজেদের চিন্তাভাবনা এবং দর্শনের প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে এই সকল সাংস্কৃতিক নায়কদের সুকৌশলে ব্যবহার করছে।

৬.১৩: আঞ্চলিক সভ্যতা-সংস্কৃতি

আঞ্চলিক সভ্যতা-সংস্কৃতি ইসলামের বিপক্ষে ব্যবহৃত অনেক গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। ইসলামি বিশ্বের প্রাচীন সম্মিলিত সভ্যতা-সংস্কৃতি পরিত্যাক্ত বানিয়ে তার স্থলে প্রতিটি অঞ্চলকে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কালচার দ্বারা পরিচিত করে তোলা হচ্ছে। এই সাংস্কৃতিক গোঁড়ামিই ইসলামি বিশ্বে আঞ্চলিকতা এবং স্বাদেশিকতার উপর নির্ভরশীল রাজনৈতিক পার্টিগুলো অস্তিত্বে এনেছে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকে বাথপার্টি আত্মপ্রকাশ করে, যার প্রতিষ্ঠাতা খ্রিষ্টান। সংগঠনটির প্রধান ভিত্তি ছিল আরবজাতীয়তাবাদ। ১৯০৯ সালে আরবে আলজামইয়্যাতুল কাহতানিয়্যাকে পরিচিত করানো হয়। আঞ্চলিক সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং বর্ণ ও গোত্রের ভিত্তিতে শিক্ষা এবং গবেষণাপ্রতিষ্ঠানও তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো জামিয়া দুয়ালুল আরাবিয়া।

এ ছাড়াও পশ্চিমা বিশ্ব শত কোটি ডলার খরচ করে ইসলামি বিশ্বে সুপ্ত হয়ে থাকা হাজার বছরের পুরোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং জাহেলি যুগের ধ্বংসাবশেষ সামনে নিয়ে আসছে, যাতে মুসলমানকে তাদের ইসলামি পরিচয় ভুলিয়ে দিয়ে এটা মনে করিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় যে, তোমরা মূলত তাদের সন্তান, যারা মূর্তিপূজক ছিল। তক্ষশীলা, হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদাড়োর প্রতি এই কারণেই পশ্চিমের এত আগ্রহ। কারণ, এগুলোকে ইসলামপূর্ব সময়ের স্মারক মনে করা হয়।

গত শতাব্দীর শুরুতে যখন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কারের কাজ বেশ উদ্যমের সাথে চলছিল তখন জনৈক প্রাচ্যবিদ লিখেছিলেন :

"এই বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয়ে যে কর্মযজ্ঞ চালানো হচ্ছে তার ফল ও উপকারিতা এখনই দৃশ্যমান হবে না। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তার সীমাহীন প্রভাব চোখের সামনে হাজির হবে।"

৬.১৪: জাহেলি গোঁড়ামি, জাতিবাদী ও স্বাদেশিক গোঁড়ামির প্রসার

জাতিবাদী এবং স্বাদেশিক গোঁড়ামির প্রসার, ইসলামি বিশ্বের বৈশ্বিক ঐক্য ও সংহতি ভেঙে দিয়ে তাকে বহু ছোট ছোট জোটে পরিণত করে। ফলে ধর্মহীনতার পথ হয়ে ওঠে আরও মসৃণ। আরও সুগম।

কোনো দল, দেশ বা বংশ নিয়ে এই পরিমাণ গর্ব করা যে, বৈধ-অবৈধ, ইনসাফ কিংবা অবিচারের সীমা ভুলে গিয়ে সর্বাবস্থায় তার সঙ্গ দেওয়া হয়; তার অবস্থানকে সর্বাবস্থায় হক মনে করা হয়—এটাই আসাবিয়্যাত বা সাম্প্রদায়িকতা। একইভাবে নিজের জাতি, দেশ এবং বংশের ব্যাপারে এমন ধারণা পোষণ করাও গোঁড়ামি যে, তার সদস্যরাই সবচাইতে উত্তম এবং নেতৃত্বের অধিক যোগ্য। এটাই সেই জাহেলি গোঁড়ামি, শরিয়ত যাকে সম্পূর্ণরূপে অপছন্দ করে।

ইসলাম দুনিয়াকে আসাবিয়্যাত ও সাম্প্রদায়িকতার এই বৃত্ত থেকে বের করে, তাকে একটি বৈশ্বিক ঐক্যের রূপ দিয়েছে, যেই বৈশ্বিক ঐক্যের প্রধান ভিত্তি চারটি :

১. ওয়াহদাতুল ঈমান। অর্থাৎ একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান।
২. ওয়াহদাতুল আসল। অর্থাৎ এই বিশ্বাস রাখা যে, সমস্ত মানবজাতির উৎস মূলত একটিই। সবাই আদমের সন্তান।
৩. ওয়াহদাতুল আবদিয়্যাত। অর্থাৎ অন্তরে এই বিশ্বাস ও ইয়াকিন বদ্ধমূল করা যে, সমস্ত মানুষ আল্লাহ তায়ালার বান্দা। বান্দা হবার বিবেচনায় সকলেই সমান। কেউ-ই আল্লাহ তায়ালার আত্মীয় নয়। কেয়ামতের দিন সবাইকে নিজের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।
৪. মি'য়ারুল ফাজিলা। অর্থাৎ বান্দাদের পরস্পরে সম্মান ও মর্যাদার যদি কোনো মানদণ্ড থেকে থাকে, তা হলো তাকওয়া বা খোদাভীতি; বর্ণ, বংশ কিংবা দেশ নয়।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَكُمْ

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেজগার।[৯৬]

এই মহান শিক্ষার ভিত্তিতেই আল্লাহ তায়ালা আদম-সন্তানদের এক জাতিতে পরিণত করে দিয়েছেন। ওই সমস্ত মানুষ, যাদেরকে কোনো শাসক শাসন করতে পারতো না, ইসলাম তাদের মধ্যে এমন সংহতি স্থাপন করে দিয়েছে যে, বিশ্বের ইতিহাস তার আরেকটি দৃষ্টান্ত হাজির করতে অক্ষম।

কিন্তু ইসলামের বিপক্ষশক্তি ইসলামের এই চূড়ান্ত আকর্ষণীয় শিক্ষাকে স্বয়ং মুসলমানদের থেকেই বিস্মৃত করে দিয়েছে। আর তার স্থলে জাহেলি গোঁড়ামির প্রসার ঘটিয়ে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক লড়াই সংঘটিত করবার ক্ষেত্রে তারা এই পরিমাণ সফল হয়েছে যে, বর্তমানে দুটি মুসলিম দেশ একটি বড় সমস্যায় এক হতে পারে না। বংশীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো সেই জাতিগত গোঁড়ামিকে আরও প্রসারিত করছে এবং এভাবে ক্রমেই ইসলামি সংহতি সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছে।

---

[৯৬] সুরা হুজুরাত, আয়াত ১৩

৬.১৫: সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের প্রতি মুসলমানদের মনে ঘৃণা তৈরি করা

ধর্মহীন শক্তির প্রত্যাশা—মুসলমানদের মাঝে যেন কোনো যোগ্য ও সৎ নেতৃত্ব না থাকে। মুসলমানদের নেতৃত্বের আসন যেন সেক্যুলার গোষ্ঠী দখল করে নেয়। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রতিজন যোগ্য ও সৎ নেতৃত্বের বদনাম করবার কোনো সুযোগ তারা হাতছাড়া করে না।

সাধারণভাবে যখন সমাজে কোনো যোগ্য ও সৎ নেতৃত্বের প্রভাব প্রতিষ্ঠা হতে থাকে অভ্যন্তরে কাজ করতে থাকা ধর্মহীন লবিগুলো তাদেরকে ভয় দেখিয়ে নিবৃত করবার চেষ্টা করে। যদি তারা সাহসী প্রমাণিত হন তখন তাকে কিনে নেবার অর্থাৎ সোনার খাচায় বন্দি করবার কৌশল গ্রহণ করা হয়। যদি তারা সরাসরি বিক্রি হবার জন্য প্রস্তুত না হন তখন তাদের জন্য এমনসব সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন করা হয়ে থাকে, যাকে সহজে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। যদি কোনো নেতা এই অবস্থা থেকেও নিরাপদে বের হয়ে আসতে পারেন তখন তার সামনে হাজির করা হয় লোহার খাচা। এই পর্যায়ে গিয়ে সাধারণত কারারুদ্ধ হবার কষ্ট কিংবা আরও ভিন্ন কোনো বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি তাকে হতে হয়। যে ব্যক্তি এই সকল স্তর সাফল্য ও সাহসিকতার সাথে পেরিয়ে যেতে পারেন তখন বদনাম রটিয়ে তার প্রভাব নষ্ট করবার চেষ্টা আরম্ভ হয়।

দারুল উলুম দেওবন্দের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আলেমদের ইংরেজরা ওহাবি বলে বদনাম রটিয়েছিল। মিশরের সাইয়েদ কুতুবকে আল্লাহ তায়ালার সিফাতের অস্বীকারকারী বলে পরিচিত করানো হয়েছিল। তালেবানের ইসলামি ইমারাহ আফগানিস্তানের ব্যাপারে এই মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয়েছিল যে, তারা সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে নারীদের উপর অবিচার ও অত্যাচার করে। সারা দুনিয়ায় তাদের প্রতি ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সময়ে প্রচার ও প্রকাশনায় যেহেতু অভাবনীয় গতি এসেছে, সে কারণে কোনো সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান নষ্ট করা মুহূর্তের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬.১৬: নারীস্বাধীনতা

হাদিসে নারীকে বলা হয়েছে শয়তানের ফাঁদ। পশ্চিম এই ফাঁদকে ব্যবহার করছে অত্যন্ত চতুরতা ও নির্লজ্জতার সাথে। নারীস্বাধীনতার স্লোগান তুলে স্বয়ং নারীদেরই বিভ্রান্ত করে ফেলা হয়েছে। নারীদের বাজারি পণ্যে পরিণত করে পুরুষের ভোগ্য করে তুলবার কোনো ত্রুটি রাখা হয়নি। আর এভাবেই ইসলামি সমাজের জানাজার আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে।

নারীস্বাধীনতার আন্দোলন ধর্মহীন শক্তির সবচাইতে ভয়াবহ কৌশল। এ কারণে এই বিষয়ে কিছুটা বিস্তারের সাথে আলোচনা করা হবে। এবং সেই সাথে বর্তমান সমাজে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা ও ইসলামের উপর উত্থাপিত কতক আপত্তি দূরীকরণেরও প্রয়াস চালানো হবে।

ইসলামের বিপক্ষশক্তির পরিপূর্ণ প্রয়াস হলো নারীদের সামনে স্বাধীনতার মুলো ঝুলিয়ে তাদের ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। আর তারপর নারীদের মাধ্যমে বংশ বরং গোটা সমাজকেই ধর্মহীন করে ফেলা।

এই লক্ষ্যের বাস্তবায়নে গত শতকের শুরুতেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নারীস্বাধীনতার স্লোগান অত্যন্ত পোক্তভাবে উচ্চকিত করে। এই স্লোগান সর্বপ্রথম শোনা যায় ইউরোপ ও আমেরিকাতে। সেখানে নারীদের ঘর থেকে বের করে পুরুষের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবার জন্য উৎসাহিত করা হয়। এর পেছনে উদ্দেশ্য একটাই ছিল, পশ্চিমা পুরুষেরা নারীদের থেকে আরও বেশি সুফল ভোগ করতে চাচ্ছিল এবং স্বামী ও পিতা হবার যে দায় ও দায়িত্ব, তা নিজেদের কাঁধ থেকে নামাতে চাচ্ছিল। সে কারণে নারীদের ঘর থেকে বের করে অফিস-আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের সংক্ষিপ্ত পোশাক পরিয়ে সমস্তটা সময় নিজেদের কামনা পূরণ করবার আয়োজন করা হয়; এবং নারীদের শেখানো হয় এই বিবস্ত্রতা নিয়ে গর্ব করতে। নারীদের সাথে হ্যান্ডসেক ও আলিঙ্গনকে করে তোলা হয় সভ্যতা-ভদ্রতার অংশ। পার্টিতে অপরিচিত নারী-পুরুষের সম্মিলিত নাচ-গান মর্যাদার বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। শারীরিক সম্পর্কের সীমা ও প্রতিবন্ধকতা এতই ঢিলে করে ফেলা হয় যে, পরস্পরের সম্মতিতে সম্পাদিত ব্যভিচারকে কোনোভাবেই আর অপরাধ মনে করা হয় না। কিন্তু কথা হলো—নারীদের প্রকাশ্যে ব্যবহারের সকল দুয়ার উন্মোচন করবার পরও তাদের সেই অবস্থান দেওয়া হয় না, যার মাধ্যমে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুরক্ষা নিশ্চিত হতে পারে। বরং এই স্বাধীনতার 'সুফল' তারা এতটুকুই লাভ করে যে, এতকাল তারা এক স্বামীর তত্ত্বাবধানে ছিল। এখন তারা স্বামীর একক তত্ত্বাবধান থেকে বের হয়ে বহুজনের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়ে। ঘরের সুরক্ষা পায়ে দলে হোটেল, হাসপাতাল, বাজার এবং দোকানের সেবাদাসীতে পরিণত হয়ে ওঠে। পাত্র ধোয়া এবং ভবন পরিষ্কার করা থেকে আরম্ভ করে কার ওয়াশিং পর্যন্ত সকল নীচ কাজে নারীদের নিযুক্ত করা হয়। বিপরীতে সকল উঁচু ও সম্মানজনক পেশা পুরুষের হাতেই থেকে যায়। হ্যাঁ, দুনিয়ার সামনে নারী-পুরুষের সমতার প্রদর্শনীর জন্য দুয়েক স্থানে নারীদেরও কিছু সম্মানজনক পদ দেওয়া হয় বটে; তবে তা খুবই বিরল ঘটনা।

নারীস্বাধীনতার এই রমরমা পরিস্থিতিতে ইউরোপ ও আমেরিকাতে ব্যভিচার ও যৌনাচারের যে ঢেউ ওঠে, তার তোড়ে দ্রুতই সেখানকার পরিবার ও বংশপ্রথার বিলুপ্তি আরম্ভ হয়ে যায়। বেপর্দা এবং অশ্লীলতার ভয়ানক পরিণতি চাক্ষুষ হবার পর পশ্চিমের উচিত ছিল নিজেদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনা। কিন্তু শরীর ভোগ করবার যে অনায়াস রাস্তা ইতোমধ্যে উন্মোচিত হয়ে পড়েছিল, কামনার বাজারিরা তাকে কীভাবে বন্ধ করতে সমর্থ হবে! দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিজেদের বংশব্যবস্থা ও পরিবার-ব্যবস্থার ধ্বংসই তারা মেনে নিয়েছে। কিন্তু সেই সাথে তাদের এটাও সহ্য হচ্ছিল না যে, মুসলমানদের সমাজে তাদের নারীরা সতীত্ব ও পবিত্রতা নিয়ে টিকে থাকবে এবং

তাদের বংশরক্ষার গুরুত্বও বহাল থাকবে। সে-কারণে তারা নিজেদের এজেন্টদের মাধ্যমে মুসলিম এবং প্রাচ্যের দুনিয়াতেও নারীস্বাধীনতার স্লোগান উচ্চকিত করে তোলে। এই স্লোগান উচ্চকিত করবার পেছনে তাদের লক্ষ্য ছিল তিনটি :

৬.১৬.১: ইসলামি আখলাক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধ্বংস সাধন

সুমহান ইসলামি আখলাক, মূল্যবোধ এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্য পশ্চিমের জন্য হিংসার বিষয় হয়ে উঠেছিল। তারা চিন্তা করে দেখলো, নিজেদের সামাজিক মূল্যবোধের উৎকর্ষ সম্ভব না হলেও অন্তত মুসলমানদের তো তাদের উৎকৃষ্ট মূল্যবোধ, আখলাক ও সুরক্ষিত পরিবারব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে; নিজেদের সমাজের মতন ধ্বংস করে দেওয়া যেতে পারে তাদের সমাজও। সেই চিন্তা থেকেই তারা আটঘাট বেঁধে ইসলামি আখলাক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধ্বংস সাধনের মিশনে নামে।

৬.১৬.২: ইসলামি সমাজের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যাবলির ধ্বংস সাধন

পশ্চিমা-দুনিয়া শঙ্কাবোধ করে উঠল, যদি মুসলিম-সমাজ নিজের ঐতিহ্যবাহী সুমহান বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদাপূর্ণ মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ রাখে এবং তার উপর অবিচল থাকে তাহলে নিজেদের ভেঙে পড়া বংশ ও পরিবারব্যবস্থায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পশ্চিম তাকে ঈর্ষার চোখে দেখতে থাকবে। এমনকি পশ্চিম যখন দেখবে যে, নিজেদের অসমাধানযোগ্য সামাজিক সমস্যাবলির সমাধান কেবল ইসলামের মধ্যেই রয়েছে তখন তারা ইসলামের দিকে ঝুঁকতে আরম্ভ করবে। ফলে তারা মুসলিম-সমাজে প্রচলিত পবিত্রতা এবং সততার আভিজাত্য ও অনুকরণীয় সমাজব্যবস্থার বুনিয়াদ বিধ্বস্ত করবার জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠে, যেন দুনিয়ার মানুষ মুসলমান ও অমুসলমানের মাঝে কোনো পার্থক্য খুঁজে না পায়। এবং ইসলামি সমাজের প্রতি অমুসলিমদের আকৃষ্ট হয়ে পড়বার কোনো ধরনের সম্ভাবনা অবশিষ্ট না থাকে।

৬.১৬.৩: মুসলিম নারীদের বাজারি পণ্যে পরিণত করবার পুরোনো বাসনা

মুসলিম নারীরা বিগত তেরোশ বছর ধরে পর্দা-বিধান পালন করে আসছে। অমুসলিমদেরও কখনো এই সাহস হতো না যে, তারা মুসলিম নারীদের দিকে হাত প্রসারিত করবে। হাত প্রসারিত করা দূরে থাক, তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবে—এমন হিম্মতও তাদের ছিল না। যদি কোনো হতভাগা এমন দুঃসাহস দেখিয়েও বসত তাহলে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সম্মুখীন হতে হতো। ইউরোপ-আমেরিকার বিলাসী এবং প্রবৃত্তির পূজারি পুঁজিপতিদের বহুদিনের বাসনা—যেভাবে তারা পশ্চিমা নারীদের নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে নিজেদের নির্জনাবাস ভরিয়ে তোলে, সেভাবে মুসলিম নারীদেরও ব্যবহার করবে। মুসলিম নারীদের আনন্দের উপকরণ বানাবে। যদিও মুসলমানদের রাজনৈতিক অধঃপতনের পর লড়াই-যুদ্ধের কারণে মুসলিম নারীদের যুদ্ধবন্দি বানাবার পথে কোনো অন্তরায় ছিল না; কিন্তু কোনো কালিমা পাঠকারী নারী

সানন্দে নিজের সৌন্দর্য তাদের সামনে উন্মোচন করবে, তাদের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শারীরিক ভোগের উপকরণ হবে—এমন কল্পনাও ছিল অসম্ভব।

নিজেদের এই বাসনা পূরণ করবার জন্য তারা স্বয়ং মুসলিম নারীদের চিন্তাধারা বদলে দেবার প্রয়াস আরম্ভ করে, যাতে তারা সানন্দেই নিজেদের নেকাব খুলে ফেলে এবং ধীরে ধীরে সম্পর্কের বৈধ-অবৈধের পার্থক্যরেখা ভুলে যাবার স্তরে উপনীত হয়। পশ্চিমের স্বপ্ন—এভাবেই মুসলিম নারীরা নিজেরাই একদিন তাদের ঝুলিতে গিয়ে পড়বে।

বিশ্বায়নের পর মুসলিম-সমাজ-ব্যবস্থার অধঃপতন এবং নারীস্বাধীনতার বিস্তার স্বয়ং বিশ্বায়নের জন্যই অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, সামাজিক বিশ্বায়নের পূর্ণতার পথে সবচাইতে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা ও সামর্থ্য কেবল ইসলামি সমাজব্যবস্থারই ছিল। এ কারণে বিশ্বায়নের আন্দোলনই নিজের পথ সুগম করবার লক্ষ্যে বর্তমানে মুসলিম নারীদের পশ্চিমা; বরং মার্কিন নারীদের মতন পবিত্রতা ও সতীত্ব থেকে বে-আবরু করে দেবার জন্য সবচাইতে বড় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

৬.১৬.৪: নারীস্বাধীনতার জন্য প্রোপাগান্ডামূলক কার্যক্রম

নারীস্বাধীনতার প্রসার ঘটাবার জন্য এবং মুসলিম নারীদের চিন্তাধারা বদলে দেবার লক্ষ্যে পশ্চিম যে প্রোপাগান্ডা কার্যক্রম চালু করে রেখেছে, তার সারসংক্ষেপ এই দাঁড়ায় যে, ইসলামে নারী অত্যন্ত নিগৃহীত। মুসলিম-সমাজে নারীর কোনো মূল্য নেই। তাদের সাথে সাম্যের আচরণ করা হয় না। তারা সকল ক্ষেত্রে পুরুষের দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। সমাজের সকল বোঝা তারই কাঁধে এবং তার দ্বারাই সকল নিকৃষ্ট কাজ করানো হয়ে থাকে। মোটকথা, ইসলামকে নারী অধিকার ক্ষুণ্নকারী একটি ধর্ম বলে চিত্রায়িত করা হয়ে থাকে। (নাউযুবিল্লাহ)

এই ধারাবাহিকতায় নিম্নযুক্ত আপত্তিগুলো বিশেষভাবে উত্থাপন করা হয় :

- ইসলাম নারীকে গৃহবন্দি করে রেখেছে। নারীদের পর্দার ব্যাপারে বাধ্য করে তাদের স্বভাব-যোগ্যতা ও উৎকৃষ্টতর প্রতিভার বিকাশ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। বিশ্বকে জয় করবার যে প্রাকৃতিক বাসনা নারী-মন লালন করে, তার গলা টিপে ধরা হয়েছে। বিপরীতে পশ্চিম নারীর সত্তা ও প্রতিভার বিকাশে অবারিত সুযোগ তৈরি করে রেখেছে।
- নিজের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা নিজে করতে এবং স্ব উপার্জনের জন্য বাইরে বের হতে ইসলাম নারীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে। ফলে নারীর অর্থনৈতিক ও আর্থিক অবস্থান একেবারে ধ্বংস হয়ে পড়েছে। বিপরীতে ইউরোপে নারীরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। তারা পুরুষের মতন চাকুরি করতে পারে। এবং নিজেদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করতে পারে।

- ইসলাম নারীদের আখ্যা দিয়েছে নাকিসাতুল আকল বা স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন বলে, যা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। পশ্চিম নারীকে সম্পূর্ণ মানুষ ভাবে। আর কোনোদিক থেকেই একজন পুরুষের চাইতে তাকে কম মনে করে না।
- ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকার সম্পত্তির একটি বিরাট অংশ থেকে বঞ্চিত রেখে পুরুষের জন্য অধিক অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে। উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে 'এক পুরুষ সমান দুই নারী' হওয়া একটি পক্ষপাতদুষ্ট বিধান।
- ইসলামে তালাকের অধিকার কেবল পুরুষকেই দেওয়া হয়েছে। এটাও নারীর প্রতি অবিচার। তালাকের অধিকার নারীরও থাকার দরকার।
- ইসলাম পুরুষকে একই সময় চার চারটি বিবাহ করবার অনুমতি দিয়ে থাকে। কিন্তু নারীর এই অধিকার নেই। নারীর জন্য একই স্বামীতে ক্ষান্ত থাকবার বিধান তৈরি করা হয়েছে।
- ইসলামি আদালতে নারীর সাক্ষ্য অর্ধেক বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে মূলত তাকে অর্ধেক মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তাকে দেওয়া হচ্ছে কেবল অর্ধ-মানুষের মর্যাদা।

আপত্তির খণ্ডন : যদিও বিভিন্ন স্থানে এইসব বিভ্রান্তিকর আপত্তির জবাব বিস্তারিতভাবেই দেওয়া হয়ে গেছে এবং এখানে সেই বিস্তারিত জবাবের দিকে যাবার সুযোগ নেই; তারপরও এই প্রোপাগান্ডাগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব এখানে তুলে ধরা হচ্ছে, যাতে ইসলাম নারীদের জন্য এই পাবন্দিগুলো কেন রেখেছে—তার সঠিক কারণ, সংক্ষেপে হলেও, জেনে নিয়ে শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকেরা স্বস্তি লাভ করতে পারে।

নিয়মমতো কালিমা তাইয়েবা পাঠ করবার পর শরিয়তের কোনো বিষয়ে কোনো ব্যক্তির আপত্তি তুলবার কোনো অবকাশ থাকে না। যখন আমরা ঈমান নিয়ে এলাম যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা মানুষের সমস্ত জীবন বেষ্টন করে আছে। এবং আমরা এটাও মেনে নিলাম যে, এই ব্যবস্থার স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা, যার প্রতিটি বিধানের মধ্যেই অসংখ্য প্রজ্ঞা ও হেকমত রয়েছে; তখন সেই হুকুমের বাস্তবায়ন ও জীবনব্যবস্থার অনুসরণের জন্য তার পেছনের কারণ অনুসন্ধানের কোনো প্রয়োজন নেই। একজন মুসলমানের কর্তব্য- কোনো প্রকার 'কী কেন' ব্যতিরেকেই আল্লাহ তায়ালার হুকুমের বাস্তবায়ন করা। যুক্তি-তর্ক করা মুসলমানের কাজ নয়।

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার কোনো হুকুম হেকমত ও প্রজ্ঞাশূন্য নয়। আল্লাহ তায়ালার ব্যবস্থাপনা ও তার শরিয়তের প্রতিটি বিষয়ই অসংখ্য হেকমত ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, যাকে পুরোপুরি উপলব্ধ করা মানুষের বিবেকের জন্য আয়াসসাধ্য নয়। ঈমানদারের চিন্তাভাবনা এমনই হওয়া উচিত। তদুপরি আমরা সন্দেহগ্রস্ত চিন্তার প্রশান্তির জন্য এই প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে কিছু যৌক্তিক প্রমাণও হাজির করছি।

নারী কি ঘরবন্দি : নারীদের ঘর থেকে বের হওয়া ইসলামে একেবারেই নিষিদ্ধ নয়; বরং প্রয়োজন হলে শরয়ি পর্দা সহকারে তাকে ঘরের বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কেনাকাটার দরকার হলে বের হতে পারবে। ডাক্তারের কাছে যাবার অনুমতিও ইসলাম তাকে দিয়েছে। হজ আদায়ের মতো দীর্ঘ সফরেও নারীর জন্য কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। এ ছাড়াও যুদ্ধের ব্যাপকতার সময় নারী জিহাদেও অংশ নিতে পারবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদের সফরের সময় নিজের সাথে নিয়ে নিতেন। সুতরাং এই দাবি একেবারেই অমূলক যে, ইসলাম নারীকে ঘরের মধ্যে বন্দি করে রেখেছে। সে ঘরের বন্দিনী নয়; বরং ঘরের রানি। ঘরের বেগম। তাকে ঘরে থাকবার জন্য বলা হয়, যেন সে গৃহাস্থালির কাজকর্মে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে। বাইরের ধোঁকা-প্রতারণা এবং কালের ফেতনা-ফাসাদ থেকে সে যেন সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকতে পারে।

নারী স্বাবলম্বী নয় কেন : ইসলাম নারীকে স্বাবলম্বী হতে নিষেধ করে না। তার মালিকানার অধিকারকে ইসলাম স্বীকৃতি দেয়। ইসলামের ইতিহাসে বহু ধনাঢ্য নারীর কথাই জানতে পাওয়া যায়। স্বয়ং উম্মুল মুমিনিন হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। নারী সহায়-সম্পত্তির মালিক হতে পারে। নিজের সম্পদ থেকে দান-সদকাও করতে পারে।

উপরন্তু ইসলাম নারীকে একটি বাড়তি সুবিধা প্রদান করেছে; পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে সে পুরোপুরি মুক্ত। ভরণ-পোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে পুরুষের কাঁধে। নারী যখন কন্যা, তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার বাবার। যখন সে স্ত্রী, তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার স্বামীর। স্বামী এবং পিতার অনুপস্থিতিতে এই দায় ভাই, পুত্র এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের। আর যদি একেবারে কেউ-ই না থাকে তখন রাষ্ট্রের উপর দায় বর্তায়; রাষ্ট্র তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে। নারীকে প্রদত্ত এই সুবিধা এত বিরাট, সারা পৃথিবীর কোনো পুরুষ যার কল্পনাও করতে পারবে না।

হ্যাঁ, একথা ঠিক, এই আর্থিক দায়িত্বের কারণেই আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে ঘরের সরদার বানিয়েছেন এবং তাকে আরও কয়েকটি অধিকার প্রদান করেছেন।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।[৯৭]

[৯৭] সুরা নিসা, আয়াত ৩৪

পার্থিব জগতেও আমরা এমন বিধানই প্রচলিত দেখি। কোনো প্রতিষ্ঠানে যার কাঁধে অতিরিক্ত যত দায়িত্ব অর্পিত হয়ে থাকে, সেই পরিমাণ অতিরিক্ত ক্ষমতা ও ইচ্ছাধিকার তাকে দেওয়া হয়। এটাও সর্বজনস্বীকৃত যে, কোনো দোকান, কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ইচ্ছাধিকার সেই ব্যক্তিরই থাকে, যিনি সবার বেতন-ভাতার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। তাকেই দোকান, কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের মালিক মেনে নেওয়া হয়ে থাকে, যিনি সবার দায় গ্রহণ করে থাকেন। যেহেতু ঘরের ব্যয়ভার আল্লাহ তায়ালা পুরুষের কাঁধে সোপর্দ করেছেন; তাই ঘরের জীবনে নারীকে আল্লাহ তায়ালা তার অধীন রেখেছেন। কিন্তু এই অধীনস্থতা দাসী কিংবা বাঁদির মতন নয়; বরং একটি মোহন সম্পর্ক এবং পবিত্রতম বন্ধনের আকৃতিতে।

সাধারণ অধিকারগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা রক্ষা করেছেন। যদি পুরুষ স্বাধীন হয় তাহলে নারীও তো স্বাধীন। একইভাবে ইলম ও জ্ঞানচর্চা, সম্মান-ভদ্রতা, আত্মার পরিশুদ্ধি এবং সবচাইতে বড় কথা আখিরাতের মর্যাদা বৃদ্ধি করবার ক্ষেত্রে উভয়কেই শরিয়ত মোতাবেক অগ্রসর হবার অবকাশ তিনি দিয়েছেন।

সেইসাথে মনে রাখা দরকার, ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যকার সেই ধরনের সমতার সমর্থক নয়, যার ধুয়ো তুলে পশ্চিম নারীকে তার সৃষ্টিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিভার উপযুক্ত কাজ থেকে সরিয়ে তার অনুপযুক্ত কর্মের সাথে যুক্ত করে দিচ্ছে।

ইসলামে পুরুষকে নারীর চেয়ে একগুণ অতিরিক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুজনের অধিকারই আপন আপন স্থানে সংরক্ষিত।

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।[৯৮]

পাশাপাশি এই বাস্তবতা স্বীকার করা হয়েছে যে, নারী ও পুরুষ, তারা উভয়ে একে অন্যের পরিপূরক এবং একজন অন্যজনকে ছাড়া অসম্পূর্ণ।

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।[৯৯]

উভয়ের সম্মিলনেই মানবীয় বৈশিষ্ট্যে পূর্ণতা আসে। এবং পূর্ণতা আসে সমাজেও। আর যদি বলতে হয় ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের কথা তাহলে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককেই কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের অনুপাতেই তাদের অধিকার ও জীবনযাপন-উপকরণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অন্য কোনো কারণে নয়।

---

[৯৮] সুরা বাকারা, আয়াত ২২৮

[৯৯] সুরা বাকারা, আয়াত ১৮৭

অসম্পূর্ণ বুদ্ধি : কিছু হাদিসে নারীকে নাকিসাতুল আকল বা অসম্পূর্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়েছে। কিন্তু এটা অপবাদ আরোপমূলক নয়; বরং তার স্বভাবের নাজুকতা এবং তার প্রাকৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, যা মোটেই অস্বীকার করবার নয়। এই প্রাকৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলিই নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে দেয়।

স্বয়ং পশ্চিমা স্কলাররা নিজেদের গবেষণাকর্মে নারী এবং পুরুষের মধ্যকার এই প্রকারের পার্থক্যের স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, যাকে তারা 'সাইকোলোজিকাল' এবং 'বায়োলোজিকাল ডিফারেন্স' (মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবিক পার্থক্য) নাম দিয়েছেন।

উত্তরাধিকার সম্পত্তি বিষয়ে : উত্তরাধিকার সম্পদে নারীকে পুরুষের অর্ধেক কেন দেওয়া হলো? বাস্তবতা হলো, এই আপত্তিটা তখনই যথার্থ হতো যদি নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপর সোপর্দ করা না হতো। কিন্তু যখন ইসলামি সমাজে আল্লাহ তায়ালার দেওয়া সহজতার কারণে নারীকে উপার্জনের জন্য দায়গ্রস্ত করা হয়নি; বরং তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে অর্পণ করা হয়েছে; এমতাবস্থায় বসে বসে নারীর উত্তরাধিকার সম্পদে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক পেয়ে যাওয়াও তার জন্য অতিরিক্ত প্রাপ্তি নয় কি? এটা তো স্পষ্টই, যে ব্যক্তির কাঁধে মাসিক প্রায় ২৫ হাজার টাকার ব্যয়ভার রয়েছে এককালীন বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা পেয়ে যাওয়াতে তার আর্থিক খুব বেশি ফায়দা লাভ হয়ে যায় না। কিন্তু যার কাঁধে খরচের কোনো দায় নেই তার হাতে ১০ হাজার টাকা চলে আসাও তো বিরাট লাভ। কারণ তার এই ১০ হাজার টাকার সবটাই তো সঞ্চয়। ফলে নারীকে কম দেওয়া হচ্ছে—বাহ্যত এমনটা মনে হলেও বাস্তবে তাকে তার হকের চাইতেও বহুগুণ অধিক দেওয়া হচ্ছে।

পুরুষকে উত্তরাধিকার সম্পত্তি দেওয়ার পেছনে একটি বড় কারণ হলো, উত্তরাধিকারপ্রাপ্তির পর মৃতের সম্পর্কিত সকল লোকের দায়িত্ব তাকে নিতে হয়। মা, বোন, ভাই, সন্তান এমনকি অনেক সময় ভাতিজা-ভাতিজিসহ অনেকের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে এসে পড়ে। ফলত সে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে অধিক অংশ পেলে তার অধীন সকল ব্যক্তিরই লাভ।

এই পুরুষই জীবনের সকল সঞ্চয় জমা করে নারীর জন্য ঘর নির্মাণ করে, অলঙ্কার গড়ে দেয়, সন্তানের প্রতিপালন করে; তাদের শিক্ষা, বিয়ে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-উপার্জন পর্যন্ত তাদের সঙ্গ দেয়। এই সকল কাজের জন্য একজন পুরুষের মোটা অংকের অর্থের প্রয়োজন হয়। যদি উত্তরাধিকার সম্পদে তার অংশ একজন নারীর সমানই হয় তাহলে এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করা তার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

এ ছাড়াও স্বভাবগতভাবেই একজন নারী যেকোনো কিছু দেখেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও। এ কারণে কেনাকাটার ক্ষেত্রে তার হাত অনেক খোলা থাকে। যদি উত্তরাধিকার সম্পদে তার বেশি অংশ লাভ হয় তাহলে

বংশের মূল্যবান সম্পদ অকল্যাণকর এবং অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয়িত হয়ে পড়বে। পরিণামে সেই পরিবারটি আর্থিক অনটন ও টানাপড়েনের ভেতর পড়ে যাবে।

ইসলামপূর্ব সময়ে স্বয়ং নারীকেও উত্তরাধিকার সম্পদের মতন বণ্টন করা হতো—এ বিষয়টা ভুলে গেলে চলবে না। সবার আগে ইসলামই এই শিক্ষা দিয়েছে যে, নারী উত্তরাধিকার সম্পদের মালিক ও হকদার। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মে নারীকে উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে মুসলমানদের অনুকরণে খ্রিষ্টান এবং হিন্দুধর্মের অনুসারীরা নিজেদের ধর্মে নারীদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানের সংস্কার করে নিয়েছে।

তালাকের অধিকার : বিয়েশাদির আয়োজন হয় সম্পর্ক টিকিয়ে রাখবার জন্য, ভেঙে ফেলবার জন্য নয়। সে-কারণে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, তালাকের অধিকার যতটা সীমাবদ্ধ রাখা যায় ততই ভালো। নারী এবং পুরুষ—উভয়কেই তালাকের অধিকার দেওয়ার মাধ্যমে তালাকের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে পড়ে এবং পান থেকে চুন খসলেই তালাকের আশঙ্কা হাজির হতে থাকে। যেমনটা পাশ্চাত্যে তালাকের বর্তমান হার থেকে অনুমান করা যায়। ফলে তালাকের অধিকার স্বামী-স্ত্রীর দুজনের কেবল সেই একজনকেই দেওয়া হয়েছে, যে ঘরের কর্ণধার, স্বভাবগতভাবে সহনশীল এবং যার মধ্যে চিন্তাভাবনাসহ তালাকের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য রয়েছে। যদি এই অধিকার নারীকে দেওয়া হতো তাহলে তার আবেগ এবং সংবেদনশীল অনুভূতির কারণে সম্পর্ক দ্রুতই ভেঙে পড়ার শঙ্কা ছিল। এবং বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই বিচ্ছেদ ঘটে যেত। আর এমন হলে সমাজে দ্বন্দ্ব-কলহই কেবল বৃদ্ধি পেত। কল্যাণ কিছু হতো না।

যাই হোক, যদি নারী আলাদা হতেই চায় তাহলে শরিয়ত তালাকের বদলে তার জন্য 'খুলা'র অবকাশ রেখেছে। সে তার এই অধিকার প্রয়োগ করে আলাদা হয়ে যেতে পারে।

একই সময়ে একাধিক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে না পারা : এর কারণ তো একদমই স্পষ্ট। এমন হলে নারীর গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানের বংশ নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। কোনো মানুষের ঔরস সন্দেহপূর্ণ হয়ে যাওয়া তার সারা জীবনের জন্য অভিসম্পাৎ ও লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এবং অনাগত প্রজন্মের জন্যও এই বিষয়টি এক চিরস্থায়ী ক্ষতে পরিণত হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও দুই পরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্ক নারীর স্বভাবজাত মর্যাদাবোধেরও বিপরীত। এ কারণেই ইসলাম একই সময়ে নারীকে অনুমতি দেয়নি একের অধিক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকার। অন্য ধর্মাবলম্বীরাও এই বিষয়টিতে ঐকমত্য পোষণ করে। এবং সে-সব ধর্মমতেও এটা অবৈধ। কিন্তু ধর্মহীন শ্রেণি নারীবিষয়ে কেবল ইসলামকে সমালোচনার লক্ষ্য বানাবার জন্যই এই অমূলক ও বিবেকবর্জিত আপত্তি উত্থাপন করেছে।

অর্ধসাক্ষ্য কেন : নারীর সাক্ষ্য অর্ধেক বিবেচনা করা হয়। উদ্দেশ্য—তাকে আদালতি ঝামেলায় টানা-হেঁচড়া থেকে দূরে রাখা। আর যদি কখনো এমন প্রয়োজন এসেও যায় তাহলে সে যেন একলা হয়ে না পড়ে। আরেকজন নারীর সঙ্গ পেয়ে সে যেন নির্ভয় থাকতে পারে। প্রাকৃতিক নাজুকতার কারণে একজন নারী আদালতে হাজির হবার পর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তে পারে। তখন স্বাভাবিকভাবে সঠিক সাক্ষ্য দিতে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার যেন তাকে না হতে হয়।

এখানে একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারও আছে। নারীবিষয়ে আধুনিক গবেষণা বলছে যে, তাদের মেধা মিশ্র এবং বৈচিত্র্যময় দৃশ্যের দিকে একই সময়ে মনোযোগী হতে এবং তাকে মনে রাখতে অধিক সক্ষম। যখন তারা কোনো জিনিসের প্রতি মনোযোগী হয় তখন তার আশপাশ ও খুঁটিনাটি বিষয়ও তাদের মনের মধ্যে পোক্ত হয়ে যায়।

বিপরীতে পুরুষের মেধা ও মস্তিষ্ক একটি বিশেষ ঘটনা এবং একটি বিশেষ বিষয় অতিরিক্ত গভীরভাবে দেখতে, ভাবতে এবং স্মরণ রাখতে অধিক সমর্থ হয়। তাদের মস্তিষ্ক একটি উত্তল লেন্সের মতন, যা আলোকরশ্মিকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করে দেয়।

এই কারণেই নারীদের একটি জিনিসের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দিকও স্মরণে থাকে এবং তারই ভিত্তিতে তারা সূচিকর্ম এবং চিত্রাঙ্কনে তুলনামূলক ভালো করে থাকে। তাদের মুখস্থশক্তি টুকরো টুকরো বিষয়ও অধিক মনে রাখতে পারে। বিপরীতে পুরুষের মস্তিষ্ক সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র বিষয়গুলো এড়িয়ে একটি বিশেষ বিষয়ের দিকেই গভীরভাবে মনোযোগী হয়ে পড়ে।

সম্ভাবনা রয়েছে, নারীদের সাক্ষ্য অর্ধেক হবার পেছনে এই রহস্যও থেকে থাকতে পারে যে, কোনো বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করবার সময় নারী তার স্বভাবজাত অভ্যাসের কারণে মূল বিষয়কে এড়িয়ে গিয়ে আনুষঙ্গিক বিষয়ের অবতারণায় যেন ব্যাপৃত হয়ে না পড়ে। এ কারণে তার সাথে আরেক নারীর উপস্থিতি জরুরি করা হয়েছে। যেমনটা কুরআন কারিমে বর্ণিত হয়েছে,

فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى

যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। ওই সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ করো। যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[১০০]

আসলে কথা হলো, নারীদের যে অধিকার, তা স্বতন্ত্র এক বাস্তবতা। আর পুরুষের অধিকার স্বতন্ত্র আরেক বাস্তবতা। অধিকারের এই বিভাজন উভয়ের সৃষ্টি এবং কাঠামোর বিচারেই ভিন্ন। একজনকে কিছু বিষয়ে অতিরিক্ত অধিকার দেওয়ার

[১০০] সুরা বাকারা, আয়াত ২৮২

অর্থ কোনোভাবেই এই নয় যে, অন্যের উপর অবিচার করা হয়েছে। বিষয়টি বোঝার জন্য আরেকটি দৃষ্টান্ত হাজির করা যেতে পারে। ধরুন, দুজন শিক্ষার্থী দশম শ্রেণিতে পরীক্ষা দিচ্ছে। একজন মানবিক বিভাগের, আরেকজন বিজ্ঞান বিভাগের। উভয়েরই কিছু বিষয় সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর কিছু বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। এখন এই আপত্তি একেবারেই অমূলক হবে যে, একজনকে ফিজিক্সের প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে, অন্যজনকে কেন নয়। মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীকে কেন কেমিস্ট্রি পড়তে দেওয়া হলো না। আর বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীর জন্য ইসলামের ইতিহাস কেন ইচ্ছাধীন রাখা হলো! এমন আপত্তি নিতান্তই পাগলামি হবে।

যেহেতু দুজনের বিভাগ আলাদা; তাই বিষয় এবং পরীক্ষাও হবে ভিন্ন ভিন্ন। মূলকথা হলো, তাদের উভয়ের নিজ নিজ বিষয়ে ভালো নম্বর পেয়ে সফল হওয়া। তাহলে স্কুলেও তারা সম্মান পাবে; সম্মানের অধিকারী হবে ঘরেও। এবং উভয়েই সমাজের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হবে।

এই একই কথা নারী-পুরুষের অধিকার এবং দায়িত্বের বেলাতেও। নিজের সৃষ্টি এবং কাঠামোর ভিত্তিতে তাদের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর এই বিধান সারা পৃথিবীতেই আছে। আমরা দেখি, যেই ব্যক্তি যে কাজের জন্য উপযুক্ত, তার দায়িত্বে সেই কাজটিই অর্পণ করা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়ালা ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার দাবিতেই নারী-পুরুষের প্রত্যেককে আপন আপন বৃত্তে পরিব্যাপ্ত করেছেন। যদি উভয়েই শরিয়ত অনুযায়ী চলে এবং নিজের দায়িত্ব সম্পন্ন করে দেখাতে পারে তাহলে দুনিয়াতেও সফল হবে এবং আখিরাতেও।

প্রাচ্যবিদদের আবিষ্কৃত এই আপত্তিগুলো প্রচার করে মুসলিম নারীদের বিশুদ্ধ ইসলামি মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত করবার কাজ বিগত প্রায় দেড় শতক ধরে চলে আসছে। সাম্রাজ্যবাদ, প্রাচ্যতত্ত্ব এবং ক্রুসেডীয় শক্তি এই লক্ষ্যের বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ব্রিটিশ, ইটালীয় এবং ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের সেনারা যেখানেই গেছে, সেখানেই ইউরোপের বিবস্ত্র নারী এবং নির্লজ্জ গণিকাদেরও নিয়ে গেছে। তাদের দায়িত্ব ছিল ইসলামি দেশের পরিবেশ খারাপ করে তোলা। এদের মধ্যে ফ্রান্সের রানি ও রাজকন্যা ছাড়াও বহু শিক্ষিত নারী ও নারী সাংবাদিকও ছিল। ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী করে তুলবার মতন বিষয়ের প্রসার ঘটানো হয়েছে উপনিবেশিত অঞ্চলের নতুন শিক্ষাব্যবস্থায়ও। প্রাচ্যবিদ এবং তাদের শিষ্যরা নারীস্বাধীনতার বিষয়টা অতীব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে এ বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ, নিবন্ধ, বইপত্র এবং জার্নাল প্রকাশ করতে থাকে।

প্রাচ্যবিদদের দীক্ষাপ্রাপ্ত স্কলাররা নারীদের প্রবোধ দেবার জন্য ইসলামি বিধানের ভুল ব্যাখ্যা হাজির করতে থাকে। নারীদের কানে ফুঁকে দেওয়া হতে থাকে যে, মুসলিম-সমাজে মূল্যবোধ মনে করে যেগুলোর চর্চা ও লালন হয়ে থাকে, ইসলামের সাথে তার কোনো প্রকারের সম্পর্ক নেই। এগুলো মোল্লা-মৌলবিদের

তৈরি-করা কিছু প্রতিবন্ধকতা। প্রকৃত ইসলামি শিক্ষা পশ্চিমা জীবনধারার সমর্থন করে, যেখানে নারীদের জন্য পর্দা এবং হিজাবের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আয়-উপার্জনের জন্য নারী-পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করাকে ইসলাম সমর্থন করে। মেধা, বোধ-বুদ্ধিসহ সকল প্রতিভার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়; বরং বরাবর। তার সাক্ষ্যও পরিপূর্ণ। উত্তরাধিকার সম্পদে তার অংশ আংশিক নয়, পূর্ণাঙ্গ। পার্লামেন্টকে মুজতাহিদের অবস্থানে বসিয়ে তার মাধ্যমে নারীকে পশ্চিমা নারীর মতো তালাকের অধিকারও আদায় করে দেওয়া হচ্ছে (দেখা যাবে, এই স্কলাররা একসময় বলে বসবে যে, যদি পার্লামেন্ট অনুমোদন দেয় তাহলে নারীর একই সময়ে চারজন পুরুষের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে কোনো সমস্যা নেই)।

এই স্কলারদের মধ্যে একটা পরিচিত নাম মিশরের কাসেম আমিন, যিনি ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে 'তাহরিরুল মারআ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার কিছুদিন পর 'আল-মারআতুল জাদিদাহ' নামে তার দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশ পায়। এই গ্রন্থ-দুটিতে তিনি লেখেন :

"মুসলমানদের মধ্যে যেই পর্দা প্রচলিত আছে, ইসলামের সাথে তার কোনো প্রকারের সম্পর্ক নেই।"

আরেক জায়গায় তিনি লেখেন :

"কুরআনের টেক্সট থেকে পর্দা সংক্রান্ত কোনো আয়াত আমি পাইনি।"

তিনি আরও লেখেন :

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে আরবসমাজে সামাজিক প্রথা ও প্রচলনের কারণেই নারীরা পর্দা করত। বাস্তবে কুরআন-হাদিসের কোথাও পর্দার বিধানের উল্লেখ নেই।"

কিন্তু বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম, কুরআন এবং হাদিসের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন সাধারণ পর্যায়ের শিক্ষার্থীও জানে, শরিয়তে পর্দার প্রতি কী পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআন-হাদিসে এই বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে। সুরা নুরে আছে :

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে।[১০১]

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ

তারা যেন (তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য) জোরে পদচারণা না করে।[১০২]

---

[১০১] সুরা নুর, আয়াত ৩০

[১০২] সুরা নুর, আয়াত ৩১

এ ছাড়া হাদিসেও পর্দার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ব্যতিরেকেও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি নারীর সম্মান, মর্যাদা এবং মূল্য বোঝেন, তিনি এই বিষয়টি বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, পর্দা কেবল মুসলিম নারীর জন্যই নয়; বরং প্রতিটি নারীর সম্মান, মর্যাদা ও আভিজাত্য রক্ষার জন্য অতীব জরুরি। পর্দাকে আরবীয় প্রথা ও রীতি বলে দেওয়া অপযুক্তির চূড়ান্ত। কিন্তু পশ্চিমের শয়তানদের সুবিধাভোগী তথাকথিত স্কলাররা বাস্তবতা পায়ে দলে নারীদের ইসলামের সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধে এইভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলছে যে, তাদের হৃদয় থেকে গুনাহ ও পাপের অনুভূতি পর্যন্ত দূর হয়ে যাচ্ছে।

পর্দাবিধান বিলুপ্তি এবং ইসলামি সমাজকে বিনষ্ট করবার জন্য ইসলামের শত্রুপক্ষ নিজেদের উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। স্কুল, কলেজ এবং ভার্সিটিগুলোকে বেপর্দা এবং ফ্রি-মিক্সিংয়ের ওয়ার্কশপ বানিয়ে ফেলা হয়েছে। ছেলে এবং মেয়েদের সহশিক্ষার আয়োজন করে তাদের মন ও মস্তিষ্কে এই কথা গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে, পর্দা করা গোঁড়ামি এবং প্রাচীন চিন্তাধারার সমার্থক।

১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে একটি পরিকল্পিত চক্রান্তের অধীন এমন আধুনিকমনা মুসলিম নারীদের সামনে নিয়ে আসা হয়, যারা প্রকাশ্যে নিকাব, বোরকা এবং চাদর খুলে ছুঁড়ে ফেলে। মিশরের হুদা শা'রাবি হলেন প্রথম নারী, যিনি পর্দার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। এই ধরনের নারীদের অধিকাংশের পিতামাতা বা স্বামী ছিলেন ইংরেজ বা অন্য কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুগত সেবাদাস। এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও প্রতিপালন হয়েছিল পশ্চিমা পরিবেশে।

১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে 'মু'তামারুন নিসা' নামে ইটালির রোমে একটি নারীবিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ইসলামি বিশ্বের পশ্চিমসমর্থিত নারীদের সমবেত করা হয়। কনফারেন্সের এজেন্ডা ছিল নারীর স্বাধীনতা এবং মুসলিম-সমাজে নারীর উপর চলমান সকল জুলুম ও অবিচার (!) বন্ধ করা।

এই কনফারেন্সে হুদা শা'রাবি নিজের বোরকা খুলে পায়ের নিচে রাখে। এবং তা দু'পায়ে পিষ্ট করে ঘোষণা দেয় যে, "আজকের পর পর্দাপ্রথা শেষ। যে নারী যেমন খুশি পোশাক পরিধান করতে পারে।"

এর কিছুকাল পর ইসলামি বিশ্বে এমন কিছু ইভেন্টের আয়োজন করা হয়, যেখানে পর্দা নিয়ে ইচ্ছে মতন ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও উপহাস করা হয়। নীলদরিয়ার তীরে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফিরিঙ্গি পরিবেশে প্রতিপালিত নারীরা এখানে নিজেদের বোরকা খুলে নীলদরিয়ার মাটি এবং কাঁদার মধ্যে পিষ্ট করে। আর উৎফুল্লিত কণ্ঠে ঘোষণা দেয়, এখন থেকে নারীরা স্বাধীন। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসতফা কামাল পাশার নতুন তুরস্কে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। নারীদের পার্লামেন্টেও প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ দেওয়া হয়। যার পরে নারীদের জন্য রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা-প্রতিবন্ধকতা থাকে না।

নারীস্বাধীনতার আহ্বায়কেরা নারীদের ধীরে ধীরে পরিকল্পিতভাবে পাঁচটি ধাপে পর্দাহীনতার প্রতি আহ্বান করে :

৬.১৬.৫: প্রথম ধাপ : পুরুষের সামনে চাদর খুলে ফেলা, নেকাব উন্মোচন করা

এই কাজে নারীদের উদ্বুদ্ধ করবার জন্য কুরআন কারিমের আয়াত ও হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করে বলা হতে থাকে যে, ইসলামে চেহারার কোনো পর্দাই নেই। এই দাবিও করা হয়, নারী সাহাবিরা, এমনকি উম্মুল মুমিনিনরাও চেহারার পর্দা করতেন না।

৬.১৬.৬: দ্বিতীয় ধাপ : গাইরে মাহরাম পুরুষের সাথে মেলামেশা

নেকাব অবমুক্তকারী নারীদের বোঝানো হয়ে থাকে, এখন তাদের ঘরে আগত পুরুষদের সাথে মেলামেশা করা দরকার এবং নারী-পুরুষের অবাধ সম্মিলিত অনুষ্ঠানে যাওয়া দরকার। এভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যকার স্বভাবজাত লজ্জা-শরম উঠিয়ে দেওয়া হয় আর তার নাম দেওয়া হয় প্রকৃতির পূর্ণতা সাধন। তার পক্ষে দলিলের স্তূপ হাজির করা হয়। যেমন মিশরের সেক্যুলার চিন্তাবিদ কাসেম আমিনের বক্তব্য :

> "যখন পর্যন্ত নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা না হবে, তারা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। একে অপরের চরিত্র ও মানসিকতা বুঝতে পারবে না। যদি স্বামী-স্ত্রী বিবাহের পূর্বে একে অপরকে না বুঝতে পারে তাহলে পরবর্তীতে অল্প সময়েই বিচ্ছেদের পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়।"

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্র্যাকটিস আরম্ভ হয়ে যায় নার্সারি থেকেই। ছেলেমেয়ে নির্বিশেষ প্রথম থেকেই একসাথে ওঠাবসা করবার ফলে ধীরে ধীরে অন্য লিঙ্গের প্রতি জন্মগত দ্বিধা তাদের থেকে দূর হয়ে যায়। এবং মিশ্রিত পরিবেশে থাকা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে ওঠে। কারণ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকেই। যে-কারণে কিছুটা অনুভবের বয়সে উপনীত হবার পর ছেলেমেয়ে পড়াশোনার চেয়েও বন্ধুত্ব এবং সম্পর্ক রক্ষার পেছনে অধিক সময় ব্যয় করতে থাকে, যার ক্ষতি দৃষ্টিগোচর হয় তাদের জীবনের পরবর্তী দিনগুলোতে।

৬.১৬.৭: তৃতীয় ধাপ : চার দেয়ালের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি

পর্দার অভ্যাস শেষ করে দেবার পর আহ্বান করা হয়, ঘরে লুকিয়ে থেকে গোঁড়ামির বহিঃপ্রকাশ করা নারীর উচিত নয়; বরং তার কর্তব্য ঘরের বাইরে পা রেখে দুনিয়া দেখা। তার পক্ষে দলিল হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে, খাইরুল কুরুন বা শ্রেষ্ঠ যুগের নারীরাও ঘরের বাইরে বের হতেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন।

এ ছাড়াও এক্ষেত্রে মুসলিম নেতাদের স্ত্রীদের দৃষ্টান্ত হিসেবে হাজির করা হয়ে থাকে। যেমন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সহধর্মিনী ফাতেমা জিন্নাহ, পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের স্ত্রী বেগম রা'না লিয়াকত আলী খান, বেগম খালিকুজ্জামান, মিসেস নুসরাত ভুট্টো, বেনজির ভুট্টো—এদের মধ্যে কেউ-ই পর্দা

করেননি। সবাই ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে জনসাধারণের সেবা করে গেছেন। এই দলিলটি বেশ প্রভাবক হয়ে দেখা দেয়। এ ছাড়াও মিডিয়াতে দৃশ্যমান চিত্রাবলিও বেশ অনায়াসেই নারীদের ঘর থেকে বের হয়ে পড়তে এবং নেকাব ও পর্দা ছুঁড়ে ফেলতে প্ররোচিত করে থাকে।

৬.১৬.৮: চতুর্থ ধাপ : পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা

পরবর্তী ধাপ হয় নারীকে একেবারে কর্মের ময়দানে নামিয়ে আনা। নারীকে বলা হয়ে থাকে, জীবনের প্রতিটি স্তর নারীর বিভায় আলোকিত হয়ে আছে। যে কারণে প্রতিটি স্তরেই আগ্রহের সাথে তাদের অংশ নেওয়া উচিত। এবং যুক্তিযুক্ত আয়-উপার্জনের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভার মূল্য আদায় করে স্বাবলম্বী হওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। স্বাবলম্বী হলেই একজন নারী পুরুষের ইজারাদারি ও নজরদারি থেকে মুক্ত হতে পারে।

বোরকা ছুঁড়ে ফেলে অবাধ পরিবেশে সময় পার করা আধুনিক-মনস্ক যে নারী তার কাছে এইসব কথা খুবই আকর্ষণীয় মনে হতে থাকে। তারা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবার জন্য অতি দ্রুত তৈরি হয়ে যায়। এবং শিক্ষা, বাণিজ্য, ট্রান্সপোর্ট থেকে আরম্ভ করে সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী; এমনকি রাজনীতিতে পর্যন্ত পুরুষের সাথে মিলেমিশে কাজ আরম্ভ করে দেয়। ইসলামি দেশগুলোর অ্যাসেম্বলিতে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখা হয়েছে। প্রতিটি বড় প্রতিষ্ঠানের অফিসে বড় অফিসারের সেক্রেটারি হয়ে থাকে কোনো মেয়ে। সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে যাকে বসের সকল তামাশা ও রঙ্গ-রসিকতা সহ্য করে যেতে হয়। এমনকি অনেক সময় তাকে নিজের সম্মানও হারিয়ে বসতে হয়।

৬.১৬.৯: পঞ্চম ধাপ : শিল্প-সংস্কৃতিতে নারীর অংশগ্রহণ

পঞ্চম ধাপে এসে নারীকে শেখানো হয়—সেলস গার্ল, সেক্রেটারি অথবা এয়ার হোস্টেস হবার থেকেও বহুগুণ লাভের কাজ হলো নিজের সৌন্দর্য ব্যবহার করে অল্প সময়ের ব্যবধানেই বিপুল অর্থবিত্ত ও খ্যাতির অধিকারী হয়ে ওঠা। যার কাছে সামান্য কিছু সৌন্দর্য আছে এবং সে তার লজ্জা-শরম সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত—এমন সব নারীর জন্য আজ শোবিজের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এমন মেয়েদের মডেল, অভিনেত্রী, নর্তকী বা কলগার্ল বানিয়ে তার শরীর এবং আত্মার প্রতিটি সৌন্দর্য ও লাবণ্য সারা দুনিয়ার পুরুষের জন্য অবারিত করে দেওয়া হচ্ছে। এই শ্রেণির নারীদের দ্বারা যে চারিত্রিক অবক্ষয় প্রসার লাভ করছে, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। এভাবেই আমাদের সমাজ পৌঁছে যাচ্ছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে; এবং এর মাধ্যমে ধর্মহীন শক্তির দেড় শতকের যে প্রয়াস, তা সফলতা ও পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলছে।

৬.১৬.১০: ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ এবং সুরক্ষা-ব্যবস্থা

ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ে কিছু মৌলিক কথা ভালোভাবে জেনে নেওয়া দরকার। ইসলামি বিধান বুঝতে এবং বেশ কিছু ভুল ধারণা দূর করতে তা সহায়ক হবে। নারীবিষয়ে ইসলাম এবং পশ্চিমের দৃষ্টিকোণের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। পশ্চিম নারীর আত্মা ও শরীরকে পুরুষের জন্য অধিক থেকে অধিকতর জাদুকরী করে তুলতে চায়। পশ্চিমে পুরুষেরা এমন পরিবেশ তৈরি করতে চায়, যার মাধ্যমে মানবিক প্রবৃত্তি এবং চাহিদা বেশি পরিমাণে মেটানো যায় এবং তারা চায়, কামনা চরিতার্থ করবার পথে কোনো প্রকারের বাধা-প্রতিবন্ধকতা যেন না থাকে।

ইসলাম নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য এমন উপযুক্ত ও পবিত্র পরিবেশ তৈরি করতে চায়, যা পার্থিব কাজের জন্যও সুবিধাজনক হবে এবং হবে তাদের আত্মিক উন্নতির জন্যও সহায়ক। এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা নিজের নাজুকতম সৃষ্টি নারীদের জন্য পবিত্রতা ও নিরাপত্তার একটি সমৃদ্ধ ব্যবস্থা প্রণয়ন করে তাকে শরিয়তের অংশ বানিয়ে দিয়েছেন।

এটা এমন ব্যবস্থা, যেখানে নারীর সতীত্ব সংরক্ষিত থাকে এবং মুসলিম পুরুষও ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকে। ইসলামের চারিত্রিক ব্যবস্থা এমন পরিবেশ তৈরি করতে চায়, যেখানে মানুষ আত্মিক প্রশান্তির সন্ধান লাভ করবে এবং খুঁজে পাবে শারীরিক প্রশান্তিও। রুহানিয়্যাত হাসিলের পাশাপাশি কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হওয়া ছাড়াই তার শরীর ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ হতে থাকবে। যখন মানুষের প্রবৃত্তিগত চাহিদা উপযুক্ত পদ্ধতিতে পূরণ হতে থাকে তখন সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয় না।

আল্লামা ইবনুল জাওযি এই বিষয়ে 'সাইদুল খাতির' গ্রন্থে খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন, যার সারসংক্ষেপ হলো, আল্লাহ তায়ালা যেভাবে মানুষের মধ্যে খাবারের ক্ষুধা তৈরি করেছেন সেভাবে তার মধ্যে প্রবৃত্তির ক্ষুধাও দিয়ে দিয়েছেন, এবং উভয় চাহিদার পেছনেই একটি উদ্দেশ্য কার্যকর রয়েছে। ক্ষুধার পেছনের উদ্দেশ্য হলো মানুষের শরীর যেন টিকে থাকে (আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, মানুষের দেহ প্রতি মুহূর্তেই নির্মাণ এবং ভগ্নদশার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়)। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা সেই ক্রটি পূরণ করবার জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। সেই সাথে খাদ্যগ্রহণের মধ্যে মানুষের জন্য স্বাদও রেখে দিয়েছেন। কেননা স্বাদ না থাকলে খাওয়া অত্যন্ত দুরূহ কাজে পরিণত হয়ে উঠতো। আর মানুষ যদি ভালো মতন খাদ্য গ্রহণ না করত তাহলে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়তো। সে-কারণে আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে ক্ষুধার চাহিদা এবং খাবারগ্রহণের মধ্যে স্বাদ দিয়ে রেখেছেন। যার কারণে মানুষ আগ্রহের সাথে নিজের শরীরের এই চাহিদা পূর্ণ করে থাকে।

মানুষের মাঝে প্রবৃত্তি সৃষ্টি করা হয়েছে- তার পেছনেও একটি মহান লক্ষ্য রয়েছে। আর তা হলো, আল্লাহ তায়ালা চান, মানুষের বংশধারা যেন চলমান থাকে। ক্ষুধার

মতন প্রবৃত্তির চাহিদা মেটাবার মধ্যেও আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন 'স্বাদ'; আনন্দ। যদি এই স্বাদ বা আনন্দ না থাকত তাহলে বহু মানুষ লজ্জা ও শরমের কারণে স্ত্রীমিলন করত না। তা ছাড়া সন্তানের দায় থেকে বাঁচার জন্যও বহু মানুষ স্ত্রীসহবাস থেকে দূরে থাকত। কিন্তু প্রবৃত্তির চাহিদার কারণে মানুষ এই কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে না। এই তৃপ্তির কারণেই শারীরিক সম্পর্ককে আনন্দের সাথে; বরং একপ্রকার বাধ্য হয়েই যেন-বা সম্পূর্ণ জোশ নিয়ে একজন মানুষ নিজের যৌনচাহিদা পূরণ করে থাকে। আর এভাবেই মানুষের বংশরক্ষার উদ্দেশ্য সম্পাদন হতে থাকে।

এখন মূলকথায় আসা যাক। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে খাবারদাবারের মধ্যে হালাল-হারামের বাধ্যবাধকতা রেখেছেন সেভাবে প্রবৃত্তির চাহিদাপূরণের মধ্যেও কিছু সীমা-পরিসীমা রেখে দিয়েছেন। পানাহারের ক্ষেত্রে একজন মানুষ যদি শরিয়ত ও আখলাকের সকল সীমা লঙ্ঘন করে খোরাক হাসিলের পেছনে পড়ে তাহলে তার দুর্নাম রটে যায়। রুটিরুজির জন্য কারুর সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হলে বা চুরি করা হলে তার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়। কিন্তু প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে যদি কেউ সীমা লঙ্ঘন করে বসে তখন তার দুর্নাম হয় আরও অনেক বেশি। ক্ষতিও হয়ে থাকে সম্পদের চেয়েও বহু মূল্যবান বস্তুর : ইজ্জত ও সম্মানের।

কারণ, প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষের আরেকজন জীবন্ত জাগ্রত মানুষের দরকার হয়। এবং তারা উভয়েই আপন সমাজ ও পরিবারের অংশ হয়ে থাকে। যদি তারা শরিয়ত ও আখলাকের সকল সীমা লঙ্ঘন করে নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করে তাহলে এর ফলে কেবল তাদের সম্মান-মর্যাদায় অমোচনীয় কলঙ্ক পড়ে যায় তা-ই না; বরং উভয়ের পরিবারও লজ্জার মুখে পড়ে এবং সারা জীবন ধরে অর্জিত সম্মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশে যায়।

তারপর তাদের এই কাজ, যা সাময়িক প্রবৃত্তির প্রশমনে করা হলো, যদি অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক পন্থায় হয়ে থাকে তাহলে মানবীয় সত্তার সৃষ্টি-উপকরণ নষ্ট করবার কারণে তা অনেক বড় অন্যায় হিসেবে ধর্তব্য হবে। আর যদি তা হয়ে থাকে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেই তাহলে তাদের এই মিলন আরেকজন মানুষের জন্মের কারণ হয়ে উঠতে পারে। আর এটা একজন নবজাতকের অধিকার যে, দুনিয়াতে আগমনের পূর্বেই বাবা-মায়ের আইনসম্মত পৃষ্ঠপোষকতা, ভালোবাসায় আগলে রাখবার মতন পরিবার এবং একটি সম্মানজনক বংশীয় ধারা তাকে দেওয়া হবে। যদি এই সম্পর্কটি শরিয়তের বিধানের বিপরীতে হয়ে থাকে তাহলে সম্পূর্ণ একটি বংশধারার অধিকার খর্ব করা হবে এবং অনাগত প্রজন্মের সকলের গলায় লজ্জা ও অপমানের বেড়ী পড়ে যাবে।

এই সকল বিষয় সামনে রেখে প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানোর জন্য যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে, তা পানাহারের সীমাবদ্ধতার থেকেও বহুগুণ বেশি সতর্কতামূলক, কঠিন এবং জটিল।

ফলত এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে, অমুক অমুক সম্পর্ক হালাল। এবং অমুক অমুক সম্পর্ক হারাম। শরিয়ত স্পষ্ট বলে দিয়েছে—কার দ্বারা প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানো যাবে আর কার দ্বারা যাবে না। যার সাথে বিবাহ বৈধ নয়, তাকে মাহরাম নির্ধারণ করা হয়েছে। যার সাথে বিবাহ বৈধ, তাকে গায়রে মাহরাম বলা হয়েছে। আর এই গায়রে মাহরামদের সাথেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা রাখা হয়েছে, যাতে করে ফেতনা ও নৈরাজ্যের দরজা উন্মোচিত না হয়। পুরুষকে নজর অবনত রাখবার এবং নারীকে পর্দা ও হিজাব ব্যবহার করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইসলাম নারীকে মা-বোন ও স্ত্রী-কন্যা হিসেবে যে অবস্থান দিয়েছে, পশ্চিমে তার কল্পনাও করা সম্ভব নয়। এরপরও, শরয়ি প্রতিবন্ধকতাগুলো গুরুত্বের সাথে আমলে নেওয়ার পরও, মুসলিম নারীরা যে কর্মযজ্ঞ আনজাম দিয়ে দেখিয়েছেন, তা বর্ণনার জন্য বিশাল কলেবরের গ্রন্থ দরকার। যেমন : উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা পর্দার মধ্যে থেকেও উম্মাহর কাছে অজস্র হাদিস পৌঁছে দিয়েছেন এবং ফিকহের ক্ষেত্রে পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলামের ইতিহাস মহান সব নারী ফকিহ, মুহাদ্দিস, এবং কবি-সাহিত্যিকের আলোচনায় পূর্ণ। এ ছাড়াও অসংখ্য স্বতী-সাধ্বী নারী এমন গত হয়েছেন, যাদের গর্ভে জন্ম নিয়ে, যাদের কোলে বেড়ে উঠে ইতিহাস ও সময়কে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন মুহাম্মদ বিন কাসিম, তারিক বিন জিয়াদ, মাহমুদ গজনবী, মুহাম্মদ আল-ফাতিহের মতন বীর সন্তানেরা। এমনকি তারা 'গুমনাম' থাকাই পছন্দ করেছেন। সন্তানের নেক প্রতিপালনের মাধ্যমে একজন নারী সমাজের সংস্কার ও সংশোধনে যে ভূমিকা পালন করে তা হাজারো মহৎ কাজের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আর এই দায়িত্বে অবহেলার কারণে যে অধঃপতিত প্রজন্ম তৈরি হয়, কোনো চাকুরি বা কোনো প্রকারের উন্নতি তাদের কোনো উপকার করতে পারে না।

পর্দার গুরুত্ব বোঝার জন্য এই কথাটিও মনে রাখতে হবে, ইসলাম যখন কোনো অপরাধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে তখন তার অনেক দূরবর্তী অনুঘটকও নিষেধ করে দিয়েছে। নারী-পুরুষের সম্পর্কিত বিষয়টিও একই ধরনের, যেখানে বড় অন্যায়ের দূরবর্তী অনুঘটককেও নিষেধ করা হয়েছে। মূলত এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতা। কারণ, একজন মানুষ, পুরুষ হোক বা নারী, আল্লাহ তায়ালার কাছে তার মূল্য অনেক। দুনিয়াতেও আমরা দেখি, যদি কোনো বস্তু অনেক মূল্যবান হয় তাহলে সর্বাত্মকভাবে তা সংরক্ষণের এন্তেজাম করা হয়ে থাকে। কারেন্সির বাজারে দুজন অস্ত্রধারী পাহারাদার রাখাই যথেষ্ট মনে করা হয়। কিন্তু যে জাদুঘরে হিরা সংরক্ষিত থাকে সেখানে প্রতি কদমে পাহারাদার দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। কারণ এই ধরনের মূল্যবান বস্তুর সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সামান্য ঝুঁকি নেওয়াও বিবেকসমর্থিত নয়।

আল্লাহ তায়ালার কাছে তার প্রতিটি বান্দার মূল্য হিরার চাইতেও বহুগুণ বেশি। তাকে সংরক্ষণ করবার জন্য কেবল শরীর নয়; বরং চিন্তার পবিত্রতার প্রতিও পূর্ণ লক্ষ রাখা হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা চিন্তা পবিত্র রাখবার জন্য দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণশক্তিকেও গায়রে মাহরাম থেকে বাঁচিয়ে রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে বলেছেন। কারণ এইক্ষেত্রে সামান্য থেকে সামান্য ঝুঁকি নেওয়ারও অবকাশ নেই।

দূরবর্তী অনুঘটক থেকে বেঁচে থাকবার পাশাপাশি বিবাহের জন্য মেয়ের অভিভাবকের অনুমতি, ইজাব-কবুল এবং সাক্ষ্যের উপস্থিতিকে আবশ্যক করার মাধ্যমে এই ধারাবাহিকতাকে সর্বপ্রকারের আইনি ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। আর বান্দা নিজেই যদি এই সকল পাবন্দি ও প্রতিবন্ধকতা ভেঙে ফেলে তাহলে তার ভবিষ্যৎ বিশৃঙ্খলা ও সামাজিক নৈরাজ্যের জন্য সে নিজেই দায়ী হবে।

৬.১৬.১১: পর্দাহীনতার ক্ষতি

পর্দাহীনতার ক্ষতি বা অপকার অসংখ্য, যার কিছু হলো :

১. পবিত্রতা এবং সতীত্ব মানুষের সবচাইতে বড় সম্পদ। সতীত্ব মানুষের সম্পর্কের ভিত্তি। পারিবারিক সম্পর্কের মূল; এবং মানবীয় বংশ-প্রজন্মের সংরক্ষক। যদি সতীত্ব লীন হয়ে যায় তাহলে সবকিছু শেষ হয়ে পড়ে।

২. মানুষের প্রতিপালনে ভালোবাসা সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু যে পরিবারে বাবা-মায়ের মধ্যকার ভরসা নষ্ট হয়ে যায়, সেখানে প্রতি মুহূর্তে ঘৃণা জন্ম নিতে থাকে। ভালোবাসার নামগন্ধও সেখানে নজরে পড়ে না। ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে সন্তান একেবারে বেপরোয়া হয়ে যায়। তার সঠিক প্রতিপালন আর সম্ভব হয় না। এভাবে ঘরও ধ্বংস হয়ে যায় এবং সন্তানও।

৩. পর্দাহীনতার কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অবিশ্বাস তৈরি হয়। হার্দিক বোঝাপড়া থাকে না। ঘরের মধ্যে কোনো প্রকারের শান্তি ও প্রশান্তি আর দেখা যায় না।

৪. বংশ সমাজেরই একটি মৌলিক একক। যখন বংশধারাই নড়বড়ে হয়ে পড়ে তখন সমস্ত সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

৫. মানুষ প্রতি মুহূর্তে প্রশান্তির সন্ধান করে। পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই, সমাজে তার অবস্থান যেমনই হোক না কেন, প্রশান্তির সন্ধানে থাকে। কিন্তু আত্মার প্রশান্তি এবং শারীরিক ও দৈহিক স্বস্তি ব্যতীত বাস্তবিক প্রশান্তি কল্পনা করা যায় না। আর এমন প্রশান্তি কেবল স্ত্রীর সাথে বৈধ সম্পর্কের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এই সম্পর্ককে মজবুত করবার জন্য প্রধান ভূমিকাই পালন করে পর্দা ও দৃষ্টির হেফাজত। বেপর্দা এবং বেপরোয়া নজর এই সম্পর্ককে আরও দুর্বল করে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে আত্মিক প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত করে ফেলে।

৬. পর্দাহীন পরিবেশ এবং সতীত্বমুক্ত সমাজে বংশধারা ও পরিবার-ব্যবস্থা একদমই ধ্বংস হয়ে পড়ে, সম্পর্কগুলো লীন হয়ে যায়। প্রতিটি সম্পর্কের সূচনার মূলে থাকে কেবল প্রবৃত্তির চাহিদা, যা কয়েক সপ্তাহ, আবার কখনো মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই ফুরিয়ে আসে।

৬.১৬.১২: পশ্চিমের নারীরা কী পেয়েছে?

পশ্চিমে নারীস্বাধীনতার খোকলা স্লোগানের বাস্তবতা বিবস্ত্র হয়ে পড়েছে। পশ্চিমের মেয়েরা এখনো তাদের স্বামীদের কঠোরতার শিকার। ব্যভিচারের আইনি অনুমতির পরও প্রতি বছর অজস্র ধর্ষণের মামলা নথিভুক্ত হচ্ছে। স্কুলে পড়া মেয়েদের মা হবার ঘটনা এই পরিমাণ বেড়ে গেছে যে, কমবয়সি মেয়েদের আলাদা স্কুল গড়ে উঠেছে। সেখানে ১০ বছর বয়সি মেয়েরা নিজেদের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে লেখাপড়া করছে। আমেরিকার অল্পবয়সি মায়েরা নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে তুলেছে। এই সংগঠনটি কঠিনভাবে নারীস্বাধীনতার বিরোধিতা করছে। পশ্চিমের মেয়েরা এখন দৃষ্টিনন্দন শো-পিস ছাড়া আর কিছু নয়, যৌবন ফুরোতেই যাদের আবর্জনা মনে করে এক কোনায় ফেলে রাখা হয়। তাদের শেষঠিকানা হয়ে থাকে বৃদ্ধাশ্রম, যেখানে বাকি জীবন কঠিন একাকিত্বের অনুভূতি নিয়ে অতিবাহিত করতে হয়। পরিবার-ব্যবস্থার বিনাশ খালা ফুফু মামা চাচা দাদা-দাদি এবং নানা-নানির মতন সম্পর্কগুলো নিঃশেষ করে দিয়েছে। লাখের মধ্যে কখনো একজন এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়, নিজের দাদা কিংবা দাদির নাম যার মনে আছে।

ইউরোপ এবং আমেরিকাতে ২০ থেকে ২৫ বছর বয়সি অধিকাংশ মানুষ বিবাহ ছাড়াই শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এবং যাপিত জীবন হিসেবে সেটাকেই বেছে নেয়। উত্তর ইউরোপে এমন মানুষের সংখ্যা নব্বুই-শতাংশ। অর্থাৎ হাজারে কেবল ৩৬জন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি থেকে জানা যায়, পঁচাত্তর-শতাংশ অবিবাহিত মেয়ে গর্ভপাত করে ফেলে। দুই লাখ বৈধ গর্ভপাতকারিণীর পেছনে রাষ্ট্রীয়ভাবে সাড়ে পাঁচ কোটি ডলার খরচ করা হয়ে থাকে। বিবাহিত গর্ভপাতকারী নারীর সংখ্যা পঁচাত্তর-শতাংশ। দুই-তৃতীয়াংশ শ্বেতাঙ্গ নারী গর্ভপাত করিয়ে থাকে। আবার এদের মধ্য থেকে দুই-তৃতীয়াংশের বয়স ১৫ থেকে ২৪ বছরের মাঝামাঝি।[১০৩]

এই ক্ষতিগুলো দেখবার পরে ইউরোপজুড়ে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে যে, স্বাধীন নারীদের আরও একবার গৃহমুখী করা হোক, যেন পরিবার-ব্যবস্থা ও বংশধারার অনুভব-উপলব্ধি দ্বিতীয়বার প্রসারিত করা যায়। বড় বড় চিন্তাবিদ, রাজনীতিক এই উদ্দেশ্যে প্রয়াস-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রাশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী গর্বাচেভ তার এক গ্রন্থে লিখেছেন :

> “এখন সময় হয়েছে নারীদের ঘরে ফিরিয়ে আনার, যাতে ঘরের সেই প্রশান্তি আবারও ফিরে আসে, আমাদের ঘরগুলোতে যে প্রশান্তি কোনো একসময়ে অনুভূত হতো।”

---

[১০৩] মাগরিবি মিডিয়া অওর উসকে আসারাত, পৃষ্ঠা : ৩৫

(নোট: বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের উল্লিখিত হাতিয়ারগুলোর অধিকাংশেরই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ, খ্রিষ্টান মিশনারি এবং সেক্যুলারিজম শিরোনামের অধীনে। সেখানে বিষয়গুলো আরেকবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য শিক্ষা, মিডিয়া, গণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং নারীস্বাধীনতা বিষয়ক আলোচনা এ অধ্যায়ে কিছুটা বিস্তারিত এবং অন্যান্য স্থানে কিছুটা সংক্ষেপে করা হয়েছে।)

গ্রন্থপঞ্জি

—আল-গাজউল ফিকরি, দিরাসাত ফিস সাকাফাতিল ইসলামিয়্যা, লাজনাতুল মানাহিজ।

—আসালিবুল গাজবিল ফিকরি, আলী মুহাম্মদ জারিশা, মুহাম্মদ শরিফ আয-যিবাক।

—সুকুতুল হাদারাতিল গারবিয়্যা, আহমাদ মনসুর।

—আল-ইসলাম বাইনাশ শারকি ওয়াল গারবি, ডক্টর আলী ইজ্জাত বেজুফিতশা।

—আল-মুসলিমু বাইনাল হাউয়্যাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া বাইনাল হাউয়্যাতিল জাহিলিয়্যাহ, শায়েখ আলী ইবনে নাইফ আশ-শুহুজ।

—মাগরিবি মিডিয়া অওর উসকে আসারাত, মাওলানা নজরুল হাফিজ নদবী।

—দাওরে ফিতান অওর নাজাত কে করিনে, হাফেজ ইবনে হুজায়ফা।

সপ্তম অধ্যায়

বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের মোকাবেলায় আমাদের করণীয়

৭.১: যুদ্ধজয়ের পূর্বে যে বিষয়গুলো দেখা হয়ে থাকে

- আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাদের সাথে? শত্রু কে?
- শত্রুর হামলা কোন দিক থেকে আসছে?
- তাদের লক্ষ্য কী?
- প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র কোনটা, কেমন?
- লড়াইয়ের হাতিয়ার কী কী?
- আমাদের অবস্থান কেমন? অর্থাৎ আমাদের শক্তি-সামর্থ্য কেমন, যা আমরা কাজে লাগাবো; এবং আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা কী, যা থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।
- শত্রুর অবস্থান কী? অর্থাৎ তাদের শক্তি-সামর্থ্য কেমন? এবং তাদের দুর্বল পয়েন্টগুলো কী, যার উপর আমরা আঘাত হানতে পারি।

একটি কঠিন যুদ্ধ, যাতে সাফল্যের সাথে জয়ের আশা করা হয়ে থাকে, তাতে তখনই অবতীর্ণ হওয়া যেতে পারে যখন যুদ্ধের শুরু থেকেই উল্লিখিত বিষয়গুলোর জবাব আমাদের কাছে প্রস্তুত থাকবে।

পেছনের ছয়টি অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা জেনেছি, আমাদের শত্রুপক্ষ কারা? তাদের আক্রমণ কোন দিক থেকে আসছে? তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী কী? যুদ্ধের ক্ষেত্র কোনটা? এবং লড়াইয়ের মাধ্যমগুলোই বা কী?

এই অধ্যায়ে আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-পন্থা এবং জবাবি কার্যক্রম পরিচালনা করবার দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু তারও পূর্বে দুটি প্রশ্নের উত্তর জেনে নেওয়া বাকি আছে।

১. আমাদের শক্তি এবং দুর্বলতার জায়গাগুলো কী?

২. শত্রুপক্ষের দুর্বলতাগুলো কী?

এই প্রশ্নদুটির উত্তর জেনে নিয়ে তারপর আমাদের কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

৭.২: আমাদের দুর্বলতা

এই যুদ্ধে আমাদের ১২টি বড় দুর্বলতা রয়েছে, যার ফল ঘরে তুলছে আমাদের শত্রুরা।

১. ঈমানি দুর্বলতা।

২. আমলি দুর্বলতা।

৩. দীনি ইলমে দুর্বলতা।

৪. পার্থিব জ্ঞানের দুর্বলতা।
৫. স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা এবং রোগ-ব্যাধি।
৬. আর্থিক দুর্বলতা এবং সুদি লেনদেন।
৭. গণমাধ্যমের দুর্বলতা।
৮. রাজনৈতিক গোলযোগ।
৯. একনিষ্ঠ এবং যোগ্য নেতৃত্বের অভাব।
১০.দারিদ্র্য।
১১.অলসতা এবং স্থবিরতা।
১২.শৃঙ্খলার অভাব।

চলুন, এবারে এই দুর্বলতাগুলোর দিকে আলো ফেলা যাক। তারপর সমাধান ও প্রতিকার নিয়েও আমরা ভাববো।

ঈমানি দুর্বলতা : আমাদের ঈমানি দুর্বলতার অবস্থা হলো, আমরা পরিস্থিতির কঠিন আঘাতের পরও আল্লাহ তায়ালার অভিমুখী হবার জন্য প্রস্তুত হই না। তার দেখানো ভয়ে সেভাবে ভীত হই না, যেভাবে ভীত হওয়া দরকার। এমনকি তার প্রতিশ্রুতির ব্যাপারেও সেভাবে বিশ্বাস ও আস্থা রাখি না, যেভাবে মালিকের প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা ও বিশ্বাস লালন করা দরকার। আমরা কোনো বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করি না।

এর চিকিৎসা হলো দৃঢ় ঈমানের অধিকারী অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করা, অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করা এবং তারই সন্তুষ্টি হাসিলের পেছনে লেগে থাকা। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হাসিল হয় ফরজ ও ওয়াজিব পালন করবার মাধ্যমে। নিষেধ মান্য করা, নফল আমলে আগ্রহ, দীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার এবং জিহাদ—এর সবই আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করবার মাধ্যম। এগুলো ঈমান মজবুত করার উপায়।

আমলের দুর্বলতা : আমাদের আমলি দুর্বলতার সবচাইতে বড় প্রমাণ হলো, আমাদের অধিকাংশই দীনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রোকন নামাজ নষ্ট করে ফেলে। অন্যান্য আমল : রোজা, জাকাত, হজ, দান-সদকা ইত্যাদির কথা তো বাদই রাখলাম।

আমলি দুর্বলতা দূর করবার পন্থাও সৎ মানুষদের সান্নিধ্য গ্রহণ করা। সেজন্য প্রত্যেক মুসলমানের উচিত মসজিদের পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা। আজকাল তাবলিগে সময় লাগানো এবং সুফি-শায়েখদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এক্ষেত্রে অনেক কল্যাণকর হয়ে দেখা দেয়।

দীনি ইলমে দুর্বলতা : ইলমে দীনে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। একদিকে এখন পর্যন্ত আমাদের সমাজে এমন মানুষ রয়ে গেছেন, যারা কালিমা তাইয়েবা পর্যন্ত শুদ্ধভাবে পড়তে পারেন না। অন্যদিকে সারাক্ষণ মিডিয়ার সাথে যারা নিজেকে যুক্ত

রাখেন, টিভি চ্যানেল থেকে মুহূর্তের জন্য চোখ সরাতে পারেন না যেসব মুসলমান, তাদের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। কী কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়—তারা এটাও জানে না। তাদের কোনো খবর নেই কেন নামাজ নষ্ট হয়ে যায়—সে বিষয়ে।

দীনি ইলমে দুর্বলতা দূর করবার জন্য মুসলিম শিশুদের মাদরাসায় ভর্তি করাতে হবে। নিজে তাবলিগে চার মাস সময় লাগিয়ে দীনের মৌলিক বিষয়াদি শিখে নিতে হবে। হাজির হতে হবে কুরআনের মজলিস এবং দীনি মাহফিলে। আলেমদের সাথে নিয়মিত সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হবে। এবং সবারই কর্তব্য নিজের সাথে সম্পর্কিত শরিয়তের বিধানসমূহ অভিজ্ঞ আলেমদের থেকে জেনে নেওয়া।

জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞানে দুর্বলতা : জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞানের দাবি তো অনেক। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা দেড় শতক ধরে সরকারি কর্মকর্তা এবং ক্লার্ক তৈরি করছে কেবল। শাস্ত্রজ্ঞ এবং গবেষকের দেখা মেলে না। যে দু-চারজন শিক্ষক ব্যক্তিগত পরিশ্রমের মাধ্যমে যোগ্য শাস্ত্রজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তি তৈরি করে, তারা পশ্চিমা জ্ঞান-দর্শন এবং দীনহীন পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শেষ পর্যন্ত দীনহারা হয়ে পড়ে। অন্যরা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এবং আমাদের যোগ্য ব্যক্তির যোগ্যতা আমাদের কোনো কাজে আসে না। অন্যরা তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হতে থাকে।

এই সমাস্যার সমাধানের লক্ষ্যে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্য মডেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করা দরকার, যেখানে প্রয়োজনীয় দীনি শিক্ষা প্রদান করা হবে। সায়েন্স এবং আর্টসের পেছনে কার্যকর নাস্তিক্যবাদী পশ্চিমা দর্শনকে নাকচ করে সকল জ্ঞান ও শাস্ত্রের উপর ওহীর অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হবে। অতীতের মুসলিম দার্শনিকদের মতন আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করা হবে একটি দক্ষতা ও টেকনিক হিসেবে। উদ্দেশ্য হবে কেবল মানুষের সেবা। মুসলিম-সমাজকে প্রযুক্তিগত বিষয়ে পশ্চিম থেকে অমুখাপেক্ষী করবার জন্য কল্যাণকর জজবা নিয়ে চিকিৎসা, প্রকৌশলসহ অন্যান্য শাখায় গবেষণার কাজে এগিয়ে যেতে হবে।

উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশনির্ভরতা বন্ধ করতে হবে। অবশ্য আমাদের স্বনির্ভর হওয়া অবধি শিক্ষাগ্রহণের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের বিদেশে পাঠানো যেতে পারে। তবে কেবল এমন শিক্ষার্থীদেরই পাঠানো হবে, যাদের মেধা ও মনন ধর্মীয় ও জাতিগত দিক থেকে দৃঢ়। এবং সে অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হবার মতো নয়। যে-ব্যক্তি চারিত্রিকভাবে দুর্বল, তাকে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠানো অনর্থক। চারিত্রিকভাবে সবল তরুণেরাই দেশে ফিরে এসে বিদেশিদের নিত্যনতুন ও আধুনিক প্রযুক্তি মুসলিমবিশ্বে প্রসারিত করতে পারে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রযুক্তিগত যে ব্যবধান, এরা তা কমিয়ে আনতে সমর্থ হবে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ এইসব তরুণ আরও অভিনব কায়দায় জাতির সেবার জন্য এবং ইসলামের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বুলন্দির জন্য আবিষ্কার করবে আধুনিক সব উপকরণ। এই শূন্যতা পূরণ করবার লক্ষ্যে অকল্পনীয় দৃঢ় মানসিকতাসম্পন্ন একদল উৎসাহী তরুণের প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা এবং রোগ-ব্যাধি : প্রবাদ আছে, সুস্থ দেহেই থাকে সুস্থ মস্তিষ্ক। এই সময়ে মুসলিমবিশ্বের অধিকাংশ তরুণই শারীরিক ও মানসিকভাবে খুব বেশি সুস্থ নয়। ৫০-৬০ বছর পূর্বেকার মানুষের সাথে বর্তমান সময়ের মানুষের তুলনা করলেই এই পার্থক্য ধরতে পারা সম্ভব। সহজতার লক্ষ্যে যন্ত্রনির্ভর জীবন, পোল্ট্রি খাবার এবং চারিত্রিক গুনাহের ব্যাপকতার কারণে মুসলিম-সমাজ বর্তমানে নানাবিধ রোগ-বালাইয়ের শিকার। বিদেশি কোম্পানির উৎপাদিত খাদ্য, ফাস্ট ফুড এবং নকল ওষুধের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে অসংখ্য ব্যাধি। এসবের মাধ্যমে মূলত তরুণপ্রজন্মকে দৈহিক ও মানসিকভাবে অপদার্থ করে তোলা হচ্ছে।

আমাদের এই রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচতে হবে এবং একটি স্বাস্থ্যসচেতন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। স্বাস্থ্য ভালো করা দামি মেডিসিন এবং মোটা ফিসের চিকিৎসকের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং প্রতিদিন নিয়মমতো ব্যায়াম, সাধারণ খাদ্যগ্রহণ, অন্তর পবিত্রকরণ এবং অনর্থক দুশ্চিন্তা থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমেই তা সম্ভব।

আমাদের মাঝে প্রথমত দীনের জন্য কাজ করবে এমন মানুষের সংখ্যাই কম। আর দ্বিতীয়ত যে গুটিকয়েক মহান ব্যক্তি দীনের কাজে লেগে রয়েছেন, ব্যাপকভাবে তারা নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি অযত্নবান। বিশেষ করে আলেম এবং শিক্ষার্থীরা এদিকটাতে একেবারেই নজর দেন না। ফলে বয়স ৫০-৬০ বছর না পেরুতেই তারা কর্মক্ষমতা হারাতে শুরু করেন। দীনদার ব্যক্তির তুলনায় একজন সেক্যুলার ও আধুনিক চিন্তার মানুষের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল বহুগুণ বেশি। স্বাস্থ্যকে আল্লাহ তায়ালার আমানত মনে করতে হবে। এটা অত্যন্ত জরুরি। এবং যত্নের সাথে তার সংরক্ষণ করতে হবে। নিজের ব্যস্ততা থেকে কিছু সময় ব্যায়াম ও শরীরচর্চা, অন্তত হাঁটা-চলার জন্য বের করা খুবই জরুরি।

অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং সুদি কারবার : খনিজ সম্পদের দিক থেকে ইসলামি বিশ্ব বন্ধ্যা নয়। তবে তা সত্ত্বেও বিশ্বায়নের অধীন বাস্তবায়িত অর্থনৈতিক অবরোধ, সুদি কারবার এবং দুর্নীতি আমাদের একেবারেই দেউলিয়া বানিয়ে ছেড়েছে।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মুসলমানকে সকল বাতিল অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সুদ-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ইসলামের নিজস্ব অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করে নিতে হবে। ইসলামি অর্থব্যবস্থা সকল সুদ, স্টক মার্কেট, দুর্নীতি, জুয়া এবং অন্যান্য অবৈধ আয়ের পথ বন্ধ করে দেয়। ইসলাম জাকাত ও দান-সদকার মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে। এই সুসামঞ্জস্যশীল অর্থনীতি নিজেরাই অনুসরণ করব কেবল নয়; তাকে একটি অনুকরণীয় অর্থব্যবস্থা হিসেবে পৃথিবীর সামনে হাজির করতে হবে। ইসলামি বিশ্বের খনিজ সম্পদ অন্যের দখলে চলে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। খনিজ সম্পদ নিজেরাই বের করে সঠিক পন্থায় তা ব্যবহার করবার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য মুসলিম দেশগুলোতে বিদেশি বাণিজ্যসংস্থার ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সেবাপ্রদানকারী কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম

সীমিত করে ফেলা প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় কোম্পানিকে প্রাধান্য দিতে হবে। এবং প্রতিটি কাজের জন্য তৈরি করতে হবে স্থানীয় টেকনিশিয়ান। সর্বোপরি দুনিয়ার মোহ ও ভালোবাসার প্রতি সবাইকে নিরুৎসাহিত করে সবার মনে আল্লাহ তায়ালার ভয় ও আখিরাতের চিন্তা তৈরি করবার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে দুর্নীতির শেকড় উপড়ে ফেলা সম্ভব হয়। তা হলেই মুসলিমবিশ্বকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করে তোলা যেতে পারে।

গণমাধ্যম এবং আমাদের দুর্বলতা : মুসলিম সংস্থা এবং দলগুলো মিডিয়াযুদ্ধে অনেক পেছনে পড়ে আছে। সন্দেহ নেই, মুসলিমবিশ্বের লিবারেল নাগরিকেরা অসংখ্য পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন এবং জার্নাল প্রকাশ করছে। রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত রেডিওস্টেশন ও টিভি চ্যানেলেরও কোনো কমতি নেই। তবে তার দ্বারা না ইসলামের কোনো কল্যাণ সাধিত হচ্ছে আর না দেশ ও জাতির। শুদ্ধ ও সঠিক চিন্তার মুসলমান এই দৌড়ে অনেক পেছনে রয়ে গেছে। এই ক্ষতি পোষানোর জন্য মিডিয়াতে নিজেদের ভূমিকা বৃদ্ধি করবার কোনো বিকল্প নেই।

রাজনৈতিক গোলযোগ : রাজনৈতিক গোলযোগ আমাদের জন্য জীবন-মরণ প্রশ্ন। এর কারণে কোনো ইসলামি দেশের প্রধান সমস্যার দিকে মনোযোগ দেওয়া যায় না। একের পর এক রাজনৈতিক সঙ্কট সাধারণ মানুষ এবং শাসকশ্রেণির সকল মনোযোগ ও যোগ্যতা নষ্ট করে দিচ্ছে।

ইসলামি ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই রাজনৈতিক সঙ্কট নির্মূল হতে পারে। এক তরফাভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বর্জন করার মধ্যেও তেমন কোনো লাভ নেই। কেননা এর ফলে আইনপ্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুফিবাদী অধার্মিক ব্যক্তিদের ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং ইসলামবিরোধী আইন মঞ্জুরির গতি হয়ে উঠবে আরও বেগবান। আমাদের আন্দোলনের প্রস্তুতির পূর্ব পর্যন্ত সতর্কতার সাথে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গ দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সেই সাথে এও জরুরি যে, গণতন্ত্রের বাস্তবতা সাধারণ মানুষ থেকে গোপন রাখা যাবে না। বরং তার ক্ষতি ও অনিষ্ট সাধারণ মানুষের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে। এবং তার কার্যক্রম ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যেন আমরা ক্রমেই এই ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। প্রাথমিকভাবে অন্তত এতটুকু তো অবশ্যই করা উচিত যে, ইসলামি দলগুলো নিজেদের ব্যবস্থাপনা ও কার্যবিধি থেকে গণতন্ত্রকে বের করে দিয়ে সুন্নত অনুযায়ী প্রকৃত শুরায়ী পদ্ধতির বাস্তবায়ন ঘটাবে।

নিষ্ঠাবান এবং যোগ্য নেতৃত্বের অভাব : যোগ্য এবং নিষ্ঠাবান নেতৃত্বের অভাব আমাদের জন্য বিরাট দুর্ভাগ্য। বর্তমান সময়ে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক উভয় অঙ্গনেই নেতৃত্বের বিরাট শূন্যতা অনুভূত হয়। নেতৃত্ব কোনো বিদ্যালয়ে তৈরি করা যায় না। তারা বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। আশা করা যায়, যদি আমরা

প্রথমোক্ত আটটি দুর্বলতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের ভূমিও আর বন্ধ্যা থাকবে না; সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি হয়ে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছানুযায়ী সময়মতো অবশ্যই সামনে এসে যাবে।

সম্পদস্বল্পতা, দারিদ্র্য : সম্পদ ও উপকরণের গুরুত্ব আপন জায়গায় অনস্বীকার্য। তার স্বল্পতা বাহ্যিক উপায়-উপকরণের দিক থেকে আমাদের হিম্মতহারা করে ফেলে। এবং যারা কাজ করতে চায় তাদের পায়ের শেকলে পরিণত হয়।

সুনির্দিষ্টভাবে দারিদ্র্য দূর করা আমাদের এমন কোনো লক্ষ্য নয়, যাকে আমাদের অনেক গুরুত্ব দিতে হবে। এবং নিজেদের সম্পদশালী হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে পড়ে যেতে হবে। কেননা দরিদ্রতা এবং সাদাসিধা জীবন স্বয়ং আমাদের প্রিয় নবীজির পছন্দনীয় জীবনপদ্ধতি ছিল। যদি আমরা দীনের মূলনীতি গ্রহণ করে নিতে পারি তাহলে আমাদের অতটুকু দরিদ্রতা অনায়াসেই দূর হয়ে যাবে, যা একজন ব্যক্তির জন্য অসহনীয় এবং সমাজের জন্য লজ্জাজনক। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ রাখবার হাদিসের উপর আমল করে তাহলে কখনোই কোনো ব্যক্তি ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবার কিংবা নিঃস্বতার কারণে কারুর আত্মহত্যা করবার প্রশ্নই উঠবে না। যদি সকল ধনী ব্যক্তি জাকাত আদায় করে তাহলে সমাজে কেউ নিঃস্ব থাকতে পারে না। এভাবে এতিমের প্রতিপালন করা, দান-সদকা করা, আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদাচার এবং অন্যকে খাবার খাওয়ানোর সুন্নতের প্রতি প্রত্যেকে সঠিকভাবে আমল করলে সমাজ বাহ্যত কম সম্পদশালী এবং অনাড়ম্বর হওয়া সত্ত্বেও জান্নাতের নমুনা হয়ে উঠতে পারে; যেমনিভাবে মদিনার সমাজ ছিল অনাড়ম্বর ও দরিদ্র; কিন্তু সেখানে ভালোবাসা, আন্তরিকতা, পরার্থপরতা এবং ত্যাগের পরিবেশ যে সচ্ছলতা তৈরি করে রেখেছিল, কোনো কারুনি-সমাজব্যবস্থায় তার কল্পনাও করা সম্ভব নয়।

যাক, তারপরও ধর্মীয় এবং জাতিগত পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সম্পদের স্বল্পতা একটা গুরুতর সমস্যা। যদি মুসলিম শাসকেরা এই সমস্যাটি গুরুত্বের সাথে নিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যয়-সংকুচিত করে আনেন এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করেন তাহলে এই সমস্যা সৃষ্টিই হয় না। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম শাসকের কার্যক্রম হতাশাজনক। যে কারণে এই সমস্যার সমাধানও সাধারণ জনগণের নিজেদেরই বের করতে হবে।

আপাতত এই পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে যে, ধর্মীয় এবং জনকল্যাণমূলক সংস্থাগুলো নিজেদের সম্পদের একটি অংশ বাণিজ্য, কৃষি এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করবে। কেবল চাঁদার উপরই নির্ভর করবে না। সেই সাথে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য নিজের ব্যক্তিগত খরচ ও জীবনযাপন-পদ্ধতিতে কিছুটা সংকোচন নিয়ে আসা। এবং উদ্বৃত্ত অংশটুকু দীনি ও জাতীয় কাজে ব্যয় করা। অধিকাংশ মানুষই তার জীবনভর উপার্জনের উদ্বৃত্ত অংশ ঘরনির্মাণ এবং সন্তানের

বিয়েশাদিতেই ব্যয় করে ফেলে। এসব খাতে নিজের ইচ্ছার ৫০ ভাগ কমিয়ে এনে অনাড়ম্বর বিবাহ এবং সাধারণ ঘরে বসবাসের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে অবশিষ্ট অর্থ দীনি এবং কল্যাণী কাজে খরচ করা যায় তাহলে কল্যাণধর্মী কোনো পরিকল্পনা অবাস্তবায়িত থাকবে বলে আমার মনে হয় না।

এ ছাড়া দীনি কর্মীদের কর্তব্য কম উপকরণে কাজ সম্পন্ন করা এবং সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা। এই সময়ে আমাদের পক্ষে এর বেশি করা সম্ভব নয়। আর যা আমাদের সাধ্যাতীত তা আমরা আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে ছেড়ে দিই। আল্লাহ তায়ালা তার গোপন ভান্ডার থেকে আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা রাখেন এবং তিনি ধর্মীয় ও জাতিগত সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও পূর্ণ ক্ষমতাবান।

স্থবিরতা, অলসতা এবং হতাশা : আমাদের একটি অংশ জাতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এবং দীনের বরবাদি দেখে চোখের অশ্রু ফেলে। কিন্তু কার্যত সকলেই প্রায় অনুভূতিহীন। স্থবিরতা এবং অলসতার এমন এক চিত্র চোখের সামনে হাজির দেখছি, যাতে অঙ্কিত প্রতিজন ব্যক্তি ভবিষ্যতের ব্যাপারে নিরাশ এবং উদ্যোগী হবার ব্যাপারে গাফেল ও বিমুখ।

এর প্রতিকারের জন্য জাতীয় ও ধর্মীয় চেতনা উজ্জীবিত করবার বিকল্প নেই। মানুষের মাঝে উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে হবে। আমাদের দাঈ, খতিব, বক্তা, মসজিদের ইমাম, কবি, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকবৃন্দ নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা এবং সহমর্মিতার সাথে যদি সঠিক পন্থায় কাজ করেন তাহলে এই স্থবিরতা দূর করা যেতে পারে। এর জন্য জরুরি প্রতিটি দাওয়াত ও বয়ানের পর লোকদের কর্মপন্থা দেখিয়ে দেওয়া। এমন কোনো পন্থা তাদের বাতলে দিতে হবে, যেন তারা কিছু করবার সুযোগ পায়। এইক্ষেত্রে তাবলিগ জামাতের কার্যপন্থার কথা ভেবে দেখা যেতে পারে। যারা সমাজের সাধারণ মানুষের মাধ্যমে সাত-সমুদ্রের ওপার পর্যন্ত দীনের কাজ সম্পন্ন করে দেখিয়েছেন।

দাঈর জীবনও হতে হবে তার দাওয়াত অনুযায়ী; এটা অত্যন্ত জরুরি। তারা হবে ইসলামের চলমান প্রতিচ্ছবি। ত্যাগ ও কুরবানির ক্ষেত্রে তারা হবে আদর্শ। নতুবা ফল বিপরীত হতে পারে।

শৃঙ্খলার অভাব : শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার অভাব আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। এটা আমাদের বহু সামর্থ্য নষ্ট করে দেয় এবং আমাদের বহু প্রতিজ্ঞা ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। আমরা খেলাফতবিরোধী আন্দোলন এবং শরিয়ত বাস্তবায়ন আন্দোলনের মতন বড় বড় লক্ষ্য সামনে হাজির করি বটে। কিন্তু দেখা যায় হয়তো-বা আমরা নিজেদের উদ্যোগ কার্যকরভাবে শুরুই করতে পারি না। কিংবা অর্ধেক এগোতেই তা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। আমাদের অধিকাংশ কাজই হয় পরিকল্পনাহীন। অপরিকল্পিত। যে-সমস্ত লোক এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে তারা চার-পাঁচ বছরের

দূরত্বেই নিজেদের গন্তব্য দেখে ওঠে এবং সে হিসেবেই নিজেদের দৌড় আরম্ভ করে। অথচ কোনো বড় উদ্যোগই উত্তম ব্যবস্থাপনা, গভীর পরিকল্পনা এবং ধৈর্য ও স্থৈর্য ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না।

শৃঙ্খলা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য সবচাইতে বড় বিষয় হলো পরামর্শ। প্রতিটি ছোট-বড় কাজ করবার পূর্বে প্রকাশ্য এবং স্বাধীন পরিবেশে বারবার পরামর্শ করা। প্রতিটি দিক নিয়ে চিন্তাভাবনার পর কর্মপদ্ধতি ঠিক করা। দ্বিতীয় বিষয় হলো আমিরের আনুগত্য। এই বিষয়ে সেই সকল হাদিস অধ্যয়ন করা অতীব জরুরি, যেখানে আমিরের আনুগত্যের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক কর্মীর জন্য নিজের মত এবং স্বেচ্ছাচারিতা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। বড়দের আদেশ পালন করা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমির কোনো শরিয়তবিরোধী আদেশ প্রদান না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্য আন্তরিকভাবেই প্রস্তুত থাকা।

'সময় ও কাজের শৃঙ্খলা' স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে এখন পশ্চিমের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। সেগুলোর বিষাক্ত ও ক্ষতিকর দিকগুলো ছাটাই করে কল্যাণকর বিষয়গুলো আমাদের শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতার জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে।

৭.৩: আমাদের সামর্থ্য

এই লড়াইয়ে আমাদের সামর্থ্য একেবারেই সামান্য নয়। যদি তাকে সঠিক পন্থায় ব্যবহার করা যায় তাহলে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। আমাদের কিছু আশাজাগানিয়া গুরুত্বপূর্ণ সামর্থ্য হলো :

সত্যের উপর থাকা : আমরা মুসলিম। আমাদের সত্যপন্থি হওয়া, ঈমান ও ইসলামের উপর অবিচল থাকা আমাদের সর্বপ্রথম এবং সবচাইতে বড় শক্তি। কেননা জয় সত্যেরই হয়।

وَ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ ۔ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।[১০৪]

আল্লাহ তায়ালার সঙ্গ এবং সাহায্য : সত্যের উপর অবিচল থাকার দরুন আল্লাহ তায়ালার সঙ্গ এবং সাহায্য মুমিনদের সাথে বিশিষ্ট করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন :

وَ اللّٰهُ مَعَكُمْ

আর আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন।[১০৫]

---

[১০৪] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৮১
[১০৫] সুরা মুহাম্মদ, আয়াত ৩৫

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।[১০৬]

উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিশ্রুতি : আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিশ্চিত বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এর চাইতে অধিক সত্য কোনো প্রতিশ্রুতি হতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

وَ اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ

আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী।[১০৭]

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই জয়ী হবে।[১০৮]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরো বলেন :

وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

আল্লাহ তার নুর পূর্ণ করেই ছাড়বেন; যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।[১০৯]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

যাতে করে (আল্লাহ) একে (এই সত্য ধর্মকে) সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।[১১০]

এই প্রতিশ্রুতিগুলো আমাদের সাহস বাড়িয়ে তোলে। আর যুদ্ধে সাহসই সবচাইতে কার্যকর হাতিয়ার।

ফেতনার ভবিষ্যদ্বাণী এবং অনাগত পরীক্ষা সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান : কেবল উম্মতে মুহাম্মদিই এই সুবিধা পেয়েছে; আমাদের কাছে ফেতনাসংক্রান্ত হাদিস এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের ভবিষ্যদ্বাণীর আকৃতিতে ভবিষ্যতের আপদ ও ঝুঁকি সম্পর্কে একটি পূর্ণ ও স্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে, যার সাহায্যে আমরা পূর্ব থেকেই যুদ্ধের পরিকল্পনা করে নিতে পারি। এই সুবিধা আমাদের শত্রুপক্ষের একদমই নেই।

অন্তর প্রভাবিত করবার বাস্তবিক শক্তি : দলিল-প্রমাণের ক্ষেত্রে কেউ যদি নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে তাহলে তার অন্তর আমাদের সত্যপন্থি হবার সাক্ষ্য

---

[১০৬] সুরা রুম, আয়াত ৪৭

[১০৭] সুরা সাফফাত, আয়াত ১৭৩

[১০৮] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৯

[১০৯] সুরা সাফ, আয়াত ৮

[১১০] সুরা সাফ, আয়াত ৯

প্রদান করবে। এই কারণে হৃদয়কে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করবার বাস্তবিক ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে কেবল আমাদের কাছেই আছে।

সংরক্ষিত শরিয়ত : শুধু ইসলামপন্থিদের কাছেই কুরআন, হাদিস এবং ফিকহি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আকৃতিতে তাদের শরিয়ত বর্তমান আছে, যা কোনো দেশ, সরকার এবং সমাজ পরিচালনার জন্য কেবল যথেষ্টই নয়; বরং বারোশ বছর ধরে তার সফল প্রয়োগও দেখার সুযোগ হয়েছে। অন্যদের কাছে কেবল তত্ত্ব আছে। সেই তত্ত্বের মধ্য থেকে যতটুকু বাস্তবায়ন করা হয়েছে, তার ক্ষতিই কেবল দৃশ্যমান হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয় এবং ইউরোপের চারিত্রিক অধঃপতন তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

জনশক্তি : জনশক্তি আমাদের জন্য বিরাট এক ঢাল। এবং অনেক বড় এক হাতিয়ার। আলহামদুলিল্লাহ, এই শক্তি দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারা পৃথিবীতে মুসলিম-সমাজের সন্তান জন্মহার সবচাইতে বেশি। সেই সাথে বিগত ১০ বছরে অমুসলিমদের ইসলামগ্রহণের সংখ্যাও বেড়েছে দ্রুততার সাথে। এমনকি স্বয়ং পশ্চিমা জনসংখ্যাবিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো, আগামী অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যে সারা পৃথিবীতে মুসলিম জনসংখ্যা ষাট পার্সেন্টে গিয়ে দাঁড়াবে। এবং ইউরোপের দেশগুলোতে মুসলিম জনসংখ্যার হার হবে ত্রিশ থেকে চল্লিশ-শতাংশ।

ভৌগোলিক অবস্থান : মুসলিম দেশগুলো একটা শেকলের মতন আটলান্টিক মহাসাগরের তীর থেকে আরম্ভ করে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। তাদের অবস্থান পৃথিবীর একদম মধ্যখানে। সকল গুরুত্বপূর্ণ জল ও স্থলপথ মুসলিমদের হয়ে অতিক্রম করে। আমরা কেবল আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমেই পশ্চিমের আওয়াজ স্তব্ধ করে দিতে পারি।

খনিজ সম্পদ : মুসলিমবিশ্ব খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এগুলো হলো সেই খনিজ সম্পদ, যা ভূগর্ভে সংরক্ষিত আছে। এবং আগত কয়েক শতাব্দীকাল পর্যন্ত যা ব্যবহার করা যাবে। লিথিয়ামের সবচাইতে বড় খনিটি আফগানিস্থানে। পাকিস্তানের ভূমিতে স্বর্ণের সাতটি বড় খনি বর্তমান। এত পরিমাণ কয়লা রয়েছে যে, আমরা শত বছর ধরে সারা দেশে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারবো। বিপরীতে পশ্চিম তাদের খনিজ সম্পদের বিপুল অপচয় করে এক শতাব্দীর মধ্যেই দেউলিয়া হতে যাচ্ছে।

৭.৪: শত্রুর দুর্বল দিক

নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ও হাতিয়ার সম্বন্ধে জানবার পর শত্রুপক্ষের দুর্বল দিক সম্পর্কে ভালো রকম অবগতি রাখাও জরুরি, যাতে আমরা সেগুলো লক্ষ্য বানিয়ে নিশ্চিতভাবেই তাদের পরাভূত করতে পারি। এটাই ব্যক্তিগত এবং জাতিগত লড়াইয়ের মূলনীতি। আমাদের প্রতিপক্ষের দুর্বল দিকগুলো হলো :

১. ভ্রান্ত আকিদা ও চিন্তা-দর্শন।
২. অস্থির আত্মা এবং দ্বিধান্বিত মনন।
৩. খোকলা সমাজ, দুর্বল পরিবার-ব্যবস্থা।
৪. মৃত্যুভয়, দুনিয়ার মোহ।
৫. ধোঁকা ও প্রতারণা, রাগ ও ক্রোধ, প্রতিশোধপরায়ণতা এবং ব্যতিব্যস্ততা।
৬. ধ্বংসোন্মুখ অর্থব্যবস্থা।
৭. জনসংখ্যার স্বল্পতা।
৮. অভ্যন্তরীণ বিভেদ।

ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-দর্শন : ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস লালনকারী হওয়াই ইসলামের বিপক্ষশক্তির সবচাইতে বড় দুর্বলতা। কেননা ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস পোষণকারীদের সাথে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য থাকার প্রশ্নই ওঠে না। বরং এমন চিন্তা-দর্শন ও আকিদা আল্লাহ তায়ালার অসন্তোষ ও গ্রেফতারির কারণ হয়ে থাকে। তাদের সাময়িক সফলতা আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে সুযোগ এবং অবকাশ প্রদান ছাড়া কিছুই নয়। আদ-সামুদ থেকে আরম্ভ করে নাৎসিবাদ এবং কমিউনিজম পর্যন্ত এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

অস্থির আত্মা এবং দ্বিধান্বিত মনন : ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস এবং শয়তানি কর্মকাণ্ডের কারণে আত্মা বা নফস তো সব ভুলে থাকে; কিন্তু অন্তর ও রুহ কখনো প্রশান্ত হয় না। যে কারণে পশ্চিমা সমাজের সাধারণ ব্যক্তিক জীবন এক অস্থির আত্মা ও দ্বিধান্বিত মননের আকার নিয়েছে। এই অস্থিরতাকে ধূমপান, নেশাদ্রব্য, নাচ-গান এবং শয়তানি খেল-তামাশার মাধ্যমে দূর করবার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিমা সমাজ নিজের এই দুর্বলতার কারণে এমন কোনো আহ্বানের (ইসলামের) অধিক সময় ধরে প্রতিরোধ-মোকাবেলা করতে পারে না, যার মধ্যে আত্মার শান্তি ও প্রশান্তির প্রকৃত উপকরণ রয়েছে।

জরা-জীর্ণ সমাজ, দুর্বল পরিবার-ব্যবস্থা : পশ্চিমা সমাজের পরিবার-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সেখানে অধিকাংশই একাকী জীবন বেছে নেয়। যেহেতু সে সমাজে যৌনচাহিদা পূরণ করা এতটাই সহজ, যতটা আমাদের এখানে হোটেল থেকে চা পান করা; ফলে খুব কম সংখ্যক মানুষই নিয়মতান্ত্রিক বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। বহু কম সংখ্যক শিশু তাদের বাবা-মায়ের আদর-সোহাগ পায়। অনেক কম শিশুই নিজেদের দাদা-দাদির নাম-পরিচয় জানে। যৌবন কেটে যায় অফিস, মার্কেট, হোটেল, ক্লাব, ক্যাসিনো আর পতিতালয়ে। আর বার্ধক্যে বৃদ্ধাশ্রম তাদের শেষঠিকানা হয়ে দেখা দেয়। সেখানে পরিবার-ব্যবস্থা রক্ষা করবার সকল কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেছে। আর এই প্রলয় পশ্চিমা সমাজকে একেবারে ভেতর থেকে খোকলা করে দিয়েছে। ইসলামই পারে পশ্চিমকে দ্বিতীয়বার ভালোবাসাপূর্ণ পরিবার-ব্যবস্থার

নেয়ামত ফিরিয়ে দিতে। আর ইসলামের এই সুরক্ষা-ক্ষমতাই পারে পশ্চিমের মন ও মনন জয় করে নিতে।

মৃত্যুভয়, দুনিয়ার মোহ : পশ্চিম যেহেতু এই পার্থিব জীবনকেই একমাত্র ও চূড়ান্ত মনে করে নিয়েছে এবং আখিরাতের উপর কোনো বিশ্বাস রাখে না; সে কারণে পশ্চিমা সমাজ দুনিয়ার প্রতি সীমাহীন আসক্ত এবং তার উদ্ভ্রান্ত পূজারি। পশ্চিমের একজন মানুষ যেকোনো মূল্যে চিরদিনের জন্য দুনিয়াতে থেকে যেতে চায়। বহু বিজ্ঞানী গবেষণা করে যাচ্ছেন কীভাবে মৃত্যু থেকে বাঁচার উপায় বের করা যায় তা নিয়ে। পশ্চিমের বহু বাহাদুর ব্যক্তিও মৃত্যুকে বিপুল পরিমাণ ভয় করে। এ কারণেই, আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ডেনমার্ক এবং আরও বহু দেশের সেনাবাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও মুজাহিদদের হাতে পরাজিত হচ্ছে।

ধোঁকা-প্রতারণা, রাগ-ক্রোধ, প্রতিশোধপরায়ণতা এবং ত্বরাপ্রবণ মানসিবতা : ধোঁকা ও প্রতারণায় লিপ্ত হওয়া বস্তুত বোধ ও বুদ্ধির উপর পর্দা পড়ে যাওয়ার নামান্তর। ঠিক তেমনিভাবে রাগ ও ক্রোধও বাস্তবতা অনুধাবনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেভাবে রাগে লাল হওয়া একজন খেলোয়াড় নিজের ক্যারিয়ার নষ্ট করে বসে, তদ্রূপ যুদ্ধে অংশ নেওয়া যেকোনো পক্ষের জন্য এই অবস্থাটি ধ্বংসাত্মক। রাগ ধৈর্যকে লীন করে দেয়। এবং মনকে ত্বরাপ্রবণতার প্রতি উসকে দেয়। খেলাধুলা হোক কিংবা লড়াই, উভয় ক্ষেত্রেই জয়ের জন্য মন ও মস্তিষ্ককে রাখতে হয় ঠান্ডা আর তপ্ত রাখতে হয় হাত ও হাতিয়ার। পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে আমেরিকা এবং জায়োনিস্ট লবি বর্তমান সময়ে সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা ইসলামকে নির্মূল করতে পারছে না। বরং ইসলাম সামরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় ক্ষেত্রেই তাদের সামনে ইস্পাতের মতন অবিচল দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমেরিকা এবং জায়নবাদী লবির বিভিন্ন পদক্ষেপ ও বিবৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে, তারা আর বেশি অপেক্ষা করতে চাচ্ছে না। ইসলামের বিরুদ্ধে 'সর্বশেষ চূড়ান্ত লড়াইয়ে' বিজয় অর্জনের জন্য তারা খুবই ত্বরাপ্রবণতার স্বীকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই শেষলড়াই তো সংঘটিত হবে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম এবং দাজ্জালের মধ্যে। বাতিল শক্তির ভয় হলো, তাদের সর্বশেষ মুক্তিকামীর আগমনের পূর্বেই যেন তাদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে না যায়। ততদিন পর্যন্ত নিজের জাতির সাহস ও উৎসাহ-উদ্দীপনা ধরে রাখবার জন্য পশ্চিমা মিডিয়া 'আরমাগেডন' ও '২০১২'-এর মতো সিনেমা মুক্তি দিচ্ছে, যাতে দেখানো হয় যে, সর্বশেষ আমেরিকাই সবচাইতে বড় পরাশক্তি এবং সমস্ত মানবতার উদ্ধারকর্তা হিসেবে প্রমাণিত হবে। কিন্তু এই সকল পদক্ষেপ থেকে আমেরিকা ও ইহুদিদের ভয় ও ত্বরাপ্রবণতাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামরিক—উভয় ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনবরত পরাস্ত করে যাওয়া বাতিলের জন্য অসম্ভব, সে-কারণে তারা ক্রোধান্বিত হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্লজ্জ সব কর্মকাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ধৃষ্টতামূলক চিত্র ও সিনেমা বানানো, কুরআন মাজিদের অবমাননা, ফ্রান্স এবং আরও কিছু দেশে হিজাব পালনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, স্পেনে নামাজিদের সংখ্যাধিক্যের কারণে মসজিদে মসজিদে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া এবং সুইজারল্যান্ডের মসজিদগুলোর মিনারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা এই কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, তারা ভয়ঙ্কর রকম ঘাবড়ে গেছে।

এমন প্রয়াস-প্রচেষ্টার মাধ্যমে পশ্চিমের শক্তি নয়; বরং তাদের দুর্বলতা উলঙ্গ হয়ে সামনে আসছে। এর পরিষ্কার অর্থ, তাদের মাথা গরম হয়ে পড়েছে এবং তারা পুরুষোচিত যুদ্ধ করবার শক্তি হারিয়ে বসছে। তাদের ব্লাডপ্রেসার হাই হয়ে উঠেছে। এবং পালস ঝুঁকির মুখে পড়েছে। শীঘ্রই পশ্চিমের হাত-পা স্থবির হয়ে পড়বে। ততদিন আমাদের সাহস, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং শীতল মস্তিষ্ক নিয়ে ময়দানে অবিচল থাকতে হবে।

ধ্বংসোন্মুখ অর্থব্যবস্থা : আমেরিকা এবং ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থাও ধ্বংসের মুখে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা সারা দুনিয়াকে চুষে নেওয়ার পর এখন নিজেরা নিজেদেরই শুষতে আরম্ভ করেছে। বড় বড় ব্যাংক দেউলিয়া হবার পথে। খনিজ সম্পদ ফুরিয়ে আসছে। পুঁজিবাদের কেন্দ্র আমেরিকাতে অজস্র মানুষ, যারা গতদিন পর্যন্তও সচ্ছল ছিল, বেকার এবং নিঃস্ব হয়ে তাঁবুতে জীবন কাটাতে আরম্ভ করেছে। পশ্চিম এই অবস্থায় বিশ্বকে বেশি দিন দাস বানিয়ে রাখতে পারবে না। সিআইএ-র এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগামী ২৫ বছরে পশ্চিমের সম্পদ প্রাচ্যে স্থানান্তরিত হয়ে পড়বে।

জনসংখ্যার স্বল্পতা : পশ্চিমা দুনিয়ার জন্য এক ভয়াবহ ঝুঁকি হলো জনসংখ্যার স্বল্পতা। সেখানে জন্মহার অনবরত নিম্নগামী। সেখানে উত্তম চিকিৎসাব্যবস্থা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কারণে বয়স্কদের মৃত্যুহারও কমে গেছে। এবং মানুষের গড় আয়ু সত্তর থেকে আশি বছরে পৌঁছে গেছে। নতুন প্রজন্মের জন্মহারের স্বল্পতা এবং প্রবীণদের মৃত্যুহার কমে যাওয়ার কারণে পশ্চিমা সমাজে তরুণপ্রজন্মের সংখ্যা কমে আসছে এবং বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ইউরোপের একাধিক দেশে এখন 'সন্তান একটি হলে দুটি নয়'-এর স্থলে আকর্ষণীয় সব প্যাকেজের সাথে অধিক সন্তানগ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু সেই স্বাধীন সমাজে না কেউ মা হতে চায় আর না কেউ বাবা, যে কারণে সেইসব প্রয়াস-প্রচেষ্টার তেমন কোনো ফল সামনে আসছে না। জনসংখ্যা স্বল্পতার ভয়ঙ্কর ঝুঁকি উপলব্ধি করে পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা ক্লোনিং এবং রোবট উৎপাদনের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ক্লোনিংয়ের মতন কৃত্রিম প্রোগ্রামের মাধ্যমে তারা মুসলমানের প্রাকৃতিক জন্মহারের মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়। একইভাবে রোবট কোনোভাবেই মানুষের উত্তম বিকল্প হতে পারে না।

অভ্যন্তরীণ কোন্দল : ইসলামের বিপক্ষশক্তি বাহ্যত মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংহত। এবং দেখা যায় তাদের একতা অত্যন্ত পোক্ত। কিন্তু বাস্তবে তারা অভ্যন্তরীণ বহু কোন্দল ও বিরোধে যুক্ত। কেবল শয়তানের নির্দেশিত কামনা-বাসনা ও লক্ষ-উদ্দেশ্য তাদের একত্র করেছে। নতুবা বন্ধুত্ব, একনিষ্ঠতা এবং দয়া-ভালোবাসা বিবর্জিত এই জাতি, যারা বৃদ্ধ বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের আর কোনো প্রকারের খোঁজখবরই রাখে না, তারা পরস্পরে আন্তরিক কীভাবে হতে পারে! যদি সম্ভব হতো তাহলে তাদের একপক্ষ অন্যপক্ষকে কাঁচা চিবিয়ে ফেলতো। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এক কাতারে দাঁড়াবার পেছনে সম্পদ ও খ্যাতির আশাপূরণের সুযোগ কার্যকর থাকে ততক্ষণ তাদের সুসংহত ও সংঘবদ্ধ দেখা যায়। যখনই লাভের পরিমাণ কমে যেতে থাকে তখনই তাদের বন্ধুত্বে ফাটল দেখা দিতে আরম্ভ করে।

بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّ قُلُوْبُهُمْ شَتّٰى

তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচণ্ড হয়ে থাকে। আপনি তাদের ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তর শতধাবিচ্ছিন্ন।[১১১]

৭.৫: কর্মপদ্ধতি

নিজেদের এবং প্রতিপক্ষের শক্তি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে কিছু অবগতি লাভের পর আমাদের কাজে নেমে পড়তে হবে। এই ধারাবাহিকতায় আমরা নিচের বিষয়গুলো বুঝতে চেষ্টা করব :

১. আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী হবে?
২. কী কী বৈশিষ্ট্যের সাথে কাজ করা হবে?
৩. কাদের পেছনে শ্রম দেওয়া হবে?
৪. কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে?
৫. হাতিয়ার কী হবে?
৬. কোন কোন কেন্দ্র থেকে শক্তি সঞ্চয় করা হবে?

৭.৬: আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী হবে?

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে আমাদের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকবে :

১. আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ অর্জন।
২. বান্দাকে আল্লাহ তায়ালার অভিমুখী করা।
৩. আমাদের সেই সকল অক্ষমতা ও দুর্বলতা দূর করা, যা বাতিলপন্থিদের আগ্রাসী হবার সুযোগ করে দেয়।
৪. সাম্রাজ্যবাদ, প্রাচ্যতত্ত্ব, খ্রিষ্টান মিশন এবং বিশ্বায়নের ক্ষতি থেকে জাতিকে উদ্ধার করা।

---

[১১১] সুরা হাশর, আয়াত ১৪

৫. ইসলামের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ও পরিচালিত সকল ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধ।
৬. ইসলামি খেলাফতের জন্য মানুষের মন ও মননকে প্রস্তুত করা।
৭. অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া।
৮. শরিয়তের বাস্তবায়ন এবং একটি আদর্শ ইসলামি সমাজের রূপদান করা।
৯. পৃথিবীব্যাপী ইসলামের মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয়।

৭.৭: কাজের জন্য আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

কাজের জন্য অবধারিত কিছু গুণের কথা বলি :

১. পোক্ত ঈমান।
২. নিয়তের বিশুদ্ধতা।
৩. আল্লাহ তায়ালার অধিক স্মরণ।
৪. হালাল উপার্জন এবং দান-সদকা।
৫. দুনিয়াবিমুখতা এবং অল্পতুষ্টি। সাদাসিধা জীবনযাপন।
৬. আদেশ পালন এবং নিষেধ বর্জন।
৭. বান্দার হক আদায়।
৮. প্রয়োজনীয় দীনি ইলম।
৯. উম্মাহর ফিকির।
১০. বর্তমান পরিস্থিতি এবং ইতিহাস সম্বন্ধে অবগতি।
১১. দৃঢ়তা।

পোক্ত ঈমান : ঈমান পোক্ত হওয়া আমাদের মূলভিত্তি। তারই উপর নির্ভর করে আমরা জেগে উঠব। এটাই আমাদের দাওয়াতের প্রথম বার্তা। তার ভিত্তিতেই আমরা সমুখে অগ্রসর হবো। এবং তার সমান্তরালেই আমরা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হবো।

নিয়তের বিশুদ্ধতা বা ইখলাস : আমাদের নিয়ত হবে কেবল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। ইসলামকে উন্নীত করা এবং জাতির সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করা সবকিছুর একটাই লক্ষ্য—আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ। আমাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ব্যক্তিস্বার্থ, যেমন সম্পদ বা খ্যাতি, হওয়া অনুচিত। তাহলেই অদৃশ্য সাহায্য আমাদের সাথি হবে। অন্যথায় আমরা দেশ ও জাতির সেবক হিসেবে খ্যাতি পেতে পারি বটে; কিন্তু দীনের প্রকৃত সেবক হতে পারবো না। আমাদের কাজে বরকত আসবে না। এবং আখিরাতে আমাদের জন্য কোনো অংশ থাকবে না।

অধিক পরিমাণে আল্লাহর স্মরণ : বেশি পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার জিকির বা স্মরণ জরুরি, যাতে আল্লাহ তায়ালার সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। তেলাওয়াত, দরুদপাঠ এবং বিভিন্ন স্থানের মাসনুন দোয়াগুলো সারাক্ষণ মুখে রাখা। প্রতিদিন নিভৃতে দোয়া করবার জন্য একান্ত কিছু সময় বের করা অত্যন্ত জরুরি।

হালাল রিজিক এবং দান-সদকা : হালাল রিজিক উপার্জনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবার চেষ্টা করা। হারাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকা। আল্লাহ তায়ালার দেওয়া সম্পদ থেকে দান-সদকার ক্ষেত্রে কার্পণ্য না করা।

দুনিয়াবিমুখতা এবং অল্পতুষ্টি, অনাড়ম্বর জীবন : দীনি কাজে বেশি বেশি খরচ করা; কিন্তু ব্যক্তি-জীবনে যতটা সম্ভব অল্পতুষ্টি এবং দুনিয়াবিমুখতা অর্জনের চেষ্টা করা। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং বাহনের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থায় সন্তুষ্ট থাকা।

ফরজ-ওয়াজিব পালন এবং নিষেধ পরিহার : সকল ফরজ ও ওয়াজিব বিধান সময়মতো আদায় করা। বিশেষ করে জামাতের সাথে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত এসব ক্ষেত্রে সামান্য অলসতা না করা। কবিরা গুনাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকা।

বান্দার হক আদায় : কারো কোনো আর্থিক বা আত্মিক অধিকার নিজের কাঁধে না রাখা। ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করা। আমানতের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা। নম্রভাবে কথা বলা এবং উত্তম আখলাকে অভ্যস্ত হওয়া। অশ্লীল কথা, মিথ্যা, চোগলখোরি, গিবত, কুধারণা এবং ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে কারো অধিকার খর্ব না করা। শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন ও পারিশ্রমিক সময়মতো পরিশোধ করা। প্রয়োজনীয় ভাতা ও সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে কার্পণ্য না করা। অফিসে সম্পূর্ণ সময় কাটানো এবং নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বগুলো সুন্দরভাবে সম্পাদন করা।

প্রয়োজনীয় দীনি ইলম : ফরজ, ওয়াজিব এবং হালাল-হারাম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলা দ্রুতই শিখে নেওয়া। এবং এরপরও ইলমে দীন শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখা। প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যিক কর্তব্য হলো, কমপক্ষে দশটি ছোট সুরা, পঞ্চাশটি কুরআনের আয়াত এবং এক-দেড়শ হাদিস মুখস্থ করে নেওয়া।

উম্মাহর ফিকির : জাতির চিন্তা আমাদের রগ-রেশায় মিশে যাওয়া দরকার। আমাদের চিন্তা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উম্মাহর স্বার্থকেন্দ্রিক হতে হবে। ভাবতে হবে উম্মাহর কল্যাণ-অকল্যাণ বিষয়ে।

বর্তমান পরিস্থিতি, ইতিহাস এবং ফেতনা সম্পর্কে অবগতি : বর্তমান সময়ের ঘটন-অঘটন সম্বন্ধে খবর রাখা। শত্রুর চক্রান্তের প্রতি দৃষ্টি রাখা। পশ্চিমা মিডিয়ার সংবাদের বদলে নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে সংবাদ অবগত হওয়া। ইতিহাস অধ্যয়ন করে নিজেদের চিন্তাভাবনা আরও বিস্তৃত করা। ফেতনাসংবলিত হাদিসগুলো ভালোভাবে বোঝা, যাতে আগত সময়ের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা যেতে পারে।

দৃঢ়তা : যখন দীনের জন্য ইখলাসের সাথে কাজ করা হয় তখন সমাজে ঘটমান পরিবর্তনগুলো বাতিলপন্থিদের চমকে দেয়। আর তখনই পরীক্ষা ও বিপদের স্তর আরম্ভ হয়। এমতাবস্থায় মুমিনের কর্তব্য দৃঢ়তার আঁচল আঁকড়ে ধরে মজবুত থাকা। এক্ষেত্রে দুর্বলতা একজন ঈমানদারকে শেষ পর্যন্ত ছারখার করে দিতে পারে।

৭.৮: যাদে পেছনে শ্রম দেওয়া হবে

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের এই আন্দোলনে আমাদের পরিশ্রম ও উদ্যোগের লক্ষ্য হবে কারা?

১. নিজ সত্তা।
২. পরিবারের সদস্যবৃন্দ।
৩. বন্ধুবান্ধব ও মহল্লাবাসী।
৪. দরিদ্রশ্রেণি।
৫. ধনিকশ্রেণি।
৬. ছাত্রসমাজ।
৭. নারী।
৮. শিশু-কিশোর।
৯. সেলিব্রেটি।
১০.শাসকশ্রেণি।

নিজসত্তা : যেকোনো স্থায়ী কাজের সূচনা নিজের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমেই সূচনা করা হয়ে থাকে। এজন্য নিজেকে ইসলামের ছাঁচে ঢালবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। নিজের মধ্যে সে-সব গুণের সন্নিবেশ ঘটানো, যা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের একজন সৈনিকের জন্য প্রয়োজন বলে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিবারের সদস্যবৃন্দ : যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম নিজের জীবনের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের দাওয়াত দিয়েছিলেন, সেভাবে আমাদেরও সমাজ পরিবর্তনের কাজ আমাদের ঘর ও পরিবার থেকেই আরম্ভ করতে হবে। আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের দীনি ইলম শেখাতে হবে। তাদেরকে ফ্যাশন, গান-বাজনা এবং অন্যান্য ফেতনা থেকে দূরে রাখতে হবে। তবে কার্য সমাধা করতে হবে ধমকাধমকির বদলে সুন্দর আখলাকের মাধ্যমে।

বন্ধুবান্ধব ও মহল্লাবাসী : সুন্নত পন্থা হলো, বন্ধুবান্ধব ও মহল্লাবাসীদের মাধ্যমেই সংস্কার কাজ শুরু করা। কেননা তারা আমাদের জীবনাচার ও কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে অবহিত। তাদের আমরা তুলনামূলক কম সময়ে প্রভাবিত করতে পারবো। সেজন্য তাদের সামনে জীবনযাপনের উত্তম আদর্শ হাজির করা জরুরি। তাহলে আমাদের দাওয়াত অধিক প্রভাবক হবে।

দরিদ্রশ্রেণি : দরিদ্রশ্রেণিকে আমাদের দাওয়াতের প্রধান ক্ষেত্র বানাতে হবে। এই শ্রেণির লোকেরাই নবী-রাসুলদের আহ্বানে সর্বাগ্রে সাড়া দিয়েছিলেন। এই সময়েও দেখা যায়, দীনের কাজে নিয়োজিত আলেম ও দাঈদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্রশ্রেণির। দরিদ্র, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের প্রতি এই কারণেও

গুরুত্ব দেওয়া জরুরি যে, এনজিও এবং মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মধ্যেই অধিক হারে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

ধনিকশ্রেণি এবং সমাজের আধুনিক স্তর : ধনিকশ্রেণি এবং সমাজের আধুনিক স্তরকেও আমলে নিতে হবে; বরং বর্তমান সময়ে সমাজের এই শ্রেণিই সংশোধনের অধিক মুখাপেক্ষী এবং শত্রুর বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনে এরাই অধিক প্রভাবিত। তাদের চিন্তাধারা পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পিতভাবে হেকমত ও প্রজ্ঞার সাথে কাজ করতে হবে। তাদের প্রয়োজনের সমাধান ইসলামি শিক্ষার মাঝে আছে, এটা তাদেরকে দেখাতে হবে। এই লোকগুলো মিডিয়ার হাতে বন্দি। মিডিয়ার সকল বৈধ পন্থা ব্যবহার করে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে শত্রুর চক্রান্ত সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিফহাল করতে হবে।

ছাত্রসমাজ : ছাত্রসমাজ দ্বারা উদ্দেশ্য আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা। শত্রুর বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন থেকে তাদের উদ্ধার করা অতীব জরুরি। সে কারণে আধুনিক বিদ্যালয়ে এমন শিক্ষক-শিক্ষিকার উপস্থিতি আবশ্যক, যারা ইসলামের পোক্ত চিন্তা লালন করেন। তাদের মাধ্যমে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের পেছনে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু এই কার্যক্রম পরিচালিত হতে হবে কিছুটা নীরবে। হৈ-হুল্লোড় এবং ঢাকঢোল পিটিয়ে কাজ করতে গেলে সব বিগড়ে যাবে। শিক্ষার্থীদের কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সাথে বিবাদে যাওয়া বোকামি হবে। বিদ্যালয়ে ব্যক্তি পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করাই আমাদের সাফল্য এনে দেবে। সাংগঠনিক কার্যক্রম বিদ্যালয়ের বাইরের জন্যই রেখে দেওয়া।

নারী : উম্মাহর অর্ধেক সদস্যই হলো নারী। সমাজের সর্বোচ্চ সংবেদনশীল শ্রেণি তারাই। তাদের উপর বিশেষভাবে কাজ করার প্রয়োজন। এই ধারায় ওয়াজ-নসিহত, লিফলেট, বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা, ক্যাসেট, সিডিসহ সম্ভাব্য সকল উপকরণ দাওয়াতি কাজের মধ্যে শামিল করতে হবে। নারীদের মধ্যে কাজের নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে পুরুষের হাতে। তবে তাদের পর্যন্ত দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য কিংবা কোনো বার্তা প্রেরণের জন্য নারীদের মধ্যস্থতাই গ্রহণ করতে হবে। এইক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা হতে হবে সীমিত।

শিশু-কিশোর : উম্মাহর শিশু-কিশোরই তার সবচাইতে মূল্যবান অংশ। তাদের ভুল দিকনির্দেশনা একটি জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠতে পারে। আর তাদের সঠিক শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমেই বদলে যেতে পারে একটি জাতির ভবিষ্যৎ। শিশু-কিশোরদের গড়ে ওঠা বা বিনষ্ট হবার ক্ষেত্র তিনটি :

১. ঘর ও পরিবার।

২. বিদ্যালয়।

৩. খেলাধুলা এবং আনন্দ-বিনোদন।

এই তিন ক্ষেত্রেই আমাদের সন্তানদের বাঁচাতে হবে। ঘরের নারীদের পেছনে কাজ করে নতুন প্রজন্মের জন্য এমন মাতৃক্রোড় তৈরি করতে হবে, যেখানে তারা ঈমান এবং ইসলাম শিখতে পাবে। আর বিদ্যালয়ের ব্যাপারে কথা হলো, সেখানকার ব্যবস্থাপকদের সাথে মিলেমিশে তাদের দীনি পরিবেশের কাছাকাছি আনতে পারাটা হবে কল্যাণকর। সেই সাথে নিজেদেরই আদর্শ আধুনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবতে হবে। তাহলে আমরা বাচ্চাদের শিক্ষাঙ্গনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবো।

খেলাধুলা এবং আনন্দ-বিনোদনের ক্ষেত্রেও বাচ্চাদের একা ছেড়ে না দেওয়া। উপকারী যেসব খেলাধুলা আছে, যেমন : ফুটবল, দৌড়, সাইকেলিং, তিরন্দাজি, নিশানাবাজি, ভলিবল, টেনিস ইত্যাদি খেলাধুলার পরিবেশ করে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। একইভাবে কল্যাণধর্মী বিনোদন, যেমন : দীনি ও ইসলামি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা এবং ডিজিটাল মাধ্যমগুলোর ব্যবস্থা করাও জরুরি। নতুবা বাচ্চারা বিনোদনের জন্য ভুল পথে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে।

সেলিব্রেটি ও রোলমডেল : সাধারণত শিল্পী, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী এবং খেলোয়াড়দের সমাজের রোলমডেল ভাবা হয়। সাধারণ মানুষ তাদের অনুসরণ করে থাকে এবং তাদের মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। এই শ্রেণির লোকদের প্রভাবিত করা খুবই কঠিন কাজ। তা সত্ত্বেও তাদের কাছে আমাদের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা এবং তাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরি। কেননা এই শ্রেণির একজন মানুষ খুব সহজেই বহু মানুষের হেদায়েতের মাধ্যম হতে পারে।

শাসকশ্রেণি : শাসকশ্রেণি এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের চিন্তাধারা বদলে দেওয়া সবচাইতে কঠিন কাজ। কেননা সাধারণত অহঙ্কার ও পার্থিব জীবনে সম্পদ ও সম্মানের মোহ তাদের সত্যের মুখোমুখি হতে দেয় না। কিন্তু তাদেরও দাওয়াতের ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করা অতীব জরুরি। এই দাওয়াত হতে হবে আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্তির সকল চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রজ্ঞার সাথে দীনের দাওয়াত দেওয়ার মধ্যে সফলতার সম্ভাবনা বেশি। ইতিহাসে এর অনেক দৃষ্টান্তও রয়েছে। অতীতে এমন ঘটনা ঘটেছে, একজন শাসকের দীনের পথে ফিরে আসার দ্বারা সমস্ত জাতির গতিপথ বদলে গেছে।

৭.৯: আমাদের কর্মক্ষেত্র

যেসব ক্ষেত্রে প্রবেশ করে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, সেগুলো হলো :

মুসলমানদের পরিপূর্ণ ঈমান এবং সৎ আমলের প্রতি আহ্বান : এটা আমাদের সকল কাজের মূলভিত্তি। কেননা বাকি সমস্ত বিভাগের জন্য এইক্ষেত্র থেকেই ব্যক্তি বেরিয়ে আসবে।

রাজনীতি : রাজনীতিতে অংশ নেওয়াও আমাদের জন্য জরুরি। আমাদের ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো বহু বছর ধরে রাজনীতির ময়দানে কাজ করে যাচ্ছে। যদিও অ্যাসেম্বলিতে তাদের উপস্থিতির কারণে ইসলামবিরোধী আইন বাস্তবায়নের গতি কিছুটা কম হয়েছে; তবু দেশে তেমন বড় কোনো পরিবর্তন আসেনি। সে-কারণে আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আরো বেগবান করতে হবে; এবং সে লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। সাধারণ জনবসতিতে সাধারণ মানুষের জন্য জনকল্যাণমূলক কাজ করতে হবে, জনসাধারণের আস্থা অর্জন করতে হবে। যখন দীর্ঘ সময় ধরে ময়দান প্রস্তুত করা হবে এবং ভিত্তি মজবুত করে ফেলা যাবে তখন ফল দৃশ্যমান হবে। কেবল নির্বাচনের সময় ভোটের জন্য উদ্যোগী হওয়া সাধারণত হতাশাজনক ফল এনে দেয়।

অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত : এটিও সময়ের একটি বড় প্রয়োজন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের বিস্তৃত ক্ষেত্র। মুসলিম দেশগুলোর সংখ্যালঘুদের থেকেও এর সূচনা করা যেতে পারে। পরবর্তী সময়ে ক্রমান্বয়ে সারা পৃথিবীতে তার পরিধি বিস্তৃত করা হবে।

দীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা এবং তার অগ্রগতি ও গুণগত মানের উন্নতি : দীনি মাদরাসাগুলো আমাদের সকল কাজের জন্য মেরুদণ্ডের ভূমিকা পালন করে। এই কারণে পশ্চিম মাদরাসাকে খুব ভয় পায়। আমাদের এই মাদরাসাগুলোর উন্নতি ঘটাতে হবে এবং তার মান আরও উন্নত করতে হবে, যাতে এখান থেকে মজবুত আকিদা ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলেমগণ সারা পৃথিবীতে ছেয়ে যেতে পারে।

ধর্মীয় পরিবেশে আধুনিক আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা : যতক্ষণ পর্যন্ত আধুনিক বিদ্যালয় আমাদের কর্তৃত্বে না আসছে, আমরা কোনো বিপ্লব ঘটাতে পারবো না। এই লক্ষ্য সামনে রেখে এমনসব ব্যক্তি গড়ে তুলতে হবে, যাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ শক্ত-পোক্ত, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে ভালো দখল আছে এবং অকল্পনীয় ব্যবস্থাপনা-দক্ষতা রয়েছে। কেননা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান পড়ানোর জন্য, তার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এবং একই সাথে ধর্মীয় আবহ ধরে রাখার চেষ্টা অত্যন্ত বিচক্ষণতা, বোধ-বুদ্ধি ও বোঝাপড়ার দাবি রাখে।

আধুনিক বিদ্যালয়ের গতিপথের সংস্কার করা এবং সেখানকার শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা পর্ষদকে দীনের কাছাকাছি আনা : প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে ইসলামি মূল্যবোধের প্রসার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। সেজন্য সর্বপ্রথম আধুনিক বিদ্যালয় এবং ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গনগুলোর মধ্যকার দূরত্ব ও মতবিরোধ কমিয়ে আনা জরুরি, যা দুয়েকদিনে হবে না। বরং বছরের পর বছর ধরে লেগে থাকতে হবে। এই দূরত্ব দূর করবার কয়েকটি পন্থা হতে পারে, যেমন :

- দীনি মাদরাসাগুলোতে ইসলামি ইলমের দুই কিংবা তিন বছরব্যাপী কোর্সের আয়োজন করা, যেখানে আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিক্ষার অন্তর্বর্তীকালীন বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনের পর সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী অংশ নেবে।
- এমন মাদরাসা গড়ে তোলা, যেখানে এসএসসি পর্যন্ত ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষা একসাথেই প্রদান করা হবে। এখান থেকে শিক্ষা সমাপনকারী শিক্ষার্থীরা পরবর্তী সময়ে নিজেদের পছন্দমাফিক আধুনিক বা ধর্মীয় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে।
- শহর এলাকাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য নৈশক্লাসের আয়োজন করা যেতে পারে।
- আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছুটিকালীন চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী বিষয়ে কোর্স শুরু করা যেতে পারে। যেমন গ্রীষ্মকালীন কোর্স, দীন শিক্ষার বেসিক কোর্স ইত্যাদি।
- দরসে কুরআন কিংবা দরসে হাদিসের শিরোনামে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের নিজেদের পরিবেশে নিয়ে আসার উদ্যোগ করা যেতে পারে।
- আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং ব্যবস্থাপকদের দীনি মাদরাসার অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করে আনা।
- নিজের মহল্লা ও ভাই-বন্ধুদের মাঝে যারা আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, তাদের দীনের দাওয়াত দেওয়া। এবং সেইসাথে ইসলামি লেখাজোখার প্রসার ঘটানোও জরুরি।

মিডিয়া : মিডিয়া বিষয়ে পেছনের অধ্যায়গুলোর আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মিডিয়াযুদ্ধে অংশ নেওয়া আমাদের জন্য এখন অনিবার্য। সে-কারণে এইক্ষেত্রে কাজ করবার গুরুত্ব বিষয়ে বেশি কিছু বলবার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু মনে রাখবেন, মিডিয়ার জগতে প্রবেশ করবার সুপারিশের দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য কোনোভাবেই এটা নয় যে, আমরা হারাম-মাধ্যম ব্যবহারের দুঃসাহস দেখাবো। হারামের সাথে আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য থাকতে পারে না। সে-কারণে আমাদের সকল প্রয়াস-প্রচেষ্টা বৈধতার সীমার মধ্যে থেকেই করতে হবে। মিডিয়ার ক্ষেত্রেও হালাল-হারামের প্রশ্ন আসে। সেখানেও বৈধ ও অবৈধ মাধ্যম রয়েছে। তবে বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবীতে মিডিয়ার যে মাধ্যমগুলো প্রচলিত রয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তার অধিকাংশই বৈধ। হ্যাঁ, বৈধ হবার পরও ভিন্ন কোনো কারণে কিছু মিডিয়াকে অবৈধ ও পরিত্যাজ্য বলা হয়ে থাকে। অনেক সময় একটি 'কারণ' মিডিয়ার উপর অনিষ্টের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেয়, যার উপস্থিতির ফলে কিছু কিছু বৈধ গণমাধ্যম থেকে দূরে থাকাই ভালো। আর কিছু মাধ্যম আছে, যেগুলোর ব্যবহার সম্বন্ধে আলেমদের বৈধ-অবৈধতা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

যাই হোক। কিন্তু আমাদের অবস্থা তো হলো, যেই মাধ্যমগুলো সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ, সেগুলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আমরা একদমই প্রাথমিক পর্যায়ে আছি।

আমাদের নিজেদের সংবাদপত্র হাতেগোনা। আমাদের মাদরাসাগুলোর যে মাসিক পত্রিকা, তা নির্দিষ্ট একটা গণ্ডিতেই পৌঁছয় কেবল। আমাদের নিজস্ব কোনো রেডিওস্টেশন পর্যন্ত নেই। এই বিষয়গুলো উপলব্ধি করেই আমাদের সামনে এগোতে হবে। যেই মাধ্যমগুলোর ব্যবহারের বৈধতা বিষয়ে সকলে একমত, যেমন : পত্রপত্রিকা, জার্নাল, ম্যাগাজিন, রেডিওস্টেশন, ওয়েবসাইট ইত্যাদি সেগুলোর ব্যবহার থেকে বিমুখ না হওয়া।

এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝে নিতে হবে। তা হলো, যে ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের প্রতিরোধ কিংবা ইসলামি সাংবাদিকতা বিষয়ে কাজ করতে চায়, তার জন্য মিডিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখা জরুরি এবং মিডিয়ার ব্যবহার ব্যতিরেকে তার উপায় নেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সাধারণ মুসলমানদের মিডিয়ার উপকারিতা বর্ণনা করা হবে। এবং তাদের অন্তরে সিনেমা ও নাটকের ক্ষতি সম্বন্ধে সামান্য যে বিশ্বাসটুকু আছে, তা বের করে দেওয়া হবে। বাস্তবতা হলো, এই সময়ে গণমাধ্যম সাধারণভাবে অশ্লীলতা এবং ধর্মহীনতা প্রসারের সবচাইতে বড় মাধ্যম। সে-কারণে সাধারণ মুসলমানদের তা থেকে যত বেশি দূরে রাখা যায়, ততই ভালো। ঈমানের নিরাপত্তা এর মধ্যেই। আমাদের নেতৃবৃন্দের মিডিয়াতে থাকা এ কারণে জরুরি—কমপক্ষে জবাব দেওয়ার জন্য যেন দুয়েকজন বিদ্যমান থাকেন। এবং যে-সমস্ত লোক মিডিয়া থেকে লুকিয়ে থাকবার কসম করেছেন, তাদের সামনে যেন ছবির অপর পিঠও উন্মোচিত হয়ে যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি : ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনীতি ইসলামি বিধান মোতাবেক পরিচালনার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের ইসলামি অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে হবে। এরপর কাজ করতে হবে সমাজকে সুদি অর্থব্যবস্থা থেকে মুক্ত করবার লক্ষ্যে। মুসলিম ব্যবসায়ীদের বাজারে প্রচলিত মুনাফা অর্জনের সকল অবৈধ পন্থা বন্ধ করতে উৎসাহী করে তুলতে হবে।

জনকল্যাণ : সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণির আস্থা অর্জন করে জনকল্যাণমূলক কাজকে এই পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যে, সারা দুনিয়ার কোনো মুসলমানকে যেন নিজের দুঃখ-বেদনার জন্য কোনো অমুসলিম এনজিওর দিকে তাকিয়ে থাকতে না হয়।

খেলাধুলা, আনন্দ-বিনোদন, আকর্ষণীয় তথ্যমূলক কার্যক্রম : বর্তমানকালের তরুণদের সময় অবৈধ বিনোদনের পেছনে নষ্ট করা থেকে বাঁচিয়ে তখনই সঠিক কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে যখন বৈধ বিনোদনের উপায় বিদ্যমান থাকবে। এই ময়দানেও বলতে গেলে আমাদের কোনো কাজ নেই। মুসলিম শিশু-কিশোর ও তরুণদের জন্য উপযোগী বৈধ এবং কল্যাণকর বিনোদনের আয়োজন করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মেধাবী এবং তীক্ষ্ণ ধীমান তরুণপ্রজন্মকে এই বিষয়টা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৭.১০: আমাদের হাতিয়ার কী হবে?

পেছনের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে হাতিয়ার হিসাবে আমরা সেগুলোই ব্যবহার করব, বিপক্ষশক্তি যা ব্যবহার করছে; এবং যার আলোচনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। অর্থাৎ 'বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের উপকরণ' অধ্যায়ে।

আমরা শিক্ষাব্যবস্থা, মিডিয়া, তথ্যমাধ্যম, রাজনীতির ময়দান, আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিচারবিভাগে নিজেদের লোক প্রবেশ করাবো। বাণিজ্য ও অর্থনীতির ময়দানে সংস্কারের চেষ্টা করব; জনকল্যাণমূলক সংস্থা এবং এনজিও প্রতিষ্ঠা করব; বৈধতার সীমায় থেকে ফাইন আর্টস, কবিতা, সাহিত্য, স্পোর্টস এবং বিনোদনকেও ধর্মীয় মনন তৈরির জন্য ব্যবহার করব। সেই সাথে 'আমাদের বৈশিষ্ট্য' ও 'আমাদের সামর্থ্যের' অধীন যে আলোচনা করা হয়েছে, সে-সবও আমাদের জন্য উপকারী বিবেচিত হবে।

৭.১০.১: আধুনিক প্রযুক্তি

এইসবকিছুর পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অনিবার্য। শিক্ষা, দাওয়াত এবং মিডিয়াযুদ্ধের জন্য যেই উত্তম প্রযুক্তি আমাদের হাতে আসবে তা ব্যবহার করে সময় ও জনশক্তির সংরক্ষণ আমাদের কাজে আরও গতি এনে দেবে। তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়াও আমাদের চিকিৎসা, প্রকৌশল, জ্যোতির্বিদ্যা এবং আধুনিক সমরপ্রযুক্তিসহ বিজ্ঞানের সকল শাখায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি-মনীষা তৈরি করবার উৎসাহও যুগিয়ে যেতে হবে। যদিও এই সকল বিষয়ের সাথে প্রত্যক্ষভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের কোনো সম্পর্ক নেই; কিন্তু জাতির অগ্রগতির জন্য নতুন প্রজন্মকে এই বিষয়গুলোতে অগ্রসর হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের উদ্দেশ্যও মুসলিমজাতির সম্মান-মর্যাদা উঁচু করা। সে-কারণে এই বিভাগগুলোতে উৎসাহ প্রদান করার গুরুত্বও আমাদের সামনে পরিষ্কার থাকা দরকার।

৭.১০.২: আমাদের শক্তির উৎস (আমাদের কেন্দ্রসমূহ)

আমাদের শক্তির উৎস তিনটি :

১. মসজিদ।

২. মাদরাসা।

৩. খানকাহ।

এই আমাদের প্রধান তিন কেন্দ্র। সকল কাজে এই তিন কেন্দ্রের সাথে প্রতিমুহূর্তে সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি।

মসজিদ : মসজিদ মুসলমানের প্রথম দীনি কেন্দ্র। আমাদের সকল প্রকারের প্রয়াস-প্রচেষ্টা তখনই সফল হতে শুরু করবে যখন মসজিদ আবাদ হবে। এজন্য আমাদের

সর্বপ্রথম মসজিদ আবাদ করতে হবে। আমাদের দৈনন্দিনকার ব্যস্ততা যেন আমাদের জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হয়। আমাদের দীনি কর্মকাণ্ডের স্থানীয় কেন্দ্র মসজিদই যেন হয়। যদি কোনো কারণে তা সম্ভব না হয়, তারপরও নামাজ, জিকির, তেলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমে মসজিদ আবাদ রাখার ক্ষেত্রে প্রত্যেককে অবশ্যই অংশ নিতে হবে।

মাদরাসা : দীনি মাদরাসা সর্বপ্রকারের দীনি কাজ এবং ইসলামি কর্মকাণ্ডের উৎস। তাকে যথাসম্ভব সহায়তা করে যাওয়া। নিজের বংশের সবচাইতে মেধাবী ও নির্বাচিত শিশুদের মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে কুরআন কারিমের হাফেজ এবং আলেম বানানো। এ ছাড়াও সকল শিশুর শিক্ষাজীবনের একটা অংশ দীনি মাদরাসায় অতিবাহিত করা খুবই জরুরি।

আমাদের প্রতিটি সমস্যা এবং নিত্যনতুন অবস্থার শরয়ি সমাধানের জন্য বারবার মাদরাসা এবং মুফতি সাহেবদের শরণাপন্ন হতে হবে। তাদের সিদ্ধান্ত এবং ফতোয়াই আমাদের জন্য হবে চূড়ান্ত কথা। তাদের চিন্তার বিপরীতে যদি নিজের চিন্তাকে সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে নতুন ফেতনা জন্ম নেওয়ার আশঙ্কাই বেশি।

খানকাহ : আমাদের নিজেদের হৃদয়ের শুদ্ধতা, চারিত্রিক দোষত্রুটি দূরীকরণ এবং আত্মার সংশোধনের জন্য খানকাহর সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে হবে। আমাদের খানকাহগুলোই আমাদের তরবিয়াত ও আত্মশুদ্ধির প্রাণকেন্দ্র। নিজের ত্রুটিবিচ্যুতির সংশোধন এবং কাজে বরকত লাভের জন্যও আকাবির-মাশায়েখের তত্ত্বাবধান এবং তাদের দোয়ার অতীব প্রয়োজন।

শেষকথা

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই সম্বন্ধে অধ্যয়ন এবং তাকে গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ কখনোই সামরিক লড়াই তথা জিহাদের গুরুত্ব কমিয়ে আনা নয়। এই দুটি একটি অপরটির সাথে সম্পর্কিত এবং নির্ভরশীল। বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের মাধ্যমে জিহাদের উদ্দেশ্য তথা 'ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ'র পূর্ণতা আসে। কেননা মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করেই কোনো জাতির মূলে বিজয় লাভ করা সম্ভব। তেমনিভাবে জিহাদের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে সহায়তা লাভ হয়। কারণ অস্ত্রের শক্তিই জ্ঞান ও চিন্তাজগতের কর্মীদের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার পরিবেশ এনে দেয়।

যেভাবে শত্রুর মনস্তাত্ত্বিক ও সামরিক উভয় 'ব্যারাকে'র সৈন্য ইসলামের বিরোধিতায় জোট বেঁধেছে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে ময়দানে নেমেছে, সেভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের কর্মী এবং রণাঙ্গনের মুজাহিদদলও উদ্দেশ্যের বিচারে এক ও অভিন্ন। সুতরাং নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাঝে আমাদের কোনোভাবেই জিহাদের গুরুত্ব কম করে দেখানো শোভনীয় নয়। যেখানেই শরিয়তের বিধান মোতাবেক জিহাদ হবে, সেখানেই আমাদের সমর্থন থাকা দরকার।

৭.১১: সমস্ত বাতিল শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ কেন?

পরিশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিতে চাই। প্রশ্ন হলো, ইহুদি-খ্রিষ্টান, হিন্দু ও কম্যুনিস্ট এদের মধ্যকার বিরোধ ও লড়াই কখনোই তীব্রতর হতে দেখি না, তাদের পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘর্ষ হলেও তা তেমন কঠিন আকারে হয় না; কিন্তু ইসলামের প্রশ্নে এত দ্রুত সময়ে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে পড়ে কীভাবে? অতীতেও এর দৃষ্টান্ত কম নয়। আর বর্তমানে তো সমস্ত দৃশ্য এই প্রশ্নেরই সমর্থন করছে। কিন্তু এমন কেন? ইসলামের মূলে কী এমন ডিনামাইট রয়েছে, যাতে ভীত-শঙ্কিত হয়ে সকলে ইসলামের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে পড়ে? তাদের সকলের ইসলামে শঙ্কাটা কী? ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের সংহতির পেছনের কারণটা কী?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো, তাদের মূল ভয়টা ইসলামের নির্ভুল ব্যবস্থাপনা, হৃদয়গ্রাহী আহ্বান এবং অপরাজেয় নীতিমালা নিয়ে। এগুলো ইসলামের ত্রুটি নয়; বরং সৌন্দর্য, যেগুলোকে তারা এমন তীব্রভাবে ভয় করে। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের একতাবদ্ধ হওয়া মূলত ইসলামের সত্যতা ও হক্কানিয়াতের প্রমাণ। আলোর কিরণ দেখে অন্ধ তো ভীত হতেই পারে। এবং ঘরের সুরক্ষা দেখে চোরই তো ঘাবড়ে যায়।

ইসলাম শত বছর ধরে বিশ্বের জাতিসত্তার সুরক্ষার দায়িত্ব আনজাম দিয়ে আসছে। ইতিহাসে বিশ্বের বহু বড় বড় নামজাদা নিরপেক্ষ ব্যক্তির সাক্ষ্য বিদ্যমান যে, একটি ধর্ম এবং জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম সকল প্রকারের দোষ ও দুর্বলতা এবং ত্রুটি ও বিচ্যুতি থেকে মুক্ত। কারণ, এই ধর্মকে কোনো সৃষ্টি নয়; বরং স্বয়ং স্রষ্টা প্রণয়ন করেছেন। আর স্রষ্টার জ্ঞান অসীম। তাতে ভুলের কোনো শঙ্কা থাকে না।

ইসলামি মূলনীতি ও বিধানের প্রধান উৎস কুরআন। তা মানুষের প্রয়াস-প্রচেষ্টার ফল নয়; বরং স্রষ্টার কালাম। আর এ কারণেই ইসলাম চোদ্দশ বছর ধরে নিজের মৌলিকত্ব এবং মূলনীতির উপর টিকে আছে। কোনো সংস্কারক কিংবা মুজাদ্দিদের কখনো এই প্রয়োজন দেখা দেয়নি যে, তিনি ইসলামের বুনিয়াদি বিষয়গুলো আবিষ্কার করে তাকে নতুন রূপ দান করবেন। নিজের এই চিরন্তন ও স্থায়ী রূপের কারণেই ইসলামের কখনো ভ্রান্ত চিন্তা-দর্শনের সাথে সমঝোতা করবার প্রয়োজন পড়েনি।

এর বিপরীতে পৃথিবীর সকল ধর্ম ও দর্শনের মূলেই বহু দুর্বলতা এবং ত্রুটিবিচ্যুতি বিদ্যমান। কেননা সেগুলো নিখাদ আসমানি শিক্ষার ভিত্তিতে প্রণীত নয়। সেগুলোর রূপকার কোনো-না-কোনো মানুষ, যার জ্ঞান সীমিত। এইসব ধর্মের মৌলিক উৎসও মানুষেরই তৈরীকৃত এবং ভুল ও বিচ্যুতির সমাহারমাত্র। এই সকল চিন্তা-দর্শন ও ধর্মপ্রণেতাদের কাছেও নিজেদের 'ধর্মে'র দুর্বলতা ও বিচ্যুতি অনবরত প্রকাশ হতেই থাকে। সে-কারণেই বারবার তারা নিজেদের চিন্তা-দর্শন ও ধর্মের মাঝে মৌলিক সংস্কার এনে থাকে।

নিজের ব্যবস্থাপনা এবং গঠনতন্ত্রের ক্ষতিকর এমনসব দুর্বলতার কারণে অধিকাংশ সময়ই কিছু ভ্রান্ত দর্শন অন্য ভ্রান্ত চিন্তা-দর্শনের সাথে আদান-প্রদানে

সম্মত হয়ে যায়। এই আদান-প্রদান কখনো মৌলিক বিষয়েই (উসুল) একে অন্যের চিন্তাগ্রহণের আকৃতিতে হয়ে থাকে, আবার কখনো হয়ে থাকে শাখাগত (ফুরু) বিষয়ে অদল-বদলের আকৃতিতে। কখনো কখনো প্রকাশ্যেই একে অন্যের চিন্তা গ্রহণ করবার কথা বলে থাকে। এবং অপরের চিন্তা বাতিল জানবার পরও তার সাথে সুর মিলিয়ে বসে। যেমন আহজাবযুদ্ধের প্রারম্ভে মক্কার মুশরিক ও ইহুদিদের মধ্যকার আলাপে ইহুদিরা কুরাইশের মূর্তিপূজার অসারতা জানা সত্ত্বেও তার প্রশংসা করে এবং তাকে সঠিক বলে মত দেয়।

এভাবে দুটি বাতিল চিন্তাধারী নিজেদের দর্শনের দুর্বলতা অনুভব করা সত্ত্বেও একে অন্যকে বাহবা দিয়ে এমন এক চিন্তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পড়ে, যার মধ্যে বাতিলের সাথে সম্মিলনের কোনো উপাদান নেই, যার মধ্যে মিথ্যার কোনো অংশ নেই এবং যার মধ্যে ন্যায় ও সত্য বিরোধী হবার কোনো প্রকারের সম্ভাবনাই নেই। স্পষ্টই যে, এমন দর্শন ও ধর্মই কেবল নিজের বিশুদ্ধতা ধরে রাখতে পারে। আর এই বাস্তবতা কারুর অস্বীকার করবার জো নেই, উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য কেবল ইসলামেরই রয়েছে।

কারণ, আল্লাহ তায়ালার সত্য ও বিশুদ্ধ দীন একমাত্র ইসলামই। সৃষ্টির প্রণীত কোনো জীবনব্যবস্থা এবং চিন্তা-দর্শনের সাথে ইসলামের সন্ধি হতে পারে না। এ কারণেই সমস্ত ভ্রান্ত ধর্ম ও মতাবলম্বীদের সাথে কেবল ইসলামেরই সংঘর্ষ বাঁধে। এবং বাতিলের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তি কেবল তার বিরুদ্ধেই লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। এবং তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য পরস্পরে সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে।

যখন ভ্রান্ত চিন্তা-দর্শন পরস্পরে সংহত হয় এবং বাতিলপন্থিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন তাকে দুনিয়ার সামনে 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও' পলিসি অথবা 'মানববাদে'র মতন চিত্তাকর্ষক শিরোনাম দেওয়া হয়। চিন্তার এই সংহতি ও আদান-প্রদানের সুযোগ থাকাতে ভ্রান্ত দর্শন ও চিন্তাধারার পূজারিরা রাজনৈতিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশুদ্ধ ও শুদ্ধ চিন্তা-দর্শনের বিরুদ্ধে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে নেয়। এই ঐক্য এতটুকু পোক্ত হয়, যতটুকু তার সাথে লাভ ও স্বার্থ জড়িত। যদি উন্নতি-অগ্রগতির কোনো ভালো প্রত্যাশা থাকে তাহলে সেই ঐক্যের বন্ধন মজবুত হয়। আর যদি সুবিধা তেমন না হয় এবং প্রত্যাশাও প্রাণ হারাতে থাকে তাহলে ঐক্য-সংহতি ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়তে থাকে।

বর্তমান সময়ে বাতিল শক্তি ইসলামের বিপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামরিক লড়াইয়ে সাফল্য লাভ করছে; এবং ইসলামি বিশ্বে নিবদ্ধ তাদের লোভাতুর দৃষ্টিবাণ বলে দিচ্ছে যে, তাদের প্রত্যাশা এখনো বাকি আছে। যে কারণে তাদের ঐক্য ও সংহতিও টিকে আছে। এই অবস্থাতেও ইসলামের ধারাবাহিক প্রতিরোধ এবং বাতিলের অভ্যন্তরে অবস্থানকারীদের থেকেও নিজের সত্যতার সাক্ষ্য আদায় করে নেওয়া ইসলামের সত্য ও আসমানি দীন প্রমাণিত হবার জন্য যথেষ্ট।

৭.১২: ইসলামি চিন্তা-দর্শন কেন জয়ী হবে?

একথা সুনিশ্চিত যে, সত্য-মিথ্যার এই দ্বন্দ্বে জয় ইসলামি চিন্তা-দর্শনেরই হবে। কেননা ইসলামই একমাত্র মানুষের সেই বিশুদ্ধ ফিতরাত বা স্বভাবের প্রতিনিধিত্ব করে, যার মোতাবেক স্রষ্টা তাকে সৃষ্টি করেছেন। নিচে সামগ্রিক চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে ইসলাম ও বাতিলপন্থিদের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ হাজির করা হলো :

ইসলাম : মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য অস্বীকার করে।

পশ্চিম : সারা দুনিয়ার উপর কতক পুঁজিপতির আধিপত্যের স্বীকৃতি দেয়।

ইসলাম : মানুষকে আল্লাহর নিখাদ বান্দা বানাতে চায়, যে আল্লাহর উপর নির্ভেজাল ঈমান রাখবে এবং তার রাসুলের অনুসরণ করবে।

পশ্চিম : বন্দেগির পক্ষপাতি নয়। তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের ব্যবস্থাপনা অস্বীকার করে।

ইসলাম : প্রত্যাশা করে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হয়ে যাক।

পশ্চিম : তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য কেবল দুনিয়াই। আখিরাত হয়তো-বা একদমই তাদের সামনে হাজির নেই; কিংবা থাকলেও আখিরাত তাদের চোখে কোনো এমন কিছু নয়, যার জন্য কার্যত কোনো প্রয়াস-প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে।

ইসলাম : বর্ণ, গোত্র, বংশ, ভাষা, দেশ অথবা অন্য কোনো ভিন্নতার ভিত্তিতে গোঁড়ামি, গর্ব এবং অহঙ্কারের পূর্ণ বিরোধী।

পশ্চিম : বর্ণ, গোত্র, দেশ এবং আরও অনেক ভিন্নতার ভিত্তিতে গর্ব-অহঙ্কার ও বিদ্বেষের পক্ষপাতি।

ইসলাম : একটি পবিত্র যাপিত জীবনের আহ্বায়ক, যা পরিবার-ব্যবস্থার সুরক্ষা দেয় এবং তাকে একটি মজবুত ও সুদৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে।

পশ্চিম : জীবনযাপনের ক্ষেত্রে কোনো পবিত্রতার ধার ধারে না। পরিবার-ব্যবস্থার বন্ধন থেকে মুক্তি চায়, যাতে নারী-পুরুষের মেলামেশায় আরও অধিক স্বাধীনতা লাভ হয়।

ইসলাম : বান্দাকে আল্লাহ ও তার বান্দা উভয়েরই অধিকার আদায়ে সহজতা প্রদান করে থাকে।

পশ্চিম : স্রষ্টার হক তাদের কাছে এক রসিকতা। সৃষ্টির অধিকারের ব্যাপারে তারা এতটা ব্যাপ্তি দিয়ে থাকে যে, বৈধ-অবৈধতার পার্থক্য পর্যন্ত ভুলে বসে। তাদের সমাজে নিকৃষ্ট কামনা চরিতার্থ করা এবং ঘৃণ্য স্বাদ আস্বাদন করাও মানবীয় অধিকার।

ইসলাম : নিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থতার মূল্যায়ন করে। ভালো ও সৎকাজের প্রতিদান আল্লাহর থেকে পাবার জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকে।

পশ্চিম : কেবল অর্থ ও সম্পদের ভাষা বোঝে। তাদের ইতিবাচক কাজও অর্থসম্পদ ও পার্থিব লাভের উপর নির্ভরশীল।

ইসলাম : পারস্পরিক সন্তোষের অধীন জাতি ও দেশের মধ্যে কল্যাণকর চুক্তির জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে। আর ধোঁকা-প্রতারণা, চুক্তি ভঙ্গ করা এবং ব্ল্যাক মেইলিংয়ের কঠোর বিরোধিতা করে। ইসলামের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুরূহ, যেখানে মুসলিম কোনো অমুসলিম শক্তির সাথে চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

পশ্চিম : জাতিকে লুণ্ঠন এবং দুর্বল জাতিকে নিঃস্ব করবার জন্য অংশীদারমূলক চুক্তির উৎসাহ দিয়ে থাকে। পশ্চিম ধোঁকা-প্রতারণা এবং চুক্তিভঙ্গ ছাড়া কিছু বোঝে না। তাদের ইতিহাসে মুসলিম দেশ ও দুর্বল দেশের সাথে কৃত চুক্তি রক্ষা করেছে এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। সম্ভবত তেমন কোনো দৃষ্টান্ত নেইও তাদের ইতিহাসে।

ইসলাম : ইসলাম বলে, মূল বিষয় হলো ব্যক্তিক আমল। ইসলামে একের উপর অন্যের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই তাকওয়া ও খোদাভীতি ছাড়া।

পশ্চিম : ইজ্জত-সম্মানের মানদণ্ড হলো ধনসম্পদ, আভিজাত্য, খ্যাতি এবং কোনো শাস্ত্রে দক্ষতা। কোনো ব্যক্তি ব্যক্তি-জীবনে হতে পারে ব্যভিচারী কিংবা মদ্যপ কিংবা হতে পারে সমকামীই। সে তার পুঁজি, খ্যাতি এবং ব্যক্তিগত দক্ষতার কারণে বড় মানুষ বলে বিবেচিত হবে।

ইসলাম : ধর্ম, বর্ণ ও বংশের ঊর্ধ্বে গিয়ে মানুষের প্রাণের সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেয়। কুরআন বলছে :

اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ۚ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

> কেউ যদি প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারুর জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে।[১১২]

পশ্চিম : গ্রিক এবং রোমান যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান পর্যন্ত মানুষের প্রাণ ও সম্পদের কখনোই কোনো পরোয়া তারা করেনি। জাপানে অ্যাটমিক হামলা, ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধ এবং ফিলিস্তিনে মুসলিম-রক্তের সস্তা প্রবহমানতা তার সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত।

ইসলাম : এর ভাষায় আন্তর্জাতিক শান্তির বার্তা রয়েছে। তাতে নিরাপত্তা, ভালোবাসা, বন্দেগি এবং বিশ্বজগতের স্রষ্টার একক সত্তার প্রতি দৃঢ় ঈমানের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে।

পশ্চিম : এইসব আভিজাত্য থেকে একেবারেই মুক্ত।

এ হলো চারিত্রিক ও সর্বজনীন মূল্যবোধের এমন কিছু পার্থক্য, যা ইসলামি চিন্তা-দর্শনকে পশ্চিম বা বস্তুবাদী দর্শনের উপর স্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব এনে দেয়।

---

[১১২] সুরা মায়িদা, আয়াত ৩২

৭.১৩: গতকাল এবং আজ

বর্তমানে ইসলাম এবং পশ্চিমের মধ্যকার বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে, পশ্চিম বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সামরিক ক্ষেত্রে যেকোনোভাবে শ্রেষ্ঠ। ইসলাম ও পশ্চিমের মধ্যকার বর্তমান এই লড়াই অতীতের যেকোনো সময়ের থেকে ভিন্ন। অতীতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সবচাইতে বড় সংঘর্ষ মধ্যযুগের ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, যা সংঘটিত হয়েছিল একটি বিশেষ অঞ্চলে। বর্তমানের লড়াই চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির, যা দুনিয়াজুড়ে বিস্তৃত। মাধ্যম ও উপকরণের বিবেচনায়ও পশ্চিম এক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। এ ছাড়াও ইসলামের দাঈ, মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সৈনিকগণ এক্ষেত্রেও সংখ্যায় অনেক কম। হাতিয়ার ও উপকরণের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন, মোকাবেলা ও প্রতিরোধ করে চলেছেন, যার প্রভাব ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হচ্ছে। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ জনাব শফিকুল ইসলাম ফারুকির বক্তব্য পুরোপুরিই সঠিক। তিনি বলেন :

> "বস্তুপূজার এইকালেও বিশ্বের এমন কোনো অঞ্চল নেই, যেখানে মানুষ বস্তুপূজা ছেড়ে অত্যন্ত নীরবতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করে নিচ্ছে না। পশ্চিমে মানুষের এই ক্রমবর্ধমান প্রবণতারই ভয় করছে ক্রুসেডের ধ্বজাধারীরা।"[১১৩]

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তার আলো পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন; যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।[১১৪]

যা লিখলাম, সেই বক্তব্য এই চিন্তা থেকেই হাজির করা হয়েছে যে, আমাদের তরুণেরা বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করে ময়দানে অবতীর্ণ হবে, যেন সামনের দিনগুলোতে আমাদের পরিণতি আরও উত্তম হয়।

আলহামদুলিল্লাহ, বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন বিষয়ে এই কাজটি মঙ্গলবার, শাবানের ১৫তম রাত ১৪৩১ হিজরি (২৭ জুলাই ২০১০) ১২.৩০ ঘটিকায় পূর্ণ হলো। এরপর বিভিন্ন কারণে তার ছাপা ও প্রকাশে বিলম্ব হতে থাকে। শেষমেশ কম্পোজিং এবং পুনর্নিরীক্ষার কাজ আজ রাত সাড়ে সাতটা, বৃহস্পতিবার ৬ মহররম ১৪৩৬ হিজরিতে (৩০ অক্টোবর, ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে) নুর আবাদ, হাসান আবদালে পূর্ণ হয়। আল্লাহ তায়ালা কাজটি কবুল ও মঞ্জুর করুন। এবং জাতির জন্য কল্যাণকর বিবেচিত করুন।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى حَبِيْبِهٖ وَاٰلِه وَأَصْحَابِه أَجْمَعِيْنَ

ইসমাইল রেহান
নুর আবাদ, হাসান আবদাল

[১১৩] হেলাল ওয়া সালিব কা মারেকা
[১১৪] সুরা সাফ, আয়াত ৮

আহমাদ সাব্বির
জন্ম: ১৪ জুলাই ১৯৯৬ ঈসায়ী।
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা: তাকমীল।
লেখালেখি: গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ, জীবনী ইত্যাদি।

প্রকাশিত গ্রন্থ
কিংবদন্তির কথা বলছি (২০১৯)
জায়নামাজ (২০২০)
আমার ঘুম আমার ইবাদত (২০২০)
সন্তান গড়ার ১১০ টিপস, অনূদিত (২০২১)

ই-মেইল:
ahmedsabbir7422@gmail.com